মানুষের ইতিহাস

প্রাচীন যুগ

আবদুল হালিম
নূরুন নাহার বেগম

মানুষের ইতিহাস প্রাচীন যুগ গ্রন্থে পুরান পাথর যুগের শিকারী সমাজ পর্বে মানুষের বিবর্তন : রামাপিথেকাস, অস্ট্রালোপিথেকাস থেকে নিরাঙ্গার্থাল মানুষ ও বুদ্ধিমান মানুষের উত্থান, আদিম সমাজের পরিচয়, মাতৃতন্ত্র, ক্ল্যান সংগঠন ও চিন্তাধারার সামাজিক ভিত্তি আলোচিত। নতুন পাথর যুগের সংস্কৃতি পর্বে কৃষির অধিকার, নবোপলীয় সমাজের পৃথিবীব্যাপী বিস্তার, সভ্যতার প্রস্তুতিপর্ব : তাম্রযুগ ও ব্রোঞ্জযুগ বিষয় বিধৃত। প্রাচীন মিশরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় পর্বে ধর্ম, সামাজিক, অর্থনৈতিক, জোতির্বিদ্যা, বিজ্ঞান ও জ্যামিতি, চিকিৎসাবিদ্যা, শিল্পকলার অবস্থা আলোচিত। মেসোপটেমীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির পরিচয়, সুমেরীয় সংস্কৃতি, ব্যাবিলনীয় যুগের সংস্কৃতি, আসিরীয় যুগের সংস্কৃতি, ক্যালডীয় যুগের সংস্কৃতিও সমানভাবে আলোচিত।

প্রাচীন পারস্য সভ্যতা, সাম্রাজ্য ও তার ইতিহাস,পারসিক সংস্কৃতি ও তার প্রভাব, হীব্রু সভ্যতা, ধর্ম ও জাতির উৎপত্তি ও ইতিহাস, হিট্রাইট, ফ্রিজীয়, লিডীয়, ফিনিশীয় ও মাইনোসীয় সভ্যতা বিষয়টি আলোচিত।

গ্রীসীয় সভ্যতার আদি পর্যায়, হোমারীয় যুগ, গ্রীসীয়-পারসিক যুদ্ধ, এথেনীয় শক্তির অভ্যুদয়, পেরিক্লিসের যুগ, পেলোপনেসীয় যুদ্ধ, আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য বিষয় আলোচিত। গ্রীসীয় সংস্কৃতির পরিচয়, হেলেনিষ্টিক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, রোমক সভ্যতা, আদি ইতিহাস, রাজতন্ত্র, প্রজাতান্ত্রিক রোম, রোমের গৃহযুদ্ধ, সামাজিক ইতিহাস, সভ্যতার বিভিন্ন দিক ও ঐতিহ্য আলোচিত।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পর্বে সিন্ধু সভ্যতার নগর জীবন, জীবিকা ও শিল্প দ্রব্য ও ধর্ম বিশ্বাস এবং আর্যজাতি ও বৈদিক সভ্যতার ধর্ম, বৈদিক যুগের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা, জীবিকা ও আর্থিক ব্যবস্থা, বর্ণাশ্রম, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব, মগধের অভ্যুদয় ও বৈদেশিক আক্রমণ এবং মৌর্য ও গুপ্তযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি আলোচিত।

চীনের প্রাচীন ইতিহাস পর্বে পুরোপলীয় ও নবোপলীয় সংস্কৃতি, ব্রোঞ্জ সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন রাজবংশের বিষয়টি আলোচিত।

আমেরিকা মহাদেশের সংস্কৃতি, মায়া, আজটেক, ইন্‌কা সভ্যতার উৎপত্তি প্রসঙ্গ আলোচিত। এছাড়া কোরিয়া ও জাপানের প্রাচীন ইতিহাস, অষ্ট্রেলিয়ার ও ওশেনিয়ার ইতিহাস, আফ্রিকা মহাদেশের প্রাচীন ইতিহাস ও ইউরেশিয়ার বর্বর জাতিদের ইতিহাস সহ সকল বিষয় প্রাঞ্জল ভাষায়, ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ধারাবাহিকতায় স্বচ্ছন্দভাবে আলোচিত।

ISBN 984 401 452 2

www.icsbook.info

মানুষের ইতিহাস

প্রাচীন যুগ

www.icsbook.info

টাইটেল পেজের ছবিটি খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর একটি গ্রীসীয় (এথেনীয়) চিত্রিত মাটির পাত্রের প্রতিলিপি। পাত্রের গায়ে প্রাচীন গ্রীসের কামারশালার কাজের দৃশ্য আঁকা হয়েছে।

www.icsbook.info

মানুষের ইতিহাস

প্রাচীন যুগ

আবদুল হালিম
নূরুন নাহার বেগম

আগামী প্রকাশনী

www.icsbook.info

দশম মুদ্রণ পৌষ ১৪১৯ জানুয়ারি ২০১৩

আগামী প্রথম সংস্করণ ১৩৯৩ মার্চ ১৯৮৭
বর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ শ্রাবণ ১৪০০ আগস্ট ১৯৯৩
পঞ্চম মুদ্রণ আষাঢ় ১৪০৩ জুলাই ১৯৯৬
ষষ্ঠ মুদ্রণ বৈশাখ ১৪০৫ মে ১৯৯৮
সপ্তম মুদ্রণ চৈত্র ১৪০৭ মার্চ ২০০১
অষ্টম মুদ্রণ আশ্বিন ১৪১১ অক্টোবর ২০০৪
নবম মুদ্রণ চৈত্র ১৪১৪ মার্চ ২০০৮

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১-০০২১

প্রচ্ছদ আবদুল মুকতাদির

মুদ্রণ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন ঢাকা

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা

MANUSHER ITIHASH : Prachin Joog [A History of Mankind
Ancient Period : History of Modern Europe (1789-1919)]
by Abdul Halim & Nurunnahar Begum

Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka-1100, Bangladesh.
Phone : 711-1332, 711-0021
e-mail : info@agameeprakashani-bd.com

Tenth Printing January 2013

Price : Taka 400.00 only.

ISBN 978 984 04 1538 0

www.icsbook.info

পরম শ্রদ্ধেয়
শহীদ মুনীর চৌধুরীর স্মৃতির উদ্দেশে

তাঁর প্রতিভা, জ্ঞান ও স্বচ্ছ চেতনা
তাঁর উদারতা, মানবতাবোধ ও প্রশস্ত হৃদয়
তার সংস্কারমুক্ত, সমাজ-সচেতন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী
আমাদের সবার পাথেয় হোক

www.icsbook.info

ভূমিকা

'মানুষের ইতিহাস' গ্রন্থে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির সভ্যতার ও সংস্কৃতির ইতিহাস লিখিত হয়েছে। সাধারণভাবে যাকে পৃথিবীর ইতিহাস বা সভ্যতাবলীর ইতিহাস নামে অভিহিত করা হয়, এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু তাই। তথাপি যে একে মানুষের ইতিহাস বলা হল তার বিশেষ কারণ আছে।

মানবসমাজ এক ও অখণ্ড। একদা ইউরোপের উপনিবেশবাদী পণ্ডিত-সমাজ প্রচার করতেন যে, এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণ ও পীতকায় মানুষরা শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়দের চেয়ে নিম্নপর্যায়ের মানুষ। পৃথিবীর সব দেশের মানুষ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক কালের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব সুশিক্ষিত ইতিহাসবিদ এবং পণ্ডিতই বিশ্বাস করেন যে সমগ্র মানবসমাজ এক ও অখণ্ড। এবং পৃথিবীর শিক্ষিত ও পণ্ডিতসমাজে এ ধারণাও ক্রমশ প্রসার লাভ করছে যে মানব সমাজের ইতিহাস, অখণ্ড ও অবিভাজ্য। অবশ্য এ কথাটার নানা রকম ব্যাখ্যা হতে পারে।

আধুনিক মানবসমাজের উৎপত্তি হয়েছিল একটা মাত্র উৎস থেকে। আদিম এ মানুষদের সংস্কৃতি ছিল পুরান পাথর যুগের শিকারী সমাজের সংস্কৃতি। এ যুগে মানুষ তার সামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে নিজেদের দেহের বিবর্তন ঘটিয়ে যে সুসম্পূর্ণ মানব দেহের উদয় ঘটিয়েছিল, আধুনিক পৃথিবীর সব কটি জাতির প্রত্যেকটি মানুষ সে সুপরিণত মানবদেহেরই উত্তরাধিকারী মাত্র। আদিম শিকারী মানুষ যে সমাজ সংগঠন এবং বস্তুগত ও ভাবগত সংস্কৃতি সৃজন করেছিল তার অনেক উপাদানে আজকের পৃথিবীর সব কটি জাতির ও সমাজের মূল ভিত্তিরূপে কাজ করছে। আদিম মানুষ যে ভাষার উদ্ভাবন ঘটিয়েছিল সে ভাষা ও চিন্তাক্ষমতা, তার উদ্ভাবিত প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলী এবং নানাবিধ সামাজিক আচরণ ইত্যাদি আজকের দিনের সব মানবগোষ্ঠির সামাজিক আচরণের মূল ভিত্তিরূপে বিরাজ করছে। আজকের পৃথিবীর সব মানুষ ও জাতি এ অচ্ছেদ্য যোগসূত্র ও বন্ধনে আবদ্ধ। আদিম শিকারী সমাজের মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে ক্রমশ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপর দশ হাজার বছর আগে যখন পশ্চিম এশিয়াতে কৃষিভিত্তিক সমাজের উৎপত্তি ঘটেছিল তখন সে সংস্কৃতিও সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছিল। এ দুই সমাজের সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সমাজের বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু এ সকল মানব সমাজ কখনও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল না। ছয় সাত হাজার বছর আগে যখন মিশর ও ব্যাবিলনে ব্রোঞ্জযুগের নগর সভ্যতার উদয় ঘটেছিল তখন ক্রমশ তার প্রভাবে ও অনুকরণে পশ্চিম এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে এবং সিন্ধু অববাহিকায়, চীনে,

www.icsbook.info

ভূমধ্যসাগরের ক্রীটে বোঞ্জযুগের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এরপর ব্রোজঞ্জযুগের বিভিন্ন অঞ্চলের নানাবিধ আবিষ্কার, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, প্রভৃতির সুযোগ ও প্রভাব লাভ করার ফলে হিট্টাইটরা লোহার আবিষ্কার করেছিল, ফিনিশীয়রা বর্ণমালা আবিষ্কার করেছিল। এবং লিডীয়রা মুদ্রা আবিষ্কার করেছিল। এ সবের ভিত্তিতে গ্রীসে ও অন্যত্র গড়ে উঠেছিল লৌহযুগের উন্নত সভ্যতা। এ সভ্যতার নানা বস্তুগত আবিষ্কার, উপকরণ ও চিন্তাধারা আবার পৃথিবীতে অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছে। আবার মধ্যযুগে চীন, ভারতবর্ষে যে সব আবিষ্কার ঘটেছে (যথা, চীনের কম্পাস ইত্যাদি; প্রাচীন ভারতের ১০-ভিত্তিক গণনা পদ্ধতি) তার ভিত্তিতে ইউরোপে ধনতান্ত্রিক সমাজের উদয় ঘটেছিল। মানুষের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে এ কথা স্পষ্ট দেখা যায় যে, সব যুগেই এক জাতি অপর জাতির কাছে থেকে বা বৃহত্তর মানব সমাজের কাছ থেকে বস্তুগত ও ভাবগত সম্পদ ও উপকরণ সংগ্রহ করে নিজেদের পুরিপুষ্টি সাধন করেছে এবং মানব সমাজের অগ্রগতিতে সহায়তা করেছে। মানুষের ইতিহাস তাই মানব সমাজের অখণ্ড ইতিহাস।

কিন্তু মানব সমাজ অবিভাজ্য একথা যেমন সত্য, মানব সমাজ খণ্ড খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন এ কথাও সমান সত্য। পৃথিবীর সব মানুষ মূলত এক হলেও তারা বিভিন্ন দেশ ও জাতিসত্তার অন্তর্গত। মানুষের ইতিহাস মূর্ত হয়েছে, বাস্তবায়িত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও দেশের পরিসরে। মানুষের ইতিহাস তাই ভিন্ন ভিন্ন জাতির খণ্ডিত ইতিহাসের যোগসমষ্টিও বটে।

'মানুষের ইতিহাস' গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে মানব ইতিহাসের এ দুই প্রধান বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে। প্রথমেই মানুষের উৎপত্তি ও আদিম সমাজের পরিচয় আমরা বিস্তৃতভাবে প্রদান করেছি, যাতে পরবর্তী সভ্য সমাজের উৎপত্তির পটভূমি অনুধাবন করা সহজ হয়। (জড়জগৎ ও জীবজগতের বিবর্তনের পটভূমিতে মানুষের উৎপত্তির বিষয় আলোচনা করলে আরও ভাল হত; তবে, আবদুল হালিমের লেখা 'বিশ্বজগতের পরিচয়' গ্রন্থটি পাঠ করলে এ বিষয়টা আরও বিস্তৃত ভাবে জানা যাবে।) আদিম সমাজের পরবর্তী পর্যায়ে সব সমাজের ইতিহাসকে বিভিন্ন দেশ ও জাতির ইতিহাসরূপে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, ব্রোঞ্জ ও লৌহযুগের মিশরীয়, মেসোপটেমীয় (সুমেরীয়, ব্যবিলনীয়, আসিরীয়, ক্যালডীয়), পারসিক, হিব্রু, হিট্টাইট, ফ্রিজীয়, লিডীয়, ফিনিশীয়, ক্রীটীয়, গ্রীসীয়, রোমক, ভারতীয়, চৈনিক, কোরীয়, জাপানী, মায়া, আজটেক, ইনকা প্রভৃতি সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয় পৃথকভাবে দেওয়া হয়েছে। আবার বিভিন্ন সভ্যতা সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও প্রভাবের বিষয়ও যতদূর আবিষ্কৃত হয়েছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল প্রাচীন সভ্যতার সমকালে যে সব জাতি অনুন্নত অবস্থায় ছিল তাদের বিষয়ও বিশ্ব ইতিহাসের পটভূমিকায় আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, অষ্ট্রেলিয়া ও ওশেনিয়ার আদিবাসী, আফ্রিকার কৃষ্ণ অধিবাসী, ইউরেশিয়ার বর্বর সমাজ (শক, হুন, মোঙ্গল, স্লাভ, গথ, ভ্যাণ্ডাল, ভাইকিং) ইত্যাদির ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে তৎকালীন বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান খণ্ডে প্রাচীন যুগের অবসান (প্রায় খৃষ্টীয়

www.icsbook.info

পঞ্চম শতাব্দী কাল) পর্যন্ত মানুষের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।.... ....

মানুষের ইতিহাস বা মানব সভ্যতার বিকাশের ইতিহাস এমন একটা বিষয় যা প্রতিটি মানুষের পক্ষে জানা বিশেষভাবে আবশ্যক। বস্তুত, ইতিহাস-জ্ঞান ছাড়া শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। বিশুদ্ধ বা বিমূর্ত জ্ঞান লাভের প্রয়োজনে মাত্র নয়, সমসাময়িক বিশ্বে নিজের এবং স্বদেশের অবস্থান জানার জন্য, স্বদেশ বা সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য মানুষের ইতিহাস অধ্যয়ন করা আবশ্যক। উন্নত দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল জীবনেই পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করে থাকে, মানব সভ্যতার ইতিহাস ঐ সব উন্নত দেশের স্কুলের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষালাভের কোন পর্যায়েই মানব সভ্যতার ইতিহাস অবশ্য পাঠ্য নয়। এমন কি যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে মানব ইতিহাস সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন তবে তাঁর পক্ষে সহজে এ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের কোন উপায় নেই। কারণ বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে এ মুহূর্তে কোন সুসম্পূর্ণ গ্রন্থ নেই। ইংরেজী ভাষায় লভ্য পৃথিবীর ইতিহাস দুরূহ, দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রেই তা অসম্পূর্ণ, পক্ষপাতদুষ্ট এবং অবৈজ্ঞানিক। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ও জ্ঞানার্জনের পথে এ অভাব ও বাধা দূর করার জন্য আমরা বাংলা ভাষায় মানুষের ইতিহাস রচনার কাজে ব্রতী হয়েছি।

বাংলা ভাষায় রচিত এ গ্রন্থে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু যাতে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত, সূত্রানুগ এবং সব দিক দিয়ে উচ্চ মানের হয় সে জন্য আমরা সচেষ্ট থেকেছি। গ্রন্থপঞ্জীতে প্রদত্ত প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ ছাড়াও আরও অজস্র গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে সর্বাধুনিক আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করে সহজবোধ্য ও সুশৃঙ্খলভাবে বর্তমান গ্রন্থে উপস্থাপিত করা হয়েছে। বক্তব্যকে স্পষ্ট ও দৃশ্যমান করে তোলার জন্য বহুসংখ্যক ছবি ও মানচিত্র এ পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।..... লেখক হিসেবে আমরা চেষ্টা করেছি যাতে বইটি বিষয়বস্তুর বিচারে উৎকৃষ্ট মানের হয় এবং ব্যাপক সংখ্যক পাঠকের পক্ষে সহজবোধ্যও হয়। এ বইয়ের ভাষা ও যুক্তি-বিশ্লেষণ এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে সপ্তম অষ্টম শ্রেণীর কিশোর অথবা অল্প শিক্ষিত বয়স্ক-শ্রমজীবী বা কর্মজীবীর পক্ষেও এ বই বুঝতে কোন অসুবিধা না হয়। আবার উচ্চশিক্ষিত পাঠক, এমন কি, ইতিহাসের ছাত্র এবং শিক্ষক-অধ্যাপকগণও যাতে আগ্রহবোধ করতে পারেন এমন তথ্য ও বিশ্লেষণ এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। বইটি যদি ব্যাপক পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করে তাহলেই পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করব।

আবদুল হালিম
নূরুন নাহার বেগম

www.icsbook.info

সূচিপত্র

পুরান পাথর যুগের শিকারী সমাজ ২৫

মানুষের বিবর্তন ৩২

রামাপিথেকাস।। অস্ট্রালোপিথেকাস।। খাড়া মানুষ।। বরফ যুগ।।
শিকারী মানুষদের মগজ।। নিরাণ্ডার্থাল মানুষ।। বুদ্ধিমান মানুষ।।

আদিম সমাজের পরিচয় ৪২

বস্তুগত সংস্কৃতি।। ঘর বাড়ি।। আগুন ও রান্না।। হাতিয়ার, শিকার
কৌশল যানবাহন।। পাত্র, প্রদীপ, গয়না, পরিচ্ছেদ।।

মাতৃতন্ত্র ৫৯

ক্ল্যান সংগঠন ৫৪

চিন্তাধারার সামাজিক ভিত্তি।। টোটেম বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান।। শিকারী
সমাজের অবসান ও তার কারণ।।

নতুন পাথর যুগের সংস্কৃতি ৬৬

কৃষির আবিষ্কার।। পশুপালন।। বিভিন্ন আবিষ্কার।।
নবোপলীয় সমাজের পৃথিবীব্যাপী বিস্তার।।

সভ্যতার প্রস্তুতিপর্ব ৮২

তাম্রযুগ। ব্রোঞ্জযুগ।।

প্রাচীন মিশরের সভ্যতা ৮৮

প্রাক-রাজবংশীয় যুগ।। প্রাচীন রাজত্বের যুগ।। মধ্য রাজত্বের যুগ।। নতুন
রাজত্বের যুগ।। গ্রীসীয় টলেমী রাজবংশের যুগ। রোমান আধিপত্যের যুগ।

মিশরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় ১০০

মিশরীয় ধর্ম।। মিশরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা।।
সামাজিক জীবন।। অর্থনৈতিক জীবন।। জ্যোতির্বিদ্যা।। মিশরীয় বিজ্ঞান।।
পাটিগণিত ও জ্যামিতি।। চিকিৎসাবিদ্যা।। মিশরীয় শিল্পকলা।।
লেখন ও লিপি।। কিউনিফর্ম।। হায়ারোগ্লিফ।।

মেসোপটেমীয় সভ্যতা ১১৭

দুই নদীর দেশ।। সুমের ও আক্কাদ।। ব্যাবিলনীয় সভ্যতার উদয়।।
অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্য।। আসিবীয়দের সাফল্যের কারণ।। ক্যাল্ডীয় বা
নব-ব্যবিলনীয় সাম্রাজ্য।।

মেসোপটেমীয় সংস্কৃতির পরিচয় ১২২

সুমেরীয় সংস্কৃতি।। ব্যবিলনীয় যুগের সংস্কৃতি।। আসিরীয় যুগের সংস্কৃতি।।
ক্যালডীয় যুগের সংস্কৃতি।।

প্রাচীন পারস্য সভ্যতা ১৩০

www.icsbook.info

পারস্য সাম্রাজ্য ও তার ইতিহাস ১৩০
পারসিক সংস্কৃতি ও তার প্রভাব।।
পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য সভ্যতা ১৩৬
হীব্রু সভ্যতা ১৩৬
হিব্রু জাতির উৎপত্তি ও ইতিহাস।। হিব্রু ধর্ম।।
হিট্টাইট ও ফ্রিজীয় সভ্যতা ১৪০
লিডীয় সভ্যতা ১৪২
ফিনিশীয় সভ্যতা ১৪৩
মাইনোসীয়–মাইসিনীয় সভ্যতা ১৪৬
গ্রীসীয় সভ্যতা ১৫০
ভৌগোলিক পরিবেশ।। গ্রীসীয় সভ্যতার আদি পর্যায়।। হোমারীয় যুগ।।
প্রাচীন যুগের ইতিহাস।। স্পার্টা।। এথেন্স।। গ্রীসীয়–পারসিক যুদ্ধ।।
এথেনীয় শক্তির অভ্যুদয়।। পেরিক্লিসের যুগ।। পেলোপনেসীয় যুদ্ধ।।
আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য।। আলেকজাণ্ডারের বিজয়ের তাৎপর্য।।
গ্রীসীয় সংস্কৃতির পরিচয় ১৭৬
ধর্ম।। শিক্ষা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান।। বিজ্ঞান।। গ্রীক দর্শকের পরিচয়।। সফিষ্টদের তত্ত্ব।।
সফিস্ট তত্ত্বের উৎপত্তি ও বিকাশ।। সফিস্টবিদ্যার সাথে শিক্ষা, সাহিত্য
ও দর্শনের সম্পর্ক।। সক্রেটিস, প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের দর্শন।।
সক্রেটিস: সক্রেটিসের তত্ত্ব ও পদ্ধতি।। প্লেটোর দর্শন।। এ্যারিস্টটলের দর্শন।।
সাহিত্য ও শিল্প কলা।।
হেলেনিস্টিক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ১৯৮
অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন।। দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্প।। ১৯৮
হেলেনিস্টিক বিজ্ঞান।।
রোমক সভ্যতা ২০৫
প্রাকৃতিক পরিবেশ।। আদি অধিবাসী।। এট্রুস্কানদের সভ্যতা।।
রোমের আদি ইতিহাস : রাজতন্ত্র ২০৭
প্রজাতান্ত্রিক রোম: প্রথম পর্যায় ২০৭
প্যাটিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের সংগ্রাম।। রোমের সামরিক অভিযান।।
কার্থেজের বিরুদ্ধে অভিযান।। কার্থেজের বিরুদ্ধে অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল।।
রোমের গৃহযুদ্ধ–প্রথম পর্ব: মারিয়াস ও সুলা।। ঐতিহাসিক দাস বিদ্রোহ।।
রোমের গৃহযুদ্ধ–দ্বিতীয় পর্ব:পম্পি ও সীজার।। সীজারের একনায়কত্ব।।
রোমের গৃহযুদ্ধ–তৃতীয় পর্ব: এন্টনী ও অক্টোভিয়ান।।
রোমের সাম্রাজ্যিক ইতিহাস ২২৩
অগাষ্টাস সীজার।। ক্লডিয়াস রাজবংশ।। ফ্লেভিয়ান রাজবংশ।। এন্টোনিন রাজবংশ।।
রোমক সাম্রাজ্যের পতন।।
রোমান সভ্যতার বিভিন্ন দিক ২২৯
ধর্ম।। দর্শন।। সাহিত্য।। ইতিহাস।। শিল্পকলা।। বিজ্ঞান।। রোমান আইন।।
রোমন সভ্যতার পতনের কারণ ২৩৫
রোমক ঐতিহ্য ২৩৮
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ২৩৯

www.icsbook.info

সিন্ধু সভ্যতা ২৪০
নগর জীবন।। পোশাক-পরিচ্ছদ।। জীবিকা ও শিল্প দ্রব্য।। ধর্মবিশ্বাস।।
আর্যজাতি ও বৈদিক সভ্যতা ২৪৩
বেদ ও বৈদিক সভ্যতা।। ধর্ম।। বৈদিক যুগের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা।। জীবিকা ও আর্থিক ব্যবস্থা।। বর্ণাশ্রম।। মহাকাব্যের যুগ।। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব।। মহাবীর ও জৈন ধর্ম।। বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম।। মগধের অভ্যুদয়।। বৈদেশিক আক্রমণ।। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ।।
মৌর্য যুগ ২৪৮
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।। বিন্দুসার।। অশোক।। মৌর্যযুগের ভারতের অবস্থা। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন।। দক্ষিণ ভারতে অন্ধ্র বা সাতবাহন সাম্রাজ্য।। উত্তর ভারতে সুঙ্গ ও কাণ্ব বংশ।। গ্রীক শক ও পহ্লব।। কুষাণ সাম্রাজ্য।। গুপ্ত সাম্রাজ্য।। সমুদ্রগুপ্ত।। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত।। পরবর্তী গুপ্তরাজগণ।। গুপ্তযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি
চীনের প্রাচীন ইতিহাস ২৫৮
পুরোপলীয় ও নবোপলীয় সংস্কৃতি।। ব্রোঞ্জ সংস্কৃতি : শাং যুগ।। চু রাজবংশ।। চিন রাজবংশ।। হান রাজবংশ।।
আমেরিকা মহাদেশের প্রাচীন ইতিহাস ২৬৫
আমেরিকায় পুরোপলীয় সংস্কৃতি।। নবোপলীয় সংস্কৃতি।। মায়া সভ্যতা।। আজটেক সভ্যতা।। ইন্‌কা সভ্যতা।। মায়া, আজটেক, ইনকা সভ্যতার উৎপত্তি প্রসংগে।।
কোরিয়া ও জাপানের প্রাচীন ইতিহাস ২৭৪
কোরিয়ার ইতিহাস ২৭৪
জাপানের ইতিহাস ২৭৫
বিকাশরুদ্ধ সমাজের ইতিহাস ২৭৭
অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাস ২৭৭
ওশেনিয়ার ইতিহাস ২৭৯
আফ্রিকা মহাদেশের প্রাচীন ইতিহাস ২৮১
ইউরেশিয়ার বর্বর জাতিদের ইতিহাস ২৮৪

মানচিত্র

১. প্রাচীন সভ্যতাসমূহের কেন্দ্রভূমি ৮৭
২. প্রাচীন গ্রীস ও তার উপনিবেশসমূহ ১৫১
৩. প্রাচীন গ্রীস ও তার নগররাষ্ট্রসমূহ ১৭৩
৪. সর্বাধিক বিস্তৃতির সময়ে রোমের সাম্রাজ্য ২০৮
৫. প্রাচীন ভারত ২৪১
৬. প্রাচীন চীন ২৫৯
৭. আমেরিকা মহাদেশের প্রাচীন সভ্যতাসমূহ ২৬৬

চিত্রসূচী

১. ক্রোমানিয়ন মানুষদের জীবন যাত্রার দৃশ্য ১৫
২. পলিনেশিয়ার দ্বীপবাসীদের ব্যবহৃত সমুদ্রের মানচিত্র ১৬
৩. উত্তর আমেরিকার আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ান উপজাতির তাঁবু ১৬
৪. প্রাচীন ইণ্ডিয়ান উপজাতির ব্যবহৃত তাঁত ১৭

www.icsbook.info

৫. প্রাচীন আজটেক সভ্যতার শিলা-পঞ্জিকা বা পাথরের খোদাই করা পঞ্জিকা ১৭
৬. আফ্রিকার নিগ্রো অধিবাসী ঢাকের সাহায্যে সংবাদ পাঠাচ্ছে ১৮
৭. সাড়ে চার হাজার বছর আগেকার প্রাচীন মিশরের সমুদ্রগামী জাহাজ ১৮
৮. এথেন্সে এরক্থিয়ামের ভিতরের স্থাপিত নারীমূর্তি ১৮
৯. প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার কিউনিফর্ম লিপি লেখার পদ্ধতি ও কৌশল ১৯
১০. প্রাচীন মায়া সভ্যতার একটি বইয়ের পাতার ছবি ১৯
১১. সম্রাট এশারহাদন গাছের পরাগায়ণে সাহায্য করছেন। ২০
১২. আসিরীয়দের সিংহ শিকারের দৃশ্য ২০
১৩. মহেঞ্জোদাড়ো নগরীর রাস্তা ও নর্দমা ২১
১৪. বেড়ার যকৃতের মাটির মডেল ২২
১৫. বেড়ার যকৃতের দাগ দেখে ভবিষ্যৎ ঘণনার দৃশ্য (এট্রুস্কান চিত্র) ২২
১৬. প্রাচীন চীনের ভূমিকম্প পরিমাপক যন্ত্র ২৩
১৭. প্রাচীন গ্রীসে সাইফন যন্ত্রের সাহায্যে পানি সরবরাহঃ ধারাস্নানের দৃশ্য ২৪
১৮. প্রাচীন রোমের একোয়েডাক্ট কৃত্রিম জল-প্রণালী ২৪
১৯. প্রাইমেটদের মগজের ক্রমবিকাশ ২৬
২০. ম্যাগদালেনীদের হাড়ের হার্পুণ ও বর্শা নিক্ষেপক যন্ত্র ৩৮
২১. পাথরের গায়ে খোদাই করা বল্গা হরিণের ছবি ৩৯
২২. সাড়ে আট হাজার বছর আগের ডোঙ্গা নৌকা, হল্যাণ্ডে পাওয়া ৪৭
২৩. উচ্চ পুরোপলীয় যুগের গলায় হার ৪৮
২৪. এঙ্গোলার একটি গ্রামের শস্যের গোলা ৬৭
২৫. নবোপলনীয় যুগের একটি কুড়াল ৬৭
২৬. টাকুর সাহায্যে সূতা কাটার পদ্ধতি ৭৩
২৭. আধুনিক কালের একটি চরকা ৭৪
২৮. মহেঞ্জোদার পাশু যাঁতা ৮১
২৯. প্রাচীন সুমেরীয় যুদ্ধরথ ৮৫
৩০. প্রাচীন মিশরের বিভিন্ন কারখানার কাজের দৃশ্য ১০৫
৩১. প্রাচীন মিশরীয়দের হায়ারোগ্লিফিক লিপির নমুনা ১১৩
৩২. আসিরীয়গণ একটি দুর্গকে আক্রমণ করছে ১২০
৩৩. কিউনিফর্ম লিপির বিবর্তন ১২৫
৩৪. পার্সিপোলিস-এর প্রাসাদের দেওয়ালে খোদাই করা চিত্র ১৩১
৩৫. প্রাচীন গ্রীসের জাহাজ, মাটির পাত্রের গায়ে আঁকা ছবি ১৬২
৩৬. প্রাচীন গ্রীসের কয়েকটি পাত্র ১৯৬
৩৭. রোমান যোদ্ধা ২১২
৩৮. হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ২৪২

www.icsbook.info

১. ক্রো-মানিয়ন শিকারী মানুষদের বাসস্থান ও জীবন-যাত্রার চিত্রঃ পুরুষ ও মেয়ে সবাই কাজ করছে, কেউ হাতিয়ার তৈরী করছে, কেউ শিকারলব্ধ প্রাণীর মাংস কাটছে; পিছনে তাদের তাঁবু দেখা যাচ্ছে ( )। বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে শিল্পী এ ছবি এঁকেছেন।

www.icsbook.info

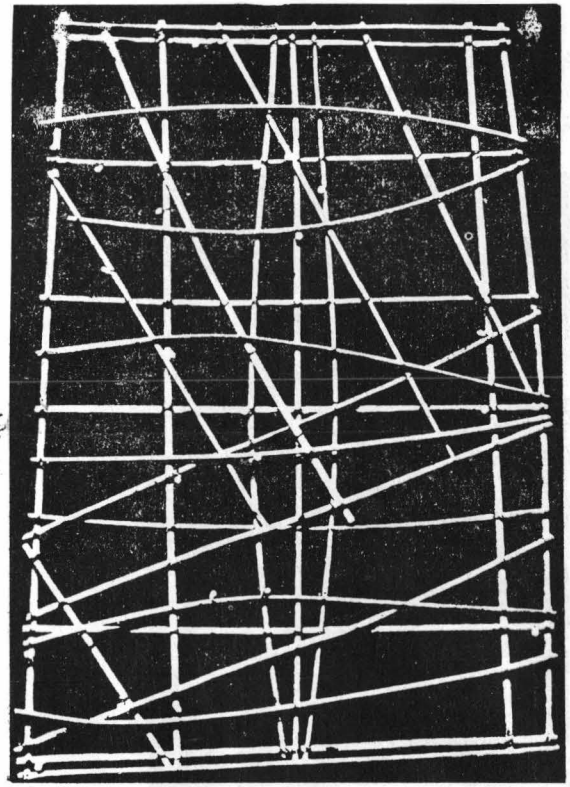

২. পলিনেশিয়ার দ্বীপবাসীদের ব্যবহৃত সমুদ্রের মানচিত্র। মাঝ সমুদ্রে কোনটা মূল ঢেউ, কোনটা দ্বীপে প্রতিহত হওয়া ঢেউ তা তারা বুঝতে পারত এবং কাঠি দিয়ে সে অনুযায়ী উপরোক্ত মানচিত্র তৈরী করত। এ মানচিত্রের সাহায্যে তারা বিশাল কূলহীন প্রশান্ত মহাসাগরে ছোট ছোট নৌকায় করে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে পাড়ি দিত।

৩. উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান উপজাতির ব্যবহৃত তাঁবু। পুরাতন পাথর যুগে প্রায় ১০-১২ হাজার বছর আগে আবিষ্কৃত তাঁবু এখনও এদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে

www.icsbook.info

৪. উত্তর আমেরিকার আদিবাসী একটি রেড ইণ্ডিয়ান উপজাতির ব্যবহৃত তাঁত। আসলে সাত-আট হাজার বছর আগের, নতুন পাথরের যুগের আবিষ্কৃত আদিম তাঁতই এদের মধ্যে অপরিবর্তিত আকারে প্রচলিত রয়েছে।

৫. মেক্সিকোর প্রাচীন আজটেক সভ্যতার মানুষের ব্যবহৃত শিলা-পঞ্জিকা বা পাথরের পঞ্জিকা। ১২ ফুট ব্যাসের এ গোলাকার পাথরটিতে চাঁদ, সূর্য, গ্রহাদির আবর্তনের কাল লেখা আছে। মধ্যখানে সূর্য-দেবতা এবং ভিতরের বৃত্তে আজটেকদের ব্যবহৃত ২০টি দিনের নাম আছে। এ পঞ্জিকার সাহায্যে আজটেকরা বছরের নিখুঁত হিসাব রাখত এবং সূর্য-ও চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতি গণনা করতে পারত।

www.icsbook.info

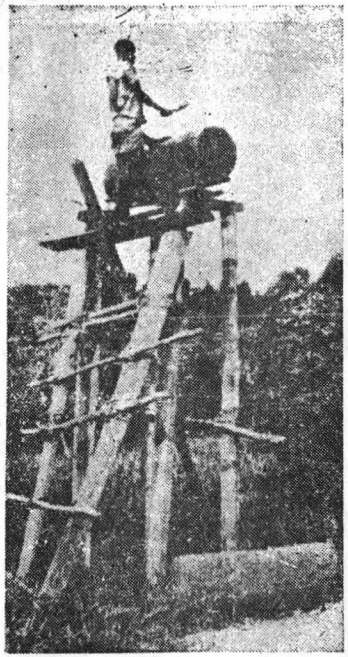

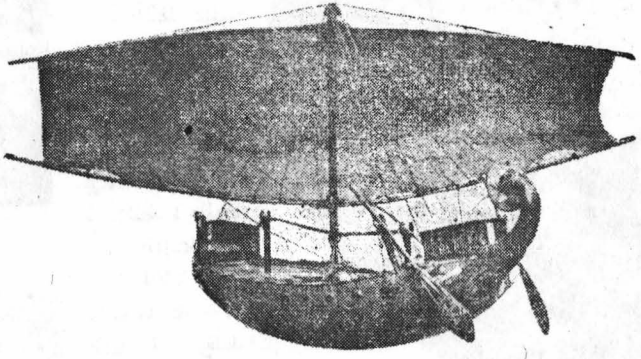

৬. আফ্রিকার কঙ্গো অঞ্চলের একজন উপজাতীয় গ্রামবাসী ঢাক বাজিয়ে সংকেতের মাধ্যমে সংবাদ পাঠাচ্ছে (১৯৪৪ সালের আলোকচিত্র)। ভিন্ন গ্রামের মানুষ আবার এটা শুনে ঢাক বাজিয়ে সে সংবাদ দূরে দূরান্তরে পাঠিয়ে দিত

৭. সাড়ে চার হাজার বছর আগের (২৪০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের) প্রাচীন মিশরের একটি সমুদ্রগামী জাহাজ

৮. এথেন্সের এ্যাক্রোপলিসে অবস্থিত অন্যতম বিখ্যাত মন্দির এরেক্ থিয়ামের ভিতর স্থাপিত একটি নারী-মূর্তি। গ্রীক ভাস্কর্যের উৎকর্ষের এটি এক সুন্দর নিদর্শন

www.icsbook.info

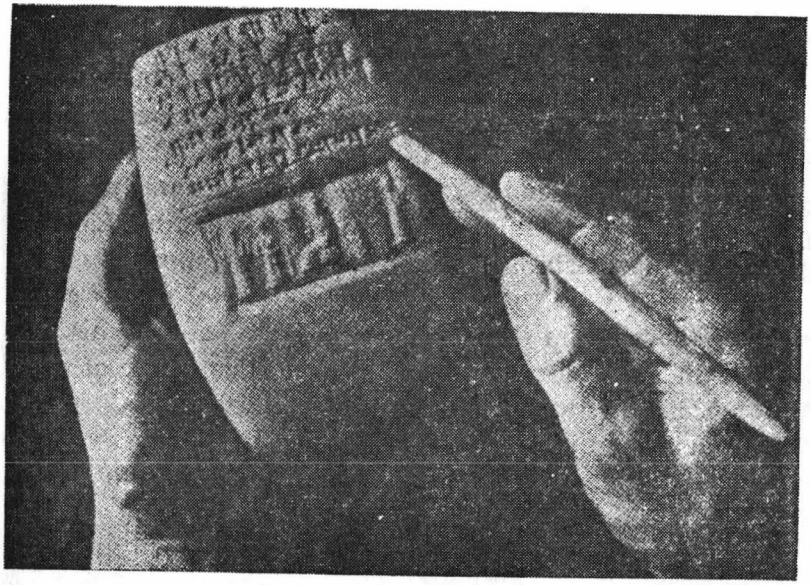

৯. প্রাচীন ব্যবিলনে কিউনিফর্ম-লিপি লেখার কৌশল ও পদ্ধতি। নরম কাদা-মাটির পাতে নরুনের মত শলাকা দিয়ে চিত্রলিপি বা অক্ষরলিপি লেখা হত। ছবির ছাপ দেওয়া হত শীলমোহর দিয়ে। পরে মাটির ফলকটিকে পুড়িয়ে শক্ত করে নেওয়া হত।

১০. (ডানে) মধ্য আমেরিকার অন্তর্গত মেক্সিকো অঞ্চলের প্রাচীন মায়া সভ্যতার মানুষদের একটি বইয়ের পৃষ্ঠার ছবি। মায়াদের লিপির অর্থ এখনও জানা যায়নি, তবে সংখ্যা-চিহ্ন জানা গেছে। যথা, • = ১, •• = ২, — = ৫, ⠤ = ৭, ইত্যাদি। ছবিতে কিছু কিছু সংখ্যা চেনা যায়

www.icsbook.info

www.icsbook.info

১১. আসিরীয় সম্রাট এশারহাদন

পরাগরেণুর সাহায্যে ফলবতী গাছের পরাগায়ণে সাহায্য করছেন। গাছের মধ্যে যে স্ত্রী

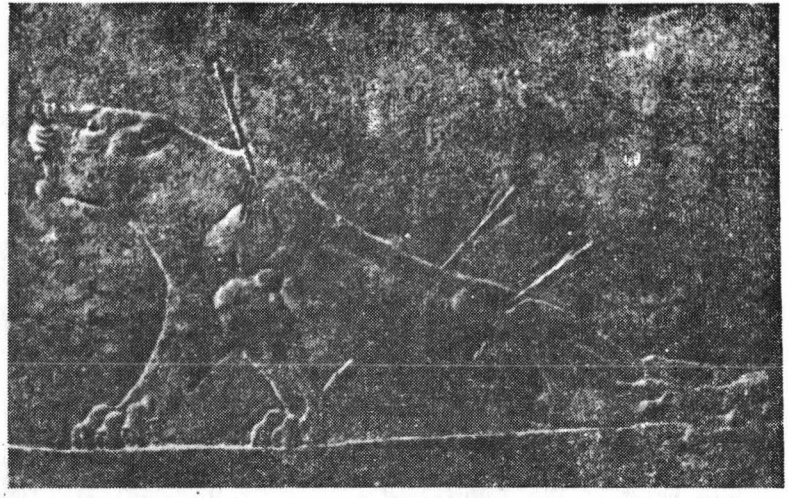

পুরুষ ভেদ থাকে এবং পুংকেশরে উৎপন্ন পরাগরেণু স্ত্রী ফুলের গর্ভকেশরের সান্নিধ্যে এলে তবে ফুলের গর্ভাধান বা পরাগায়ণ ঘটে এবং ফল ও বীজ উৎপন্ন হয় এ তথ্য আসিরীয়গণ জানতেন। এ সত্যটি এ্যারিস্টটলের জানা ছিল না

১২. (ডানে) আসিরীয় সম্রাটের সিংহ শিকারের দৃশ্য : তীরবিদ্ধ সিংহী। পাথরের গায়ে খোদাই করা এ চিত্রে আসিরীয়দের শিল্প কুশলতা, পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং পশুদেহ সম্পর্কে জ্ঞানের পরিচয় বিধৃত রয়েছে। আহত সিংহীর মেরুদণ্ডে তীর বেঁধায় তার পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে, কারণ মেরুদণ্ডের ভিতর ঐ স্থানে রয়েছে পায়ের পেশীচালক স্নায়ুর কেন্দ্র। প্রাচীন আসিরীয়রা এ জ্ঞান অর্জন করেছিল

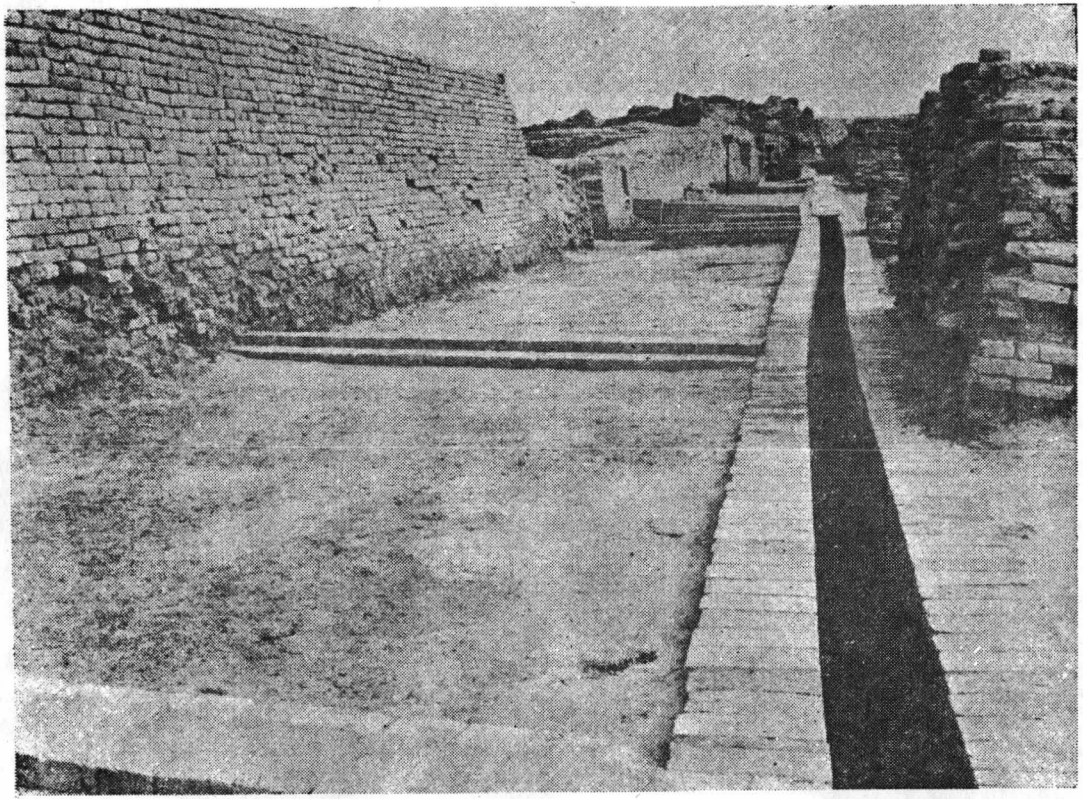

১৩. মহেঞ্জোদড়োর একটি রাস্তা। রাস্তার এক পাশে পাকা নর্দমা ও অন্য পাশে বাড়ির পাকা দেওয়াল দেখা যাচ্ছে। বাড়ি থেকে নর্দমা বের হয়ে বড় নর্দমায় পড়েছে। নর্দমার মুখ ইট দিয়ে ঢাকা থাকত। সাড়ে চার হাজার বছর আগের এ নগরে জনস্বাস্থ্য রক্ষার এ ব্যবস্থা সত্যই আশ্চর্যজনক। মহেঞ্জোদড়োর রাস্তাগুলো ছিল সোজা, আঁকাবাকা নয়। এবং দুটো রাস্তা পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করত—আধুনিক নিউইয়র্ক নগরীর মত। মহেঞ্জোদড়োই এ রকম নগর পরিকল্পনার প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত

www.icsbook.info

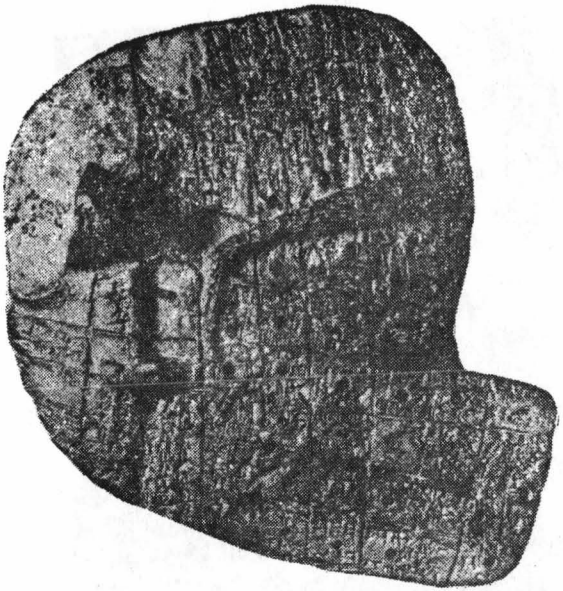

১৪. প্রাচীন কালের একটি ভেড়ার লিভার বা যকৃতের মাটির প্রতিলিপি। প্রাচীন ব্যাবিলনীয়রা মৃত ভেড়ার যকৃতের দাগ দেখে ভবিষ্যত জানার চেষ্টা করত, যেমন আমরা এখনও হাতের রেখা গণনা করি। ব্যাবিলনিয়া এ সব অপবিজ্ঞানের আদি উৎস

১৫. (ডানে) এট্রুস্কানদের একটা আয়নার পিছনে আঁকা ছবি : একজন ভবিষ্যৎ-বক্তা ভেড়ার যকৃত দেখে ভবিষ্যৎ গণনা করছেন।

www.icsbook.info

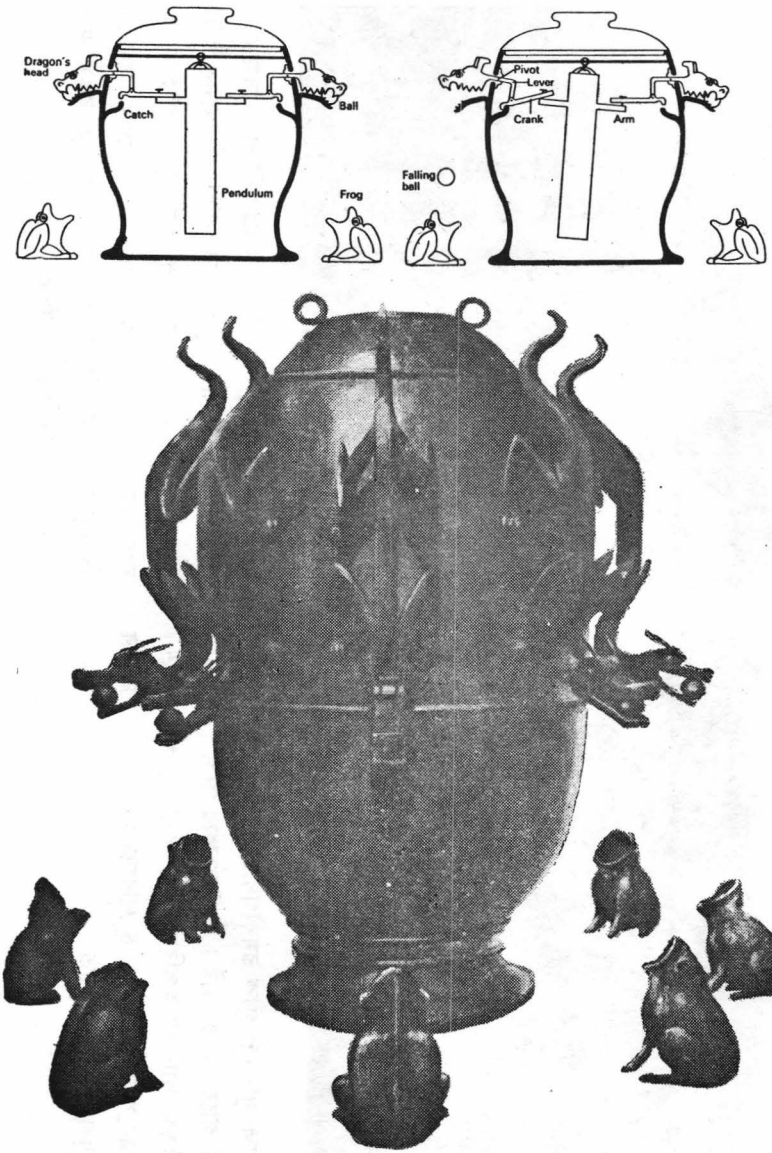

১৬. প্রাচীন চীনে হান রাজবংশের আমলে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে আবিষ্কৃত ভূমিকম্প-পরিমাপক যন্ত্র। ভূকম্পন এলে ভিতরের দোলকটি (উপরের চিত্রে) সে দিকে নড়ত, ফলে ঐ দিকের ড্রাগনের মুখ খুলে যেত ও দোলকটি খাঁজে আটকে থাকত যাতে অন্য কোন ড্রাগনের মুখ না খোলে। মুখ-খোলা ড্রাগনের মুখের বলটি তার নীচের ব্যাঙের মুখ পড়ত এবং সেটা দেখে ভূমিকম্পের দিক বোঝা যেত।

www.icsbook.info

www.icsbook.info

১৭। ধারা জলে স্নানরতা গ্রীক রমণীগণ : খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর একটি গ্রীক পাত্রের গায়ে আঁকা ছবি। স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে (খাওয়া ও গোসলের জন্য) বিশুদ্ধ পানি যে অপরিহার্য, এ কথা গ্রীকরা জানত। গ্রীকরা সাইফন যন্ত্রের সাহায্যে উঁচু নীচু পার্বত্য অঞ্চলেও নগরের সব এলাকায় পানি সরবরাহ করতে পারত

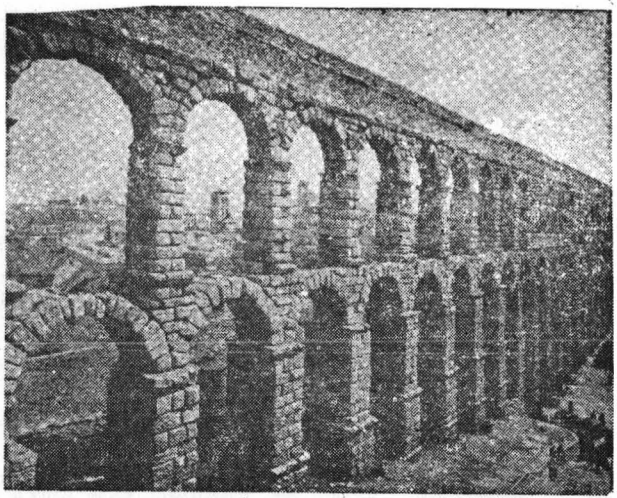

১৮। রোমান যুগের কৃত্রিম জলপ্রণালী বা একোয়েডাক্ট। পাথরের তৈরী থাম ও খিলানের সাহায্যে অনেক উঁচুতে বাঁধান কৃত্রিম প্রণালী বা খাল তৈরী করে পাহাড় থেকে নগর সমূহে পানি নিয়ে যাওয়া হত। রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইটালীতে, ফ্রান্সে, স্পেনে এ রকম অনেক একোয়েডাক্ট নির্মিত হয়েছিল

পুরান পাথর যুগের শিকারীসমাজ

পৃথিবীতে সব কিছুই পরিবর্তনশীল, রূপান্তরশীল। জগতের পরিবর্তন আছে, রূপান্তর আছে, তাই তার একটা ইতিহাস আছে। যদি জগৎ স্থবির হত, পরিবর্তনহীন হত, তবে তার কোনো ইতিহাস থাকত না। ইতিহাস কথাটার মধ্যেই তাই একটা গতিময়তার ধারণা নিহিত রয়েছে। ইতিহাস অর্থ পরিবর্তনের ইতিহাস, রূপান্তরের ইতিহাস। মানব সমাজের ইতিহাস সম্পর্কে কথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মানুষের ইতিহাস বলতে তাই কতগুলো তাৎপর্যহীন, সম্পর্কহীন ঘটনার বিবরণমাত্র বোঝায় না; তার রূপান্তরের, তার প্রগতিশীল বিকাশের বিবরণকেই বোঝায়।

মানুষের ইতিহাস লিখতে গেলে তার উৎপত্তির কাহিনী দিয়েই শুরু করা দরকার। কিন্তু এখানে একটা অসুবিধা আছে। আজকের পৃথিবীতে যে মানুষ বাস করছে, এ জাতের মানুষের আবির্ভাব পৃথিবীতে ঘটেছিল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। তার আগের অন্য এক অসম্পূর্ণ মানুষ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক মানুষের উদ্ভব হয়েছিল এবং তা ছিল এক দীর্ঘকালব্যাপী প্রক্রিয়া। আবার এ পরিবর্তনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, যা প্রাণিজগতের বিবর্তন থেকে পৃথক। মানুষের আগের অর্থাৎ মানুষের চেয়ে নিম্নতর পর্যায়ের সব প্রাণীর বিবর্তন ঘটেছে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখে। এভাবেই নতুন নতুন দেহ-বৈশিষ্ট্য অর্জন করে একটা প্রাণী অন্য একটা প্রজাতির প্রাণীতে পরিণত হয়। যেমন মাটিতে যে সব প্রাণী বাস করে তাদের পক্ষে মাথার দুপাশে চোখ থাকা সুবিধাজনক। তার ফলে তারা সহজে চারপাশে দৃষ্টি রাখতে পারে, সহজে শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। কিন্তু প্রায় সাত কোটি বছর আগে মুষিকজাতীয় একরকম স্তন্যপায়ী প্রাণী যখন গাছে বাস করতে শুরু করল, তখন মুখের দুপাশে চোখ থাকাটা অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াল। কারণ, গাছের ডালে চলাফেরার সময় ভারসাম্য রক্ষার জন্য সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাই বেশি দরকার। মুখের সামনে দুটো চোখ থাকলে যে কোনো জিনিসের উপর দুই চোখের দৃষ্টি একসাথে ফেলা সম্ভব হয়। আর তার ফলে কোন জিনিসটা কাছে কোনটা দূরে অথবা একটা জিনিসের বেধ বা গভীরতা কতখানি তা বোঝা সম্ভব হয়। বৃক্ষবাসীদের পক্ষে এ গুণটা বিশেষ দরকারী। এক ডাল থেকে আরেক ডালে লাফিয়ে যেতে হলে সেটা কত দূরে আছে তা নিখুঁতভাবে অনুমান করতে পারা চাই। একাজটা বানররা সহজেই করতে পারে, কারণ তাদের চোখ দুটো মুখের সামনের দিকে এবং দুই চোখে তারা একই জিনিসের যে দুটো চিত্র দেখতে পায়, তাদের মগজে গিয়ে সেগুলো একত্রিত হয়ে একটা চিত্রে পরিণত হয়। অপরপক্ষে, শুধু এক চোখে দেখলে

www.icsbook.info

চারপাশের জিনিসকে মনে হয় কাগজে আঁকা ছবির মতো। এক চোখওয়ালা মানুষ তাই সহজে স্থির করতে পারে না দুটো জিনিসের মধ্যে কোনটা কাছে কোনটা দূরে।

অনেককাল আগে, চার-পাঁচ কোটি বছর আগে, এক জাতের স্তন্যপায়ী প্রাণী গাছে বাস করার ফলে ঐ পরিবেশের উপযোগী কতগুলো গুণ অর্জন করেছিল, যা ভূমিচর প্রাণীদের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয়নি। এ জাতের প্রাণীদের বলা হয় প্রাইমেট। অতীতকালের প্রাইমেটদের একটি শাখা থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। প্রাইমেটদের অন্যান্য শাখার প্রাণীরা বানর অথবা নরবানর (গরিলা, শিম্পাঞ্জী ইত্যাদি) পর্যায়েই আটকে আছে। গাছে চলার পক্ষে তীক্ষ্ণ বাঁকানো নখর বাধাস্বরূপ বলে প্রাইমেটরা ক্রমে চ্যাপ্টা নখ অর্জন করল। গাছের ডাল আঁকড়ে ধরতে সুবিধা বলে প্রাইমেটরা ক্রমশ অর্জন করেছে এমন আঙুল, যা স্বতন্ত্রভাবে নাড়ানো চলে এবং তার বুড়ো আঙুল অন্যান্য আঙুলের উল্টোদিকে এমন আলাদা ভাবে অবস্থিত যে, তার ফলে যে কোনো জিনিসকে মুঠ করে ধরা যায়। গাছে বাস করার ফলে প্রাইমেটদের মাংসপেশি, ইন্দ্রিয় এবং স্নায়ুতন্ত্রেরও বিকাশ ঘটেছে।

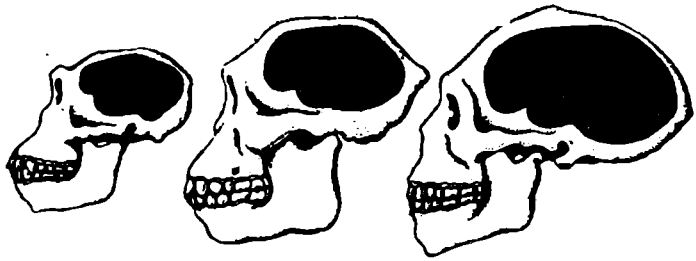

প্রাইমেটদের মগজের ক্রমবিকাশ। (ক) শিম্পাঞ্জী (খ) অস্ট্রালোপিথেকাস মানুষ (গ) খাড়া মানুষ (পিকিং ও জাভা মানুষ)। করোটির ভিতরে কালো রঙে মগজের আকার দেখানো হয়েছে। লক্ষণীয় যে, মগজের আয়তন যত বৃদ্ধি পেয়েছে, চোয়ালের আকার ততই তুলনামূলকভাবে ছোট হয়ে এসেছে।

গাছের ডালে যারা বাস করে তাদের জগৎ মাটির প্রাণীর মতো স্থির নিশ্চল জগৎ নয়। গাছের ডাল সব সময়েই দুলছে, আন্দোলিত হচ্ছে, কখনও প্রাণিদেহেরই ভারে। এ চিরচঞ্চল জগতে থাকতে গেলে সব সময় ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হয়, দ্রুত চিন্তা করতে হয়। স্মৃতিশক্তির বিকাশ ঘটাতে হয়। পরিবেশের দিক থেকে এ রকম সহায়তা পাওয়ার ফলেই প্রাইমেটরা কালক্রমে বড় মগজের অধিকারী হয়েছে। প্রাইমেটদের একটা শাখা যখন গাছ থেকে নেমে এল এবং বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষে পরিণত হল, তখনও তার মধ্যে প্রাইমেটদের ঐ সকল গুণ (বিশেষ ধরনের চোখ-জোড়া, হাত, মগজ) রয়েই গেল এবং আরও বিকাশ লাভ করল। প্রাইমেটদের অন্যান্য শাখার প্রাণীর মধ্যেও প্রাইমেটদের ঐ সকল গুণ রয়ে গেছে। এ কারণেই বানর, গরিলা ও মানুষের মধ্যে কতগুলো আশ্চর্য মিল রয়েছে। এখানে একটা কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার। পরিবেশের প্রভাবে প্রাণী নতুন নতুন প্রয়োজনীয় গুণ অর্জন করে, কথাটার মানে কি? দরকার হলেই কি কেউ তীক্ষ্ণ বাঁকানো নখর বাদ দিয়ে চ্যাপটা নখ অর্জন করতে পারে? অথবা মুখের দুই পাশ থেকে চোখকে ঠেলে ঠেলে সামনের দিকে নিয়ে আসতে পারে? তা কেউ পারে না। সাধারণভাবে অবশ্য একথা ঠিক যে, পিতামাতার মধ্যে যে দৈহিক গুণ থাকে, সন্তান তা লাভ করে। এ প্রক্রিয়ার নাম বংশগতি। এ কারণেই মানুষের সন্তান

www.icsbook.info

তার পিতামাতার অনুরূপ হয়, ভালুকের সন্তান ভালুকের মতোই হয়। তবে পিতামাতার প্রায় অনুরূপ হলেও কোনো সন্তানই ঠিক তার পিতামাতার মতো হয় না, খানিকটা পার্থক্য থাকেই। এ পার্থক্য থেকেই পরিবর্তনের বা বিবর্তনের শুরু। তবে প্রাণিজগতে বিবর্তন শুধু একটা প্রাণীর দ্বারা ঘটে না, এর জন্য একদল প্রাণীর দরকার হয়। মনে করা যাক, বৃক্ষবাসী একদল প্রাইমেটের মধ্যে একটা প্রাইমেটের ক্ষেত্রে চোখ দুটো খানিকটা সামনের দিকে এগিয়ে এল। এ প্রাইমেটের সন্তানরাও ঐ রকম চোখবিশিষ্ট হবে। কয়েক পুরুষ পরে দেখা যাবে ঐ দলের মধ্যে কয়েক শ' প্রাইমেট রয়েছে, যাদের চোখ-জোড়া খানিকটা সামনের দিকে। গাছের উপর এ ধরনের চোখওয়ালা প্রাইমেটদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি বলে এরা বেশি বেশি সংখ্যায় বেঁচে থাকবে এবং দু'পাশে চোখওয়ালা প্রাইমেটরা (গাছ থেকে পড়ে) বেশি বেশি সংখ্যায় মারা যেতে থাকবে। কিছুকাল পরে দেখা যাবে, জীবনসংগ্রামে পরাজিত হয়ে মুখের দুপাশে চোখওয়ালা প্রাইমেটরা লুপ্ত হয়েছে আর মুখের সামনের দিকে চোখওয়ালা প্রাইমেটরা তাদের স্থান নিয়েছে। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রাকৃতিক নির্বাচন, কারণ প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক পরিবেশ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে জীবনসংগ্রামে জয়ী প্রজাতিসমূহ বেঁচে থাকে। জীবনসংগ্রাম মানে অবশ্য হাতাহাতি মারামারি নয়। যারা প্রাকৃতিক পরিবেশের অনুরূপ দেহবৈশিষ্ট্য লাভ করে তারা জীবনসংগ্রামে জয়ী হয়। যাদের দেহবৈশিষ্ট্য প্রকৃতির আনুকূল্য লাভ করে না তারা জীবনসংগ্রামে পরাজিত হয়। তবে পরাজিত হলেও এরা সব সময় লুপ্ত নাও হতে পারে, হয়তো কষ্টে বা অপ্রধান হয়ে বেঁচে থাকে। উপরে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হল, তা থেকে বোঝা যাবে সামগ্রিকভাবে দেখলে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, নতুন পরিবেশের প্রভাবে বৃক্ষবাসী প্রাইমেটরা নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে ক্রমশ নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটাতে শুরু করল। প্রজাতি বলতে বোঝায় একই জাতীয় প্রাণীদের, যারা নিজেদের মতো সন্তানের জন্ম দিয়ে বংশবিস্তার করতে পারে। যেমন, সমস্ত মানুষ এক প্রজাতির প্রাণী, সব গরু এক প্রজাতির প্রাণী, ইত্যাদি।

মানুষের উৎপত্তির আগে পর্যন্ত প্রাণিজগতে বিবর্তন ঘটেছে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এসে দেখা যায় মানুষ নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা নিজেরাই বিবর্তন ঘটাচ্ছে। যদিও মাত্র চল্লিশ কি পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আধুনিক ধরনের মানুষের উৎপত্তি হয়েছে (যে মানুষ মস্তিষ্কের ক্ষমতা বা হাতের কাজের দক্ষতার দিক থেকে ঠিক আমাদের মতোই ছিল), তথাপি তার আগে দশ পনের বা কুড়ি লক্ষ বছর আগেকার আধা-মানুষদের আমরা মানুষের হিসাব থেকে বাদ দিতে পারি না। কারণ গত দশ পনের লক্ষ বছর ধরে আধা-মানুষরা দলবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের দৈহিক বিবর্তন ঘটিয়েছে এবং তার ফলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আধুনিককালের সুসম্পূর্ণ মানুষের উদয় ঘটেছে। শুধু দৈহিক গুণাগুণের বিচার করলে আমরা হয়তো তাদের মানুষের হিসাব থেকে বাদ দিতে পারতাম, কিন্তু সামাজিক কার্যকলাপের দিক দিয়ে বিচার করলে আধা-মানুষদেরও মানুষ বলতে হয়। গত পাঁচ দশ লক্ষ বছর ধরে অসভ্য পর্যায়ের আধা-মানুষরা যেসব দৈহিক ও মানসিক গুণ অর্জন করেছে তার ফলেই আধুনিক মানুষের উদয় সম্ভব হয়েছে, এ কথা তো সত্যি বটেই। তা ছাড়াও ঐ সব আধা-মানুষরা যেসব কার্যকলাপ, রীতিনীতি, চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছিল, তার অনেক

www.icsbook.info

কিছুই পরবর্তীকালের সুসম্পূর্ণ আধুনিক মানুষের সমাজ জীবনের ভিত্তিস্বরূপ হয়েছে। তা সত্ত্বেও যে তাদের আমরা আধা-মানুষ বলছি তার কারণ, দেহের নানা বৈশিষ্ট্যের বিচারে তারা ছিল আধুনিক মানুষদের তুলনায় অসম্পূর্ণ। যেমন, তাদের অনেকেই পুরোপুরি খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারত না, এবং তাদের মগজের পরিমাণও ছিল কম। আবার ঐসব আধা-মানুষরা এমন সব গুণ অর্জন করেছিল, বা আবিষ্কার সাধন করেছিল যার দরুন আমরা সুসভ্য মানুষরা আজকের দিনেও মানুষ বলে গর্ব করতে পারছি। যেমন, মানুষের ভাষা অর্থাৎ কথা বলার ক্ষমতা।

একথা আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, ভাষার জন্যই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে পুরোপুরি আলাদা। মানুষের মতো মগজ, হাত, চোখ আছে বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাং ওটাং ইত্যাদিরও। কিন্তু মানুষের মতো কথা বলতে পারে না আর কেউ। কথা বলতে পারার গুরুত্ব কতখানি? এর গুরুত্ব অসাধারণ। এই ভাষার সাহায্যেই মানুষ চিন্তা করতে পারে এবং অন্য মানুষের সাথে কথা বলে চিন্তা ও ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে। এর ফলে কোনো কোনো জিনিস শিখলে বা জানলে মানুষ সহজেই ভাষার সাহায্যে অন্য মানুষকে তা শেখাতে পারে। কুকুর, বানর ইত্যাদি মানুষেতর প্রাণী কথা বলতে পারে না বলে তারা চিন্তা করতেও পারে না বা অন্যের কাছে নিজের ভাব প্রকাশও করতে পারে না। ফলে ঐসব প্রাণী সীমিতসংখ্যক অভিজ্ঞতা নিজ নিজ সন্তানদের অথবা দলের প্রাণীদের হাতে-কলমে শিখিয়ে থাকে। এসব শিক্ষার বেশির ভাগ বিষয়ই হল, কোনটা খাদ্য কোনটা অখাদ্য, কে শত্রু, কে মিত্র, বিপদ থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় ইত্যাদি। কিন্তু কোনো দিন একটা বিড়াল আরেকটা বিড়ালকে মুখে বলে জানাতে পারবে না যে, চিনি গুড়ের মতোই মিষ্টি। মানুষেতর প্রাণীরা তাই কখনও বংশানুক্রমে বেশি বেশি করে এবং নতুন নতুন জ্ঞান লাভ করতে পারে না। অপরপক্ষে মানুষ যেসব নতুন জ্ঞান লাভ করে বা নতুন কৌশল ও যন্ত্র আবিষ্কার করে তা ভাষার মাধ্যমে অন্য মানুষকে এবং বংশানুক্রমে অন্যদের শিখিয়ে যেতে পারে।

এত যে গুণ ভাষার, সে ভাষা মানুষ আয়ত্ত করল কি ভাবে? কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছিলেন কি? মোটেই তা নয়। এটা কোনো একজন মানুষের আবিষ্কার নয়। এটা একটা সামাজিক আবিষ্কার। আদিম সমাজের মানুষরা সবাই মিলে এর আবিষ্কার করেছিল। এবং তাদের সমাজ সংগঠন ও সামাজিক কার্যকলাপই এ আবিষ্কারকে সম্ভব করে তুলেছিল। আদিম মানুষ পশু শিকার করে প্রাণধারণ করত। ক্রমে যখন অনেক মানুষ মিলে বড় বড় পশু শিকার করতে শুরু করল, তখন তাদের মধ্যে কাজের সমন্বয়ের জন্য ও সহযোগিতার জন্য যে ভাব-বিনিময়ের চেষ্টা হয়, তারই ফলে ক্রমে ক্রমে ভাষার সৃষ্টি হয়। অবশ্য মানুষের কথা বলাকে সম্ভব করে তোলার জন্য কতগুলো দেহ-বৈশিষ্ট্য অর্জনের দরকার হয়েছিল। যেমন, বড় আকারের উন্নত মগজ, উন্নত বাকযন্ত্র ও জিভ, কান ও জিভের সমন্বয় ব্যবস্থা ইত্যাদি। অবশ্য মানুষের তৎকালীন জীবন-যাত্রা ও কার্যকলাপ এ সকল দেহ-বৈশিষ্ট্য অর্জনের সহায়তাও করেছিল। কুড়ি পঁচিশ লক্ষ বছর আগের এক ধরনের আধা-মানুষদের কঙ্কাল পাওয়া গেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে অস্ট্রালোপিথেকাস। কথাটার অর্থ হল দক্ষিণের বানর। এই আধা-মানুষরা এক ধরনের ধারালো পাথরের হাতিয়ার

www.icsbook.info

ব্যবহার করত পশু শিকারের জন্য। সে অস্ত্রগুলো তাদের কঙ্কালের কাছে পাওয়া গেছে। একটা পাথর দিয়ে আরেকটা পাথরকে আঘাত করে ফাটিয়ে এসব ছোট ছোট হাতিয়ার তৈরি করত আমাদের পূর্বপুরুষ সেই আধা-মানুষরা। এসব হাতিয়ারের কোনোটার একমুখ ছুঁচালো, কোনোটার দুপাশ ধারালো। কোনোটা দিয়ে পশু হত্যা করা চলে, কোনোটা দিয়ে নিহত পশুর চামড়া ছাড়ানো চলে, কোনোটা দিয়ে মাংস কাটা চলে ইত্যাদি। এসব হাতিয়ার যত আদিম ধরনেরই হোক, এসব তৈরি করার জন্য তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি এবং হাত ও চোখের কাজের সমন্বয় দরকার হয়েছে, মাথা খাটানোরও দরকার হয়েছে। হাত ও চোখের কাজের সমন্বয় বলতে কি বোঝায়? আমরা যে জিনিসটা চোখে দেখি, নাগালের মধ্যে থাকলে তা সহজেই ধরতে পারি। ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড় শূন্যে লাফিয়ে উঠে বল লুফে নিতে পারেন। ভাল হাতের টিপ যাঁর আছে তিনি ঢিল ছুঁড়ে পাখি মারতে পারেন। এ সব সম্ভব হয় এ কারণে যে, আমাদের মাথার মধ্যে অর্থাৎ মগজের মধ্যে, চোখের দৃষ্টি ও হাতের কাজের মধ্যে একটা সংযোগব্যবস্থা আছে। এ সংযোগ স্থাপিত হয় অনেক সংখ্যক সূক্ষ্ম স্নায়ুর সাহায্যে। মস্তিষ্কের মধ্যে রয়েছে স্নায়ুকোষ, সেখান থেকে টেলিফোন তারের মতো অজস্র স্নায়ুসূত্র সারা শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে— কোনটি শেষ হয়েছে চোখ, কান, মুখ, হৃৎপিণ্ড ফুসফুস ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গে, কোনোটি শেষ হয়েছে দেহের চামড়ায়। এক ধরনের স্নায়ু দিয়ে মস্তিষ্কের নির্দেশ বিভিন্ন অঙ্গে, যথা, হাত, পা, চোখ, মুখ ইত্যাদিতে যায়। মানুষের মস্তিষ্কের উপরের অংশকে বলে গুরুমস্তিষ্ক। গুরুমস্তিষ্কের উপরের স্তরকে বলে কর্টেক্স। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রগুলো এখানেই রয়েছে। কর্টেক্সে রয়েছে দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শ, ব্যথাবোধ ইত্যাদির কেন্দ্র। আবার এ সব বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী স্নায়ুও মস্তিষ্কের মধ্যে রয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় চোখ এবং হাতের কাজের সমন্বয়-ব্যবস্থাই মানুষের মগজের অর্ধেক জুড়ে রয়েছে। মানুষের মগজের ভিতর দৃষ্টিশক্তি ও হাতের কাজের মধ্যে এ সমন্বয়ব্যবস্থা রয়েছে বলেই মানুষ অনায়াসে হাতিয়ার বানাতে পারে, যন্ত্র চালাতে পারে। অবশ্য চোখ ও হাতের কাজের সমন্বয় ব্যবস্থার খানিকটা মানুষ তার পূর্বপুরুষ বৃক্ষবাসী প্রাইমেটদের কাছ থেকে পেয়েছিল। কিন্তু হাতিয়ার তৈরির মাধ্যমে এবং সফলভাবে শিকার করার মাধ্যমেই যে মানুষ এ সমন্বয় ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর একটা প্রমাণ হচ্ছে, শিকারী জীবনের শেষ ২০ লক্ষ বছরে মানুষের (বা আধা-মানুষের) মস্তিষ্কের আকার প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। মানুষের হাতের কাজের দক্ষতা ও জীবনযাত্রার জটিলতা বৃদ্ধি দুইয়ে মিলে তার মস্তিষ্ককে বড় করে তুলেছিল। কয়েকটা অনুকূল পরিস্থিতিতে এটা সম্ভব হয়েছিল।

বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জী ইত্যাদির তুলনায় আদিম মানুষ বা আধা-মানুষরা প্রথম থেকেই হাতের ব্যবহার অনেক বেশি করত। বানর বা শিম্পাঞ্জীকে খাদ্য ভেঙে টুকরো করে খাওয়ার জন্য মুখকেই বেশি ব্যবহার করতে হয়, একাজে হাত তার বিশেষ কাজে আসে না। শক্ত খাদ্য কামড়ে টুকরো করে খেতে হয় বলেই তাদের চোয়াল এবং দাঁত এত শক্ত আর বড়। আদিম মানুষরা হাতিয়াবের সাহায্যে খাদ্য টুকরো করে কেটে খেতে শেখার ফলে তার মুখের উপর চাপ কমে গেল। এর ফলে চোয়ালটা ক্রমশ ছোট হওয়ার পথে কোন বাধা রইল না। চোয়াল ছোট হয়ে আসার ফলে মানুষের মস্তিষ্ক

www.icsbook.info

আকারে বড় হতে পারল। মানুষ আগুন ব্যবহার করতে শেখার পর যখন রান্নার কৌশল আবিষ্কার করল, তখন পোড়া বা সেদ্ধ খাদ্য নরম হওয়ার দরুন চোয়াল আরও ছোট হল এবং মস্তিষ্ক আরও বড় হতে পারল। অবশ্য মানুষের শিকারী কার্যকলাপ তার মগজবৃদ্ধির অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল; চোয়াল ছোট হওয়ায় মগজ বড় হওয়ার বাস্তব দৈহিক অবস্থা সৃষ্টি হল। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, হাতের দক্ষ কাজ যদিও মগজের বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছিল, হাতের এ প্রভাব একতরফা ছিল না। মগজ যত বড় আর উন্নত হয়েছে সেটা আবার ততই বেশি করে হাতের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। কারণ, হাতই কাজ করে একথা যেমন সত্য, মস্তিষ্ক হাতকে চালায় সে কথাও সমান সত্য।

আদিম মানুষের জীবনযাত্রা ও সামাজিক কার্যকলাপ তাদের দৈহিক বিবর্তনকে আরও অন্যভাবেও প্রভাবিত করেছিল। শিকারী সমাজ যত অগ্রসর হতে থাকে ততই শিকারের সময় দলের মধ্যে কাজের সমন্বয় ও সহযোগিতার জন্য ভাবের আদান-প্রদান প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। যেমন, একটা বড় হাতি শিকার করতে হলে অনেক লোক মিলে তা করতে হয়। এসব লোক কারা কোন দিক থেকে হাতিটাকে তাড়া করবে, কারা কোন দিক থেকে আক্রমণ করবে তা স্থির করতে না পারলে, নির্দেশ দিতে না পারলে এবং সকলের কাজকে সুশৃঙ্খলভাবে সমন্বিত করতে না পারলে, এত বড় প্রাণীকে শিকার করা সম্ভব নয়। এবং এ ধরনের নির্দেশ দান, কাজের সমন্বয় সাধন ভালভাবে হতে পারে কথার সাহায্যে। অবশ্য ভাষা তাই বলে একদিনে সৃষ্টি হয়নি। প্রথম প্রথম হয়তো ভাবভঙ্গির সাহায্যে, অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে বিভিন্ন লোকের মধ্যে ভাবের ও সংবাদের আদান-প্রদান হত। আফ্রিকার অনেক শিকারীগোষ্ঠীর মধ্যে এখনও শিকারের সময় অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে ইঙ্গিতে পরস্পরের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের প্রথা রয়েছে। আদিমকালে অঙ্গভঙ্গির সাথে অর্ধোচ্চারিত শব্দও মানুষ ব্যবহার করত সঙ্কেত হিসাবে, কিন্তু মুখের মধ্যে জিভের নড়াচড়ার মতো যথেষ্ট জায়গা না থাকাতে শব্দোচ্চারণ খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। ক্রমে যখন মানুষের চোয়ালের হাড় ছোট হল তখন জিভের নড়াচড়ার মতো স্থান হল মুখের ভিতরে, ফলে সুস্পষ্ট শব্দোচ্চারণ সম্ভব হল। অবশ্য তার পাশাপাশি গলার ভিতরের বাকযন্ত্রেরও উন্নতি হয়েছে এবং কানের সাথে জিভের কাজের সমন্বয়ব্যবস্থাও জন্ম নিয়েছে। কর্টেক্সের শ্রবণ কেন্দ্র এবং কথা বলার কেন্দ্রের মধ্যে কতগুলো আভ্যন্তরীণ স্নায়ুসূত্রের সংযোগ আছে। তার ফলে কানে যে শব্দ শোনা যায়, জিভটা কোনো স্থানে নিলে সে রকম শব্দ উৎপন্ন করা যায় তা মানুষ নিজে থেকেই বুঝতে পরে। কান ও জিভের কাজের মধ্যে এ সমন্বয় ব্যবস্থা দেহের অভ্যন্তরে থাকার ফলেই মানবশিশুকে কথা শেখানো এত সহজে সম্ভব হয়।

আমরা দেখতে পেলাম মানুষ তার উৎপত্তির লগ্নে নিজেদের চেষ্টার অর্থাৎ নিজেদের সামাজিক কার্যকলাপ দ্বারা নিজেদের দৈহিক বিবর্তন ঘটিয়ে আধুনিক সুসম্পূর্ণ মানুষের উদ্ভব ঘটিয়েছে। দৈহিক পূর্ণতা লাভের আগের পর্যায়ের মানুষ দেহগতভাবে আধা-মানুষ হলেও সামাজিকভাবে তাদের মানুষ বলে মানতেই হয়। মানুষের ইতিহাস বর্ণনাকালে আমরা তাই প্রাগৈতিহাসিক সময়ের আধা-মানুষদের ইতিহাস থেকেই শুরু করব। কারণ, আমরা দেখতে পাব প্রাগৈতিহাসিক কালের ঐ আধা-মানুষরা যেসব কলাকৌশল, সামাজিক রীতিনীতি, মানবিক সম্পর্ক ইত্যাদির আবিষ্কার ও প্রবর্তন

www.icsbook.info

করেছিল তার অনেক কিছুই এখন আমাদের কালেও টিকে রয়েছে। আমরা দেখতে পাব, আধুনিক কালে আমাদের মধ্যে যে সকল ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধ রয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলো চিরায়ত ও সৎ মূল্যবোধের (যথা, মানবপ্রেম, সাম্যবোধ ইত্যাদির) উদয় ঘটেছিল সেই প্রাগৈতিহাসিক মানবসমাজে। অপরপক্ষে বর্তমান কালের অনেক কদাচার, কুসংস্কার (যথা স্বার্থপরতাবোধ, পরশ্রীকাতরতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা) ইত্যাদির উদ্ভব হয়েছিল পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক যুগে তথাকথিত সভ্যতার উদয়ের পর।

www.icsbook.info

মানুষের বিবর্তন

রামাপিথেকাস

বৈজ্ঞানিকরা মানুষের দেহের সাথে প্রইমেটদের দেহের মিল দেখে স্থির করেছেন, বৃক্ষবাসী প্রাইমেট থেকেই অনেককাল আগে মানুষের উদ্ভব হয়েছিল। বৃক্ষবাসী প্রাইমেটদের কোন শাখার প্রাণী থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছিল তা অবশ্য বলা কঠিন। কারণ কয়েক কোটি বছর ধরে এ বিবর্তন ঘটেছে এবং এত আগেকার প্রাইমেটদের কোনো জীবিত বংশধর আজকের পৃথিবীতে নেই। আদি প্রাইমেটদের বংশধরেরা বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে কেউ পরিণত হয়েছে বানরে, কেউ শিম্পাঞ্জীতে, কেউ গরিলায়। ঐ প্রাইমেটদেরই একটা শাখা জন্ম দিয়েছে মানুষের। যেসব অবলুপ্ত প্রাইমেট থেকে অনেককাল আগে মানুষের উদ্ভব হয়েছিল, তাদের সম্পর্কে কিছু কিছু জানা যায় কেবলমাত্র ফসিল-এর সাক্ষ্য থেকে। প্রাচীনকালের যেসব প্রাণীদেহের অংশ কোনক্রমে মাটির নিচে চাপা পড়ে পাথরে পরিণত হয়েছে তাদের বলা হয় ফসিল (এম্রধফ) বা জীবাশ্ম। ফসিল থেকে বৈজ্ঞানিকরা তিনশ' ও চারশ' কোটি বছর আগেকার জীব সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। কিন্তু আশ্চর্য হলেও এ কথা সত্যি যে, চার কোটি বছর আগের প্রাইমেটদের ফসিল বিশেষ পাওয়া যায়নি। কারণ, বৃক্ষবাসী প্রাইমেটরা বনে থাকত। আর যে ধরনের পাথরে ফসিল রক্ষা পায়, বনের মাটি থেকে সে রকম পাথরের সৃষ্টি হয় না। তবে আফ্রিকা, ভারতীয় উপমহাদেশ প্রভৃতি যেসব অঞ্চলে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়েছে, সেখানে মৃত প্রাইমেট বা অন্য প্রাণী নদীতে পড়লে নদীর তলার বা তীরের কাদামাটিতে চাপা পড়ে যেত এবং কালক্রমে তা পাথরে পরিণত হত। এরকমভাবে রক্ষা পাওয়া এক জাতের প্রাইমেটের ফসিল পাওয়া গেছে কেনিয়ায় আর ভারতে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে রামাপিথেকাস।

রামাপিথেকাস-এর দাঁতগুলো লক্ষণীয়। অধিকাংশ প্রাইমেটদের তীক্ষ্ণ শ্বদন্ত থাকে, এগুলো আত্মরক্ষা ও শত্রুকে আক্রমণের কাজে লাগে। কিন্তু রামাপিথেকাসের শ্বদন্ত ছিল ছোট। এরা সম্ভবত হাতের সাহায্যে আত্মরক্ষা করত। এবং টুকরো পাথরকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করত। রামাপিথেকাসরা সম্ভবত সময় সময় বা অধিকাংশ সময় দুপায়ে হাঁটত, হাতকে অন্য কাজে লাগাত। চার পায়ের বদলে দুপায়ে দাঁড়ানো কিভাবে সম্ভব হয়েছিল?

মনে রাখা দরকার বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে অনেক প্রাণীর বিবর্তনের সূচনা হয়েছে। দেড় দুই কোটি বছর আগে পৃথিবীর জলবায়ু শুষ্ক হয়ে উঠেছিল, সে সময় বনভূমি ক্রমে কমে আসে এবং তৃণভূমির বিস্তার ঘটে। হাতি, ঘোড়া, শূকর, জিরাফ, হরিণ প্রভৃতি আশ্রয় নেয় এ

www.icsbook.info

তৃণভূমিতে। কিছু কিছু প্রাইমেট গাছেই রয়ে যায়, রামাপিথেকাসরা গাছ ছেড়ে মাটিতে নেমে এসেছিল। খোলা মাটিতে চলতে গিয়ে এরা সম্ভবত ক্রমশ দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল,হাতের সাহায্যে এরা হয়তো খাদ্য সংগ্রহ করত। বৈজ্ঞানিকদের অনুমান, রামাপিথেকাসের বংশধরদের একটা শাখা থেকেই ক্রমশ মানুষের উৎপত্তি হয়েছে।

অস্ট্রালোপিথেকাস

এর পরবর্তী উন্নততর এক প্রাইমেটের ফসিল পাওয়া গেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। তার নাম দেওয়া হয়েছে অস্ট্রালোপিথেকাস। কথাটার অর্থ দক্ষিণের 'নরবানর'। কিন্তু আসলে এরা নর বানর ছিল। এদের শ্বদন্ত ছিল না ছোট আর কোমরের হাড়, হাত, পা, চোয়াল ইত্যাদি ছিল প্রায় মানুষেরই মতো। তবে তার মস্তিষ্কের আয়তন ছিল আধুনিক মানুষের প্রায় অর্ধেক। পরে আফ্রিকার অন্যান্য স্থানেও এদের কঙ্কালের হাড় পাওয়া গেছে। সবচেয়ে পুরনো হাড় যেটি পাওয়া গেছে সেটি চল্লিশ লাখ বছর আগের। রামাপিথেকাসের পরবর্তী যেসব প্রাইমেট ক্রমশ দুই পায়ে ভালভাবে হাঁটতে শিখেছিল এবং ভালভাবে পশু শিকারের কৌশল আয়ত্ত করেছিল তাদের কঙ্কাল বা ফসিল এখনও পাওয়া যায়নি। সম্ভবত আফ্রিকাতেই এসব ফসিলের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। কারণ পণ্ডিতদের মতে আফ্রিকাই হচ্ছে আদি মানবের বাসভূমি ও উৎপত্তি-স্থল।

তাঞ্জানিয়ার এক হ্রদের পাড়ে সাড়ে সতের লক্ষ বছর আগে একদল অস্ট্রালোপিথেকাস জাতীয় আধা-মানুষ বাস করত। তাদের জীবনযাত্রার নানা উপকরণ, তাদের ব্যবহৃত হাতিয়ার ইত্যাদি পুরাতাত্ত্বিকরা উদ্‌ঘাটন করেছেন। সে সময় হ্রদের পাশের প্রান্তরে বাস করত অদ্ভুত সব প্রাণী— ছোট গলাবিশিষ্ট শিংওয়ালা জিরাফ, তিন আঙুলওয়ালা ছোট আকারের ঘোড়া, লম্বা লম্বা কানওয়ালা শেয়াল, হায়েনা, বিশাল আকারের হাতি ইত্যাদি। তবে অস্ট্রালোপিথেকাসরা সম্ভবত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যাঙ, গিরগিটি, খরগোস, হাঁস ইত্যাদি ধরে খেত। তবে তারা যে বেবুন শিকার করত তারও প্রমাণ আছে। এদের ব্যবহৃত প্রাচীনতম যেসব পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গেছে তা প্রায় ২৫ লাখ বছরের পুরান।

খাড়া মানুষ

তাঞ্জানিয়ার হ্রদের পাড়ের আধা-মানুষদেরও বিবর্তন ঘটতে থাকে এবং আট দশ লাখ বছর আগে আফ্রিকাতেই নতুন আরেক ধরনের মানুষের উৎপত্তি ঘটে। এদের নাম খাড়া মানুষ। এরা খাড়া হয়ে চলত। এ পর্যায়ে আমরা মানুষের চেহারা নিয়ে কথা বলতে পারি। এর আগে পর্যন্ত মানুষের চেহারা বানর থেকে বিশেষ পৃথক ছিল না। খাড়া মানুষদের অবশ্য থুতনি বা কপাল বলতে কিছু ছিল না আমাদের মতো, আর তার ভুরুর খাঁজ ছিল গভীর আর চোয়াল ছিল বেশ বড়। তথাপি তার দাঁত আর হাত-পাগুলো ছিল মানুষের মতো আর মগজ ছিল অস্ট্রালোপিথেকাসের দ্বিগুণ।

খাড়া মানুষদের সময়ে তার আশেপাশে ছিল আশ্চর্য সব জন্তু-জানোয়ার। সেখানে তখন ছিল ঘোড়ার চেয়ে বড় আকারের ভেড়া, গরিলার মতো বড় আকারের বেবুন, বড় কুকুরের সমান সজারু আর তখনকার গণ্ডার ছিল এখনকার তুলনায় দ্বিগুণ আকারের। এ পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে অনেক বেশি চালাক, চতুর ও দক্ষ শিকারী হতে হয়েছে। আশ্চর্য নয় যে খাড়া মানুষের মগজ খুব বড় ছিল। তার হাতিয়ারও ছিল উন্নত

www.icsbook.info

ধরনের। তার ছিল হাত-কুড়াল ও গাঁইতি। হাত-কুড়াল অবশ্য কুড়াল নয় মোটেই, এটা একটা পাথরের ছোট অস্ত্র, যার এক প্রান্ত ছুঁচালো অন্য প্রান্ত ভোঁতা এবং লম্বালম্বিভাবে দুই পাশ ধারালো। গাঁইতিগুলোও হাত-কুড়ালের মতোই, তবে আরও ভারী ও বড়। হাত-কুড়াল দিয়ে শিকার করা, প্রাণীর মাংস কাটা, চামড়া ছাড়ানো ইত্যাদি কাজ সহজে করা যেত।

বরফ যুগ

ছয় সাত লাখ বছর আগে খাড়া মানুষরা প্রথমে উত্তর আফ্রিকায় এবং তারপর ইউরোপ ও এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। উন্নত হাতিয়ারের বলে জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ায় হয়তো তাদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি হয়েছিল এবং তার ফলে আদি বাসভূমি ছেড়ে বাইরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। আবার উন্নত ধরনের শিকারের হাতিয়ার তাদের নতুন পরিবেশে ছড়িয়ে পড়াকে সম্ভবও করে তুলেছিল। এ দিকে ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে এক সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এর নাম দেওয়া হয়েছে বরফ যুগ। সে সময় উত্তর মেরু থেকে বিশাল আকারের সব হিমবাহ দক্ষিণে আসতে শুরু করে এবং উত্তর গোলার্ধের অধিকাংশ স্থলভাগকে অর্থাৎ উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তরাংশকে বরফে ঢেকে দেয়। হিমবাহ হচ্ছে বড় বড় বরফের পাহাড় বা জমাট বরফের সচল নদী। দক্ষিণ গোলার্ধে স্থলভাগ বেশি না থাকায় সম্ভবত সমুদ্রে ভাসমান বরফের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, তবে দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বত অঞ্চলে এবং নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার পর্বতসমূহেও হিমবাহের সৃষ্টি হয়েছিল। বরফ যুগ প্রকৃতপক্ষে একটি ছিল না, ছিল চারটি। প্রায় সোয়া ছয় লাখ বছর আগে প্রথম বরফ যুগ শুরু হয় এবং প্রায় ৬০ হাজার বছর তা স্থায়ী হয়। এ সময় উত্তর গোলার্ধের স্থলভাগের বিস্তৃত অংশ এক মাইল পুরু বরফের আস্তরণে ঢেকে যায়। তারপর প্রথম বরফ যুগের অবসান ঘটে। কিন্তু এক লাখ বছর পর আবার দ্বিতীয় বরফ যুগের সৃষ্টি হয় এবং এটা প্রায় ৪০ হাজার বছর স্থায়ী হয়। এ রকম ভাবে পৃথিবীতে চারটে বরফ যুগের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তাদের মাঝে মাঝে দেখা দেয় আন্তঃবরফ যুগ। এ রকম তিনটা আন্তঃবরফ যুগ এ পর্যন্ত পার হয়েছে। আন্তঃবরফ যুগে পৃথিবীর জলবায়ু কিছুটা উষ্ণ হয়ে উঠত। শেষ বা চতুর্থ বরফ যুগ শুরু হয়েছিল প্রায় ৮০ হাজার বছর আগে এবং তার অবসান ঘটে প্রায় ১০ হাজার বছর আগে। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে ভবিষ্যতে আবারও বরফ যুগের সৃষ্টি হতে পারে। তাহলে বলতে হবে আমরা এখন একটা আন্তঃবরফ যুগে বাস করছি। বরফ যুগের আবির্ভাব কেন হয়েছিল তা এখনো সঠিকভাবে জানা যায়নি। বিজ্ঞানীদের ধারণা, কোনো কারণে সূর্যের তাপ কমে যাওয়ার ফলে পৃথিবী শীতল হয়ে বরফ যুগের সৃষ্টি করেছিল। তবে এ বিষয়ে ভিন্নমতও আছে।

পানি জমেই বরফ হয়। বরফ যুগে এত এত বরফ হওয়ার মতো পানি এল কোথা থেকে? এখনকার দুনিয়ায় যে জলবায়ু, তাতে সমুদ্রের পানি বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে যায়, সেটা আবার বৃষ্টি হয়ে মাটিতে পড়ে এবং নদী বেয়ে আবার সমুদ্রে ফিরে যায়। বরফ যুগে সমুদ্রের পানি বাষ্প হয়ে আকাশে উঠত, তারপর তুষার হয়ে মাটিতে পড়ত। এখনও সাইবেরিয়া প্রভৃতি শীতাঞ্চলে শীতকালে তুষার পড়ে। বরফ যুগে অবশ্য অনেক বেশি বিস্তৃত অঞ্চলে অনেক বেশি পরিমাণ তুষার পড়ত। এ সকল তুষার জমাট বেঁধে শক্ত বরফে পরিণত হয়ে মাটিতেই থেকে যেত, পানি হয়ে আর সমুদ্রে ফিরত না।

www.icsbook.info

এভাবে সমুদ্রের পানি কমে যাওয়ায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা অনেক কমে গিয়েছিল। পণ্ডিতদের হিসাব অনুযায়ী এখন সমুদ্রের পানি যেখানে আছে বরফ যুগে তার চেয়ে চারশ ফুট নিচে নেমে গিয়েছিল। এর ফলে এখন মহাদেশগুলোর উপকূলে যেখানে সমুদ্রের পানি অগভীর, বরফ যুগে সেখানে মাটি দেখা দিয়েছিল। এর ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলোর সাথে এশিয়া মহাদেশ স্থলপথে সংযুক্ত হয়ে পড়েছিল।

বরফ যুগে আফ্রিকাতে হিমবাহ পৌঁছায়নি। কিন্তু তথাপি বরফ যুগে তার জলবায়ুকে প্রভাবিত করেছিল। বরফ যুগে আফ্রিকার জলবায়ু শীতল ও আর্দ্র ছিল। সাহারা মরুভূমি তখন এত ভয়ঙ্কর ছিল না, তাকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য ছিল না। সে সময় সম্ভবত খাড়া মানুষরা সাহারার মধ্য দিয়ে উত্তর আফ্রিকা পার হয়ে ইস্রায়েল এবং তুরস্কের মধ্য দিয়ে ইউরোপে পৌঁছায়। খাড়া মানুষদের কোনো কোনো দল ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে চীন এবং জাভায় গিয়ে পৌঁছায়। আগেই বলা হয়েছে বরফ যুগে জাভা ইত্যাদি দ্বীপ এশিয়া মহাদেশের সাথে যুক্ত হয়েছিল। এদের কঙ্কাল চীনে এবং জাভায় পাওয়া গেছে। পিকিং-এ যে মানুষদের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল পিকিং মানুষ। জাভায় যাদের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল জাভা মানুষ। দুই জায়গার কঙ্কালই পাঁচ লাখ বছরের পুরান। এরা আসলে একই দলের মানুষ— খাড়া মানুষ। ইউরোপে হাঙ্গেরি, স্পেন এবং ফ্রান্সেও এ খাড়া মানুষদের কঙ্কাল পাওয়া গেছে।

শিকারী মানুষদের মগজ

খাড়া মানুষদের সবচেয়ে আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য হল তাদের মগজের আকার। মাত্র বিশ লক্ষ বছরের মধ্যেই প্রাচীনতর মানুষের তুলনায় এদের মগজের আকার দ্বিগুণ হয়েছে। এত দ্রুত পরিবর্তন প্রাণীর বিবর্তনের ইতিহাসে খুবই বিরল ঘটনা। সাধারণত কোনো প্রজাতির প্রাণীর রূপান্তর ঘটতে বহু কোটি বছর, কখনও শত কোটি বছর লেগে যায়। মানুষের শিকারী জীবনের কার্যকলাপই সম্ভবত তার দ্রুত দৈহিক বিবর্তনের সহায়ক হয়েছিল। স্পেনে খাড়া মানুষদের একদল শিকারীর একটা আস্তানার সন্ধান পাওয়া গেছে। আস্তানার এক অংশে শিকার করা পশুকে কেটে টুকরো টুকরো করা হত। আরেকটা অংশে খাওয়া হত। হাড়ের গা থেকে পাথরের ধারালো হাতিয়ার দিয়ে মাংসকে চেঁছে কাটা হত এবং পাথরের হাতিয়ার দিয়ে হাড়কে ভেঙ্গে তার ভিতরের মজ্জা খাওয়া হত। শিকারীদের আস্তানায় যেসব হাড় পাওয়া গেছে সেগুলো হল হাতি, গণ্ডার বা গরু ইত্যাদি বড় বড় বিপজ্জনক জানোয়ারের।

শিকারভূমিতে পাওয়া পোড়া কাঠের টুকরো ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে, এ শিকারীরা আগুন দিয়ে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে তাড়িয়ে বড় বড় পশুদের জলাভূমিতে এনে ফেলত এবং তারপর হত্যা করত। এভাবে বড় বড় প্রাণী শিকার করতে হলে বড় শিকারীদল থাকা দরকার, তাদের উপযুক্ত হাতিয়ার থাকা দরকার। হাতিয়ার তৈরি ও হাতিয়ার ব্যবহারের কৌশল শেখানোর জন্য সামাজিক সহযোগিতা দরকার। শিকার করার সময় দলেবলে সংগঠিতভাবে কাজ করার জন্য নির্দেশ দান ও নির্দেশ গ্রহণের ব্যবস্থা দরকার। খাড়া মানুষরা সম্ভবত ভাষা আয়ত্ত করেছিল, কারণ শিকারের এত জটিল কলাকৌশল ভাষার সাহায্য ছাড়া বংশানুক্রমে

www.icsbook.info

তরুণ ও বালকদের শেখানো সম্ভবই হত না।

বরফ যুগে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যই যথেষ্ট দক্ষতা ও তৎপরতা দরকার। সে অবস্থায় পাথরের হাতিয়ার ও আগুন ব্যবহার করে মানুষ শুধু বেঁচেই থাকেনি, নিজেদের দৈহিক বিকাশও ঘটিয়েছে। আগুন দিয়ে ভয় দেখিয়ে মানুষ পশু শিকার করত, আগুনের উত্তাপে শীতের আক্রমণ ঠেকাতে পারত, আগুনে সেদ্ধ করা আমিষ ও নিরামিষ (শক্ত মাংস, বাঁশের ডগা ইত্যাদি) থেকে বেশি পরিমাণে পুষ্টি গ্রহণ করতে পারত। আগুনে পোড়ানো বা রান্না করা খাদ্য গ্রহণের অভ্যাসের ফলে সম্ভবত মানুষের আয়ুবৃদ্ধিও ঘটেছিল। কারণ কাঁচা খাবার খেলে যত তাড়াতাড়ি দাঁত ক্ষয় হত, রান্না করা খাদ্যে তত দ্রুত ক্ষয় হত না।

নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ

তৃতীয় বরফ যুগে, হয়তো আজ থেকে পৌনে দুই লক্ষ বা দুই লক্ষ বছর আগে, আরও উন্নত ধরনের মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল। জার্মানির নিয়াণ্ডার্থাল নামক স্থানে এদের কঙ্কালের সন্ধান প্রথম পাওয়া গিয়েছিল বলেই তাদের এ নাম দেওয়া হয়েছে। তবে তারপর ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে এ ধরনের মানুষ যে এককালে বাস করত তার নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে। এরা আকারে খাটো ছিল, তাদের হাত-পা ছিল শক্তিশালী। এদের মস্তিষ্ক ছিল আধুনিক মানুষের মতোই বড়।

নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ বাইসন, লোমশ ম্যামথ, লোমশ গণ্ডার, বন্য ঘোড়া, হিংস্র বন্য মহিষ ইত্যাদি শিকার করত। এরা সব ছিল বরফ যুগের প্রাণী। বাইসন হচ্ছে মস্ত বড় এক ধরনের ষাঁড় বা মহিষজাতীয় প্রাণী আর ম্যামথ হচ্ছে বিশাল আকৃতির এক ধরনের হাতি। ম্যামথরা বহুদিন হল পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে। হায়েনা, সিংহ, চিতাবাঘ প্রভৃতির সাথেও নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের ভালই পরিচয় ছিল। এ ছাড়া গুহাবাসী ভালুককে মেরে বা তাড়িয়ে মানুষরা সেসব গুহা দখল করে বাস করত।

নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ বহু রকমের পাথরের হাতিয়ার তৈরি করত। শিকার করার এবং শিকারের পশুকে হত্যা করা, তার চামড়া ছাড়ানো, মাংস কাটা, হাড় কাটা, হাড় বা কাঠ ফুটো করা, মাটি খোঁড়া প্রভৃতি কাজের জন্য আলাদা আলাদা হাতিয়ার ছিল।

নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ মৃতদের কবর দিত। মানুষের ইতিহাসে এটা এক নতুন ঘটনা। মৃতদেহকে পাথরের গর্তে রেখে তার পাশে তার ব্যবহৃত হাতিয়ার ইত্যাদি, খাদ্য, ফুল-মালা, দেহকে উষ্ণ রাখার জন্য আগুনের পাত্র প্রভৃতি রাখত, উপরে পাথরের ছাদ দিয়ে দিত।

নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ ছিল দৈহিক শক্তির অধিকারী এবং দক্ষ শিকারী। আগুন এবং হাতিয়ার তারা করায়ত্ত করেছিল। এবং শিকার করার মতো অনেক প্রাণীও তখন ছিল। তবুও প্রায় ৩৫ হাজার বছর আগে এরা পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যায়। ততদিনে তাদের চেয়েও উন্নত ধরনের মানুষের উদ্ভব হয়েছিল। হয়তো উন্নত মানুষদের কাছে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে অথবা পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পেরে তারা লুপ্ত হয়েছিল। তবে এও সম্ভব যে, আধুনিক মানুষের সাথে

www.icsbook.info

মিশ্রণের ফলে তাদের জাতিগত পার্থক্য লোপ পেয়েছিল। এরকম হয়ে থাকলে নিয়ান্ডার্থাল মানুষদের কিছু কিছু দেহ-বৈশিষ্ট্য আমাদের মধ্যেও রয়েছে বলতে হবে।

বুদ্ধিমান মানুষ

আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার বছর আগে ইউরোপে এক নতুন ধরনের শিকারী মানুষের আবির্ভাব হয়। এদের কপাল ছিল চওড়া, ভুরু মসৃণ, ভুরুর খাঁজ প্রায় নেই বললেই হয়। এরাই হচ্ছে আধুনিক মানুষ। বর্তমান পৃথিবীতে শুধুমাত্র এ জাতির মানুষই আছে, অন্য যে সব অপরিণত মানুষের কথা আগে বলা হয়েছে তাদের সবাই বর্তমানে লুপ্ত। এই আধুনিক মানুষের নাম দেওয়া হয়েছে হোমো স্যাপিয়েন। এ কথাটার অর্থ হচ্ছে বুদ্ধিমান মানুষ।

হোমো স্যাপিয়েনদের প্রথম কোথায় উদ্ভব হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, হাঙ্গেরি, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

তবে যেখানেই এদের প্রথম উৎপত্তি হয়ে থাকুক, চতুর্থ বরফ যুগের শেষ দিকে ফ্রান্সে এসব শিকারীদল পাথরের হাতিয়ার, হাড়ের টুকরো প্রভৃতি যে সব নিদর্শন রেখে গেছে, তা থেকেই এদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমরা বিশদ ভাবে জানতে পেরেছি।

নতুন এ মানুষরা যে সময়ে তাদের শিকারী কার্যকলাপ চালিয়েছে, তাকে বলা হয় 'উচ্চ বা শেষ পুরোপলীয়' যুগ। পুরোপলীয় যুগের অর্থ হল পুরান পাথরের যুগ। 'পুরা' (প্রাচীন) এবং 'উপল' (পাথর) শব্দ দুটোর সন্ধি করে তৈরি হয়েছে 'পুরোপল' শব্দটি। শিকারী যুগের শেষ পর্যায়ে মানুষ নতুন নতুন ও উন্নত ধরনের পাথরের হাতিয়ার তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। এমনকি তারা হাতিয়ার তৈরির হাতিয়ার অর্থাৎ যন্ত্র তৈরি করতে শিখেছিল। তাই এ পর্যায়কে বলা হয় 'উচ্চ পুরোপলীয় যুগ'। তার আগের কয়েক লক্ষ বছর ব্যাপী সময়কে বলা হয় 'নিম্ন পুরোপলীয় যুগ'। সমগ্র ভাবে শিকারী যুগকে বলা হয় 'পুরোপলীয় যুগ' বা 'পুরান পাথরের যুগ'। আজ থেকে আট-দশ হাজার বছর আগে মানুষ কৃষিকাজ আবিষ্কার করার পর সমাজের আরও উন্নতি হয় এবং মানুষ আরও উন্নত ও মৃসণ পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করতে শুরু করে। কৃষির যুগকে তাই নাম দেওয়া হয়েছে 'নবোপলীয় যুগ' বা 'নতুন পাথরের যুগ'।

অবশ্য কেবল সময় নির্দেশ করে পুরোপলীয় যুগের সীমা নির্দেশ করা যায় না। কারণ, পৃথিবীর অনেক স্থানেই, যেমন, অস্ট্রেলিয়ার কোনো অংশ বা কোনো কোনো প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপে এখনও পুরোপলীয় পর্যায়ের শিকারী মানুষের দল রয়ে গেছে। তবে সাধারণভাবে বলা চলে যে, আজ থেকে আট-দশ হাজার বছর আগে পর্যন্ত পুরোপলীয় যুগের শিকার ব্যবস্থাই ছিল পৃথিবীর সব অঞ্চলের মানব সমাজের মূল ভিত্তি। তারপর থেকে কৃষি যুগের নবোপলীয় উৎপাদন-ব্যবস্থা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

পুরোপলীয় যুগের শেষ পর্যায়ের কয়েক ধরনের হোমোস্যাপিয়েন মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে। এরা অরিনেশীয়, সলুত্রীয়, ম্যাগদালেনীয় ইত্যাদি নামে পরিচিত। হোমো স্যাপিয়েনদের এই শ্রেণীবিভাগ অবশ্য তাদের কৃষ্টি বা সংস্কৃতির বিভিন্নতার হিসাবে

www.icsbook.info

করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ইংরেজি কালচার শব্দটার বাংলা হিসাবে কৃষ্টি বা সংস্কৃতি শব্দটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। কোনো মানবগোষ্ঠীর ব্যবহৃত যাবতীয় বাস্তব উপকরণ, যথা— খাদ্য বাসস্থান, পোশাক পরিচ্ছদ, উৎপাদনের হাতিয়ার-উপকরণ এবং আচার আচরণ প্রভৃতিকে একত্রে বলা হয় কালচার বা সংস্কৃতি।

ফ্রান্সের অরিনাক নামক স্থানে ৩৫ হাজার থেকে ২২ হাজার বছর আগে যে হোমো স্যাপিয়েন শিকারী দল বাস করত তাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'অরিনেশীয় সংস্কৃতির মানুষ।' এরা পাথরের চওড়া ও ভারি হাতিয়ার (ছুরি, মাংস চাঁছার হাতিয়ার প্রভৃতি) তৈরি করত। তা ছাড়া হাড়ের বর্শাফলক প্রভৃতি তৈরি করে কাঠের হাতলের মধ্যে তা বসিয়ে বর্শা ব্যবহার করার কৌশলও এরা জানত। অরিনেশীয় সংস্কৃতির সাথে যুক্ত কয়েকটি মানুষের কঙ্কাল প্রায় একশ বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল। যে গুহায় তাদের পাওয়া গিয়েছিল তার নাম অনুসারে এদের নাম রাখা হয়েছে ক্রোমানিয়ন (Cromagnon) মানুষ।

কুড়ি হাজার থেকে সতের হাজার বছর আগে দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সের সলুত্রে নামক স্থানে যারা থাকত তাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'সলুত্রীয় সংস্কৃতির মানুষ'। এরা সুন্দর সুন্দর বর্শাফলক তৈরি করতে পারত। এরা সম্ভবত তীর-ধনুক ব্যবহার করত।

ফ্রান্সের লা মাদেলিন নামক স্থানের আরেক শিকারী দল ঐ সময়ে এক উন্নত সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছিল। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে ম্যাগদালেনীয়। ১৭,০০০ থেকে ১২,০০০ বছর আগে ফ্রান্সে অন্তত ৫০ হাজার শিকারী মানুষ বাস করত। এরা প্রধানত বল্গা হরিণ শিকার করত।

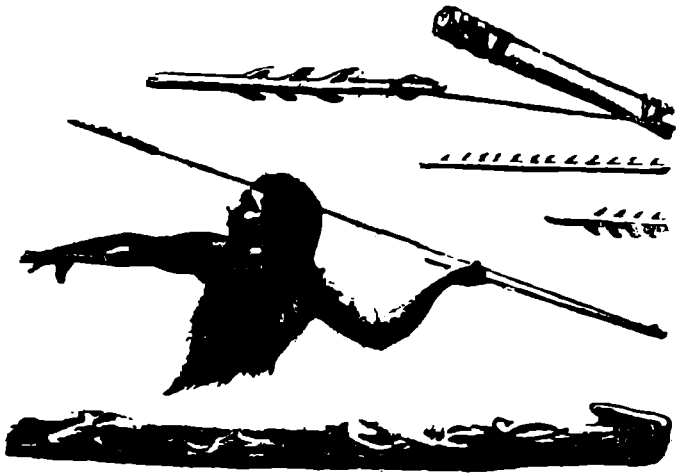

(উপরে) ম্যাগদালেনীয়দের ব্যবহৃত খাঁজ কাটা হাড়ের হার্পুন। (নিচে) ম্যাগদালেনীয়দের বর্শা নিক্ষেপক যন্ত্র। এ যন্ত্রের এক প্রান্তের খাঁজে বর্শার শেষ প্রান্ত আটকিয়ে আদিম শিকারীরা বর্শা ছুঁড়ত।

www.icsbook.info

ম্যাগদালেনীয়দের সময়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয়। হিমবাহগুলো সরে যেতে শুরু করে, নদীগুলো আবার প্রাণবন্ত এবং মাছে পূর্ণ হয়ে ওঠে, বসন্তে আকাশ পূর্ণ হয়ে ওঠে উড়ন্ত হাঁসের ঝাঁকে। খাদ্যের জন্য ম্যাগদালেনীয়দের আর দুশ্চিন্তা করতে হয় না।

ম্যাগদালেনীয়রা হাড়, হরিণের শিং ও হাতির দাঁত দিয়ে হাতিয়ার বানাত। হাতিয়ারগুলোর উপর তারা আবার সুন্দর ছবি আঁকত বা খোদাই করত। এরা দুটো সম্পূর্ণ নতুন হাতিয়ার তৈরি করতে পারত। একটা হল বর্শা নিক্ষেপক, দ্বিতীয়টা হল হার্পুন।

বর্শা নিক্ষেপক যন্ত্র হল এক প্রান্তে খাঁজ তোলা একটা লম্বা দণ্ড। এই খাঁজের মধ্যে বর্শার পিছনের দিকটা ঠেকা দিয়ে বর্শার মাঝামাঝি জায়গায় ধরে সেটা ছোঁড়া যায়। এভাবে ছুঁড়লে বর্শা অনেক জোরে আর অনেক দূরে যায়।

হার্পূন হচ্ছে খাঁজ কাটা এক রকমের বর্শা। এটা দিয়ে বড় মাছ প্রভৃতি জলজ প্রাণী শিকার করা হত। বর্তমানকালে যেভাবে হার্পুন দিয়ে তিমি মাছ শিকার করা হয় তার কৌশল ঐ আদিকালের মানুষরা প্রথম আবিষ্কার করেছিল।

ম্যাগদালেনীয়দের বাসস্থানে অনেক হাড়ের সুচ পাওয়া গেছে। এরা মৃত পশুর চামড়া সেলাই করে গায়ের পোশাক তৈরি করত। চামড়ার পোশাক দিয়েই তারা দুরন্ত শীত নিবারণ করত।

ম্যাগদালেনীয়রা ছিল সুন্দর শিল্পকর্মের স্রষ্টা। তাদের আগে অরিনেশীয়রা গুহার গায়ে প্রাণীদেহের রেখাচিত্র খোদাই করে আঁকত। ম্যাগদালেনীয়রা গুহার দেওয়ালে গোলা রঙ দিয়ে ছবি আঁকত। ফ্রান্স আর স্পেনে প্রায় একশ গুহায় সুন্দর সুন্দর গুহাচিত্র আবিস্কার হয়েছে। এ সকল গুহাচিত্রের বিষয়বস্তু সবক্ষেত্রেই ছিল বল্গা হরিণ, ঘোড়া, ষাঁড় প্রভৃতি। ছবি আঁকার জন্য সে যুগের মানুষরা বিভিন্ন রঙের পাথর বা মাটি গুঁড়ো করে চর্বির সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করত।

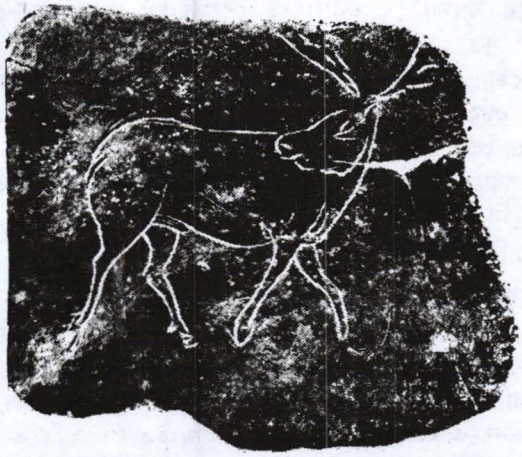

পাথরের গায়ে খোদাই করা বল্গা হরিণের ছবি।

www.icsbook.info

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, এ সকল সুন্দর সুন্দর গুহাচিত্র সাধারণত গুহার সবচেয়ে ভিতরের দিকে দুর্গম অংশে আঁকা হত। সেখানে অন্ধকারের মধ্যে পাথরের প্রদীপে চর্বিতে ভেজানো শ্যাওলার পলতের আলো জ্বালিয়ে শিল্পীরা ছবি আঁকত। পণ্ডিতরা অনুমান করেন, সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য নয়, বরং শিকার বৃদ্ধির জন্য যাদু অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে এ সকল গুহাচিত্র আঁকা হত। এ বিষয়ে আমরা পরে আরও আলোচনা করব।

আধুনিক মানুষ বা হোমো স্যাপিয়েনরা কালক্রমে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। নতুন নতুন পরিবেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ নতুন নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে। যেমন, বন-অঞ্চলে যারা বাস করত তারা কাঠের কাজ, ছুতোরের যন্ত্রপাতি, কাঠের ঘর ইত্যাদি বানাতে শেখে। তৃণভূমিতে যারা বাস করে তারা হাড়, চামড়া, বাঁশ, বেত ইত্যাদির ব্যবহার শেখে এবং চামড়ার তাঁবু ইত্যাদি তৈরি করতে শেখে। এসব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আদান প্রদান ও বিনিময়ের মাধ্যমে সমগ্র মানবসমাজের সামাজিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং নতুন স্তরে প্রবেশ করে। হোমো স্যাপিয়েনরা প্রথমে আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর ১২-১৪ হাজার বছর বা তারও আগে তারা বেরিং প্রণালী পার হয়ে এশিয়া থেকে উত্তর আমেরিকা মহাদেশে আসে। বেরিং প্রণালী তখন আরও সরু ছিল এবং বরফ যুগে সম্ভবত ঐ স্থানটা বরফে আবৃত ছিল। উত্তর আমেরিকার উত্তরপ্রান্ত থেকে শুরু করে মানুষ ক্রমশ সারা মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং পানামা যোজক পার হয়ে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়েই সম্ভবত মানুষ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য দ্বীপ পার হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছায়।

বরফ যুগের অবসানের পর আমেরিকা মহাদেশ ও অস্ট্রেলিয়া এশিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মানুষ অবশিষ্ট মানব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং বৃহত্তর মানব সমাজের সম্মিলিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফলাফল থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলে অস্ট্রেলিয়ার মানুষরা সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত শিকারী যুগেই আটকা পড়ে ছিল, ইউরোপীয়রা ঐ সময় জাহাজে করে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে তাদের সে অবস্থাতেই পেয়েছিল। আমেরিকার কোনো কোনো অংশের মানুষরা সভ্যতার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিল। কলম্বাস ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা আবিষ্কার করার পরে ইউরোপীয়রা সেখানে গিয়ে দেখতে পায় যে, চার-পাঁচ হাজার বছর আগে মিসরীয় বা ব্যাবিলনীয়রা যে পর্যায়ে ছিল মধ্য আমেরিকার মায়া সভ্যতা ও আজটেক সভ্যতা এবং দক্ষিণ আমেরিকার ইনকা সভ্যতা তখন মোটামুটি সেই পর্যায়ে। অবস্থান করছিল। তবে আমেরিকার এ দুই সভ্যতা স্বতন্ত্রভাবে নির্মিত হয়েছিল না এশিয়ার সভ্যতার দ্বারা (জলপথে) প্রভাবিত হয়েছিল সে সম্পর্কে বিতর্ক আছে। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

হোমো স্যাপিয়েনরা যখন প্রথম এশিয়া-আফ্রিকা-ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে, সে সময়েই সম্ভবত মানুষের বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। বিভিন্ন পরিবেশে দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্নভাবে থাকার ফলেই সম্ভবত এ সকল জাতির উদ্ভব হয়েছিল। চেহারা, গায়ের রং, নাক ও ঠোঁটের আকৃতি, চুলের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির বিচার করে পণ্ডিতরা মানুষকে ককেশীয়, নিগ্রো, মঙ্গোলীয় ইত্যাদি জাতিতে ভাগ করেছেন। কিন্তু মানুষে মানুষে এ সকল পার্থক্য নিতান্তই বাহ্যিক বিষয়ের পার্থক্য। মানুষের

www.icsbook.info

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা মস্তিষ্কের গঠনের উপর এ সকল পার্থক্যের কোনো প্রভাব নেই। তা ছাড়াও, মানুষের মধ্যে নানা জাতির উদয় হওয়ার পর কিছুকালের মধ্যেই আবার বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণের মাধ্যমে ঐ সমস্ত বৈশিষ্ট্য আবার সবার মধ্যে মিশে মিলিয়ে যায়। বর্তমানে নিখুঁত জাতিগত বৈশিষ্ট্য আর কোনো জাতির মানুষের মধ্যে নেই। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যদিও কেউ কেউ এমন দাবি করে থাকেন যে ককেশীয় বা শ্বেতাঙ্গ জাতিরা নিগ্রো ইত্যাদি অন্যান্য জাতির চেয়ে মাথার গুণে বা সংস্কৃতিতে উন্নত, এ কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অবৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান অকাট্য ভাবে প্রমাণ করেছে যে, বিভিন্ন দেশে ও জাতির মানুষদের মধ্যে সভ্যতার মাত্রার যে পার্থক্য দেখা যায় তার কারণ হচ্ছে সামাজিক। অর্থাৎ উন্নততর সমাজ কাঠামোয় বাস করলে তার অন্তর্গত পীত বা কালো মানুষও উন্নত সভ্যতা সংস্কৃতি আয়ত্ত করবে। আর নিম্নপর্যায়ের সমাজ কাঠামোর মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ থাকলে শ্বেতাঙ্গ মানুষের সংস্কৃতি ও চিন্তাধারাও নিম্ন পর্যায়ের হবে। যেমন, ভারতবর্ষে (হরপ্পা), মহেঞ্জোদাড়ো এবং চীনে যখন নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা প্রসার লাভ করেছিল ইউরোপের শ্বেতাঙ্গরা তারও অনেক কাল পরে পর্যন্ত নবোপলীয় বর্বর সমাজের গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল। একথা আজ তাই মানববিদ্বেষী এবং বর্ণবৈষম্যবাদী অশিক্ষিত মানুষরা ছাড়া আর সকলেই মানেন যে, পৃথিবীর সব মানুষ একই প্রজাতির অন্তর্গত এবং তাদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য নিতান্তই একটা বাহ্যিক বিষয়।

www.icsbook.info

আদিম সমাজের পরিচয়

এ পর্যন্ত আমরা মানুষের জৈবিক ও দৈহিক বিকাশের বিবরণ আলোচনা করেছি। এখন আমরা তার সামাজিক বিকাশের দিকটি আলোচনা করব। কয়েক লক্ষ বছর ধরে আদিম শিকারী মানুষ কি ধরনের সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল, তাদের কার্যকলাপ ও ধ্যানধারণা কেমন ছিল এ সকল বিষয়ে এবার আমরা বলব।

বস্তুগত সংস্কৃতি

পুরান পাথরের যুগের শেষ দিকে মানুষের বস্তুগত সংস্কৃতি যথেষ্ট উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বস্তুগত সংস্কৃতি বা বৈষয়িক সংস্কৃতি বলতে বোঝান হচ্ছে সেইসব বস্তুগত উপকরণ ও তার ব্যবহার পদ্ধতি, যার ভিত্তিতে মানুষ জীবনযাপন করে। পুরোপলীয় যুগের শেষ পর্যায়ে মানুষ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক মূল সমস্যার সমাধান করেছিল। সেসব সমাধান অনেক ক্ষেত্রেই এমন নিখুঁত ছিল যে, তার অনেকগুলোই আধুনিক সমাজে পর্যন্ত গৃহীত হয়েছে। আদিম শিকারী মানুষরা চামড়ার তাঁবু ও পাথরের কুঠার, সেলাই করা চামড়ার পোশাক, চামড়ার ঝুলি ও পাত্র, হাড়ের সুঁই, পাথরের প্রদীপ, ডোঙ্গা নৌকা, বড়শি, বর্শা নিক্ষেপক হার্পুন প্রভৃতি আবিষ্কার করেছিল। পুরোপলীয় যুগের মানুষরা প্রয়োজন মত বিভিন্ন পদার্থকে জোড়া দেওয়া এবং নির্দিষ্ট আকৃতির জিনিস তৈরি করা প্রভৃতি কারিগরি সমস্যার যে সমাধান বের করেছিল। তা আজও প্রচলিত রয়েছে। পুরোপলীয় যুগের শেষ দিকে মানুষ তীর-ধনুক আবিষ্কার করেছিল এবং কয়েক টুকরো কাঠ বেঁধে জোড়া দিয়ে তারা ধনুক বানাতে পারত। কাঠ বা পাথর ফুটো করার জন্য ড্রিল বা ছেদনযন্ত্র তারা আবিষ্কার করেছিল এস্কিমোরা এখনও হার্পুন দিয়ে সীল মাছ প্রভৃতি শিকার করে তা অনেকগুলো অংশ জোড়া দিয়ে তৈরি। এ হার্পুন মূলত পুরোপলীয় যুগের হাতিয়ার। কারণ এস্কিমোরা কিছুকাল আগে পর্যন্ত মেরু অঞ্চলের বরফের দেশে পুরোপলীয় যুগের শিকারী জীবন যাপন করত।

এখন আমরা পুরোপলীয় যুগের মানুষদের বৈষয়িক সংস্কৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলব।

ঘর বাড়ি

আদিম শিকারী মানুষরা গুহায় বাস করত, এ কথা আমরা আগে বলেছি। কিন্তু একদম শুরু থেকেই যে মানুষ গুহায় বাস করত একথা হয়তো ঠিক নয়। কারণ মানুষের প্রথম উদ্ভব যদি ঘটে থাকে আফ্রিকায়, তবে সেখানে তার বাসগৃহের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। প্রথম যুগে তাই মানুষ সম্ভবত খোলা জায়গাতেই থাকত। তারপর মানুষ যখন

www.icsbook.info

পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ল তখন উত্তরের শীতপ্রধান অঞ্চলে এবং বিশেষ করে বরফ যুগে শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ সম্ভবত গুহাবাসী হয়েছিল। তা ছাড়াও মানুষ যতদিন আগুন আয়ত্ত করেনি ততদিন গুহাবাসী অন্যান্য হিংস্র প্রাণীদের তাড়িয়ে গুহা দখল করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

কিন্তু গুহা কখনও সব মানুষদের বাসস্থানের সমস্যা দূর করতে পারেনি। সব জায়গাতে তো আর পাহাড় বা গুহা নেই। তা ছাড়াও শিকারী মানুষদের হাতিয়ারের উন্নতি হওয়ার পর যখন তারা বড় বড় প্রাণীদের শিকার করতে শিখেছিল, তখন তাদের পক্ষে এক জায়গায় বসে থাকা সম্ভব ছিল না। মানুষ তখন বড় বড় বাইসন, বলগা হরিণ আর ঘোড়ার পালকে অনুসরণ করত আর তার থেকে কিছু কিছু প্রাণী শিকার করত। যে শিকারী দল একটা বলগা হরিণের পালকে অনুসরণ করত, তাদের বাধ্য হয়ে বলগা হরিণের সঙ্গে সঙ্গে শত শত মাইল ঘুরে বেড়াতে হত। এ অবস্থায় খোলা জায়গায় কুটির বা তাঁবু বানানোর কৌশল মানুষ ক্রমশ আয়ত্ত করে। অনেক জায়গায় গর্ত খুঁড়েও মানুষ বাস করত। সাধারণত ডালপালা, হাড় ইত্যাদি দিয়ে তাঁবুর কাঠামো নির্মাণ করা হত এবং তার উপর চামড়ার আচ্ছাদন দেওয়া হত। চেকোশ্লোভাকিয়ায় উচ্চ পুরোপলীয় যুগের (হয়তো ২৫-৩০ হাজার বছর আগেকার) ম্যামথ শিকারীদেরে ঘরের এবং ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব ঘর প্রায় তাঁবুরই মতো। ঘরগুলোর ছাদ তৈরি করা হত কাঠের থামের উপর স্থাপন করে। থামগুলোকে সামান্য গর্ত করে মাটিতে পোঁতা হত এবং তারপর বড় বড় ভারি পাথর দিয়ে ঠেকা দিয়ে তাদের সোজা রাখা হত। চামড়া দিয়ে ঢেকে এবং ডালপালা, ঘাস, পাতা, মাটির চাপড়া ছাই ইত্যাদি দিয়ে ছাদগুলো তৈরি হত এবং ম্যামথের হাড় ইত্যাদি ভারি জিনিস দিয়ে ছাদ চাপা দেওয়া হত। এখানে কতগুলো কুটির পাওয়া গেছে। তাদের চারপাশে গোল করে চুনা পাথর, কাদামাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। এটাই মানুষের নিজের হাতে তৈরি দেওয়ালের প্রাচীনতম নিদর্শন।

আজকালকার বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসীদের ঘরবাড়ি দেখলেও বোঝা যায় আদিমকালের গৃহনির্মাণ কৌশল কত উন্নতি লাভ করেছিল। কারণ এসব আদিবাসীদের ঘরবাড়ির মধ্যে আদিমকালের রেশ রয়ে গেছে এবং হাজার হাজার বছর ধরে তার নির্মাণ কৌশল অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। যেমন, আমেরিকা মহাদেশের অনেক শিকারী আদিবাসী (রেড ইণ্ডিয়ান) সুন্দর চামড়ার ঘরে বাস করে। তাদের ছাদগুলো ঢালু এবং ঘরের মাথার কাছে ছাদে ফাঁক রয়েছে ধোঁয়া বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। ঘরের মধ্যে শীত দূর করার জন্য আগুন জ্বালাতে হয় বলে ধোঁয়া বের হওয়ার পথ থাকা খুবই জরুরি। এস্কিমোরাও চামড়ার স্থায়ী ঘর তৈরি করে বাস করে (অস্থায়ী বাসস্থান হিসেবে বরফের ঘরও তৈরি করে)। ফিলিপাইনের আদিবাসীরা গাছের ডালে ঘর তৈরি করে থাকে।

পুরোপলীয় যুগের পর মধ্যোপলীয় যুগের ঘর নির্মাণের কৌশল আরও উন্নত হয়। প্রায় দশ হাজার বছর আগে বরফ যুগের অবসানের পর এ যুগের উদয় হয়েছিল। পুরোপলীয় শিকারী যুগ আর নবোপলীয় কৃষি যুগের মধ্যবর্তী বলে এর নাম দেওয়া হয়েছিল "মধ্যোপলীয় যুগ" বা মধ্য পাথরের যুগ, এ যুগে শিকারের হাতিয়ার ও কৌশলের কিছু কিছু উন্নতি হয়েছিল। বরফ যুগের অবসানে এশিয়া ইউরোপের বিস্তীর্ণ

www.icsbook.info

অঞ্চলে নতুন করে বন সৃষ্টি হওয়ায় উপরে যেসব ঘরবাড়ির কথা বলা হয়েছে তার কিছু কিছুর উদ্ভব এ যুগেও ঘটে থাকতে পারে।

ঘরবাড়ি নির্মাণ ও ঘরসংসারের বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন স্থানের মানুষরা তাদের এলাকার সরঞ্জাম ব্যবহার করত। যেমন, সাধারণত ঘরে আগুন জ্বালানোর জন্য কাঠকুটো ব্যবহার করা হলেও চেকোশ্লোভাকিয়ার ম্যামথ শিকারীরা কয়লা পোড়াত। এখানে এক কয়লা খনির কয়লা কোনো সময়ে মাটির উপর পর্যন্ত ভেসে উঠেছিল এবং শিকারীরা তার গুণাগুণ আবিষ্কার করতে পেরেছিল। মানব সমাজের বিভিন্ন অংশ এভাবে যে বিভিন্ন সংস্কৃতি আয়ত্ত করেছিল পরবর্তীকালে সেগুলোই বিশ্বমানব সংস্কৃতির ভিত্তি রচনা করেছে।

আগুন ও রান্না

আগুনের ব্যবহার আদিম মানুষের এক বড় আবিষ্কার। আগ্নেয়গিরি বা জ্বলন্ত প্রাকৃতিক গ্যাস বা দাবাগ্নি থেকেই হয়তো মানুষ প্রথম আগুন আহরণ করেছিল। আগুনের ব্যবহার আয়ত্ত করার পরও বহুকাল পর্যন্ত অবশ্য মানুষ নিজের হাতে আগুন জ্বালাতে শেখেনি। প্রথমদিকে মানুষ আগুন দিয়ে শীত নিবারণ করত এবং পশুদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করত। কালক্রমে মানুষ চকমকি পাথর ঠুকে এবং আরও পরে কাঠে কাঠ ঘষে আগুন জ্বালাতে শেখে। তা ছাড়া আদিম শিকারী মানুষ আগুনের সাহায্যে রান্না করতেও শেখে। রান্নার প্রক্রিয়া মানুষকে শুধু সুস্বাদু এবং তৃপ্তিকর খাদ্যই দেয়নি, অনেক যুগান্তকারী আবিষ্কারের সূচনাও করেছিল। পাথরের হাতকুড়াল, বল্লম, তীর, ধনুক প্রভৃতি হাতিয়ার যেমন সর্বপ্রথম পদার্থবিদ্যা এবং বলবিদ্যার ভিত্তি রচনা করেছিল, আগুন এবং রন্ধনবিদ্যা তেমনি রসায়নবিদ্যার সূত্রপাত ঘটেছিল। রান্না আসলে একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া। আবার কাঠিতে মাংস গেঁথে আগুনে পোড়ানো এবং শক্ত ফলমূল পোড়ানো খুব কঠিন নয়। কিন্তু পানিতে খাবার সিদ্ধ করা একটা কঠিন সমস্যা এবং এ সমস্যার সমাধান করতে গিয়েই অনেক নতুন জিনিসের আবিষ্কার হল। প্রথম প্রথম চামড়ার পাত্র বা পানি নিরোধক বাঁশ-বেতের ঝুড়িতে গরম পাথর ফেলে পানি ফুটানোর চমৎকার পদ্ধতির আবিষ্কার হয়। কালক্রমে মানুষ আবিষ্কার করে যে বাঁশ বা বেতের ঝুড়ি মাটি দিয়ে লেপে সেটা আগুনে পোড়ালে তা পানি নিরোধক পাত্রে পরিণত হয়। ক্রমশ মানুষ আরও শিখল যে বেতের ঝুড়িটা আসলে অপ্রয়োজনীয়, কাদা মাটির পাত্র আগুনে পোড়ালে তাতে পানি রাখা, সিদ্ধ করা, রান্না করা— সবই সম্ভব হয়। এ ভাবেই মধ্যোপলীয় যুগে বা নবোপলীয় যুগের শুরুতে মাটির পাত্র আবিষ্কৃত হয়।

হাতিয়ার, শিকার কৌশল, যানবাহন

শিকারী মানুষদের পাথরের হাতিয়ারের (হাতকুড়াল, ছুরি, বল্লম ইত্যাদির) কথা আমরা আগে কিছু কিছু বলেছি। উচ্চ পুরোপলীয় যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হচ্ছে বর্শা নিক্ষেপক যন্ত্র এবং তীর-ধনুক। এ দুটো দূরপাল্লার হাতিয়ার আয়ত্ত করার ফলে মানুষের শিকারী গুণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারণ এর ফলে তারা খোলা প্রান্তরে দ্রুতগতিসম্পন্ন প্রাণীদের শিকার করতে পারত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে,

www.icsbook.info

উপরোক্ত দুটো হাতিয়ারেই যন্ত্রবিদ্যার দুটো গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের প্রয়োগ ঘটেছে। বর্শা নিক্ষেপক যন্ত্রে লিভার বা দণ্ডের সাহায্যে বর্শার গতি ও পাল্লা বাড়ানো হয়েছে। আর ধনুকের ক্ষেত্রে তার ছিলা বা গুণ-এর মধ্যে সঞ্চিত শক্তিকে অকস্মাৎ মুক্ত করে তার সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করা হয়। এভাবেই মানুষ বিজ্ঞানের তত্ত্ব আবিষ্কারের অনেক আগেই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে পদার্থবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যার সূত্র আয়ত্ত ও প্রয়োগ করতে শিখেছিল। পরবর্তীকালে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বহু লক্ষ মানুষের সঞ্চিত এ সকল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছিল।

উচ্চ পুরোপলীয় যুগে মানুষ হাতিয়ার তৈরির হাতিয়ার অর্থাৎ যন্ত্র নির্মাণ করতে শিখেছিল। এ সময় বাটালি, ছেদনযন্ত্র প্রভৃতির নির্মাণ কৌশল আয়ত্ত করার ফলেই মানুষের পক্ষে হাড় ও শিঙের বিভিন্ন হাতিয়ার তৈরি করা সম্ভব হয়। এই প্রথম মানুষ খাঁজকাটা বল্লম, মাছ ধরার হার্পুন, ছিদ্র বিশিষ্ট হাড়ের সুঁই প্রভৃতি নির্মাণ করতে সক্ষম হল। অবশ্য আদিম মানুষ ঐসব যন্ত্র কেবল হাতিয়ার নির্মাণেই নয়, হাড়ের গায়ে ছবি খোদাই করা বা হাড়ের সুন্দর মূর্তি তৈরি করার কাজেও ব্যবহার করত। হাড়, শিঙ এবং হাতির দাঁতের হাতিয়ার ও শিল্পদ্রব্য তৈরির কাজে ম্যাগদালেনীয় মানুষরা অন্য সব আদিম মানুষদের তুলনায় অনেক বেশি উৎকর্ষ অর্জন করেছিল। এ কাজে তাদের মতো দক্ষতা এবং শিল্পপটুতা কেবল এস্কিমোরাই দেখাতে পেরেছে। উচ্চ পুরোপলীয় যুগে পৌঁছানোর অনেক আগেই মানুষ কাঠের হাতিয়ার ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। জার্মানিতে অনেক প্রাচীনকালের এক হাতির কঙ্কালের মধ্যে গাঁথা অবস্থায় একটা কাঠের বল্লম পাওয়া গেছে। উচ্চ পুরোপলীয় এবং মধ্যোপলীয় যুগের মানুষ পাথরের হাতিয়ারে কাঠের হাতল সংযোগ করতে শিখেছিল। শিকারীরা কাঠের বাঁট বা হাতলে পাথরের ধারালো অগ্রভাগ সংযোজন করে বর্শা, হার্পুন প্রভৃতি তৈরি করত। এমনকি তীর-ধনুক আবিষ্কারের পর কাঠের দণ্ডের সামনের দিকে পাথরের সূচীমুখ বসিয়ে তীর পর্যন্ত তৈরি করা হত।

মধ্যোপলীয় যুগে বনভূমি বিস্তার লাভ করার সাথে সাথে কাঠের কাজেরও প্রসার ঘটে। ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের মানুষরা ব্যাপক হারে বনের গাছ কাটত এবং পাথরের কুঠার ও বাটালি দিয়ে বুমেরাং ধরনের নিক্ষেপণ অস্ত্র, ডোঙ্গা বা শালতি নৌকা, নৌকার দাঁড় প্রভৃতি তৈরি করত। ডোঙ্গা নৌকা তৈরি করা হত বড় গাছের গুঁড়িতে খোঁড়ল সৃষ্টি করে। প্রথমে একপাশে লম্বালম্বিভাবে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে তারপর কুঠার বাটালি ইত্যাদির সাহায্যে চেঁছে ঐ খোঁড়ল সৃষ্টি করা হত। আমাদের দেশে এখনও গ্রামাঞ্চলে তাল-গাছের গুঁড়ি কেটে তৈরি করা ডোঙ্গা নৌকা দেখা যায়।

পুরোপলীয় যুগে মানুষ শক্তিশালী বা দ্রুতগতিসম্পন্ন প্রাণী শিকারের উদ্দেশে ফাঁদের ব্যবহার আয়ত্ত করেছিল। প্রথম প্রথম মানুষ পশুর পালকে তাড়িয়ে এনে জলাভূমিতে বা পাহাড়ের উপর থেকে নিচে অথবা বড় আকারের গর্তে ফেলে তারপর হত্যা করত। এভাবেই সম্ভবত ক্রমে ক্রমে কৃত্রিমভাবে প্রাণী শিকারের জন্য আদিম শিকারীরা গর্ত খুঁড়ে নিচে তীক্ষ্ণ কাঠের শূল পুঁতে রাখত এবং গর্তের মুখ ডালপালা দিয়ে ঢেকে রাখত। হাতি বা অন্য প্রাণী ঐ পথ দিয়ে গেলে ভুলক্রমে গর্তে পড়ে শূলে বিঁধে মারা যেত। কঙ্গোর পিগমি শিকারীরা আজও গর্ত খুঁড়ে তার ভিতর বল্লম হাতে লুকিয়ে বসে থাকে। গায়ের গন্ধ ঢাকার জন্য গোবর দিয়ে নিজেদের চাপা দেয়। পাশ দিয়ে হাতি যাওয়ার সময় তারা লাফ দিয়ে উঠে হাতির পেট ফুঁড়ে দেয় বর্শা দিয়ে।

www.icsbook.info

আজকালকার আদিবাসীদের শিকার-কৌশল আলোচনা করলে আদিম মানুষের কার্যকলাপ সম্পর্কে ধারণা করা সহজ হবে, কারণ আজকালকার আদিবাসীদের কাজের মধ্যে পুরোপলীয় যুগের অনেক কর্মকৌশলের রেশ প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়ে গেছে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী শিকারীরা এমুপাখি শিকার করতে হলে একটা বড় পাতাসুদ্ধ ডাল হাতে করে তার আড়ালে লুকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে পাখির কাছে যায় এবং তাকে হত্যা করে (উটপাখির মত এমুও উড়তে পারে না)। আফ্রিকার বুশম্যানরা উটপাখির পালকের মালা গলায় পরে আর একটা মাথা-বাঁকানো লাঠি সামনে ধরে উটপাখি সেজে পাখিদের কাছে যায় এবং বিষ মাখানো তীর মেরে তাদের হত্যা করে। উত্তর আমেরিকার আদিম শিকারীরা বাইসন শিকারের সময় বাইসনের চামড়ায় গা ঢেকে এবং হরিণ শিকারের সময় হরিণের চামড়ায় আত্মগোপন করে পশুর পালের কাছে গিয়ে তাদের শিকার করত। নানা রকমের ফাঁদ ব্যবহার করার জন্য এসব আদিম শিকারীদের বিভিন্ন পশুর স্বভাব ও আচরণ খুব ভালভাবে জানতে হত। পশুকে ফাঁদে ফেলার জন্য অনেক সময় ঝোপ-জঙ্গল বা ঘাসের বনে আগুন ধরানো হত। আফ্রিকার আদিম শিকারীরা এভাবে হাতি শিকার করত। হাতির পালের সন্ধান পেলে শিকারীরা তাদের ঘিরে একটা বড় বৃত্ত ধরে আগুন লাগাত। আগুনের বেড়াজালে আটকা পড়া হাতিগুলোকে অতঃপর শিকার করা হত। উত্তর আমেরিকার আদিম শিকারীরা অনুরূপ পদ্ধতিতে বাইসন শিকার করত।

আদিম শিকারীরা পশু শিকারের সাথে সাথে সুযোগ মতো মাছও শিকার করত। আর নদী বা সমুদ্রের তীরের মতো সুবিধাজনক স্থানে যারা বাস করত তারা মাছ শিকারের উপর পুরোপুরি নির্ভর করেও চলতে পারত। মাছ ধরার যে পদ্ধতি পুরোপলীয় যুগের শেষ ভাগ অথবা মধ্যোপলীয় যুগ থেকে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল তা হল জাল দিয়ে মাছ ধরা। ছিপ-বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরার কৌশল অনেক আদিম শিকারীদের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও সর্বত্র তা প্রসার লাভ করেনি। আদিম মানুষরা ছোট হাত-জাল থেকে শুরু করে নদীতে ব্যবহার করার মতো টানা জাল সবই ব্যবহার করত। মধ্যোপলীয় যুগের (প্রায় আট দশ হাজার বছর আগেকার) মাছ ধরা জালের সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। পুরোপলীয় যুগে জাল তৈরি করার মতো দড়ি বা সুতলী আবিষ্কৃত হয়েছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অবশ্য, পুরোপলীয় যুগের পাথরে আঁকা একটি ছবিতে দেখা যায়॥ একটি মেয়ে দড়ির মই বেয়ে উঠে মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করছে। কিন্তু এ দড়ি চামড়ার ফালি দিয়েও তৈরি হয়ে থাকতে পারে। যাহোক, উচ্চ পুরোপলীয় যুগের শেষ দিকে (১২-১৪ হাজার বছর আগে) মাছ ধরার জাল আবিষ্কৃত হয়েছিল বলে ধরে নিলে সম্ভবত খুব বেশি ভুল হবে না।

পুরান পাথরের যুগের মানুষরা মাছ ধরার চাঁই আবিষ্কার করেছিল। বাঁশ, বেত বা গাছের ডাল দিয়ে তৈরি ঐ ধরনের চাঁই এখনও পর্যন্ত ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের মানুষরা ব্যবহার করে।

পুরোপলীয় যুগে নৌকার আবিষ্কার হয়েছিল কি না সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ বা সে আমলের কোনো নৌকার ছবি কোথাও পাওয়া যায়নি। তথাপি মানুষ যখন থেকে ব্যাপকভাবে মাছ শিকারের দিকে দৃষ্টি দেয়, তারপর যে ভেলা এবং নৌকার ব্যবহার শুরু হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষত টানা জাল ব্যবহার করতে

www.icsbook.info

যে নৌকার প্রয়োজন হত এ বিষয়ে পণ্ডিতরা একমত। সবচেয়ে পুরান যে নৌকার সন্ধান পাওয়া গেছে তা সোয়া আট হাজার বছর আগেকার। হল্যাণ্ডে পাওয়া এ নৌকাটি ছিল গাছের গুঁড়ি থেকে তৈরি ডোঙ্গা নৌকা। এ ছাড়া বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জেও ৫০-৬০ ফুট লম্বা কয়েকটি সুপ্রাচীন কালের শালতি নৌকা পাওয়া গেছে।

ডোঙ্গা ছাড়া ভেলা এবং চামড়ার নৌকাও আদিম মানুষ আবিষ্কার করেছিল। কাঠের গুঁড়ি; নলখাগড়া, বড় লম্বা ঘাস ইত্যাদি একসাথে বেঁধে ভেলা তৈরি করা হত। চামড়া সেলাই করে তার ভিতর বাতাস পুরে সেটাকে নৌকার মতো ব্যবহার করা

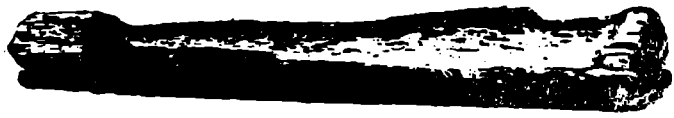

প্রায় সাড়ে আট হাজার বছর আগের একটি ডোঙ্গা নৌকা। হল্যাণ্ডে এটি পাওয়া গেছে। গাছের গুঁড়ির খুদে এ নৌকা তৈরি করা হত।

হত অনেক জায়গাতেই। চামড়ার নৌকার উৎকৃষ্টতম নিদর্শন হচ্ছে এস্কিমোদের 'উমিয়াক' এবং 'কায়াক'। কাঠের কাঠামোর উপর চামড়া টান টান করে আটকিয়ে এ সব নৌকা তৈরি করা হয়। কায়াক শুধু মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এতে একজনমাত্র শিকারীর স্থান সঙ্কুলান হয়। সিন্ধুঘোটক প্রভৃতি বড় প্রাণী শিকারের জন্য এস্কিমোরা 'উমিয়াক' ব্যবহার করে। এ সকল চামড়ার নৌকা সম্ভবত মধ্যোপলীয় যুগের আবিষ্কার।

পুরোপলীয় যুগের শেষ ভাগে বা মধ্যোপলীয় যুগে শিকারীরা একটা নতুন সহায়ক শক্তি আয়ত্ত করার ফলে তাদের শিকারীগুণ আগের তুলনায় অনেক বেড়ে যায়। এ সহায়ক শক্তি হলো পোষ মানা কুকুর। কুকুর হলো প্রথম প্রাণী যাকে মানুষ পোষ মানিয়ে নিজের কাজে লাগিয়েছে। তীব্র ঘ্রাণ-শক্তির গুণে কুকুর বহু দূর থেকে শিকারের গন্ধ পেয়ে মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত এবং পশুর পালকে তাড়া করে বা আক্রমণ করে মানুষকে শিকারে সাহায্য করত। ইউরোপ আমেরিকায় এখনও কুকুরের পাল নিয়ে দল বেঁধে শিকারে যাওয়ার রেওয়াজ আছে।

কুকুর প্রথম কিভাবে পোষ মেনেছিল, সে বিষয়ে নানা মত আছে। কুকুরের উৎপত্তি হয়েছে নেকড়েজাতীয় প্রাণী থেকে। ছোট আকারের নেকড়ে বা কুকুর সম্ভবত অনেক কাল আগে থেকেই শিকারীদের আস্তানার কাছে ঘোরাফেরা করত এবং কালক্রমে এরা মানুষের অনুগত হয়ে পড়ে। কুকুর শুধু শিকারেই সাহায্য করত না, বরফের উপর দিয়ে যাতায়াতের সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে মানুষ কুকুরে টানা শ্লেজ-গাড়ির আবিষ্কার করে। শ্লেজ হচ্ছে চাকাবিহীন এক রকম গাড়ি, শুধু মসৃণ বরফের উপর দিয়েই এগুলোকে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। বলা প্রয়োজন যে, আদিম শিকারীদের যুগে চাকার আবিষ্কার হয়নি। চাকা অনেক কাল পরের জিনিস।

কুকুর ছাড়াও, শিকারী ও মৎস্য শিকারী মানুষরা অন্যান্য পশু ও প্রাণীদের পোষ মানিয়ে কাজে লাগিয়েছে। মাছের ঝাঁককে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক জায়গায় উদবিড়াল(ভোঁদড়) এবং কুকুরকে ব্যবহার করা হয়। চীনের অনেক স্থানে সামুদ্রিক

www.icsbook.info

পাখিকে পোষ মানিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় পানিতে ডুব দিয়ে মাছ ধরে আনার জন্য। এসব পাখি যাতে মাছ খেয়ে না ফেলে সে উদ্দেশ্যে তাদের গলায় একটা দড়ির ফাঁস লাগানো থাকে।

পাত্র, প্রদীপ, গয়না, পোষাক

পুরোপলীয় যুগের শেষ দিকে মানুষ সম্ভবত পানি, দুধ ইত্যাদি বহন করার জন্য চামড়ার পাত্র বা সেলাই করা চামড়ার ব্যাগ ব্যবহার করতে শিখেছিল। আগে একবার যে মধু সংগ্রাহিকার ছবির কথা বলা হয়েছে ঐ ছবিতে মেয়েটি সম্ভবত একটা চামড়ার পাত্রেই মধু সংগ্রহ করছিল। পণ্ডিতদের ধারণা, মাটির পাত্র সম্ভবত পরবর্তীকালের অর্থাৎ নবোপলীয় যুগের আবিষ্কার। মানুষের উদ্ভবের পর বহু লক্ষ বছর পর্যন্ত সম্ভবত মানুষ কৃত্রিম আলো ব্যবহার করতে শেখেনি। সবচেয়ে প্রাচীন যে প্রদীপের নিদর্শন পাওয়া গেছে তা উচ্চ পুরোপলীয় যুগের পশ্চিম ইউরোপের শিকারী মানুষের ব্যবহৃত প্রদীপ। অন্ধকার গুহার ভিতরে দেওয়ালে ছবি আঁকার জন্য সম্ভবত এ সকল প্রদীপ ব্যবহার করা হত। প্রদীপগুলো ছিল পিরিচের মতো এক ধরনের পাত্র। আধুনিক এস্কিমোরাও এ ধরনের তবে বড় আকারের প্রদীপ ব্যবহার করে। এস্কিমোরা

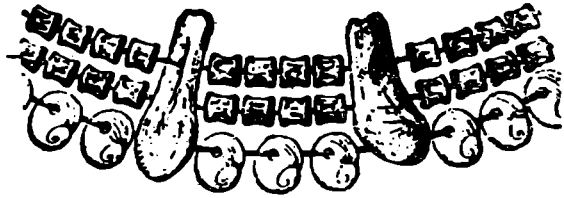

উচ্চ পুরোপলীয় যুগের গলার হার। এ হারটা মাছের মেরুদণ্ডের হাড়, ঝিনুক ও হরিণের দাঁত গেঁথে তৈরি করা হয়েছে।

প্রদীপ জ্বালাতে সীল মাছ বা সিন্ধুঘোটকের চর্বি এবং শ্যাওলার পলতে ব্যবহার করে। পাথর যুগের মানুষরাও সম্ভবত একই কৌশলে প্রদীপ জ্বালাত।

পোশাক-পরিচ্ছদ কখন কি ভাবে মানুষ আবিষ্কার করেছিল তা আমরা জানি না। এ বিষয়ে পণ্ডিতরা একমত হতে পারেননি। অনেকের ধারণা, প্রথমে খাদ্য, হাতিয়ার প্রভৃতি মাথায়, কাঁধে বহন করতে করতে মানুষ ক্রমশ পালক, হাড়, চামড়া প্রভৃতির গয়না বা অলঙ্কার ব্যবহার করতে শুরু করে। ক্রমশ তারা আবিষ্কার করে যে, পশুর চামড়া গায়ে জড়িয়ে রাখলে শীত কম লাগে।

এভাবে পোশাকের আবিষ্কার হোক বা না হোক, এ বিষয়ে অধিকাংশ পণ্ডিত একমত যে, নিয়াণ্ডার্থাল মানুষরা শীত নিবারণের জন্য পশুর চামড়া ব্যবহার করত। এবং একথাও ঠিক যে, গুরুত্বের দিক থেকে হাতিয়ার এবং আগুনের ব্যবহারের পরেই এই পোশাক বা পরিচ্ছদের স্থান। পোশাকের আবিষ্কার করতে পারার দরুনই মানুষের পক্ষে সারা পৃথিবীর সব রকম আবহাওয়াতেই বসবাস করা সম্ভব হয়েছে। চামড়ার পোশাক এবং পাদুকা আবিষ্কার করতে পারার ফলেই এস্কিমোরা অতি প্রাচীনকালেই উত্তর মেরুর প্রচণ্ড শীতের মধ্যে জীবন যাপন করতে পারত।

www.icsbook.info

আদিম মানুষ প্রথম প্রথম হয়তো চামড়া গায়ে জড়িয়ে শীত নিবারণ করত। কিন্তু ক্রমশ তারা চামড়া সেলাই করতে শিখেছিল। উচ্চ পুরোপলীয় যুগের একটা হাতির দাঁতের মূর্তি সাইবেরিয়াতে পাওয়া গেছে। তাতে দেখা যায়, একটি মানুষ সেলাই করা লোমশ চামড়ার পোশাকে মাথা এবং সমস্ত শরীর আবৃত করে রেখেছে।

প্রাচীন অনেক গুহাচিত্রে দেখা যায়, কিশোরীরা পশুচর্মে শরীর ঢেকে শিকারীর নাচে অংশ নিচ্ছে। আরও কিছু কিছু পশুচর্মে ঢাকা মানুষের ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে, যা দেখে পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে ঐ শিকারীরা পশুর চেহারা নকল করে শিকারযোগ্য পশুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাদের শিকার করত। পশুর চামড়া পরে পশুর চেহারা নকল করা থেকে পোশাকের আবিষ্কার হয়েছিল কি না তা অবশ্য বলা কঠিন।

একেবারে আদিকালের মানুষ ছিল রীতিমতো অসহায়। বনের বড় বড় পশুর তুলনায় মানুষ ছিল শক্তিহীন। তবে তার ছিল কাজ করার মতো, হাতিয়ার গড়ার মতো দুখানি হাত আর উন্নত ধরনের মগজ ও বুদ্ধি। তবুও মানুষ তখন ছিল দুর্বল আর অসহায়। অতি কষ্টে ফলমূল বা ইঁদুর প্রভৃতি ছোট ছোট প্রাণী সংগ্রহ করে সে জীবন রক্ষা করত। জীবন তখন ছিল কঠোর আর বিপদপূর্ণ। মানুষের আয়ু তখন ছিল সংক্ষিপ্ত। অনেক মানুষ তো ২০ বছরের গণ্ডিই পার হতে পারত না— কিছু যেত বাঘের পেটে, কিছু মারা যেত রোগে বা অনাহারে।

প্রকৃতির মুখাপেক্ষী এ আদি মানবরা বাঁচার একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছিল একসাথে দল বেঁধে থেকে। দলবদ্ধ না হয়ে সেকালে মানুষের পক্ষে হিংস্র পশুর হাত থেকে আত্মরক্ষা বা খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হত না। এ কারণে আদিকালে মানুষরা দল বেঁধে বাস করত, এবং এক সাথে খেয়ে বাঁচত। এক একটা দলে সাধারণত কয়েক কুড়ি মানুষ থাকত। এরচেয়ে বেশি লোকের উপযুক্ত খাদ্য এক জায়গায় পাওয়া কঠিন। আদিম মানুষের এ দলগুলোকে নাম দেওয়া চলে আদি দল। একই বন বা অঞ্চলের বিভিন্ন দল সাধারণত আলাদা আলাদা থাকত। একসাথে মিলে বড় দল করত না।

আদিম মানুষরা সবাই মিলে খাদ্য সংগ্রহ করত। দলের ভিতরে বিভিন্ন মানুষের কাজের ধরনে কোনো পার্থক্য ছিল না, সবাই একই ধরনের কাজ করত। কিন্তু হাতিয়ারের উন্নতি, বিশেষত বল্লম ইত্যাদি আবিষ্কারের ফলে মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা অর্থাৎ পশু শিকারের ও খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেল। এর ফলে দলের মধ্যে কাজের বিভাগ দেখা দিল। দলের সংগঠনেও অনেক পরিবর্তন এল।

হাতিয়ারের উন্নতির ফলে দলের সব লোককে আর শিকার সংগ্রহে না গেলেও চলত। আগে যে খাদ্য সংগ্রহ করতে পঞ্চাশজন দরকার হত, এখন পঁচিশ জনেই তা পারে। তাই পুরুষেরা যখন শিকারে যেত, মেয়েরা আস্তানার কাছাকাছি থেকে ফলমূল, মাছ ইত্যাদি সংগ্রহ করত আর ঘর সংসারের নানা কাজ করত। তিন চার বছর বয়স থেকে বাচ্চারাও মায়েদের কাজে সাহায্য করত। ঘরের কাজ নিতান্ত কম ছিল না। পুরুষরা শিকার করে নিয়ে এলে পশুর মাংস কাটা, রান্নাবান্না করা, চামড়া চর্বি ছাড়িয়ে রাখা, হাড়ের সুঁই আর পশুর রগের সুতোর সাহায্যে চামড়া সেলাই করে পোশাক বানানো, সন্তান লালন-পালন ইত্যাদি সব কাজ মেয়েদের করতে হত। গুহায় বা আস্তানায় আগুন জিইয়ে রাখাও ছিল মেয়েদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আগুন ব্যবহারের

www.icsbook.info

পদ্ধতি আবিষ্কার হওয়ার পরও বহুদিন পর্যন্ত মানুষ কৃত্রিমভাবে আগুন জ্বালাতে শেখেনি। তাই আগ্নেয়গিরি বা দাবাগ্নি (অর্থাৎ সূর্যের তাপে জ্বলে ওঠা বনের আগুন) থেকে পাওয়া আগুনকে গুহাবাসী মানবরা নিবতে দিত না, কাঠকুটো দিয়ে বাঁচিয়ে রাখত, এমনকি হাজার হাজার বছর ধরে তারা এ ভাবে আগুনকে বাঁচিয়ে রাখত।

নতুন অবস্থায় কাজের বিভাগের ফলে মানুষের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। পুরুষরা শিকারের কাজে এবং মেয়েরা ফলমূল আহরণ ও অন্যান্য কাজে দক্ষতা অর্জন করেছিল। দলের একাংশ অর্থাৎ বয়স্ক পুরুষরা যা শিকার করত, দলের মেয়ে পুরুষ বাচ্চা সবাই তা খেত। ফলে বৃদ্ধ ও শিশু কিশোররা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ যথা, হাতিয়ার বানানো, পোশাক তৈরি ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করতে পারত।

www.icsbook.info

মাতৃতন্ত্র

আদিমসমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা দরকার। আমরা যে সমাজে বাস করি তাতে পুরুষ মানুষের প্রাধান্য রয়েছে। আজকের পৃথিবীতে অধিকাংশ দেশেই পরিবারের কর্তা হচ্ছে পুরুষ মানুষ। শুধু পরিবারের মধ্যেই নয়, সমাজের সবক্ষেত্রেই পুরুষ মানুষদের প্রাধান্য দেখা যায়। আমাদের মতো উন্নয়নকামী দেশগুলোতে সাধারণত মেয়েরা ঘর সংসারের কাজ করে, পুরুষরা কলে কারখানায় বা অফিস আদালতে চাকরি করে উপার্জন করে। কিন্তু ইউরোপ আমেরিকার উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে মেয়েরা ঘর সংসারের দায়িত্ব পালন করেও জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে পুরুষদের মতোই সমান ভাবে কাজ করে। কিন্তু তারাও পুরষদের সমান মর্যাদা পায় না। এখনও ইউরোপ আমেরিকার অনেক দেশে সমান সমান কাজ করেও মেয়েরা পুরুষের চেয়ে কম বেতন পায়। এমনকি অনেক দেশেই মেয়ে বৈজ্ঞানিকরা পুরুষ বৈজ্ঞানিকের চেয়ে কম বেতন পান, যদিও তাঁরা কাজ করেন একই রকম। এ ধরনের সমাজকে বলা হয় পুরুষপ্রধান সমাজ বা 'পিতৃতান্ত্রিক সমাজ'।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা পুরুষদের হাতে নিগৃহীত এবং অবহেলিত হয়। অবশ্য আমাদের সমাজে ধনী দরিদ্রের প্রভেদও রয়েছে। এবং একথাও সত্য যে, ধনী বা অভিজাত মহিলা গরিব শ্রেণীর পুরুষমানুষের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারে। কিন্তু অভিজাত সমাজের মধ্যেও আবার মেয়েরা পুরুষের অধীনে থাকতে বাধ্য হয়। সমাজে এ রকম পুরুষদের প্রাধান্য বহু হাজার বছর ধরে প্রচলিত রয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে পুরুষপ্রধান সমাজে বাস করার ফলে এবং মেয়েদের উপর কর্তৃত্ব ফলানোর অভ্যাসের দরুন পিতৃপ্রধান সমাজের পুরুষ মানুষদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, পুরুষরা মেয়েদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে সবদিক দিয়ে নিকৃষ্ট। আর পুরুষ কর্তা, পুরুষ পণ্ডিত, পুরুষ দার্শনিকদের কাছে যুগ যুগ ধরে শুনতে শুনতে পিতৃপ্রধান সমাজের মেয়েদেরও ধারণা হয়ে গেছে যে পুরুষরা বুঝি মেয়েদের চেয়ে বেশি গুণের অধিকারী। কিন্তু এ সকল কথায় কোনো সত্যতা নেই। মেয়ে ও পুরুষের দৈহিক আকৃতিতে যেটুকু সামান্য পার্থক্য আছে তা ধর্তব্যই নয়। এ কথা ঠিক যে, পুরুষের তুলনায় মেয়েদের শরীর সামান্য ছোট, কিন্তু অন্য হিসেবে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী। মানুষের দেহের সবচেয়ে শক্তিশালী দেহযন্ত্র রয়েছে মেয়েদের শরীরে। এটা হচ্ছে মেয়েদের জরায়ু। জরায়ুতে মেয়েরা সন্তান ধারণ করে। জীবনী শক্তির হিসেবে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে কম নয়। বরং মেয়েদের আয়ু পুরুষের চেয়ে কিছু বেশি।

আসলে দৈহিক আকৃতির সামান্য ইতরবিশেষের জন্য মানুষে মানুষে বা মেয়ে পুরুষে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। যেমন, ইউরোপীয় বা জার্মানদের তুলনায়

www.icsbook.info

বাঙালীরা আকারে খর্ব, রঙে কালো। এজন্য হিটলার আমাদের মানুষ মনে করত না কিন্তু বাঙালী বৈজ্ঞানিকরা নানা যুগান্তকারী আবিষ্কার করে এবং বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পেয়ে বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণ করেছেন যে, বাঙালীরা বুদ্ধিতে খাটো নয়। তেমনিভাবে, মাদাম কুরী প্রমুখ মহিলা বিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন যে, মেয়েরা পুরুষের চেয়ে বুদ্ধিতে, ক্ষমতায় বা দক্ষতায় কম নয়। চৈনিক এবং জাপানীদের মতো এস্কিমোরাও আজকাল প্রমাণ করেছে যে, গুণের বা দক্ষতার বিচারে তারা পৃথিবীর যে কোনো উন্নত জাতির মানুষের চেয়ে হীন নয়। তা সত্ত্বেও যে বিশ্বসভ্যতায় এস্কিমোদের অবদান নগণ্য, তার কারণ হচ্ছে অনুন্নত সমাজ ব্যবস্থার গণ্ডির মধ্যে থাকার দরুন এস্কিমো মানুষদের জ্ঞান এবং দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছিল।

দীর্ঘকাল পিতৃপ্রধান সমাজে সামাজিক ভাবে অবহেলিত এবং অবদমিত থাকার দরুন, প্রাচীন, মধ্য বা আধুনিক যুগে মেয়েরা তাদের প্রতিভার প্রকাশ ঘটাতে পারেনি। বর্তমানে উন্নত দেশসমূহে মেয়েদের অগ্রগতির পথে কৃত্রিম সামাজিক বাধাসমূহ যত দূর হচ্ছে মেয়েরা ততই বেশি করে তাদের প্রতিভার পরিচয় দিতে পারছে। ইউরোপ আমেরিকার মেয়েরা, জাপানের মেয়েরা, সোভিয়েত ইউনিয়নের মেয়েরা আজকাল জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে।

ইতিহাসের দিক থেকে বিষয়টার বিচার করলে আমরা দেখব, যদিও সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, অতীতে চিরকাল ধরেই পৃথিবীতে পিতৃপ্রধান সমাজ ব্যবস্থা চলে এসেছে, আসলে একদম শুরুতে সমাজে মাতৃতন্ত্র প্রচলিত ছিল।

একদম শুরুতে মানুষ যখন শিকারে খুব বেশি দক্ষতা লাভ করেনি তখন তারা ছিল জোগাড়ে অর্থাৎ তারা ফলমূল, ছোটখাট প্রাণী ইত্যাদি খাদ্য জোগাড় করত। এ অবস্থায় মেয়ে ও পুরুষের কাজে খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। মেয়ে পুরুষ সবাই মিলে একসাথে খাদ্য সংগ্রহ করত। কিন্তু তা ছাড়াও মেয়েদের একটা অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিল। মেয়েরা সন্তানের জন্ম দিত এবং তাদের লালন পালন করত। আদিকালে মানুষের জীবন ছিল খুবই বিপদসঙ্কুল আর মানুষের সংখ্যা ছিল কম। সন্তানের জন্ম দিয়ে মেয়েরা বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করত। এর ফলে মানুষের দলের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হত। মেয়েরা সন্তান লালন পালনের জন্য আস্তানার কাছাকাছি থাকত এবং ঘর সংসারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করত। ক্রমে হাতিয়ারের কিছু উন্নতি হলে পুরুষরা যখন দূর দূর অঞ্চলে যেত, তখনও মেয়েরা কাছাকাছি থেকে ফলমূল, বিচি ইত্যাদি জোগাড় করত। এবং শিকার যখন ছিল খুবই অনিশ্চিত ব্যাপার, মেয়েরা তখন ঘাস, লতা-পাতা, গাছ ইত্যাদি থেকে নিশ্চিতভাবে খাদ্য সংগ্রহ করত। সমাজের মানুষদের বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে একান্ত জরুরি কাজগুলো মেয়েরা দক্ষতার সাথে করত বলে স্বভাবতই তারা সমাজের কর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এটা একান্ত স্বাভাবিকভাবেই হয়েছিল। মেয়েরা যে দাপট ফলানোর জন্য কর্তৃত্ব করত তা নয়, কাজ এবং দক্ষতার গুণেই তারা সমাজের পরিচালনার ভার পেয়েছিল। কিন্তু হাতিয়ারের উন্নতির ফলে যখন মানুষ ম্যামথ প্রভৃতি শিকার করতে শিখল তখন শিকার একান্ত ভাবেই পুরুষের কাজ হয়ে দাঁড়াল, কারণ মেয়েরা ঘর সংসার ফেলে বড় বড় শিকারে অংশ গ্রহণ করতে পারত না। মনে রাখা দরকার, মানবশিশুকে চার পাঁচ বছর ধরে সযত্নে লালন পালন না করলে তাদের বাঁচিয়ে রাখাই সম্ভব হয় না। বল্লম, তীর, ধনুক ইত্যাদি আবিষ্কারের পর শিকার কৌশলের

www.icsbook.info

উন্নতির ফলে মানুষ খাদ্য সংগ্রহের সুনিশ্চিত উপায় আবিষ্কার করল। এর ফলে সমাজের অস্তিত্বের পক্ষে সবচেয়ে জরুরি কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব পড়ল পুরুষদের উপর। ক্রমশ তাই উচ্চতর শিকারী সমাজে পুরুষরা প্রধান হয়ে উঠল।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরাই ছিল দলের মধ্যে প্রধান। মাকে মনে করা হত দলের আদিপুরুষ, অর্থাৎ তার থেকে দলের উদ্ভব হয়েছে। আদিপুরুষ কথাটার মধ্যে অবশ্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চিন্তার ছাপ রয়েছে। আদিপুরুষ যে কোনো মেয়ে হতে পারে, আমাদের ভাষায় তার কোনো স্বীকৃতি নেই। আদিম যুগে আজকালকার মতো একজন পুরুষের সাথে একজন মেয়ের বিয়ে হত না। তখন যৌথ বিবাহের প্রচলন ছিল। একটা দলের সব পুরুষ আরেকটা দলের সব মেয়েকে বিয়ে করত। সন্তানের জন্ম হলে সে তার মায়ের নামেই পরিচিত হত এবং মায়ের দলেই থাকত। ক্রমশ যখন সমাজে পুরুষের কর্তৃত্ব বাড়ল তখন পুরুষরা হয়ে দাঁড়াল সমাজের কর্তা, দলপতি হল পুরুষ এবং সমাজ হয়ে দাঁড়াল পিতৃতান্ত্রিক।

আবার মেয়েরা গাছপালা, ঘাসপাতা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে করতে এক সময় আবিষ্কার করেছিল যে, বুনো ঘাস ইত্যাদির বিচি থেকে নতুন ঘাসের জন্ম হয় এবং ঐ বিচি খাদ্য হিসেবে খুবই ভাল। ঐ বুনো ঘাস হচ্ছে গম, যব ইত্যাদির পূর্বপুরুষ। মানুষ এ ভাবেই প্রথম কৃষির আবিষ্কার করেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের উপকথা বিশ্লেষণ করে এবং অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে বৈজ্ঞানিকরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, কৃষিকাজ সম্ভবত মেয়েদের আবিষ্কার এবং অনেক দিন পর্যন্ত প্রধানত মেয়েরাই দক্ষতার সাথে কৃষিকাজ করত। শিকারের উন্নতি হওয়ার পরও যে সব মানুষের দল জোগাড়ের পর্যায়ে রয়ে গিয়েছিল সেসব মানুষের দলই সম্ভবত কৃষিকাজের পথে অগ্রসর হয়েছিল। এ সকল সমাজে তাই মাতৃতন্ত্রই বজায় ছিল। কিন্তু কৃষিকাজ কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর যখন কৃষিতে হাল বলদের প্রচলন হল তখন থেকে কৃষি পুরুষের কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এ সমাজেও তাই পিতৃতন্ত্র দেখা দেয়। এ সম্পর্কে পরে আমরা আরো ব্যাখ্যা করব।

www.icsbook.info

ক্ল্যান সংগঠন

ক্ল্যান ও ট্রাইব

পুরোপলীয় যুগের শেষ দিকে শিকারী মানুষরা যে দলে সংগঠিত হত তার নাম দেওয়া হয়েছে 'ক্ল্যান'। অপরিচিত বা অসম্পর্কিত মানুষদের নিয়ে ক্ল্যান গঠিত হত না। রক্তের সম্পর্ক আছে এ রকম লোকদের নিয়েই ক্ল্যান গঠিত হত। আসলে একটা আদি দল থেকে শুরু হলে তাদের ছেলেমেয়ে নাতি নাতনী ইত্যাদি নিয়ে একটা ক্ল্যান গঠিত হত। শিকারী যুগের শেষ দিকে বড় বড় পশু-শিকারের জন্য শত শত শিকারীর দরকার হত। সে জন্য কয়েকশ লোক নিয়ে ক্ল্যান গঠিত হলে তা বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণই হত।

শিকারী জীবনযাত্রার জন্য ক্ল্যান একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগঠন হলেও বল্গা হরিণ, বাইসন বা ঘোড়ার পাল শিকার করার পক্ষে ক্ল্যান যথেষ্ট উপযোগী ছিল না। এ কারণে তৈরি হয়েছিল আদিম মানুষদের আরেকটি বড় সংগঠন, তার নাম 'ট্রাইব'। অনেকগুলো ক্ল্যান মিলে একটা ট্রাইব গঠিত হত। প্রয়োজন হলে পুরো ট্রাইব একযোগে কাজ করত, অন্যথায় ক্ল্যান নিজেদের মতো চলত। ট্রাইবের অন্তর্গত বিভিন্ন ক্ল্যানের মধ্যে সম্পর্ক ও আচরণ কেমন হবে, তার অনেক নিয়ম কানুন ছিল।

ট্রাইব স্পষ্টতই একটা বড় সংগঠন। এ সংগঠন কার্যকর হতে হলে তার অন্তর্গত সব ক্ল্যানের ভাষা এবং আচার আচরণ একই রকমের হওয়া দরকার। বলা বাহুল্য, দশটা ক্ল্যান একসাথে মিটিং করে ট্রাইব গঠন করলে তাদের ভাব ভাষার মিল থাকা সম্ভব হত না। আসলে ট্রাইব সংগঠন আদিম মানুষ বসে বসে চিন্তা করে আবিষ্কার করেনি। স্বাভাবিক ভাবেই ক্ল্যান থেকে ট্রাইবের উদ্ভব হয়েছিল।

মনে করা যাক, একটা ক্ল্যান দিয়ে শুরু হল। কিছুকাল পরে বংশ বিস্তারের ফলে তার জনসংখ্যা বেড়ে গেলে সেটা বিভক্ত হয়ে দুটো ক্ল্যানের জন্ম দেয়। এ দুটোর প্রত্যেকটা এইভাবে বিভক্ত হয়ে কয়েক গুচ্ছ করে ক্ল্যানের সৃষ্টি করে। এ সকল ক্ল্যানের গুচ্ছের বিভিন্ন নাম আছে, কিন্তু জটিলতার ভয়ে আমরা সে আলোচনায় যাব না। মোট কথা হল, অনেকগুলো ক্ল্যান নিয়ে এক একটা ট্রাইব গঠিত হত আদিম মানুষদের আমলে। এ ট্রাইবের অন্তর্গত সব ক্ল্যানের মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। সে কালের শিকারী মানব সমাজ এ রকম অনেকগুলো ট্রাইবে সংগঠিত ছিল, আজকের পৃথিবীর মানুষরা যেমন বিভিন্ন জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের মধ্যে সংগঠিত।

এক একটা ক্ল্যানের সব মানুষরা একই গুহায় বা আস্তানায় অথবা এক সাথে সংলগ্ন কয়েকটা বড় বড় কুটির বা তাঁবুতে থাকত। ক্ল্যানের সবাই যা যা খাদ্য শিকার

www.icsbook.info

সংগ্রহ করত তা ক্ল্যানের সব মানুষদের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ হত। তা ছাড়া ক্ল্যানের সম্পত্তি বলতে যা বোঝাত তা ছিল ক্ল্যানের সব মানুষের সাধারণ সম্পত্তি। যে জমিতে তারা বাস করত বা যে পশু তারা শিকার করত তা কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। কারো একার শক্তিতে কোনটি অধিকার করার ক্ষমতাও অবশ্য কোন মানুষের ছিল না।

আদিম কালে মানুষের উৎপাদনের ক্ষমতা এতই কম ছিল যে সবাই মিলে খাদ্য সংগ্রহ করে সবাই সমান ভাগ করে খেলে তবেই সবাই বাঁচতে পারত। বাস্তব অবস্থাই মানুষকে সমতায় বিশ্বাসী করে তুলেছিল। সমস্ত ক্ল্যান মিলে যেটুকু খাদ্যসংগ্রহ করতে পারত তার পরিমাণ এতই অল্প ছিল যে, কেউ কেউ যদি বেশি বেশি করে খেতে শুরু করত তবে বাকি মানুষের অনেকেই অনাহারে মারা যেত এবং তার ফলে সমগ্র ক্ল্যানের সব অস্তিত্বই বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ত। উৎপাদনব্যবস্থা অনুন্নত থাকার ফলে আদিমকালে স্বভাবতই এ নিয়মের উদয় হয়েছিল যে সমস্ত সম্পত্তি হবে ক্ল্যানের সকলের যৌথ সম্পত্তি বা সাধারণ সম্পত্তি। ক্ল্যানের সকলেরই তাতে থাকবে সমান সমান অধিকার, এবং ক্ল্যানের মানুষদের মধ্যেও অধিকারের কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলে সমানভাবে অংশগ্রহণ করবে।

এভাবে আদিম শিকারী মানুষরা এক গণতান্ত্রিক সমাজ সংগঠন নির্মাণ করেছিল। ক্ল্যানের সদস্যরা তাদের ক্ল্যান-প্রধান বা সর্দারকে নির্বাচিত করত। ট্রাইবের অন্তর্গত সমস্ত ক্ল্যান প্রধানদের নিয়ে গঠিত হত একটা পরিষদ। এ পরিষদ ট্রাইব বা গোষ্ঠীর সব কাজ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করত। ক্ল্যানের সর্দার বা ট্রাইবের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যরা তাদের গুণাবলী, অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, দক্ষতা ইত্যাদির জন্যই নির্বাচিত হত। সর্দারদের পদ বংশানুক্রমিক ছিল না পরবর্তীকালের রাজাদের মতো। সর্দারের ছেলে সর্দার হবে এমন কোনো নিয়ম ছিল না। সর্দার অযোগ্য প্রমাণিত হলে তাকে সরানো যেত।

ট্রাইবের পরিচালনা পরিষদ বিভিন্ন ক্ল্যানের মধ্যে শিকার ও মাছ ধরার এলাকা ভাগ করে দিত এবং সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করত। কিন্তু এ পরিষদ পরবর্তীকালের রাষ্ট্র বা সরকারের মতো কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। দাস যুগের রাষ্ট্র দাস মালিকদের স্বার্থে, সামন্ত যুগের রাষ্ট্র জমিদারদের স্বার্থে এবং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করে। কিন্তু ট্রাইবের পরিচালনা পরিষদ সমস্ত ট্রাইবের স্বার্থে কাজ করত। ক্ল্যান ও ট্রাইবের সব সদস্য তাতে অংশ গ্রহণ করত। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য পরিষদ সমগ্র ট্রাইবের সাধারণ সভা আহ্বান করত।

এ ক্ষেত্রে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আদিম মানুষরা চিন্তা ভাবনা করে এরকম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সৃষ্টি করেনি। বাস্তব অবস্থাই তাদের সামনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই সমস্যার একমাত্র সমাধান হিসেবে তুলে ধরেছিল। আমাদের যুগের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে অবশ্য আমরা জানি যে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই ধনী-দরিদ্রের পার্থক্যটাই একমাত্র বাস্তব সত্য। আর ধনিক শ্রেণীর ক্ষমতা ও সামাজিক কদর যে দরিদ্রের চেয়ে বেশি, একথাও তো সর্ববাদীসম্মত সত্য। কিন্তু আসলে এ ধরনের চিন্তা ও বাস্তবতা হচ্ছে দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল। আদিম কালে যখন সমাজে ধনীদের উদয় হয়নি এবং ধনিকদের নিজেদের দল ও সংগঠন গড়ে ওঠেনি, তখন কারো পক্ষে অন্যদের দাবিয়ে রাখার কোনো শক্তি ছিল না। কিন্তু শক্তির চেয়েও বড় কথা হল, এ রকম

www.icsbook.info

কোনো চিন্তা বা প্রবণতাও আদিম মানুষদের মধ্যে ছিলনা একজন বা একদল মানুষ অন্য একদল মানুষের উপর প্রভুত্ব করবে— এ চিন্তা মানুষের স্বভাবগত নয়, এ ধারণা বা প্রবণতা মানুষ ঐতিহাসিক কালে বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় বাস করে ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করেছে। আদিম কালে শিকারী যুগের মানুষ ভাবতেও পারত না যে একের পক্ষে অন্যের উপর দাপট চালানো সম্ভব। কেন? সেকালের মানুষ স্বভাবত বেশি গণতান্ত্রিক, সৎ ও মানবপরায়ণ ছিল কি? তা নয়, আসলে মানুষের চিন্তাধারা নির্ভর করে তার সমাজ কাঠামোর উপর। এক একটা সমাজ ব্যবস্থা তার অন্তর্গত মানুষদের সামগ্রিক চিন্তাধারার গণ্ডি নির্ধারণ করে দেয়। কোনো মানুষের সাধ্য নেই এ গণ্ডির সীমা ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ নতুন চিন্তা করতে পারে। এ কথাটা এত জটিল যে খানিকটা বিশদ ভাবে না ব্যাখ্যা করলে এর অর্থ বোঝা যাবে না।

চিন্তাধারার সামাজিক ভিত্তি

মানুষের চিন্তাধারার ভিত্তি কি? একটা মানবশিশু যখন জন্মায়, তখন তার মাথাটা থাকে একেবারে চিন্তাশূন্য। তার মাথায় কোনো রকম চিন্তাই থাকে না। তবে তার মাথায় মগজ থাকে, স্নায়ুকেন্দ্র থাকে, সারা গায়ে বিস্তৃত স্নায়ুতন্ত্র থাকে। এর ফলে কালক্রমে শিশু বড় হয়ে চিন্তা ইত্যাদি আয়ত্ত করতে পারে। প্রথমে তাকে শিখতে হয় ভাষা। কারণ ভাষা ছাড়া চিন্তা সম্ভব না। তবে ভাষা শেখার সাথে সাথে শিশু চিন্তা করতেও শিখতে থাকে। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ— এসব কথা শেখানোর মাধ্যমে তার পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন ও আশেপাশের মানুষ সমাজে প্রচলিত চিন্তাই তার মাথায় সঞ্চারিত করে। শিশু যখন বড় হয় তখন সে তাই সমাজে প্রচলিত চিন্তা ও প্রবণতাসমূহ আয়ত্ত করে।

সমাজে প্রচলিত চিন্তা ও প্রবণতা বলতে আমরা কি বুঝি? সমাজে দেখা যায় কেউ স্বার্থপর হয়, কেউ পরের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে, কেউ প্রসন্নচিত্ত হয়, কেউ কোপন স্বভাবের হয়। এ রকম বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ও প্রবণতা সমাজে আছে। আমরা কিন্তু এ ধরনের চিন্তার কথা এখানে আলোচনা করছি না। এগুলোও চিন্তা ও প্রবণতা বটে। তবে তা ব্যক্তিগত পর্যায়ের। এ ছাড়া আরেক ধরনের চিন্তাধারা আছে, তাকে বলা চলে সামাজিক পর্যায়ের চিন্তাধারা বা ভাবাদর্শ। যেমন অতীতে এক সময়ে পৃথিবীতে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। তখন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি বাজার থেকে দাস কিনে আনত। দাস অবশ্য সব হিসেবেই মানুষ, কিন্তু সামাজিক মানদণ্ডে দাস। এবং সে যুগের দাসমালিক শ্রেণীর মানুষরা দাসকে গরু ভেড়ার মতো সম্পত্তি বলে মনে করত। দাসের উপর অত্যাচার করলে বা দাসকে মেরে ফেললে কেউ তাতে দোষের কিছু দেখত না। সে যুগের একজন বিখ্যাত দাসমালিক দার্শনিক এরিস্টটল বলেছেন যে, দাসরা স্বাধীন মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট। সে যুগের ভাবাদর্শের বিচারে দাসকে হেয় জ্ঞান করার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কিন্তু এরিস্টটলের মতো পণ্ডিত না হলেও আমাদের দেশের যে কোনো সাধারণ মানুষও জানে যে, মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই এবং নিকৃষ্ট মানুষ বলেও পৃথিবীতে কিছু নেই। আরও উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে, দুঃখে কষ্টে পড়ে অনেকে এখনও আমাদের দেশে ছেলেমেয়ে বিক্রি করে, এ রকম খবর শোনা গেলেও কেউ কাউকে দাস বানিয়েছে বা বানানোর ইচ্ছা করে এমন কথা বিশেষ শোনা যায় না।

www.icsbook.info

কারো যদি একজন বিনা পয়সার দাস থাকে তবে সে তাকে খাটিয়ে আরাম আয়েশে থাকতে পারে। কিন্তু এ প্রলোভন সত্ত্বেও আমাদের দেশে কেউ কাউকে ক্রীতদাস বানাতে চাইবে কি না সন্দেহ। যদি দু' একজন এ রকম ইচ্ছা পোষণ করে, তবে সে যে সামাজিকভাবে ধিকৃত হবে তাতে সন্দেহ নেই। এর কারণ হচ্ছে আমরা যে সমাজে বাস করি, তার সামাজিক ভাবাদর্শ দাসপ্রথার বিরোধী।

আবার অতীতে পৃথিবীতে এমন এক সমাজ ছিল, যাকে বলা হয় সামন্ত সমাজ। সামন্ত সমাজে জমিদার এবং তার তাঁবেদার সামন্তরাই ছিল প্রভু শ্রেণীর মানুষ। সামন্ত সমাজে জমিদাররা প্রজাশোষণ করে নিজেদের ধনবৃদ্ধি করত। শোষণের ধরনটা ছিল বেগার খাটানো। জমিদাররা কৃষকদের দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে নিজেদের জমি চাষ ও অন্যান্য কাজ করাত। অথচ আমাদের যুগে যদি শোনা যায় যে কেউ অন্যকে বিনা পারিশ্রমিকে জোর করে খাটাচ্ছে, তবে লোকে যে তাকে ঘৃণা করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, যদিও সামন্ত যুগে লোকের কাছে ব্যাপারটাকে খুবই স্বাভাবিক মনে হত। এর কারণ হচ্ছে, আমাদের যুগের ভাবাদর্শ সামন্ত ভাবাদর্শের বিরোধী।

অবশ্য আমাদের যুগের ভাবাদর্শের এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যা আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক মনে হয়, কিন্তু অন্য সমাজের লোকের কাছে আশ্চর্যের মনে হবে। যেমন কেউ যদি কারখানা স্থাপন করে বা ব্যবসা করে ধনসঞ্চয় করে আমরা তাতে দোষের কিছু দেখি না। সহজ হিসেবে দেখা যাবে একজনকে মিলমালিক হতে হলে পাঁচ-সাতশ জনকে শ্রমিক হতে হবে। এরকম যদি একলক্ষ পুঁজিপতি হয় তবে বাকি সাত কোটি মানুষকে তার শ্রমিক বা কর্মচারী হতে হবে। তথাপি আমরা এতে দোষের কিছু দেখি না। কারণ এ সমাজের ভাবাদর্শ হচ্ছে পুঁজিবাদের অর্থাৎ জমিজমা, সম্পত্তি, কলকারখানার উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ভাবাদর্শ। আমরা সবাই পুঁজিবাদকে ভাল মনে করি এবং মনে মনে আশা করি আমরাও পুঁজিপতি হব। ঠিক যেমন দাস সমাজে বিত্তহীনরাও দাস ব্যবস্থাকে ভাল মনে করত এবং সে যুগে মনে মনে আশা করত দাসমালিক হবার। তবে আদিম সমাজের কোনো মানুষ যদি শুনত যে দেশের কারখানার উৎপাদিত জিনিস ব্যবহার করবে সারা দেশের মানুষ অথচ সে সম্পদের মালিক হবে অল্প কয়েকজন পুঁজিপতি, তবে তারা আশ্চর্য হত নিঃসন্দেহে। কারণ তাদের ভাবাদর্শ ছিল আদিম সাম্যবাদী সমাজের ভাবাদর্শ। আদিম শিকারীসমাজে উৎপাদনের উপায়সমূহ অর্থাৎ জমি, পশু ইত্যাদি কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, তা ছিল সমস্ত ক্ল্যান বা ট্রাইবের সম্পত্তি।

আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম যে, এক একটা সমাজে এক এক ধরনের চিন্তাধারা বা ভাবাদর্শ প্রসার লাভ করে। ইতিহাসের গতির সাথে সাথে পৃথিবীতে কোন কোন সমাজের উদয় হয়েছিল, সে বিষয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আলোচনা করব। উপরে যেটুকু ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার ভিত্তিতে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা এমন ধরে নিতে পারি যে, এক এক সমাজে তার সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনুরূপ এক একটা ভাবদর্শ জন্মলাভ করে। এ ভাবাদর্শ মানব সমাজের অস্তিত্বের পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো সমাজ ভাবাদর্শ ছাড়া বাঁচতে পারে না। সমাজের মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থির হয় এ ভাবাদর্শের ভিত্তিতে। ভাবাদর্শ ছাড়া সমাজ অচল সমাজের সব লোক কতগুলো মূল বিষয়ে এক রকম বিশ্বাস ও ধারণা

www.icsbook.info

পোষণ করে বলেই তাদের মধ্যে মেলামেশা, লেনদেন, কাজ কারবার সম্ভব হয়। আমাদের সমাজে সবাই বিশ্বাস করে এবং জানে যে পারিশ্রমিক নিলে কাজ করতে হয়। ঋণ করে ঘি খেলে পরিশ্রম করে তা শোধ দিতে হয়, অন্যথায় জেলে যেতে হয়। আদিম সমাজের সব লোক বিশ্বাস করত এবং জানত যে সবাই মিলে পরিশ্রম করে শিকার করা ও ক্ল্যানের সব কাজ করাই নিয়ম। সকলেই এ কথা মানত বলেই কেউ কাজে ফাঁকি দেযার চেষ্টা তো করতই না— ফাঁকি যে দেয়া চলে এমন আজব কথাও কারো মনে হত না। সমাজের সব মানুষের মধ্যে এ ভাবাদর্শের মিল ছিল বলেই আদিম সমাজ নির্বিঘ্নে চলতে পারত। এক এক জন যদি এক এক রকম চিন্তা করত আর জনে জনে বুঝিয়ে বা জবরদস্তি করে যদি কাজ করান হত তবে সে সমাজ টিকতে পারত না। আর বোঝাতই- বা কে? সব সময় সমাজ সম্পর্কেই অবশ্য এ কথা মোটামুটি খাটে।

কিন্তু ভাবাদর্শের এ মিল সমাজের মানুষদের মধ্যে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? এটা বুঝতে হলে ভাবাদর্শের প্রকৃত রূপ কি এবং তার উৎপত্তি হয় কিভাবে তা বুঝতে হবে। আমরা অবশ্য আমাদের সমাজের দিকে তাকালে দেখব, এক এক দল মানুষ এক এক রকম চিন্তা করে। কেউ মনে করে পুঁজিবাদ ভাল, কেউ মনে করে সমাজতন্ত্র ভাল, কেউ বা অন্য কিছু। একই সমাজে এত রকম ভাবাদর্শের সৃষ্টি হল কিভাবে? এ রকম হওয়ার কারণ হচ্ছে পৃথিবীতে যখন একটা সমাজ ভেঙে আরেকটা সমাজের সৃষ্টি হয়, তখন পুরান সমাজের ভাবাদর্শ কিছু কিছু নতুন সমাজেও টিকে থাকে। ফলে পৃথিবীতে ইতিহাস কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর একটা উৎসের পরিবর্তে একটা সমাজের ভাবাদর্শের দুটো উৎস দেখা দেয়— একটা হচ্ছে নতুন সমাজের ভাবাদর্শ আরেকটা হচ্ছে আগের সমাজের ভাবাদর্শের রেশ। এ দুয়ের সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে নতুন সমাজের ভাবাদর্শ গড়ে ওঠে। আবার এমনও হতে পারে যে, পৃথিবীর একাংশে সমাজ এগিয়ে গিয়ে নতুন সমাজের সৃষ্টি করল। এখন এ অগ্রসরমান সমাজের ভাবাদর্শ সমসাময়িক অন্যান্য পশ্চাৎপদ সমাজের উপর প্রভাব ফেলবে। যেমন ইউরোপে ষোল থেকে আঠার শতকের মধ্যে যখন হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা জন্ম নিল তখন নতুন পুঁজিবাদী ভাবাদর্শ ইউরোপের অবশিষ্ট দেশের সামন্ত ভাবাদর্শের উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করল। আমাদের দেশেও বর্তমানে সামন্ত ভাবাদর্শ এবং পুঁজিবাদী ভাবাদর্শের প্রভাব পড়েছে।

কিন্তু অতীতে যখন পৃথিবীতে প্রথম মানবসমাজের উদয় ঘটেছিল, যাকে আমরা পুরোপলীয় শিকারী সমাজ বলেছি, তখন আর কোনো প্রাচীনতর বা অগ্রসরতর সমাজ পৃথিবীতে ছিল না। তখন কিভাবে এবং কোন ভাবাদর্শের উৎপত্তি হয়েছিল? এ কথাটা বুঝলে আমরা সাথে সাথে আরও বুঝতে পারব, পরবর্তী কালের সমাজ সমূহের নতুন নতুন ভাবাদর্শের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল।

মানুষ সব সময় দলবদ্ধ হযে বাঁচে, দলবদ্ধ হয়ে কাজ করে, উৎপাদন করার জন্য তদের মধ্যে কাজের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। এ সহযোগিতা কার্যকর করতে গিয়ে মানুষ ভাষা আয়ত্ত করেছিল অতীত কালে, একথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। ভাষার সাথে সাথে মানুষ চিন্তাশক্তিও আয়ত্ত করেছে। চিন্তার সাহায্যে মানুষ ক্রমশ এক ভাব জগতের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এ ভাব জগৎ বস্তু জগৎ থেকে সম্পূর্ণ সংযোগহীন নয়। কারণ দেখা যায়, যে, চিন্তাধারা মানুষের জীবন ধারণ এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকে

www.icsbook.info

সম্ভবপর এবং সহজতর করে তুলত, আদিম মানুষ সেসব চিন্তাধারাই আয়ত্ত করত। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, চোখের সামনে খাবার বা বল্গা হরিণের পাল দেখলে আদিম মানুষ যতখানি কর্মতৎপর হতে পারত ঠিক ততখানি কর্মপ্রেরণা তারা পেত নিজেদের কল্পিত ধ্যান-ধারণা থেকে। বস্তুময় জগৎ মানুষকে যতখানি অনুপ্রাণিত করতে পারে, তার ভাবাদর্শ বা ভাব জগৎও তাকে ততখানি অনুপ্রাণিত করতে পারে। এ সকল ভাব ও চিন্তাধারা যে বাস্তবানুগ হতে হবে, তেমন কোনো কথা নেই। অবাস্তব ধারণাও মানুষের প্রেরণার উৎস হতে পারে।

ভাবাদর্শের এহেন শক্তির কারণ হচ্ছে ভাবাদর্শ একটা সামাজিক সৃষ্টি। প্রথম কথা হচ্ছে, যেসব শব্দ বা কথা দিয়ে ভাবাদর্শ চিন্তাধারা গঠিত হচ্ছে, সে শব্দগুলো সমাজেরই সৃষ্টি এবং সমাজ জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলেই সেসব কথা বা চিন্তা অর্থপূর্ণ হয়। তা ছাড়াও ঐ সব চিন্তাধারা মানুষকে প্রভাবিত করার শক্তি লাভ করে এবং নিজে একটা বাস্তবতা হিসাবে পরিচিত হয় শুধু এ কারণেই যে, সমাজ তাকে সত্য বলে গ্রহণ করে। নিতান্ত অসম্ভব কথাও সমাজে সত্য বলে পরিগণিত হতে পারে, যদি সমগ্র সমাজ অর্থাৎ দলের সমস্ত মানুষ তাকে সত্য বলে গ্রহণ করে এবং ছোটকাল থেকে সবাইকে সেটা শেখানো হয়। সমস্ত লোকে যা বিশ্বাস করে তা অবিশ্বাস করার কথা কারো মনে কখনই জাগবে না।

কিন্তু আজগুবি যেনো কোনো চিন্তা মানুষের মাথায় এলে তাই কি সমাজের সকলের কাছে ভাবাদর্শ বলে গৃহীত হবে? তা হবে না। ভাবাদর্শের প্রধান কাজ হচ্ছে সমাজকে সংহত করা বা একত্রে ধরে রাখা এবং তার কাজকর্মকে সহজ ও বিঘ্নশূন্য করা। আবার সমাজ টিকে থাকে উৎপাদন ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে। তাই এক একটা সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে তার ভাবাদর্শের সৃষ্টি হয়। উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখাই ভাবাদর্শের প্রধান কাজ। উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখার জন্য সমাজের মানুষদের মধ্যে যে রকম পারস্পরিক সম্পর্ক দরকার, ভাবাদর্শ সে ধরনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কাজেই সহায়তা করে। এসব ভাবাদর্শ বা চিন্তাধারা তাই সব সময় যে বিজ্ঞানসম্মত বা বাস্তবসম্মত হবে তার কোনো কথা নেই বরং তার বিপরীতটাই সত্যি। বিশেষত আদিম সমাজের ভাবাদর্শ কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস ও অজ্ঞানতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তা সত্ত্বেও আদিম গণতান্ত্রিক সমাজ পরিচালনায় সে ভাবাদর্শ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শুধু আদিমকালেই নয়, আমরা পরে দেখতে পাব যে, তার পরবর্তীকালের অনেক সমাজের ভাবাদর্শই অজ্ঞানতা ও অন্ধবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেবলমাত্র আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভবের পরই মানুষের ধ্যান ধারণা বিজ্ঞান সম্মত হতে শুরু করেছে।

সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে ভাবাদর্শের সম্পর্ক ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়টা উল্লেখ করে ভাবাদর্শেব প্রসঙ্গ আপাতত শেষ করব। আদিম সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে তার ভাবাদর্শের সৃষ্টি হয়েছিল। আদিম সমাজ ভেঙে যখন পরবর্তীকালের সভ্য সমাজ উদিত হয়েছিল, তখন এ ভাবাদর্শকে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করে বা বর্জন করে নতুন ভাবাদর্শ সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিল। নতুন ভাবাদর্শকে উৎপাদনব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয়েছিল। নতুন সমাজে পুরান ভাবাদর্শ অবশ্য একেবারে লোপ পেয়ে যায় না, তার রেশ রয়ে যায় কিছু কিছু লোকের

www.icsbook.info

চিন্তায় ও স্মৃতিতে এবং সেগুলো সঞ্চারিত হয় নতুন যুগের ভাবাদর্শেও। তা ছাড়া পৃথিবীর একাংশে যখন সভ্যতার উদয় হয়েছিল, বাকি পৃথিবীতে তখনও অনগ্রসর বন্য ও বর্বর সমাজ রয়ে গিয়েছিল। এ সকল বন্য বা বর্বর সমাজকে অবলম্বন করে প্রাচীন ভাবাদর্শ অনেক কাল পৃথিবীতে টিকে ছিল। বস্তুত আমরা বর্তমানকালে যে গণতন্ত্রের এত বড়াই করি, আদিম মানুষদের কাছেই আমরা তার জন্য অনেকাংশে ঋণী। মধ্য যুগে ইউরোপে সভ্য রোমক মানুষ এবং বর্বর জনগোষ্ঠীর মিলন ও সংমিশ্রণের মাধ্যমে সামন্ত সমাজের উদয় হয়েছিল। এ বর্বর জনগোষ্ঠী তাদের আদিম গণতান্ত্রিক চিন্তা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রবর্তন করেছিল ইউরোপের সামন্ত সমাজে এবং সে সকল গণতান্ত্রিক প্রথাই শেষ পর্যন্ত ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখান থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

টোটেম বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান

আদিম শিকারী সমাজের চিন্তাধারা ও নানা অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব, একদম শুরুতে কি ভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে চমৎকার সঙ্গতি রেখে আদিম সমাজের ভাবাদর্শ গড়ে উঠেছিল।

আদিম শিকারী যুগে সামাজিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিকার করাকে সম্ভব করে তোলার জন্য এবং দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক বন্ধনকে সম্ভবপর করার জন্য মানুষ নিজের অজান্তেই নানা রকম চিন্তা, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করেছিল। যে কতগুলো মূল বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে উপজাতীয় মানুষদের চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিল তাদের বলা হয় টোটেম ও টাবু।

আমরা আগেই বলেছি, সাধারণত একই পূর্বপুরুষের ছেলেমেয়ে ও বংশধরদের নিয়ে এক একটা ক্ল্যান গড়ে উঠত। ক্ল্যানের সব মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার এবং রক্তের সম্পর্ক থাকত। এক একটা ক্ল্যানে কয়েক পুরুষের মানুষ থাকত। ভাই বোন, মা খালা মামা নানী ও তার ভাই বোন ইত্যাদি কয়েক পুরুষের মানুষ। এক একটা ক্ল্যানের সকলে বিশ্বাস করত যে একই সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে ক্ল্যানের সব মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। আদিম মানুষরা সাধারণত এক একটা পশু, গাছ বা ফলকে নিজেদের পূর্বপুরুষ বলে মনে করত। ঐ পশু বা গাছকে বলা হত টোটেম। ক্ল্যানের সব মানুষ মনে করত যে তাদের টোটেম থেকেই তাদের ক্ল্যানের নামকরণও হত টোটেমের নাম অনুসারে। এক একটা ট্রাইব বা উপজাতির অন্তর্গত বিভিন্ন ক্ল্যান বা গোত্র খরগোশ গোত্র, কৌশিক (অর্থাৎ প্যাঁচা) গোত্র, ক্যাঙারু গোত্র ইত্যাদি নামে পরিচিত হত। ক্যাঙারু গোত্রের মানুষরা মনে করত ক্যাঙারু থেকেই তাদের জন্ম হয়েছে।

ট্রাইবে সমাজের মানুষরা নানা রকম বিধি নিষেধ মেনে চলত। এ সকল নিষেধকে বলা হয় টাবু। টাবু না মানলে শাস্তি ছিল ক্ল্যান থেকে বের করে দেয়া। ট্রাইব সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য টাবু হল— ক্ল্যানের মানুষের নিজেদের টোটেম নিজেরা খেতে পারবে না। কিন্তু না খেলেও তারা বছর বছর টোটেম উৎসব করত। উৎসবে ক্ল্যানের সব শিকারীরা দল বেঁধে নাচত, গান গাইত। তবে এ নাচগান আমাদের পরিচিত নাচগান নয়। আদিম শিকারীরা পশুচর্মে গা ঢেকে টোটেম পশুর মতো সেজে তাদের ভাবভঙ্গি চিৎকার প্রভৃতি অনুকরণ করত এবং শিকারের ঘটনা ও কায়দা কৌশলকে অঙ্গভঙ্গির

www.icsbook.info

মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলত। টোটেম পশুর বৃদ্ধি কামনা করেও তারা নাচগান করত। অনেক সময় গুহার দেওয়ালে এসব দৃশ্যের ছবি আঁকা হত। বিজ্ঞানীরা বর্তমানকালের অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের কার্যকলাপ লক্ষ করে এবং ঐসব গুহাচিত্র বিশ্লেষণ করে এ সকল কথা জানতে পেরেছেন।

টোটেম অনুষ্ঠান আদিম মানুষদের শিকারী গুণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করত। এর মাধ্যমে তারা শিকারে তৎপর হতে শিখত, শিকারের স্বভাব ও অভ্যাস সম্পর্কে ভালভাবে জানতে বুঝতে পারত। টোটেম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একযোগে কাজ করা বা শিকার করার মহড়া দেওয়া হয়ে যেত। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে একদম শুরুতে সম্ভবত কোনো পশু খাওয়ার বিষয়েই কোনো নিষেধ ছিল না। তখন হয়তো একটা ক্ল্যান এক একটা বিশেষ প্রাণী শিকারেই দক্ষতা অর্জন করত। পরে যখন উন্নত হাতিয়ার ও কৌশল আবিষ্কার হল তখন তারা সব প্রাণীই শিকার করতে শিখল। আগে যারা শুধু হরিণ শিকার করত, তারা এখন হরিণকে টোটেম বানিয়ে বসল। আগে তারা হরিণের ভাবভঙ্গি আয়ত্ত ও অনুকরণ করত তাকে শিকার করার জন্য। সেটা কেবল একটা অনুষ্ঠানে পরিণত হল, হরিণ ক্ল্যানের পক্ষে হরিণ শিকার নিষিদ্ধ হয়ে গেল। নতুন অবস্থায় এরও একটা অর্থ ছিল, প্রয়োজন ছিল। উন্নত হাতিয়ারের যুগে অতিরিক্ত পশুহত্যা বন্ধ করার এটা ছিল একটা পথ। হরিণ ক্ল্যানের লোক যদি হরিণ না খায় তবে অন্য ক্ল্যানের লোকের জন্য সে খাদ্যটা থেকে যায়। এভাবে টোটেম খাওয়া নিষিদ্ধ করার ফলে তা সমগ্র ট্রাইবের পক্ষে সুবিধা জনক হয়েছিল।

উচ্চ পুরোপলীয় যুগের শিকারী মানুষরা গুহাচিত্র আঁকত, একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ক্রোমানিয়ম মানুষরা গুহার দেওয়ালে বল্গা হরিণ শিকারের দৃশ্য এঁকেছে, পাথরের গায়ে বর্ষাবিদ্ধ ভালুকের ছবি খোদাই করেছে। পাথর, কাঠ এবং হাড় কেটে মূর্তি তৈরির কাজও বাদ যায়নি।

তবে চিত্রাঙ্কনেই ক্রোমানিয়ম মানুষ সবচেয়ে চমকপ্রদ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। সুন্দর সুন্দর রঙের ব্যবহার, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে দৃষ্টি, বিভিন্ন বস্তুর চিত্রের পরিমাপে সামঞ্জস্য বজায় রাখা এবং আশ্চর্য রকম স্বাভাবিক প্রতিকৃতি আঁকার ক্ষেত্রে ক্রোমানিয়ম মানুষরা অপূর্ব শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছে। তুলনা করলে দেখা যাবে, আধুনিক কালের আদিবাসী মানুষরা যেসব ছবি আঁকে তা অনেকটা ছোট শিশুদের আঁকা ছবির মতো; এসব ছবি কোনো বস্তুর অবিকল প্রতিকৃতি হয় না, তা হয় মনের ধারণা অনুযায়ী আঁকা ছবি। পুরোপলীয় যুগের শিকারী শিল্পীরা গতিশীল ও ছুটন্ত প্রাণীর ছবি আঁকতে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। গুহাচিত্রসমূহে অধিকাংশ প্রাণীকেই দৌড়ানো, লাফানো, ঘাস খাওয়া, রোমন্থনরত বা শিকারীর হাতে আহত অবস্থায় দেখা যায়।

এসব সুন্দর সুন্দর গুহাচিত্র আদিম শিকারী মানুষরা শিল্পসৌন্দর্য উপভোগের জন্য সৃষ্টি করত না।। সবচেয়ে সুন্দর ও ভাল ভাল গুহাচিত্রগুলো আঁকা হত গুহার ভিতরে সবচেয়ে দুর্গম অঞ্চলে ঃ গুহামুখ থেকে সিকি মাইল বা আধ মাইল দূরে। ঐ অন্ধকার গুহায় চর্বির প্রদীপ ছাড়া ছবি আঁকাও যেত না। শুধু তাই নয়, একবার ছবি আঁকা হয়ে যাওয়ার পর, আদিম মানুষরা আর তার দিকে দৃষ্টি দিত না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, একটা ছবির উপর পরে আবার ঐ রকম বা অন্য রকম ছবি আঁকা

www.icsbook.info

হয়েছে। আসলে ছবি আঁকাটা ছিল আদিম মানুষদের জীবন সংগ্রামের অঙ্গ। তারা বিশ্বাস করত, গুহার দেয়ালে নিখুঁতভাবে প্রাণীর ছবি এঁকে তাকে বর্শাবিদ্ধ করতে পারলে বাইরে শিকারীরাও অনুরূপভাবে সত্যিকার প্রাণীকে বর্শা দিয়ে শিকার করতে পারবে। এ ধরনের বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিকরা নাম দিয়েছেন ম্যাজিক বা যাদু বিশ্বাস ও যাদু অনুষ্ঠান। যাদু বিশ্বাসের মূল কথা হল, যা চাই তার অনুকরণ করলে বা সে রকম ভান করলে সত্যি সত্যি সেটা পাওয়া যায়। টোটেম অনুষ্ঠান বা শিকারী নৃত্য ইত্যাদির উদ্দেশ্যও ছিল তাই। ঐ সব অনুষ্ঠানে শিকারী মানুষরা নেচে গেয়ে বলত এবং কামনা করত যে পশুর বংশ বৃদ্ধি হোক এবং তারা মানুষের হাতে মারা পড়ুক, ইত্যাদি। আদিম শিকারী মানুষদের গুহাচিত্র অঙ্কন তাদের খাদ্য সংগ্রহের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল বলেই গুহাচিত্রের প্রায় একমাত্র বিষয়বস্তু ছিল হরিণ, বাইসন প্রভৃতি পশু। ফুল বা গাছ বা প্রাকৃতিক দৃশ্য গুহাচিত্রে বিশেষ দেখা যায় না।

আদিম সমাজের ভাবাদর্শে গুহাচিত্র আঁকা, শিকারী নৃত্য অনুষ্ঠান ইত্যাদির এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল যে, সমাজকে এ সকল কাজ পরিচালনার জন্য বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দিতে হয়েছে। কারণ মনবগোষ্ঠীর খাদ্যসংগ্রহ তথা জীবন মরণ সমস্যার সাথে এ সকল ভাবাদর্শ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। দুর্গম গুহার অভ্যন্তরে যে শিল্পীরা গুহাচিত্র আঁকত তাদের অবশ্য শিকারেও যোগ দিতে হত। কারণ শিকারের সময় জীবন্ত পশুদের আচরণ তাদের ভাল করে লক্ষ করতে হত, তা না হলে দরকারী ছবি আঁকা তদের পক্ষে সম্ভবই হত না। কিন্তু কালক্রমে ছবি আঁকা এবং তরুণ শিল্পীদের ছবি আঁকতে শেখানোর জন্য তাদের বেশি বেশি করে সময় দিতে হত। শিল্পীদের তাই শিকারের কাজ থেকে কিছু পরিমাণের মুক্তি দিতে হত।

শিকারী যুগের গুহাচিত্রে মাঝে মাঝে এক একজন পশুর ছদ্মবেশ পরা মানুষের ছবি দেখা যায়। মনে হয় এরা বিশেষ দায়িত্ব পালন করে এবং সমাজে এদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। বর্তমান কালেও প্রাচীনতম বন্য উপজাতির মধ্যে এক ধরনের লোক দেখা যায়, তাদের বলা হয় যাদুকর-ওঝা। গুহাচিত্রেও সম্ভবত পশুর ছদ্মবেশে এ ধরনের যাদুকর-ওঝাদেরই দেখানো হয়েছে। এরা নানা রকম মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে সমাজকে অদৃশ্য শক্তির উপদ্রব থেকে রক্ষা করে। যাদুকর ওঝাদের শিকার ও হাতিয়ার উৎপাদনের কষ্টকর দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয়া হয়। তার বিনিময়ে এরা সমাজের মঙ্গলের জন্য নানা রকম যাদু ইত্যাদি সম্পন্ন করে। তা ছাড়া সমাজের প্রথাগত ও অর্জিত জ্ঞানকে রক্ষা করা ও সমৃদ্ধ করাও এদের কাজ। অসুখ বিসুখে ফল, লতাপাতার রস ইত্যাদির সাহায্যে চিকিৎসাও তারা করত। বস্তুত, বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত যত গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের গাছ গাছড়ার সন্ধান মানুষের জানা ছিল তার অধিকাংশই এই যাদুকর-ওঝারা আবিষ্কার করেছে অথবা সংরক্ষণ করেছে। রসায়ন, ভেষজবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই যাদুকর-ওঝাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। অবশ্য তাদের অনুসৃত তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্র ও যাদুবিদ্যাকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে সভ্য মিশর ও ব্যবিলনে জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি কুবিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিল।

আদিম সমাজের এ সকল শিল্পী, যাদুকর-ওঝা প্রভৃতি বিষেষজ্ঞ ধরনের লোকদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব হচ্ছে, খাদ্য সংগ্রহের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে অবসর পাওয়ার দরুন এরা সমাজের সামগ্রিক সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে চিন্তা ভাবনা

www.icsbook.info

করতে পারত। পরবর্তীকালের সভ্য সমাজে পুরোহিত, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি জ্ঞানী ও পণ্ডিতরা প্রথম অবস্থায় সংগৃহীত হত এ সকল বিশেষজ্ঞ মানুষদের থেকেই।

আদিম মানুষদের উপরোক্ত টোটেম বিশ্বাস বা যাদু-বিশ্বাস ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান অলীক ও অবাস্তব হলেও তা একেবারে অর্থহীন ছিল না। এ সকল ভাবাদর্শের দরুনই কঠোর প্রকৃতির সাথে লড়াই করে আদিম অসহায় মানুষ তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছিল। কারণ আদিম সমাজের ভাবাদর্শ অবাস্তব হলেও তার একটা সামাজিক বাস্তবতা ছিল। সব মানুষ ঐ সব অবাস্তব বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানে আস্থা স্থাপন করেছিল বলেই তারা একসাথে সমাজবদ্ধ হয়ে থাকতে পারত এবং শিকার ও অন্যান্য কার্যকলাপ চালাতে পরত। কিন্তু অবাস্তব ভাবাদর্শ দিয়ে মানুষকে বশ করতে পারলেও প্রকৃতিকে বশ করা যায় না। প্রকৃতি চলে তার নিয়মে। ভাবাদর্শ যদি প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয় তবে একদিন তা ধরা পড়বেই। অবাস্তব বা অলীক ভাবাদর্শের সীমাবদ্ধতা এখানেই। আদিম উপজাতীয় মানুষরা ট্রাইব বা ক্ল্যানের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলত। যাদু-বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়ে তারা এও মনে করত যে ক্ল্যানের নির্দেশ পশু প্রাণীরাও মেনে চলবে। কিন্তু বরফ যুগের শেষে যখন পৃথিবীর আবহাওয়া বদলে গেল এবং পশুর পাল লুপ্ত হয়ে গেল, তখন আদিম মানুষদের ভাবাদর্শ তাদের খাদ্যের যোগান বৃদ্ধিতে কোনো সাহায্য করতে পারল না। ফলে আদিম সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা বানচাল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখার জন্য যে ভাবাদর্শ সৃষ্টি হয়েছিল তাও ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গেল। কারণ সমাজ ব্যবস্থা ও উৎপাদন ব্যবস্থা হচ্ছে ভাবাদর্শের ভিত্তি। উৎপাদন ব্যবস্থা লোপ পেলে তার উপর নির্ভরশীল ভাবাদর্শও লোপ পায়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভাবাদর্শ যে চিরকালই মিথ্যা চিন্তাধারা নিয়ে গড়ে উঠবে এমন কোনো কথা নেই। আদিম সমাজের পর থেকে ক্রমশ এক এক ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় ক্রমশ উন্নত ধরনের বিভিন্ন ভাবাদর্শের সৃষ্টি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আধুনিকতম সমাজ ব্যবস্থায় এসে ভাবাদর্শ পরিণত হয়েছে বিজ্ঞানসম্মত ভাবাদর্শে। এ ভাবাদর্শে মিথ্যা বা অবৈজ্ঞানিক চিন্তা অথবা বিশ্বাসের স্থান নেই। এ আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাবাদর্শ তাই শুধু সমাজ ব্যবস্থার সাথেই নয়, প্রকৃতি বা বস্তুজগতের সাথেও সুসঙ্গতিপূর্ণ। এ বিষয়ে পরে যথাস্থানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে।

শিকারী সমাজের অবসান ও তার কারণ

পুরোপলীয় যুগের সংস্কৃতি অনেক উচ্চ পর্যায়ে আরোহণ করা সত্ত্বেও আজ থেকে প্রায় দশ বার হাজার বছর আগে তা লোপ পায়। তারপর পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গায় কৃষির উপর ভিত্তি করে নতুন সমাজ গড়ে ওঠে। উচ্চ পুরোপলীয় যুগে মানুষের শিকারের হাতিয়ার ও কৌশল এবং তাদের সমাজ সংগঠন এতদূর উন্নতি লাভ করেছিল যে, প্রশ্ন জাগতে পারে, শিকারী সমাজই পৃথিবীতে স্থায়ী হয়নি কেন? তার বদলে পৃথিবীতে অন্য সমাজের উদয় হল কেন?

পৃথিবীতে শিকারী মানুষের সমাজ অন্তত মানুষের উৎপত্তির শুরু থেকে আট দশ লক্ষ বছর স্থায়ী হয়েছিল, আমরা তা দেখেছি। দশ বার হাজার বছর আগে যদি শিকারী যুগের অবসান না ঘটত, তাহলে আজও সারা পৃথিবীতে একমাত্র পশুশিকারী দলই

www.icsbook.info

বিচরণ করত। তার বদলে আমরা দেখি মানুষ আজ কারখানায় মোটর গাড়ি, এরোপ্লেন তৈরি করেছে, রকেটে চড়ে চাঁদে যাচ্ছে। শুধু সময়ের সাথে সাথে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি বেড়েছে এবং মানুষ এত উন্নতি করেছে— তা ঠিক নয়। গত দশ বার হাজার বছরের কথা বাদ দিলেও শিকারী মানুষ এরকম অনেক অনেক দশ বার হাজার বছর ধরে অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে, কিন্তু তাদের বস্তুগত বা মানসিক সংস্কৃতির বিকাশ একটা বিশেষ গণ্ডি ছাড়িয়ে কখনও উঠতে পারেনি। আদিমসমাজের কতগুলো সীমাবদ্ধতাই এজন্য দায়ী।

আদিম শিকারী মানুষ শিকারের যত কলাকৌশলই আবিষ্কার করে থাকুক না কেন, তারা ছিল প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল পরগাছা বিশেষ। পশুর পালের সন্ধান পেলে তারা পশু শিকার করতে পারত বটে, কিন্তু পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোনো উপায় তাদের হাতে ছিল না। তাদের ভাবাদর্শও এ বিষয়ে তাদের কোনো সাহায্য করতে পারেনি। পশুর বংশবৃদ্ধির জন্য টোটেম উৎসব করলেই তো সত্যি সত্যি তাতে পশুর সংখ্যা বাড়ত না। আদিম যুগে মানুষ তাই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখেনি। পরবর্তীকালে মানুষ কৃষিকাজ এবং পশুপালনের কৌশল আয়ত্ত করে নিজেদের খাদ্যের যোগান বাড়াতে পেরেছিল। কিন্তু আদিম মানুষ কেবল পশুহত্যা করে, নিজেদের খাদ্যের উৎস ধ্বংস করে, খাদ্য সংকট বাড়াতেই পারত, খাদ্যের যোগান বাড়াতে পারত না।

আদিম শিকারী সমাজকে বলা হয় মানুষের বন্যদশা। বন্য সমাজের অর্থনীতি তাদের জন্য এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছিল। হিসাব করে দেখা গেছে, মানুষ শুধুমাত্র শিকারের উপর নির্ভর করলে অবস্থা অনুযায়ী মাথাপিছু ৭ থেকে ৫০০ বর্গমাইল জমি লাগে। অর্থাৎ যদি শিকার সুলভ হয় তবে ৭০০ বর্গমাইল জায়গায় ১০০ জন মানুষ শিকার করে খেয়ে বাঁচতে পারবে। আর যদি আবহাওয়া প্রতিকূল হয় ও শিকার দুর্লভ হয়, তবে ১০০ জন মানুষের সারা বছরের খাদ্য সরবরাহ করতে পারে ৫০ হাজার বর্গমাইল এলাকার পশু ও প্রাণী। পৃথিবীর স্থলভাগের পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি বর্গমাইল। মাথাপিছু কম করে ৭ বর্গমাইল জমি ধরলেও শিকারী যুগে সারা পৃথিবীর মানুষের সংখ্যা ৭০ লক্ষের বেশি কোনোক্রমেই হতে পারত না। অর্থাৎ দশ বার হাজার বছর আগে শিকারী সমাজের চরম উন্নতির যুগে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৭০ লক্ষের চেয়ে বাড়তে পারছিল না।

শিকারী যুগের বন্য অর্থনীতির এ অন্তর্নিহিত দুর্বলতা মানবসমাজের সামনে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছিল। এ দুর্বলতা দূর করতে না পারলে ঐ অচলাবস্থা দূর হত না এবং বন্য মানুষ দুর্লভ প্রাণীরূপেই পৃথিবীতে বাস করত। আর এ দুর্বলতা দূর করার একমাত্র পথ ছিল খাদ্য উৎপাদনের নতুন উপায় বের করা।

প্রায় দশ হাজার বছর আগে চতুর্থ বরফ যুগ শেষ হয়েছিল, একথা আমরা আগেই বলেছি। আজ থেকে বার তের হাজার বছর আগে যখন ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্য ও দক্ষিণ ভাগে বরফ গলতে শুরু করল, তখন হিমবাহ অঞ্চল ক্রমশ উত্তরে সরতে লাগল। বরফের প্রান্ত যত উত্তরে সরতে লাগল বল্গা হরিণও ততই উত্তরে সরে যেতে লাগল। বল্গা হরিণের পিছন পিছন অনেক শিকারী দলও উত্তরে যাত্রা করল। অবশ্য একদিনে এটা হয়নি। কয়েক শ বা কয়েক হাজার বছর ধরে একটু একটু করে মানুষ বল্গা হরিণের পিছন পিছন চলে মেরু অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছেছে, যেখানে এখনও চিরতুষারের

www.icsbook.info

রাজত্ব চলছে। আদিম শিকারীর যে বংশধররা বরফাচ্ছন্ন তুন্দ্রা অঞ্চলে বল্গা হরিণ, সাদা ভালুক আর সিন্ধুঘোটক শিকার করে জীবন বাঁচায় তারাই আমাদের বহু পরিচিত এস্কিমো। তাদের জীবনে এখন পর্যন্ত বরফ যুগের শিকারী জীবনের অবসান ঘটেনি।

কিন্তু এস্কিমোদের মতো সহজ সমাধান সব মানুষের জন্য ছিল না। বরফ যুগের অবসানের ফলে ম্যামথ এবং অন্যান্য অনেক শীতের প্রাণী লোপ পেয়ে যায়। এর ফলে শিকারী মানুষরা তীব্র সঙ্কটের মধ্যে পড়ে। এ সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো উপায় আদিম সমাজের গণ্ডির মধ্যে ছিল না। যে অনুকূল পরিবেশে পুরোপলীয় যুগের বন্য সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছিল, তা দূর হয়ে যাওয়া মাত্র অর্থাৎ শিকারের পশু বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া মাত্র আদিম সমাজ ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর পশ্চিম এশিয়ার কোনো অঞ্চলের মানুষ যখন কৃষিকাজ আয়ত্ত করল তখন কৃষিভিত্তিক উন্নত সংস্কৃতি ক্রমশ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। এদের সংস্পর্শে এসে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বন্য সমাজ বা শিকারী সমাজের মানুষরা কৃষিকাজ আয়ত্ত করল। এ প্রক্রিয়াতে ধ্বংসোন্মুখ আদিম সমাজ বিলুপ্ত হয়ে কৃষিভিত্তিক সমাজে রূপান্তরিত হল। অবশ্য তার পরেও পৃথিবীর নানা দুর্গম অঞ্চলে বন্য শিকারী সমাজ টিকে ছিল। যেমন, আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলে, মালয়ের জঙ্গলে, প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো কোনো দ্বীপে, উত্তরের তুন্দ্রা অঞ্চলে, সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আদিম শিকারী মানুষরা তাদের আদিম সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে টিকে ছিল। তা ছাড়া এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার দরুন পুরো অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে দু'তিনশ বছর আগে পর্যন্ত কেবল মাত্র বন্য শিকারী সমাজই ছিল একমাত্র মানব সমাজ। মানব সমাজের মূল অংশ এবং মূল ধারা থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন থাকার দরুন উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলেও কয়েকশ' বছর আগে পর্যন্ত আদিম শিকারী সমাজ বিদ্যমান ছিল। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করার পর এবং ক্যাপ্টেন কুক প্রমুখ অভিযাত্রীরা অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার পথ আবিষ্কার করার পর এসব দেশে ইউরোপীয়রা গিয়ে পৌঁছায় এবং তার পরই মাত্র এ সকল আদিম সমাজের মানুষদের মধ্যে পরিবর্তন আসতে শুরু করে।

যা হোক, পৃথিবীর কোনো কোনো অংশে শিকারী সমাজ এ ভাবে টিকে থাকলেও আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে কৃষিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মানুষের প্রধান সমাজব্যবস্থা হিসাবে আর শিকারী সমাজ থাকতে পারল না। তখন থেকে কৃষিভিত্তিক সমাজই পৃথিবীতে মূল সমাজব্যবস্থা হয়ে উঠল। এ নতুন সমাজ সম্পর্কে আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব।

www.icsbook.info

নতুন পাথর যুগের সংস্কৃতি

চতুর্থ বরফ যুগের অবসানে পুরোপলীয় শিকারী যুগের মানুষরা যে সঙ্কটে পড়েছিল তার কথা আমরা আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এক যুগান্তকারী অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সাধনের মাধ্যমেই মানুষ এ সঙ্কটের হাত থেকে চিরকালের মতো মুক্তি পেয়েছে। এ বিপ্লব হল কৃষির আবিষ্কার। তারপর শুরু হল নুতন পাথরের যুগ বা নবোপলীয় যুগ। কৃষির সাহায্যেই মানুষ সর্বপ্রথম খাদ্য উৎপাদকে পরিণত হল। শিকারী মানুষেরা ছিল প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল পরগাছা স্বরূপ। কারণ, তারা নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করতে পারত না। শিকারী সমাজের একটা অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা হল, এরা খাদ্য সংগ্রহে খুব বেশি দক্ষতা অর্জন করলে তার ফল সমাজের পক্ষে আত্মঘাতী হত। কারণ উন্নত অস্ত্র ও হাতিয়ার আবিষ্কার করলে তার সাহায্যে মানুষ বেশি বেশি পশুপ্রাণী হত্যা করে ফেললে তার নিজেরই ভবিষ্যতের খাদ্য ধ্বংস হয়ে যেত।

কিন্তু কৃষিভিত্তিক সমাজে এ রকম কোনো সীমাবদ্ধতা ছিল না। কৃষি কাজের দ্বারা মানুষ নিজেই নিজের খাদ্য উৎপাদন করত। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় হাজার উন্নতি হলেও তার ফলে কোনো সঙ্কট সৃষ্টি হত না। বরং তার উল্টো। নবোপলীয় যুগে জনসংখ্যা বাড়লেই তার খাদ্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান ছিল কৃষির বিস্তার। জনসংখ্যা বাড়লে খাওয়ার লোক বেড়ে যায় একথা ঠিক কিন্তু সাথে সাথে কাজ করার মতো লোকও বাড়ে। শিকারী যুগের খাদ্য তথা পশুর পরিমাণ সীমিত থাকায় তার উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যাও একটা নির্দিষ্ট সীমার বেশি বাড়তে পারত না। কিন্তু কৃষি আবিষ্কৃত হওয়ার পর মানুষের সংখ্যা বাড়লে বাড়তি মানুষেরা নতুন জমিতে চাষ করত, এই মাত্র। যতদিন পৃথিবীতে অঢেল জায়গা ছিল, ততদিন লোকসংখ্যার বৃদ্ধিতে কোনো অসুবিধাও ছিল না। নবোপলীয় যুগে খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জনসংখ্যাও দ্রুত বাড়তে শুরু করেছিল।

বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করেছেন, কয়েক লক্ষ বছর স্থায়ী শিকারী যুগে মানুষের সংখ্যা যতখানি বাড়তে পেরেছিল, নবোপলীয় কৃষি যুগের কয়েক হাজার বছরে মানুষের সংখ্যা তার কয়েকশ' গুণ বেশি হয়েছিল। একমাত্র ফ্রান্সেই উচ্চ পুরোপলীয় যুগের যতগুলো মানুষের ফসিল কঙ্কালের সন্ধান পুরাতাত্ত্বিকরা পেয়েছেন তা হল তার পূর্ববর্তী সমস্ত যুগের সর্বমোট কঙ্কালের সংখ্যার সমান। আবার উচ্চ পুরোপলীয় যুগের কঙ্কালের সংখ্যা থেকে নবোপলীয় যুগের কঙ্কালের সংখ্যা কয়েক শ' গুণ বেশি।

শিকারী যুগে যারা সবচেয়ে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিল, তারা কিন্তু এ যুগান্তকারী কৃষি ব্যবস্থার আবিষ্কার করতে পারেনি। ম্যাগদালেনীয় প্রভৃতি প্রাগ্রসর শিকারী মানুষর বরফ যুগের বিশেষ অনুকূল পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো বিশেষ ধরনের সংস্কৃতি

www.icsbook.info

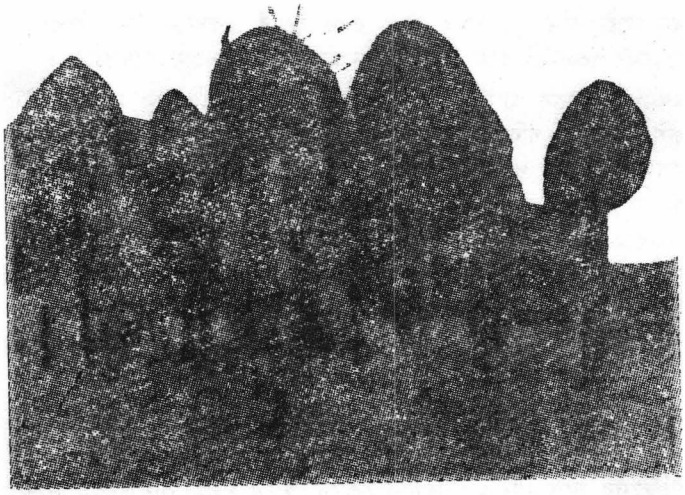

এঙ্গোলার একটি গ্রামের শস্যের গোলা। ভেজা মাটি এবং পশুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য খুঁটির মাথায় শস্য জমা রাখার ব্যবস্থা হয়েছে।

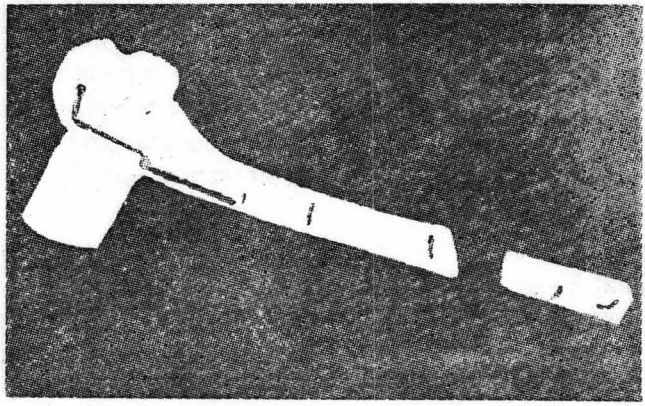

নবোপলীয় যুগের একটি কুড়াল। কাঠের হাতলে পাথরের ফলা বসিয়ে এই কুড়াল তৈরী করা হত।

www.icsbook.info

ও জীবন যাত্রা গড়ে তুলেছিল। কিন্তু বরফ যুগের অবসানে সে পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় এবং পশুপ্রাণী বিরল হয়ে যাওয়া মাত্র তারা অসহায় হয়ে পড়ল।

অপরপক্ষে উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষরা শিকারী যুগে খুব বেশি সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেনি। এরা খুব উচ্চ সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে পারেনি এবং কোনো বিশেষ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েনি। অথবা এরা নির্দিষ্ট কোনো এক পন্থায়ই মাত্র শিকার সংগ্রহ করতে শেখেনি। এদের মধ্যে পুরুষরা যখন শিকার করতে যেত, মেয়েরা তখন ফলমূল এবং ঘাসের বিচি সংগ্রহ করত। আস্তানার কাছাকাছি ঘাসের বিচি পড়লে তার থেকে যখন নতুন ঘাসের জন্ম হত, সেটা দেখে দেখেই হয়তো কালক্রমে মানুষ বীজ রোপন করে বুনো ঘাসের চারা করতে শিখেছিল। এসব বুনো ঘাসই হচ্ছে আজকালকার গম, যব প্রভৃতির পূর্বপুরুষ। ধীরে ধীরে মানুষ ধান প্রভৃতির চাষও আয়ত্ত করেছে। কিন্তু প্রথম কৃষি সমাজ গড়ে উঠেছিল গম ও যবের চাষের উপর ভিত্তি করে। এবং এ বিষয়েও বিজ্ঞানীরা একমত যে মেয়েরাই কৃষিকাজের আবিষ্কার করেছিল।

পণ্ডিতদের মতে পশ্চিম এশিয়ার কোনো স্থানে প্রথম কৃষিভিত্তিক সমাজের উদয় হয়েছিল। বরফ যুগের অবসানে একদিকে যেমন এশিয়া ইউরোপের বরফাস্তীর্ণ সমভূমিতে বনভূমির উদয় হয়েছিল, তেমনি আবার উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়াতেও জলবায়ুর পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। বরফ যুগে উত্তর আফ্রিকার মরক্কো থেকে এশিয়ার ইরান পর্যন্ত ছিল একটানা তৃণভূমি। বরফ যুগের অবসানে এ তৃণভূমি পরিণত হয় মরু অঞ্চলে। মরুভূমির মাঝে মাঝে অবশ্য মরূদ্যান এবং কিছু কিছু নদী তীরবর্তী উর্বর ভূমিও থাকে। এসব স্থানের জঙ্গল ও ভূমিতে এসে জড়ো হয় আশেপাশের সব জীব জানোয়ার ও শিকারী মানুষরা। এসব জায়গায় অল্প পরিমাণ শিকারের উপর নির্ভর করা ক্রমেই কঠিন হয়ে ওঠে। এ অঞ্চলের মানুষই সম্ভবত প্রথম কৃষির আবিষ্কার করেছিল।

অবশ্য নবোপলীয় কৃষিবিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য শুধু উপযুক্ত শস্য এবং তার চাষের পদ্ধতি আবিষ্কারই যথেষ্ট না। সাথে সাথে জমি চাষ করার ও শস্য কাটার যন্ত্র বা হাতিয়ার, শস্য থেকে খাদ্য তৈরির পদ্ধতি, সারা বছর ধরে শস্য জমা করে রাখার ব্যবস্থা ইত্যাদির আবিষ্কার না হলে কৃষি ব্যবস্থার জন্ম হতে পারত না। প্রয়োজনের সাথে সাথে এ সবের আবিষ্কারও হয়েছিল। এবং আরও উল্লেখযোগ্য যে মেয়েরাই এ সবকিছু আবিষ্কার করেছিল। কারণ প্রথম অবস্থায় মেয়েরাই চাষাবাদের সাথে জড়িত সব কাজ করত।

প্রথম আমলে জমি চাষ করা হত একটা চোখা লাঠি বা শিং দিয়ে। ক্রমে লাঠির মাথায় চোখা পাথরের ফলক দড়ি দিয়ে বেঁধে আদিম ধরনের কোদাল তৈরি করতে শেখে মানুষ। এ সব কোদাল বা শিঙের হাতিয়ার দিয়ে মাটি কুপিয়ে আলগা করে মেয়েরা গম বা বার্লির দানা মাটিতে ছিটিয়ে দিত। আগের বছরের ফসল থেকে সাবধানে জমিয়ে রাখতে হত এ সব শস্যের দানা। ফসল পাকলে প্রথম প্রথম জানোয়ারের চোয়ালের হাড় দিয়ে ফসল কাটত মেয়েরা। ক্রমশ তার অনুকরণে কাঠের কাস্তে বা হাড়ের হাতল লাগান ধারাল পাথরের কাস্তে আবিষ্কৃত হয়।

www.icsbook.info

নবোপলীয় যুগের সূত্রপাত সব যায়গায় এক সাথে হয়নি। পশ্চিম এশিয়ার সম্ভবত আজ থেকে আট দশ হাজার বছর আগে এর উদয় হয়েছিল। মিশরেও সাত আট হাজার বছর আগে নবোপলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। আবার ৩০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের আগে (অর্থাৎ এখন থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে) ইউরোপে এ ব্যবস্থা ঠিকমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আবার সর্বত্র এ ব্যবস্থা সমান স্থায়ী হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দের দিকে মিশরে এবং তার কিছুকাল পরে ব্যাবিলনিয়ায় নবোপলীয় গ্রাম সমাজের বিলোপ ঘটে এবং তার স্থানে উদিত হয় নগরকেন্দ্রিক সভ্য সমাজ। কিন্তু ক্রীট দ্বীপ ছাড়া ইউরোপের কোনো স্থানেই ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের আগে নবোপলীয় সমাজের বিলোপ ঘটেনি। আর ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে তো নবোপলীয় সমাজ তার পরেও কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত টিকে ছিল।

মানুষের ইতিহাসে নবোপলীয় যুগ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এ পর্যায়ে মানুষ কৃষি আবিষ্কার করেছিল, তা আমরা আগেই বলেছি। এ সময়ে মানুষ পশুপালনের কৌশল আবিষ্কার করে। কৃষি ও পশুপালন আয়ত্ত করার ফলে মানুষ খাদ্য উৎপাদনকারী হয়ে ওঠে এবং খাদ্যের অভাবে মানুষের ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা দূর হয়। গোলায় জমান শস্য এবং পোষা পশুর পাল আয়ত্তে থাকার ফলে মানুষের অনাহারে বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দূর হয়। সাথে সাথে মানুষের বস্তুগত সংস্কৃতিরও উচ্চতর বিকাশ ঘটে। সব রকম আবহাওয়ায় বেঁচে থাকার মতো ঘরবাড়ি, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি নবোপলীয় মানুষ আবিষ্কার করে।

পশুপালন

নবোপলীয় যুগে মানুষ কৃষি আবিষ্কারের সাথে সাথে পশুপালনের কৌশলও আবিষ্কার করেছিল ,একথা আগেই বলা হয়েছে। মানুষ কৃষিকাজ শুরু করার পরে হয়তো শস্যের লোভে নিরামিষভোজী প্রাণীরা শস্যখেতের দিকে আকৃষ্ট হত। এ ভাবে মানুষের সান্নিধ্যে থেকে থেকেই হয়তো ভেড়া, ছাগল, শূকর, গাধা, গরু প্রভৃতি মানুষের পোষ মেনেছিল। পোষ মানানোর পর মানুষ দেখেছিল যে, তার থেকে মাংস, দুধ, চামড়া, লোম ইত্যাদি তো পাওয়া যায়ই, মাঠে পশু চরালে তার গোবর থেকে জমির উর্বরাশক্তিও বাড়ে। পশুশিকারের চেয়ে পশুপালন স্বভাবতই বেশি লাভজনক। কারণ জীবন্ত পশুর দুধ ও দুগ্ধজাত পদার্থকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা চলে এবং পশুর বংশবৃদ্ধি ঘটলে প্রয়োজন মত তাদের মাংসও খাওয়া চলে। পশুপালনের আবিষ্কার হওয়ার পর তাই আগেকার শিকারী মানুষের দলও পশুপালক দলে পরিণত হল এবং অনেক অঞ্চলে জমি চাষাবাদের উপযুক্ত না হওয়ায় অনেক নবোপলীয় কৃষিজীবীও পশুপালনেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে সব কৃষিনির্ভর নবোপলীয় মানুষই আংশিকভাবে পশুপালনেও মনোনিবেশ করেছিল।

পশুপালক দলের মানুষরা কিন্তু সাধারণত যাযাবর ছিল না। তারা দীর্ঘকাল একস্থানে বাস করত। চারণভূমি নষ্ট হয়ে গেলেই কেবল তারা অন্যত্র গিয়ে বাস স্থাপন করত।

নবোপলীয় অর্থনীতি বা উৎপাদন ব্যবস্থার দুটো প্রধান শাখা হল কৃষি এবং পশুপালন। এ দুই উৎপাদন প্রথা মিলে নবোপলীয় অর্থনীতির সৃষ্টি করেছিল এবং এরা

www.icsbook.info

ছিল পরস্পরের পরিপূরক। একদিকে নবোপলীয় কৃষিজীবী বিভিন্ন ধরনের গাছপালা ও খাদ্যশস্য আবিষ্কার করেছে এবং উন্নত ধরনের শস্যবীজের মিশ্রণের মাধ্যমে নতুন জাতের শস্যের সৃষ্টি করেছে, অপরদিকে পশুপালক মানুষেরা যুগের পর যুগ পরিশ্রম করে, সাধনা করে নতুন প্রাণীকে পোষ মানিয়েছে, উন্নত গুণের প্রাণীদের সংমিশ্রণের মাধ্যমে উত্তম গুণসম্পন্ন প্রাণীর সৃষ্টি করেছে।

নবোপলীয় যুগে মানবসমাজ কৃষিজীবী ও পশুপালক— এ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ায় সমগ্রভাবে মানুষের উন্নতি হয়েছে। নিজ নিজ বিশেষ ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করার দরুন কৃষক ও পশুপালকরা নতুন কর্মকৌশল ও পদ্ধতি আবিষ্কার করতে থাকে, পাশাপাশি অবস্থানরত পশুপালক ও কৃষক মানুষদের মধ্যে এ সকল অভিজ্ঞতার বিনিময় ঘটতে থাকে। এদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকার দরুনই মানুষ কালক্রমে গাধা, গরু, ঘোড়া, উট প্রভৃতিকে ভারবাহী পশু হিসাবে ব্যবহার করতে শেখে। এ সব পশুকে কৃষিকাজে নিয়োগ করার চেষ্টা থেকে ৩০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে মেসোপটেমিয়াতে বা ইরানে কাঠের লাঙল প্রভৃতিরও আবিষ্কার হয়। এর ফলে আবার কৃষি উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

পশুপালক ও কৃষিজীবীদের সামাজিক শ্রমবিভাগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে পণ্য বিনিময় প্রথা জন্মলাভ করে। কারণ পশুপালক সমাজের হাতে পশু, চামড়া, মাংস, লোম প্রভৃতি সব সময়েই উদ্বৃত্ত থাকত কিন্তু তাদের ছিল খাদ্যশস্য প্রভৃতির প্রয়োজন। আর কৃষকদের হাতে খাদ্যশস্য প্রভৃতি উদ্বৃত্ত থাকত, কিন্তু তাদের ছিল মাংস ইত্যাদির অভাব। তাই এ দুই সমাজের মধ্যে বস্তু বিনিময়ের রেওয়াজ হয়। প্রথম প্রথম সাধারণত গরুর সঙ্গে গম, ধান প্রভৃতি বিনিময় করা হত। কালক্রমে হাতিয়ার, বিলাসদ্রব্য প্রভৃতির বিনিময় বা কেনাবেচা শুরু হয়। ক্রমশ একটা নির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে জিনিস কেনাবেচার রেওয়াজ হয়। কোথাও গরু, কোথাও পশুর মূল্যবান চামড়া, কোথাও নুন এ রকম বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হয়। গরু, নুন, চামড়া॥ এগুলোকে তাই বলা চলে আদিমকালের টাকা বা মুদ্রা। ধীরে ধীরে অবশ্য কড়ি বা সোনা, রূপা বা অন্যান্য ধাতু মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত হয়, তবে তা অনেক পরের কথা।

বিভিন্ন আবিষ্কার

নবোপলীয় যুগে নতুন অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থার প্রয়োজনে মানুষ অনেক নতুন নতুন প্রয়োজনীয় বস্তুগত উপকরণ ও সরঞ্জাম আবিষ্কার করেছিল। স্থায়ীভাবে গ্রাম স্থাপন করে বসবাস শুরু করার সাথে সাথে মানুষ কুটির তৈরি করতে শিখেছিল। শিকারী যুগের চেয়ে এ সকল কুটির ছিল অনেক অনেক উন্নত ধরনের। নবোপলীয় যুগে মানুষ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়ার উপযোগী বিভিন্ন ধরনের ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে শিখেছিল মানুষ। স্থানীয় সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করে নবোপলীয় মানুষ বেতের বা কাঠের ঘর, মাটির ঘর ইত্যাদি তৈরি করত। এ যুগের মানুষ হ্রদের উপর বাড়ি বানানোর কৌশলও আবিষ্কার করেছিল। কোনো কোনো অঞ্চলে হ্রদের মাঝখানে মাটি ফেলে কৃত্রিম দ্বীপ সৃষ্টি করে গ্রাম স্থাপন করা হত, আবার কোথাও পানির মধ্যে বাঁশের খুঁটি পুঁতে তার উপর কাঠের পাটাতন বানিয়ে ঘর

www.icsbook.info

তৈরি করা হত।

নবোপলীয় যুগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল বাঁশ-বেতের ঝুড়ি, পোড়ামাটির পাত্র, হাতে ঘোরানো যাঁতা, কুমারের চাক, টাকু দিয়ে সূতা কাটার চরকা, প্রাথমিক ধরনের নৌকা ইত্যাদি। এ সকল আবিষ্কার আবার পরবর্তীকালের অনেক যান্ত্রিক আবিষ্কারের সূচনা করেছিল।

ঝুড়ি, মাদুর ইত্যাদি তৈরি শুরু হয় ঘাস, বেত, নলখাগড়া, খড় ইত্যাদি দিয়ে। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তাতে শস্য রাখা হত, আগেই বলা হয়েছে। এসব গর্তের গায়ে নলখাগড়া, খড় বা বেত গোল করে ঘুরিয়ে বিছিয়ে একটা আস্তরণ তৈরি করে তার ভিতর শস্য রাখা হত। বাঁশ-বেতের ঝুড়ি তৈরিরও একটা বহুল প্রচলিত পদ্ধতি ছিল ঃ নলখাগড়া বা বেতকে ঘুরিয়ে ও পেঁচিয়ে তাকে পাত্রের আকার দান করা। প্রথমে বেত বা নলখাগড়ার নলকে জোড়া দিয়ে দিয়ে লম্বা একটা নল তৈরি করা হত। তারপর তাকে পেঁচিয়ে গোল করে একটার উপর একটা পরত পরত করে সাজানো হত। একটা পরতের সাথে আরেকটা পরতকে বেত বা শনের দড়ি দিয়ে বাঁধা হত। আমাদের দেশে এখনও এ পদ্ধতিতেই বেতের ধামা তৈরি করা হয়।

ঝুড়ি তৈরির অনুরূপ কৌশলে মাটির পাত্র তৈরির কৌশলও মেয়েরাই আবিষ্কার করেছিল। ছোটখাট মাটির বাসন, পিরিচ বা বাটি ইত্যাদি তৈরি করা অবশ্য কঠিন ছিল না। খানিকটা কাদা নিয়ে হাতে টিপে টিপেই ছোটখাট বাটি বাসন ইত্যাদি তৈরি করা যেত। হাঁড়ি ইত্যাদি বড় পাত্র তৈরি করার জন্য প্রথমে দু'হাতে গোল করে ডলে ডলে লম্বা দড়ির মতো করা হত। তারপর এটাকে চক্রের মতো গোল করে পেঁচিয়ে পরত পরত করে একের উপর এক করে সাজান হত— বেত দিয়ে ধামা বানানোর মতো করে। প্রতি পরত বিছানো হয়ে গেলে আগের পরতের সঙ্গে তাকে আঙুল দিয়ে টিপে জোড়া লাগিয়ে দেয়া হত। পুরো পাত্রটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর ভিতর ও বাইরের পিঠকে আঙুল দিয়ে চেপে চেপে বা হাত বুলিয়ে পাতলা ও মসৃণ করা হত।

এভাবে মসৃণ করার জন্য পাত্রটাকে বারবার হাতে ধরে ঘোরাতে হত। এ ভাবে বারবার এবং অনবরত মাটির পাত্র ঘোরাতে ঘোরাতেই হয়তো এক সময় মানুষ বা সঠিকভাবে বললে মেয়েমানুষ কুমারের চাক আবিষ্কার করেছিল।

কুমারের চাক অবশ্য খুব জটিল কোনো যন্ত্র নয়। একটা গোল কাঠের তক্তা বা চাক্তির মাঝখানে একটা কয়েক ইঞ্চি লম্বা কাঠি খাড়াভাবে বসান থাকে। মাটিতে খাড়াখাড়ি একটা ছোট গর্ত করে তাতে ঐ কাঠির মাথাটা বসিয়ে দিলে কাঠের গোল চাকটা মাটির সাথে সমান্তরাল থেকে ঘুরতে পারবে। এ চাকতির মাঝখানে খানিকটা মাটির তাল রেখে চাকতিটাকে কয়েক পাক ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলে সেটা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরতেই থাকবে। এ অবস্থায় মাটির তালটার ভিতর দিকে আঙুল প্রবেশ করিয়ে দিলে এবং বাইরের দিকে হাত বুলিয়ে দিলে মাটিটা গোল পাত্রের আকার পাবে। কৌশলী শিল্পী এ পাত্রকে নানারকম সুন্দর গোলাকার আকৃতি দান করতে পারে। কুমারের চাক আবিষ্কৃত হওয়ার পর একজন কুমারের পক্ষে দিনে কয়েকশ' পাত্র তৈরি করাও কঠিন কাজ ছিল না। তার আগে একটা ভাল পাত্র তৈরি করতে দুই তিন দিন পর্যন্ত সময় লেগে যেত। অবশ্য আগে যেমন সবাই হাত দিয়ে পাত্র তৈরি করতে পারত এখন আর তা সম্ভব ছিল না। যারা দীর্ঘদিন ধরে এ কৌশল শিখত সেই বিশেষজ্ঞ কুমাররাই

www.icsbook.info

কেবল কুমারের চাকের সাহায্যে পাত্র বানাতে পারত। কুমারের চাক খুব জটিল যন্ত্র না হলেও যন্ত্রবিদ্যা ও কৃৎকৌশলের ইতিহাসে এর গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। কুমারের চাক, চরকা, গাড়ির চাকা প্রভৃতিতে যে চক্রাকার গতিকে কাজে লাগান হয় তা পরবর্তী সব সভ্যতার অন্যতম ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে। এমনকি আধুনিক জগতেও ঘড়ি, রেকর্ড প্লেয়ার, বিদ্যুৎ জেনারেটর থেকে শুরু করে মোটর গাড়ি, এরোপ্লেন সব কিছুতেই যে চাকা ও চক্রগতি একান্ত আবশ্যক বিবেচিত হয়, সুদূর অতীতে নবোপলীয় যুগে তার আবিষ্কার ঘটেছিল।

নবোপলীয় মানুষ অবশ্য কাঁচা কাদামাটির পাত্র বানিয়েই থেমে থাকেনি, তাকে পুড়িয়ে শক্ত পাত্র তৈরি করার কৌশলও আবিষ্কার করেছিল। প্রথমত সব মাটি দিয়ে পোড়ামাটির পাত্র হয় না। বিশেষ ধরনের মাটিতে পানি মিশিয়ে কাদা তৈরি করে তা দিয়ে প্রথমে পাত্রটা বানানো হত। তারপর সেটাকে বাতাসে শুকিয়ে নিয়ে পাথর দিয়ে ঘষে মসৃণ করা হত। তারপর সেটাকে রোদে আরও শুকানো হত। তারপর কতগুলো পাত্রকে একসাথে ঘাসপাতা দিয়ে পুরোপুরি ঢেকে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হত। এভাবে উত্তপ্ত হলে পাত্রের কাদামাটি থেকে পানি সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যেত এবং মাটির পাত্রটা পাথরের মতো শক্ত পদার্থে পরিণত হত। এ সব পাত্রের গায়ে তাদের নির্মাতারা কাঠি, হাড় বা নখ দিয়ে নানা রকম চিহ্ন ও অলঙ্করণ এঁকে দিত এবং বিভিন্ন রং-এর মাটি ও পোড়ানোর কৌশল প্রয়োগ করে নানা রংয়ের পাত্র তৈরি করত।

নবোপলীয় যুগে মেয়েরা আরও একটা দুরূহ ও অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার সাধন করেছিল। তা হল সূতা কাটা এবং কাপড় বোনা। সূতা কাটা অর্থ হচ্ছে তুলা, শণ ইত্যাদির তন্তু বা আঁশকে পাকিয়ে জোড়া দিয়ে দিয়ে লম্বা সূতা তৈরি করা। পশ্চিম এশিয়ায় ও অন্যান্য স্থানে প্রথম প্রথম শণের সূতা দিয়েই কাপড় তৈরি করত। এ কাপড়েরই নাম ক্ষৌমবস্ত্র বা লিনেন। কিছুকাল পরে পশুলোম থেকে পশমী সূতা বা উল-সূতা এবং পশমের কাপড় তৈরিরও রেওয়াজ হয়। এ সবই ছিল কৃষি ও পশুপালনের সাথে সম্পর্কিত। নবোপলীয় সমাজে পরিকল্পিত ভাবে শণগাছ উৎপাদন করা হত। অবশ্য শণের আঁশও আবার তৈরি করতে হয়, কারণ সরাসরি গাছে কখনও আঁশ জন্মায় না। শণ প্রভৃতি গাছের ছাল কয়েক দিন পানিতে ডুবিয়ে রাখলে সেটা পচে আঁশ তৈরি হয়। এমনিভাবে পাটগাছ পানিতে পচিয়েই আমাদের দেশে পাট তৈরি করা হয়। অবশ্য শণ ছাড়া অন্য গাছের আঁশ কিংবা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের তন্তু থেকেও সূতা তৈরি করা হত কোনো কোনো অঞ্চলে। মহেঞ্জোদাড়োতে নগর সভ্যতার শুরুতেই তুলা থেকে সূতা তৈরির প্রচলন ছিল, তবে তার কত আগে তারা এ কৌশল আয়ত্ত করেছিল তা জানা যায় না। আবার চীন দেশের মানুষ রেশমগুটি বা রেশমের আঁশ থেকে সূতা তৈরির কৌশল আবিষ্কার করেছিল। এ কারণেই রেশম আমাদের দেশে চীনাংশুক নামে পরিচিত হয়েছে।

সুদূর অতীতে নবোপলীয় যুগে কাপড় বোনার যে পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল, যুগ যুগ ধরে মানুষ মূলত সে পদ্ধতিই এখন পর্যন্ত অনুসরণ করে এসেছে। কাপড় তৈরি করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন সূতার ফেটি বা লম্বা সূতা। তুলা বা শণের আঁশকে পাকিয়ে জোড়া দিয়ে দিয়ে লম্বা সূতার ফেটি করা হয়। প্রথম প্রথম হয়তো হাত দিয়ে

www.icsbook.info

পাকিয়ে বা উরুর উপর হাত দিয়ে ঘসে ঘসে পাকিয়ে সূতার আঁশ জোড়া দেওয়া হত। আমাদের দেশে এখনও এ রকম পদ্ধতিতেই পাকিয়ে জোড়া দিয়ে পাটের দড়ি তৈরি করা হয়। ক্রমশ টাকুর সাহায্যে সূতা তৈরির পন্থা আবিষ্কৃত হয়। টাকু হচ্ছে পেন্সিলের মতো একটা গোলাকার লম্বা কাঠি। এক হাতের তালু দিয়ে কাঠিটাকে উরুতে গোল করে ঘষলে তার এক প্রান্তে সূতার আঁশ আটকিয়ে অন্য হাত দিয়ে টেনে টেনে পাক খাওয়া আঁশগুলোকে লম্বালম্বি জোড়া লাগিয়ে সূতা তৈরি করা সম্ভব হয়।

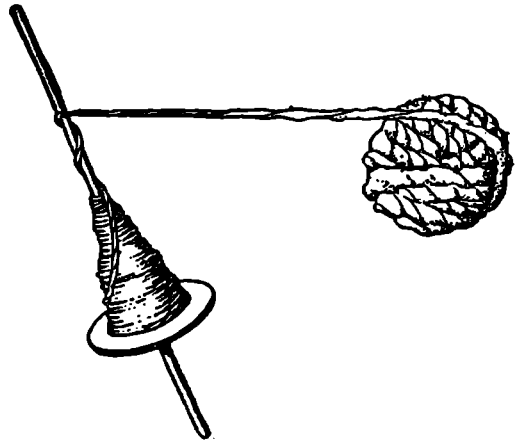

চাকতি লাগানো টাকুর সাহায্যে সূতা কাটা অর্থাৎ সূতা তৈরির পদ্ধতি

মানুষ ক্রমে আবিষ্কার করে যে, টাকুকে উরুতে না ঘষে তাকে সূতায় আটকে ঝুলিয়ে পাক দিয়ে ছেড়ে দিলে সেটা ঘুরতেই থাকে। আর টাকুর মধ্যে একটা চাকতি ফুটো করে আটকে দিলে তার ওজনের দরুন সেটা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরতে থাকে। শূন্যের মধ্যে ঘুরন্ত এ টাকুকে কাজে লাগিয়ে সূতার আঁশকে পরপর পাকিয়ে জোড়া লাগিয়ে সূতা তৈরি করা চলে।

সূতা তৈরির যে উন্নততর যান্ত্রিক পদ্ধতি এরপর আবিষ্কৃত হয় সেটা হল চরকা। যদিও এটা নবোপলীয় যুগের শেষ দিকের অথবা নগর সভ্যতার শুরুর দিকের আবিষ্কার তথাপি বর্তমান প্রসঙ্গেই আমরা তার বর্ণনা দেব। চরকা আসলে একটা গোল চাকা যার সাহায্যে একটা টাকু বা কাঠিমকে দ্রুত ঘোরানো চলে। টাকুর সাহায্যে শণ বা তুলার আঁশকে পাকিয়ে জোড়া দিয়ে সূতা তৈরির যে প্রক্রিয়া আমরা আগে ব্যাখ্যা করেছি, চরকাতেও সে পদ্ধতিতে সূতা কাটা হয়। চরকাতে শুধু একটা চাকা ঘুরিয়ে তার সাহায্যে টাকুকে জোরে এবং বিরামহীন ভাবে ঘোরানো হয় মাত্র। চরকায় একটা কাঠের তক্তার এক পাশে আড়াআড়িভাবে একটা কাঠিম বা টাকু থাকে। চরকার চাকাটার নাভিকেন্দ্রে একটা হাতল সংযুক্ত থাকে, ঠিক সিঙ্গারের হাত মেশিনের চাকাটার মতো। এ চরকার চাকাটার উপর দিয়ে একটা মোটা ফিতা ঘুরিয়ে এনে কাঠিমটার উপর দিয়েও ঘুরিয়ে নেওয়া হয়। এ ফিতাটার দুই প্রান্ত জোড়া থাকে। এর

www.icsbook.info

ফলে চরকার চাকা এবং কাঠিমটা ফিতার সাহায্যে এমন ভাবে যুক্ত হয়ে যায় যে, চাকাটা ঘুরলে কাঠিমটাও ঘুরতে থাকে। এ বর্ণনাটা যদি দুর্বোধ্য মনে হয় তাহলে সিঙ্গারের একটা পা-মেশিনের নিচের বড় চাকাটার সাথে উপরের ছোট চাকাটা কেমন ভাবে ফিতার সাহায্যে যুক্ত থাকে সেটা দেখলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। চরকার চাকাটার ব্যাস কাঠিমের ব্যাসের চেয়ে অনেক বেশি হওয়ার ফলে চাকাটা একপাক ঘুরলে কাঠিমটা অনেকবার পাক খায়, ঠিক যেমন সিঙ্গারের পা-মেশিনের নিচের মস্তবড় চাকাটা এক পাক ঘুরতে ঘুরতে উপরের ছোট চাকাটা আট-দশ বার ঘুরে আসে। যা হোক, চরকার হাতল ঘুরিয়ে কাঠিম ঘোরানোর পর সূতা কাটায় আর কোনো অসুবিধা থাকে না। কাঠিমের মাথায় শণ বা তুলার আঁশগুলো পাকিয়ে জোড়া লেগে লেগে সূতা তৈরি হয়ে যায়। খানিকটা সূতা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর সেটা আবার কাঠিমের পেটের কাছে ধরলেই সেটা ঘুরে কাঠিমে জড়িয়ে যায়, সূতার রীল অথবা নাটাইয়ে সূতা জড়ানোর মতো। একটা কাঠিম সূতায় ভরে গেলে সেটা খুলে চরকায় আরেকটা কাঠিম বসিয়েও দেওয়া যায়। এভাবে চরকায় আগের তুলনায় অনেক সহজে সূতা তৈরি করা যেত।

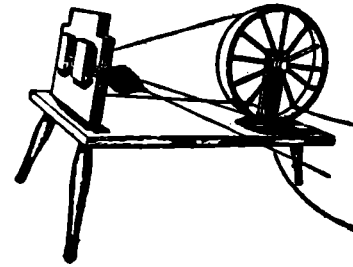

আধুনিককালের একটি চরকা

সূতা তৈরির পর অবশ্য কাপড় বোনার কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যায়। দুটো খুঁটির উপর একটা কাঠি আড়াআড়ি ভাবে রেখে তা থেকে সারি সারি সূতা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সূতাগুলোর নিচের দিকে পাথরের টুকরো বেঁধে ঝুলিয়ে দিলে সুতাগুলো টানটান হয়ে ঝুলে থাকবে। এ সূতাগুলোকে বলা হয় টানা সূতা। অনেক ক্ষেত্রে দুটো সমান্তরাল দণ্ডের মধ্যে টানটান করে বেঁধেও সূতাগুলোকে সাজানো হয়। এবার আরেকটা সূতা একটা সরু শলাকা বা সুইয়ে গেঁথে সুতাগুলোর একটার উপর দিয়ে আরেকটার নিচ দিয়ে আবার তার পরেরটার উপর দিয়ে এবং তার পরেরটার নিচ দিয়ে এ ভাবে পাশাপাশি চালিয়ে গেলে একবার বোনা হল। পাশাপাশি এ ভাবে যে সূতাটা গেল তাকে বলা হয় পড়েন। এ রকম নিচে নিচে অনেকগুলো পড়েনের সূতা সাজালে একখণ্ড কাপড় বোনা হয়। চাটাই বা পাটি বোনার সময়ও এই একই পন্থা অনুসরণ করা হয়। তবে বেত বা বাঁশের চটাগুলো শক্ত বলে তাদের টানা ও পড়েনগুলোকে শুধু হাতেই সাজানো বা বোনা চলে।

উপরে টানা সূতার মধ্য দিয়ে একান্তরক্রমে পড়েনের সূতা চালান দিয়ে কাপড় বোনার যে পদ্ধতির বর্ণনা করা হল এটাই হল আদিমতম তাঁত, আর যে কাঠির সাহায্যে পড়েনের সূতা বোনা হয় সেটাই হল মাকু। কালক্রমে এর অবশ্য অনেক উন্নতি হয়েছে। এমন তাঁত আবিষ্কার হয়েছে যাতে টানা সূতাগুলোর একটা অন্তর একটা এ রকম সব সূতা একটা দণ্ডে আটকিয়ে একবার উপরে ওঠান হয়, আরেকবার নিচে নামান হয়। সাথে সাথে অন্য দণ্ডের সুতাগুলোকে একবার নিচে নামানো হয়, তারপর

www.icsbook.info

উপরে ওঠানো হয়। আর মাকুর সাহায্যে পড়েনের সুতাটা এ দুই সারি সুতার মধ্য দিয়ে চালান দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁতের যত উন্নতিই হোক না কেন, আধুনিকতম বিদ্যুৎচালিত যান্ত্রিক তাঁতে পর্যন্ত মূলত সেই নবোপলীয় যুগের তাঁতের বয়ন পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

নবোপলীয় যুগের একটা বৈশিষ্ট্য হল, এই প্রথম মানুষ এক এক স্থানে গ্রাম বানিয়ে বাস করতে শুরু করে। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ঘর মানুষ নিয়ে এক একটি গ্রাম হত। চাষের জমির সংলগ্ন স্থানেই এক এক দল মানুষ তাদের গ্রাম স্থাপন করত। প্রথম প্রথম অবশ্য একস্থানে বেশি দিন বাস করা তাদের হয়ে উঠত না। কিছু দিন একস্থানে চাষ করলে জমির উর্বরতা কমে যেত এবং ফসলের ফলনও কমত। তখন মানুষ অন্য জায়গায় গিয়ে নতুন জমি চাষ করত। এতে কোনো অসুবিধা ছিল না। কারণ পৃথিবীতে তখন অঢেল জায়গা ছিল। ক্রমশ মানুষ আবিষ্কার করে যে, এক জমি কয়েকবার চাষ করার পর যদি তা কিছুকাল ফেলে রাখা যায় এবং তারপর নতুন করে সেখানকার আগাছা পুড়িয়ে সেখানে আবার চাষ করা হয়, তবে জমির উর্বরতা ফিরে আসে। পশুপালন আয়ত্ত করার পর মানুষ আরও আবিষ্কার করে যে, মাঠে গরু মহিষের পাল চরালে তাদের গোবর জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। ফলে উর্বর জমির সন্ধানে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ানোর পরিবর্তে একস্থানে স্থায়ী গ্রাম স্থাপনই নবোপলীয় যুগে নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়।

নবোপলীয় গ্রাম সমাজের মানুষ তাদের জীবনের যাবতীয় সমস্যার একটা মোটামুটি সমাধান বের করেছিল। নবোপলীয় গ্রামগুলি ছিল প্রায় সর্বাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ। নবোপলীয় যুগের বিভিন্ন আবিষ্কারের কথা আমরা আগেই বলেছি। নবোপলীয় গ্রামের মানুষেরা এক এক স্থানে স্থায়ীভাবে যেসব উপকরণ, যথা, পাথর, হাড়, কাঠ, মাটি ইত্যাদি যা পাওয়া যেত তাই দিয়ে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ও অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরি করত এবং খাদ্য উৎপন্ন করত। গ্রামের সব পরিবার নিজ নিজ প্রয়োজনীয় সব সরঞ্জাম তৈরি ও উৎপন্ন করত। গ্রামের মানুষদের মধ্যে কোনো কাজের বিভাগ বা শ্রমবিভাগ ছিল না। অর্থাৎ সেখানে এমন নিয়ম ছিল না যে, এক এক দল লোক এক এক ধরনের কাজ করবে। এক একটা পরিবারের মানুষ ঐ পরিবারের দরকারী সব জিনিসই তৈরি করত। যেমন প্রত্যেক পরিবার নিজেদের শস্য উৎপন্ন করত, খাদ্য তৈরি করত এবং হাঁড়ি পাতিল, কাপড় পোশাক, হাতিয়ার যন্ত্র ও অন্যান্য জিনিস তৈরি করত। পরিবারের মেয়েরা জমি চাষ করত, ফসল উৎপাদন করত, খাদ্য রান্না করত, সূতা কাটত, কাপড় বুনত, পোশাক বানাত, মাটির পাত্র তৈরি করত, গয়না ইত্যাদি তৈরি করত। আর পুরুষরা জঙ্গল কেটে জমি পরিষ্কার করত, ঘর বানাত, পশুপালন করত, হাতিয়ার ও অস্ত্র তৈরি করত।

কিছুকাল আগে আমাদের দেশে যে গ্রাম সমাজ ছিল সেসব গ্রামে এক এক দল মানুষ এক একটা কাজ করত। বেশির ভাগ লোক ছিল চাষী, কিছু লোক ছিল কামার— তারা লাঙ্গল, কাস্তে ইত্যাদি লোহার হাতিয়ার তৈরি করত; কিছু লোক ছিল কুমার— তারা মাটির পাত্র তৈরি করত। কিছু লোক ছিল তাঁতী তারা কাপড় তৈরি করত ইত্যাদি। এ রকম কাজের বিভাগের ভিত্তিতে যেসব গ্রাম সমাজ গড়ে ওঠে, তাদের সম্পর্কে বলা হয় যে, সেখানে শ্রমবিভাগ আছে। কিন্তু নবোপলীয় যুগের গ্রামে

www.icsbook.info

শ্রমবিভাগ ছিল না। সেখানে সব গৃহস্থ পরিবারই নিজেদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র তৈরি করতে পারত। নবোপলীয় গ্রামে শুধু মেয়ে আর পুরুষদের মধ্যে অবশ্য কাজের ভাগ ছিল।

নবোপলীয় বা নতুন পাথরের যুগে গ্রাম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর ছোট শিশুদের লালন পালন করা এবং মানুষ করে তোলা সহজ হয়ে ওঠে। শিকারী যুগের মতো নানাস্থানে ছুটোছুটি করার বদলে এক জায়গায় বাস করার ফলে শিশুদের যত্ন নেয়া ও রক্ষা করা সম্ভব হয়। আবার বৃদ্ধ মানুষরা এখন আর সমাজের বোঝা হয়ে থাকে না। নতুন পাথরের যুগে গ্রামের দৈনন্দিন কাজে বৃদ্ধরা ভালভাবেই অংশ গ্রহণ করত। শিকারী যুগে বৃদ্ধরা শিকারে অংশ গ্রহণ করতে পারত না। কিন্তু নতুন পাথরের যুগে কৃষিকাজ বা পশুপালনে সাহায্য করতে না পারলেও, নিজেদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা সমাজকে সাহায্য করতে পারত। কৃষিকাজের নানা কৌশল, পশুপ্রাণীর রোগ ব্যাধি ইত্যাদি বিষয়ে তারা ছিল অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ। বৃদ্ধরাও ছোট শিশুদের লালন পালন করতে পারত, কিশোরী তরুণীদের নানা হস্তশিল্প শেখাতে পারত এবং রান্না ও ঘর সংসারের কাজ করতে পারত। এর ফলে জনসংখ্যাও নতুন পাথরের যুগে দ্রুত বাড়তে থাকে এবং বাড়তি মানুষরা নতুন নতুন গ্রাম স্থাপন করে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

নতুন পাথরের যুগে অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, প্রতিবার ফসল ওঠানোর পর পর্যাপ্ত পরিমাণ শস্য জমা করে রাখতে হত, যেন বৎসরান্তে নতুন ফসল ওঠার আগে পর্যন্ত সময় মানুষ তা খেয়ে বাঁচতে পারে। নতুন পাথরের যুগে মানুষদের পল্লীতে তাই শস্যের গোলাঘর থাকতেই হত।

প্রথম প্রথম মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার তলা এবং চারপাশ খড় দিয়ে ঢেকে তাতে শস্য রাখা হত এবং গর্তের মুখটা ভাল করে ঢেকে দেয়া হত যাতে বাতাস ঢুকতে না পারে। কালক্রমে মাটি থেকে খানিকটা উঁচুতে শস্য রাখার গোলা তৈরি করতে শেখে মানুষ।

ফসল কাটলে বা গোলায় ভরলেই অবশ্য কাজ শেষ হয়ে যায় না। গম বা বার্লিকে ঝাড়াই মাড়াই করে ছড়া থেকে আলাদা করতে হয় এবং তার খোসা বা তুষ ছাড়াতে হয়। তারপর আবার তাকে পিষে ময়দা করতে হয়। প্রথম প্রথম মেয়েরা শিলের মতো একটা শক্ত পাথরে গম রেখে আরেকটা শক্ত পাথর দিয়ে তা' পিষত। এটাই হল আদিম যাঁতা। কালক্রমে মেয়েরা হাতে ঘোরানো যাঁতা আবিষ্কার করে। এতে একটা গোল আকারের চ্যাপ্টা পাথরের ওপর আরেকটা গোল আকারের পাথর ঘোরানো হয়। দুটো পাথরের মধ্যে গম রেখে তা' পেষা হয়। এ ময়দা থেকে হাত-রুটি বা পিঠা তৈরি করা খুবই সহজ। চাষ করে শস্য ফলানো এবং শস্য থেকে খাদ্য তৈরির যেসব প্রক্রিয়া মানুষ আবিষ্কার করেছিল তার ভিত্তিতে শিকারী যুগের অবসানে নতুন পাথরের যুগের কৃষিভিত্তিক গ্রাম সমাজ গড়ে উঠেছিল। কৃষি সমাজের উদয়ের পর নতুন সমাজের প্রয়োজনে মানুষ আরো অনেক নতুন নতুন হাতিয়ার, কৌশল ও প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছিল এবং নতুন সংস্কৃতি আয়ত্ত করেছিল। পুরাতাত্ত্বিকরা এ যুগের নাম দিয়েছেন 'নবোপলীয় যুগ' বা নতুন পাথরের যুগ । এ আমলের মানুষ মূলত পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করলেও সে হাতিয়ারকে তারা

www.icsbook.info

বেলেপাথরে ঘষে মসৃণ ও ধারাল করত। নবোপলীয় বা নতুন পাথরের যুগের হাতিয়ার ছিল 'পুরোপলীয়' বা পুরান পাথরের যুগের তুলনায় উন্নত ও মসৃণ। আবার আদিম শিকারীদের বন্যসমাজের তুলনায় নবোপলীয় কৃষি সমাজ ছিল উন্নততর। নৃতাত্ত্বিকরা এ সমাজকে আখ্যা দিয়েছেন 'বর্বর সমাজ'। পরবর্তীকালের সভ্য সমাজের সাথে তুলনা করেই আগেকার শিকারী যুগের স্তরকে বলা হয় 'বন্য সমাজ' এবং নতুন পাথরের যুগে কৃষি সমাজকে বলা হয় বর্বর সমাজ।

নতুন পাথরের যুগে গ্রামের মানুষরা নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছুই নিজেরা তৈরি করত। অবশ্য সব অঞ্চলে কুড়াল বানানোর ফ্লিন্ট পাথর বা যাঁতা তৈরির মতো শক্ত পাথর পাওয়া যেত না। পাহাড় বা খনিতে আবার কিছু লোক পাথর কাটার কাজে দক্ষতা অর্জন করেছিল। এরা মাটির নিচে সুড়ঙ্গ কেটে চর্বির প্রদীপের আলোতে পথ দেখে তার ভেতর থেকে ভাল পাথরের চাঙড় কেটে আনত। হাড় আর হরিণের শিং-এর শাবল গাঁইতি ইত্যাদি দিয়ে তারা খনি থেকে পাথর কাটত। বিভিন্ন অঞ্চলের নবোপলীয় গ্রামের মানুষেরা এদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য, মাংস ইত্যাদির বিনিময়ে পাথর নিয়ে আসত। এ ভাবে সুদূর অতীতেই বিনিময় প্রথার উদয় হয়েছিল। তবে এ রকম কিছু কিছু জিনিস বাইরে থেকে আনতে হলেও নতুন পাথরের যুগের গ্রাম ছিল মূলত স্বনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

নতুন পাথরের যুগের গ্রামবাসীরা ছিল শান্তিপ্রিয় মানুষ। এদের সমাজে অস্ত্রের প্রচলন বিশেষ ছিল না। বন্যপশু ইত্যাদি তাড়ানোর জন্যেই যা অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হত। তীর ধনুক ইত্যাদি দিয়েই বন্যপশুকে কাবু করা হত। অবশ্য ছুরি, কুড়াল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পাথরের হাতিয়ার নতুন পাথরের যুগের মানুষরা তৈরি ও ব্যবহার করত।

নতুন পাথরের যুগেও ক্ল্যান সংগঠন এবং উপজাতীয় সংগঠন টিকে ছিল। কিন্তু যে শিকারী সমাজে ক্ল্যান সংগঠন গড়ে উঠেছিল, কৃষি সমাজের সাথে তার কোনোই মিল ছিল না। তাই ক্ল্যান সংগঠন টিকে থাকলেও তার ভেতরের নিয়ম কানুন ও আচার অনুষ্ঠানে অনেক পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে। শিকারী যুগে জমি, পশু, নদীর মাছ ইত্যাদি ছিল ক্ল্যানের সম্পত্তি। নতুন পাথরের যুগে জমিই ছিল উৎপাদনের মূল উপকরণ। এ যুগে জমির ওপর ছিল ক্ল্যানের অধিকার। অর্থাৎ জমি কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, জমি ছিল সর্বসাধারণের সম্পত্তি।

আবার শিকারী যুগে ক্ল্যানের সবাই একসাথে মিলে বড় বড় হাতি, বাইসন ইত্যাদি শিকার করত। কিন্তু নতুন পাথরের যুগে হাতিয়ারের উন্নতির ফলে সব মানুষের একসাথে কাজ করা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। কোদাল, খুরপি, লাঙল ইত্যাদি আবিষ্কারের পর এক একটা গৃহস্থ পরিবারই এক এক খণ্ড জমি সুন্দর ভাবে চাষ করতে পারত। এর পর পুরান আমলের মতো সমগ্র ক্ল্যানের যৌথ শ্রম আর প্রয়োজন হত না, তা সম্ভবও ছিল না। ফলে ক্রমে ক্রমে একসাথে সব মানুষের কাজ করার প্রথা লোপ পায়। ক্ল্যানের সর্দার এখন থেকে সব পরিবারের মধ্যে জমি ভাগ করে দেয়। প্রত্যেক পরিবার তার নিজের জমিতে চাষ করত এবং তার ফসল নিজেরা নিত। সব পরিবারের নিজেদের হাতিয়ার ছিল, গরু ছাগল ছিল, ঘর ছিল। অবশ্য জমির ওপর বিভিন্ন পরিবার কোনো স্বত্ব লাভ করত না। প্রতি বছর ক্ল্যানের সর্দার জমিকে নতুন করে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে ভাগ করে দিত। পশু চারণভূমি, নদী পুকুর ইত্যাদি অবশ্য

www.icsbook.info

সকলের সাধারণ সম্পত্তি ছিল।

নতুন পাথরের যুগে গ্রামসমাজে এ ভাবে ক্রমে ক্রমে ক্ল্যানের দৃঢ় সংগঠন ভেঙে পড়ে এবং তার স্থানে পৃথক পৃথক পরিবারের উদয় হয়।

নতুন পাথরের যুগের সমাজের পৃথিবীব্যাপী বিস্তার

নতুন পাথরের যুগে সংস্কৃতি আরো এক কারণে মানবসভ্যতার পরবর্তী বিকাশের পক্ষে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রথম মানব সমাজ সত্যিকার অর্থে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য 'উচ্চ পুরোপলীয়' যুগেও শিকারী মানুষ পৃথিবীর সবকটি মহাদেশে বিস্তার লাভ করেছিল। তবে শিকারী মানুষরা বিভিন্ন মহাদশের মূল ভূখণ্ডের সুগম অঞ্চলেই বিস্তার লাভ করেছিল। অপরপক্ষে নতুন পাথরের যুগের সংস্কৃতির মানুষেরা পৃথিবীর সব আনাচে কানাচে, বরফাচ্ছন্ন তুন্দ্রা অঞ্চল থেকে শুরু করে উষ্ণমণ্ডলের গভীর অরণ্য, সব জায়গাতেই বাস স্থাপন করেছিল। স্থলপথে এবং জলপথে অবিশ্বাস্য রকম দূরত্ব অতিক্রম করে মানুষ সারা পৃথিবীতে নতুন পাথরের যুগের সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়েছিল। এমন কি এশিয়া ভূখণ্ড থেকে চার হাজার মাইল দূরের প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত নতুন পাথরের যুগের মানুষের আওতার বাইরে ছিল না।

সারা পৃথিবীতে নতুন পাথরের যুগের গ্রাম সংস্কৃতির বিস্তারের বিশেষ কারণ ছিল। আমরা আগেই দেখেছি কৃষিকাজ আয়ত্ত করার পর মানুষের খাদ্য সমস্যার একটা মোটামুটি স্থায়ী সমাধান হয়। খাদ্য উৎপাদন করতে শেখার ফলে মানুষের পক্ষে অনাহারে মারা যাওয়ার আশঙ্কা দূর হয়েছিল। আবার নবোপলীয় গ্রামে বৃদ্ধ বা শিশুরাও অপ্রয়োজনীয় ছিল না বা সমাজের উপর ভার স্বরূপ ছিল না। জনসংখ্যা বাড়লেও কোনো বিপদ ছিল না, কারণ, বর্ধিত জনসংখ্যা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই উৎপাদন করতে পরত। এ অবস্থায় নতুন পাথরের যুগে অতিদ্রুত মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এক এক গ্রামে মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেলে বাড়তি মানুষরা খানিক দূরে গিয়ে সুবিধা মত স্থানে আরেকটা গ্রাম স্থাপন করত।

নতুন পাথরের যুগে গ্রামগুলো মূলত স্বনির্ভর হলেও কিছু কিছু প্রয়োজনীয় উপকরণ যথা, পাথর ইত্যাদি অনেক সময় বাইরে থেকে আনতে হত। এ সব পাথরের খনিতে যে সব বিশেষজ্ঞ কারিগর কাজ করত তারা অন্য অঞ্চলের শিকারী, কৃষিজীবী ও পশুপালকদের কাছ থেকে পশুর হাড়, শিং, কাঠ ইত্যাদি এনে তা' দিয়ে খনি খোঁড়ার হাতিয়ার তৈরি করত। তাই এ কথা বলা চলে, নতুন পাথরের যুগে গ্রামগুলো স্বনির্ভর হলেও বাইরের জগতের সাথে যোগযোগশূন্য ছিল না। নতুন পাথরের যুগে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে কিছুটা যোগাযোগ থাকত। ব্যাবসা বাণিজ্য বলতে অবশ্য পণ্য বিনিময়ব্যবস্থারই তখন মাত্র প্রচলন হয়েছিল। যারা পাথরের হাতিয়ার বা নানা শখের জিনিস গ্রামবাসীদের কাছে বিক্রি করতে আসত তারা তার বিনিময়ে খাদ্যশস্য বা মাংস, পশু ইত্যাদি নিয়ে যেত। এই বিনিময়ব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে কারিগরি জ্ঞান ও ভাবনা চিন্তা ইত্যাদিরও আদান প্রদান হত। এসব ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ী ইত্যাদির কাছ থেকেই সম্ভবত নতুন পাথরের যুগে গ্রামবাসীরা দূর দূর অঞ্চল সম্পর্কে খবর পেত। এ সব সংবাদের ভিত্তিতে এক এক অঞ্চলের জনসংখ্যা বেড়ে গেলে বাড়তি মানুষরা দল বেঁধে নতুন স্থানে গিয়ে চাষাবাদের

www.icsbook.info

জন্যে সুবিধাজনক জায়গা দেখে বাস স্থাপন করত।

এ ভাবে নতুন পাথরের যুগের মানুষরা পশ্চিম এশিয়া থেকে আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে, ইউরোপে, পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় অবস্থা অনুসারে এক এক অঞ্চলের মানুষরা নতুন নতুন সংস্কৃতি ও অভ্যাস আয়ত্ত করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নতুন পাথরের যুগে মানুষরা গম বা বার্লির পরিবর্তে ধানের চাষ আয়ত্ত করে। কারণ এ অঞ্চলের জলবায়ু ধান চাষের অনুকূল। আমেরিকা মহাদেশের নতুন পাথরের যুগের কৃষক সমাজ ভুট্টার চাষ আয়ত্ত করেছিল। যে সব অঞ্চলে চাষাবাদের সুযোগ নেই সেখানে মানুষ পশুপালন এবং ফলের আবাদে মন দেয়। এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ আঙুরের চাষ আয়ত্ত করে এবং ভূমধ্যসাগরের উপকুল ও দ্বীপাঞ্চলের মানুষ জলপাই, আঙুর ইত্যাদির চাষে উৎকর্ষ অর্জন করে। এ সকল নতুন পাথরের যুগের সমাজ আঙুরের রস থেকে মদ এবং জলপাই থেকে উৎকৃষ্ট তেল তৈরির কৌশলও আবিষ্কার করেছিল। আবার ভূমধ্যসাগরে যেমন জলপাই, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপে তেমনি ছিল নারকেল। এ অঞ্চলের মানুষ নারকেল থেকে তেল বের করতে তো পারতই, নারকেলের ছোবড়া থেকে দড়ি, নারকেল পাতা দিয়ে ঘর, ইত্যাদি তৈরি করতে শিখেছিল। ইন্দোনেশিয়ায় একটা প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে যে, বছরে যতগুলো দিন আছে নারকেল গাছ তত রকম কাজে লাগে।

নতুন পাথরের যুগে সমাজে শিকারী যুগের সমাজ সংগঠন অনেকাংশে টিকে ছিল। কিন্তু তথাপি, নতুন পাথরের যুগের কৃষিনির্ভর সমাজের বস্তুগত ভিত্তি শিকারী যুগের তুলনায় আমূল পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন পাথরের যুগের সমাজে প্রাচীন সামাজিক অনুষ্ঠান ও চিন্তাধারারও রূপান্তর ঘটে। নতুন পাথরের যুগে সমাজের মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি হচ্ছে কৃষি উৎপাদন। রূপান্তরিত টোটেম অনুষ্ঠানে মেয়েদের ভূমিকা বাড়ল এবং শস্য উৎপাদনের বিষয়টার ওপর জোর পড়ল। মেয়েরা সন্তানের জন্ম দেয় এবং শস্যবীজ অনেক শস্যের জন্ম দেয়। তাই শস্যের ফলনবৃদ্ধির কামনায় মেয়েদের সন্তান উৎপাদনের বিষয়টার ওপর জোর দেয়া হয় নতুন পাথরের যুগে সমাজের উৎসব অনুষ্ঠানে।

বৃষ্টির সাথে ফসলের ফলনের যে সম্পর্ক আছে এ কথা হয়তো মানুষ শিকারী যুগ থেকেই জানত। কিন্তু নতুন পাথরের যুগে সম যমতো বৃষ্টি হওয়াটা মানব সমাজের অস্তিত্বের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠল। শিকারী যুগে যাদুকর-ওঝাদের মূল কাজ ছিল টোটেম অনুষ্ঠান পরিচালনা করে পশুসম্পদ বৃদ্ধি করা। কিন্তু নতুন পাথরের কৃষি যুগে এ যাদুকর-ওঝাদের একটা মূল কাজ হয়ে দাঁড়াল বৃষ্টি নামানোর অনুষ্ঠান করা। নতুন পাথরের যুগের সমাজেও শিকারী যুগের মতোই মানুষেরা গোল হয়ে ঘুরে নাচত, গান গাইত। তবে, এখন আর পশুসম্পদ বৃদ্ধির কামনায় নয়। এখন তারা নেচে গেয়ে বলত, বৃষ্টি হোক, ফসল ফলুক, ফুল ফুটুক ইত্যাদি।

নতুন পাথরের যুগে শস্য রোপনের অনুষ্ঠান, নবান্নের অনুষ্ঠান, বসন্তের উৎসব ইত্যাদি নিয়মিত অনুষ্ঠানের রেওয়াজ হয়। ফসলই নতুন পাথরের যুগে গ্রামের প্রাণস্বরূপ ছিল বলে এ সব সমাজে ফসল-রানী ও ফসল-রাজা ইত্যাদি নির্বাচিত করার রেওয়াজ হয় এবং তাদের বিশেষ ক্ষমতা ও অধিকার দেয়া হয়। তা ছাড়া যাদুকর ও ওঝাদেরও সমাজে প্রাধান্য ছিল। নতুন শস্য পেতে হলে মাটিতে বীজ বপন

www.icsbook.info

করতে হয় অর্থাৎ বীজকে হত্যা করতে হয়। এ ধারণা থেকেই সম্ভবত প্রথম বলিদানের প্রথার উৎপত্তি হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের কল্যাণের জন্য ফসল-রাজাকেই বা তার প্রতিনিধিকে আত্মদান করতে হত। এ ছাড়া পশুবলি এবং নরবলি অর্থাৎ মানুষ বলিরও প্রচলন ঘটে।

নতুন পাথরের যুগের অর্থনীতি শিকারী যুগের বন্য অর্থনীতির তুলনায় উন্নত হলেও তার কতগুলো অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ছিল। প্রথম অবস্থায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকলেও কিছুকালের মধ্যেই তা একটা সঙ্কট সৃষ্টি করে। নতুন পাথরের যুগে গ্রামগুলো ছিল স্বনির্ভর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এসব গ্রামে জনসংখ্যা খুব বেশি বেড়ে গেলে কিছু মানুষ নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন গ্রাম স্থাপন করত। এভাবে ছড়াতে ছড়াতে নতুন পাথরের যুগের গ্রাম-সংস্কৃতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। তখন দেখা দিল সঙ্কট। সঙ্কট অবশ্য ত্বরান্বিত হয়েছিল আরো একটা কারণে। নতুন পাথরের যুগের গ্রাম-সংস্কৃতি যখন চারদিকে ছড়াতে লাগল তখন তার সংস্পর্শে এসে আদিম শিকারী মানুষরাও কৃষিকাজ আয়ত্ত করে নতুন পাথরের যুগে সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। পৃথিবীর নানা স্থানের বন্য-সংস্কৃতির মানুষ এভাবে নবোপলীয় সংস্কৃতি আয়ত্ত করার ফলে খুব দ্রুত অর্থাৎ কয়েক হাজার বছরের মধ্যেই সারা পৃথিবী নতুন পাথরের যুগের গ্রামে পূর্ণ হয়ে গেল। এর পর নতুন গ্রাম স্থাপন করার মতো আর জায়গা যখন রইল না, তখন সঙ্কট দেখা দিল। নতুন পাথরের যুগের কৃষি অর্থনীতি শিকার অর্থনীতির চেয়ে উন্নত হলেও, আদিম পদ্ধতির কৃষিতে উৎপাদন ছিল আজকের তুলনায় অনেক কম। নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির ওপর নির্ভর করে যত মানুষ বাঁচতে পারত তার পরিমাণটা ছিল খুব সীমিত। তার ফলে মোটামুটি সারা পৃথিবীতে নতুন পাথরের যুগের গ্রাম-সংস্কৃতির বিস্তার লাভের পর জন সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটলে জমির জন্যে প্রতিযোগিতা বাড়তে লাগল। এর ফলে ক্রমশ বিভিন্ন বর্বর জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ-লড়াইয়ের সূত্রপাত হল। প্রথম অবস্থায় নতুন পাথরের যুগে সংস্কৃতির মানুষ ছিল শান্তিপ্রিয়। তাদের হাতিয়ারের তালিকায় অস্ত্রের কোনো স্থানই ছিল না। অথচ ইউরোপে নতুন পাথরের যুগের শেষ দিকে বর্বরসমাজে যুদ্ধের কুঠার, ফ্লিন্ট পাথরের ছোরা প্রভৃতির প্রচলন দেখা দেয়। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ রকম হানাহানি নতুন পাথরের যুগে অর্থনীতির সীমাবদ্ধতারই লক্ষণ। এতে প্রমাণ হয় যে, নতুন পাথরের যুগে অর্থনীতি নিজেই যে বিপুল পরিমাণ মানুষের উদয় ঘটিয়েছিল, তাকে পরিপোষণ করার ক্ষমতা তার ছিল না। কারণ যুদ্ধের ফলে একদল মানুষের জমি, ফসল ও সম্পদ অন্য একদল মানুষ হয়তো দখল করতে পারে, কিন্তু তাতে মানব সমাজের আয়ত্তাধীন মোট সম্পদের পরিমাণ বাড়ে না। মারামারি-হানাহানিতে বরং জনসংখ্যা এবং সম্পদের হানি ঘটে।

নতুন পাথরের যুগের অর্থনীতির আরেকটি ত্রুটি ছিল। এ ব্যবস্থায় খাদ্য উৎপাদন শিকারী যুগের তুলনায় অনেক উন্নত হলেও, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সামনে নতুন পাথরের যুগের অর্থনীতি ছিল নিতান্তই অসহায়। অবশ্য নতুন পাথরের যুগে গ্রামসমূহে সব সময়েই শস্য ভাণ্ডারে পর্যাপ্ত পরিমাণ শস্য জমিয়ে রাখা হত। এ সঞ্চিত খাদ্য গ্রামের মানুষ দু'-এক বছর খেয়ে বাঁচতেও পারত। কিন্তু অনাবৃষ্টি, বন্যা, ঝড়, শিলাবৃষ্টি বা তুষারপাতে পরপর কয়েক বছর শস্যহানি ঘটলে তার বিরুদ্ধে কোনো

www.icsbook.info

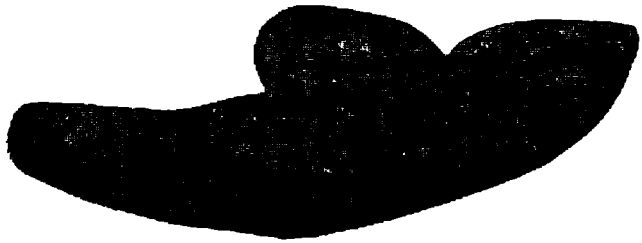

মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত যাঁতা, অনেকটা আমাদের দেশের মশলা বাটার শিল নোড়ার মত।

প্রতিকারের ব্যবস্থা নতুন পাথরের যুগের অর্থনীতিতে ছিল না। গ্রামগুলো বিচ্ছিন্ন এবং স্বনির্ভর থাকায় এক গ্রামের বিপদে আরেক গ্রাম বিশেষ সাহায্যও করতে পারত না। পরপর কয়েক বছর শস্যহানি ঘটলে নতুন পাথরের যুগে তাই গ্রামের পর গ্রাম মড়ক লেগে উজাড় হয়ে যেত।

সারা পৃথিবীতে নতুন পাথরের যুগে অর্থনীতির বিস্তার ঘটার পর তাই দেখা গেল যে, নতুন পাথরের যুগের অর্থনীতির গণ্ডির মধ্যে থেকে আর সঙ্কট এড়ানো সম্ভব নয়। এ গণ্ডি থেকে বের হয়ে যদি নতুন ও উচ্চতর অর্থনীতি মানুষ সৃষ্টি করতে না পারত তবে আজকের পৃথিবীও ছয় সাত হাজার বছর আগের মতো জনবিরল অবস্থায় থাকত। এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির মাত্রাও তার বেশি অগ্রসর হতে পারত না।

কিন্তু নতুন পাথরের যুগে অর্থনীতির গণ্ডি অতিক্রম করার পক্ষে ঐ অর্থনীতিই আবার বাধাও সৃষ্টি করেছে। নতুন পাথরের যুগের অর্থনীতি ছিল স্বনির্ভর একথা আমরা আগে অনেকবার উল্লেখ করেছি। নতুন পাথরের যুগে গ্রামের মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছুই নিজেরা তৈরি করতে পারত। ফলে নতুন পাথরের যুগে মানুষদের মধ্যে বৈষয়িক উন্নতি সাধনের কোনো প্রেরণা ছিল না। খাওয়া-পরা, ঘরবাড়ি ইত্যাদি জীবনের মোট প্রয়োজনগুলো মেটানোর পন্থা তারা আবিষ্কার করেছিল। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর অর্থনীতিতে তাদের কোনো অভাব ছিল না। অভাব বা অপূর্ণতা বোধ না থাকায় তাদের জীবনে কোনো সমস্যা ছিল না। তাই সমস্যার সমাধানের কথাও তাদের চিন্তায় কখনো আসেনি। প্রথম প্রথম যখন গ্রামের লোকসংখ্যা বেড়ে যেত, তারা নতুন গ্রাম স্থাপন করে সে সমস্যার সমাধান করেছে। এ সমাধান ছিল নতুন পাথরের যুগের অর্থনীতির গণ্ডির মধ্যেই। কিন্তু সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার পর যখন সঙ্কট তীব্র আকারে দেখা দিল তখনো মানুষ নতুন পাথরের যুগে গ্রামের গণ্ডির ভেতর বাস করার ফলে নতুন সমাধানের কথা ভাবতে উদ্বুদ্ধ হয়নি। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ একই ধরনের গ্রামে,একই রকম উৎপাদন ব্যবস্থায় নিযুক্ত থেকেছে, একই রকম প্রথাগত চিন্তায় লিপ্ত থেকেছে, একই রকম আচারণ-অনুষ্ঠান ব্রত পালন করেছে। কিন্তু স্বনির্ভর নতুন পাথরের যুগের গ্রামের অর্থনীতির গণ্ডি ছেড়ে বের হতে পারেনি।

অবশেষে আজ থেকে ছয় সাত হাজার বছর আগে পশ্চিম এশিয়ার ও উত্তর আফ্রিকার কোনো কোনো স্থানে মানুষ অনুকূল পরিবেশে এবং নানাবিধ সামাজিক ও প্রাকৃতিক কারণের সন্নিপাতে নতুন পাথরের যুগের গ্রামীণ অর্থনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। এ বিষয়ে আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব।

www.icsbook.info

সভ্যতার প্রস্তুতিপর্ব

নতুন পাথরের যুগের শেষ দিকে মানুষ কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সাধন করে, যার ফলে গ্রামসমাজ থেকে নগরকেন্দ্রিক সমাজে উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল। ৬০০০ থেকে ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে মানুষ পশুতে টানা লাঙল, চাকাওয়ালা গাড়ি, পালওয়ালা নৌকা, কুমারের চাক, প্রাথমিক ধাতুশিল্প অর্থাৎ তামার আকর থেকে তামা নিষ্কাশন, প্রাথমিক ধরনের সৌর পঞ্জিকা প্রভৃতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। বিশেষত খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে অর্থাৎ ৪০০০ থেকে ৩০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের মধ্য এ সকল আবিষ্কারের অনেকগুলোই খুব দ্রুত একের পর এক ঘটতে থাকে। আরো উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিম এশিয়াতেই এ সকল আবিষ্কার ঘটেছিল। এ সকল আবিষ্কারের ভিত্তিতেই মানুষ মিশর ও ব্যাবিলনে প্রথম নগর সভ্যতা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। আবার নগর সভ্যতা প্রতিষ্ঠার পর নাগরিক জীবনের প্রয়োজনে মানুষ লেখা, সংখ্যা গণনা ও হিসাবের পদ্ধতি, ওজন ও পরিমাপের পদ্ধতি প্রভৃতিও আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল। নতুন পাথরের যুগ থেকে নগর সভ্যতার যুগে উত্তরণের সন্ধিক্ষণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যতগুলো যুগান্তকারী আবিষ্কার ঘটে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের যত প্রসার ঘটে, আধুনিক কালের আগে জ্ঞানের এত দ্রুত বিকাশ মানুষের ইতিহাসে আর ঘটেনি। অবশ্য ঐ সময়েই আকস্মাৎ কেন পশ্চিম এশিয়ায় অতি দ্রুত এ সকল আবিষ্কার ও কারিগরি জ্ঞানের বিকাশ হয়েছিল, তার বিশেষ ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণ রয়েছে।

৪০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের মধ্যে ভূমধ্য সাগরের পূর্ব অংশের তীরভূমি থেকে শুরু করে ভারতীয় উপমহাদেশ পর্যন্ত সর্বত্র নতুন পাথরের যুগের সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল। নতুন পাথরের যুগে কৃষিজীবী মানুষ ছাড়াও এ সকল অঞ্চলে অবশ্য শিকারী, ম ৎস্যজীবী, পশুপালক দল ইত্যাদি ছিল। নতুন পাথরের যুগের সংস্কৃতি অবশ্য এ পরিসীমার বাইরেও সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অনুকূল সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে পশ্চিম এশিয়াতেই নবোপলীয় সংস্কৃতির আবিষ্কার ঘটেছিল বলে এ অঞ্চলের প্রাণবন্ত সমাজের পক্ষে স্বভাবতই নতুন নতুন জান ও আবিষ্কারকে আত্মস্থ করা সহজ এবং সম্ভবপর ছিল। মিশর-প্যালেস্টাইন-লেবানন থেকে শুরু করে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা মানুষরা বিভিন্ন পরিবেশে যে সকল জ্ঞান ও কারিগরি কৌশল আয়ত্ত করে, তা ক্রমশ সব মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এভাবে ভৌগোলিক, ভূতাত্ত্বিক, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, কৃষি, ধাতুবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত জ্ঞান ও কৌশল ক্রমশ এক এক স্থানে সঞ্চিত হতে শুরু করে। কিন্তু ওপরে যেসব কারিগরি আবিষ্কারের কথা বলা

www.icsbook.info

হয়েছে, সব অঞ্চলের নতুন পাথরের যুগের গ্রাম সমাজের পক্ষে সেগুলোকে কাজে লাগানো সম্ভব ছিল না। যেমন, ধাতুর কাজের জন্য বিশেষজ্ঞ কারিগর দরকার। যে কর্মকার আকর থেকে তামার যন্ত্র তৈরি করবে, তাকে কাজ শেখার জন্য এবং তারপর কাজ করার জন্যে সর্বক্ষণ ঐ কাজেই নিয়োজিত থাকতে হবে। এ ধরনের বিশেষজ্ঞের খাদ্য উৎপাদন করে সমাজের অবশিষ্ট মানুষরা। অর্থাৎ যেসব সমাজ উদ্বৃত্ত বা বাড়তি খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারত, সেসব সমাজই কেবল কারিগর শ্রেণীর পরিপোষণ করতে পারত। সিরিয়ার তৃণভূমি বা ইরানের মালভূমি প্রভৃতি অঞ্চলে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ খুব বেশি না থাকায় এসব অঞ্চলের মানুষের পক্ষে বেশি পরিমাণ উদ্বৃত্ত শস্য উৎপাদন সম্ভব ছিল না। তাই এ সকল অঞ্চলের সমাজের পক্ষে বেশিসংখ্যক কারিগর পরিপোষণ করা সম্ভব ছিল না। অথচ ওপরে যেসব আবিষ্কারের কথা বলা হল, সেগুলোর মধ্যে এমন প্রচণ্ড ক্ষমতা লুকিয়ে ছিল যে তাদের সাহায্যে এক অতি সমৃদ্ধিশালী নগরসভ্যতা গড়ে তোলা চলত। কিন্তু এ সকল কারিগরি আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে নতুন সভ্যতা শুরু করার মতো প্রারম্ভিক যোগ্যতা ছিল পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি নদীতীরবর্তী অঞ্চলের। এ সকল পলিভূমিতেই কেবল প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত শস্য উৎপাদন সম্ভবপর হয়েছিল, যার সাহায্যে বিপুলসংখ্যক কারিগরশ্রেণীর পরিপোষণ সম্ভব হয়েছিল। অপরপক্ষে উল্লিখিত কারিগরি আবিষ্কারের ফলেই এ সকল নদীতীরবর্তী জলাভূমিতে চাষাবাদ সম্ভব হয়েছিল। কিভাবে নতুন কারিগরি আবিষ্কারের ভিত্তিতে নীল নদের তীরে মিশরে এবং টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্তী সুমের ব্যাবিলনিয়ায় নতুন নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা নির্মিত হয়েছিল, তা আমরা একটু পরেই বিশদভাবে আলোচনা করছি, তাই এখানে এ সম্পর্কে আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

তাম্রযুগ

নতুন পাথরের যুগ থেকে 'ব্রোঞ্জ যুগ' অর্থাৎ নগরসভ্যতার যুগে উত্তরণের মধ্যবর্তী কালকে তাম্রযুগ বা 'তাম্রোপলীয়' যুগ (তাম্র প্রস্তর যুগ) ধরা হয়। এ সময়ে মানুষ প্রথম বারের মতো পাথরের বদলে তামার হাতিয়ার ব্যবহার করতে শেখে। এটা ছিল এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। নতুন পাথরের যুগের শেষ দিকেই মানুষ আবিষ্কার করে যে, তামার আকরকে কাঠকয়লা পুড়িয়ে উত্তপ্ত করলে তা থেকে তামা পাওয়া যায়। মানুষ অবশ্য তখনও খনি থেকে আকর সংগ্রহ করতে শেখেনি। তামার সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেন যুক্ত হলে এক রকম পাথর তৈরি হয়। এ রকম তামার আকর বা পাথুরে পদার্থ পাহাড় অঞ্চলের কাছাকাছি মাটির উপরেই পাওয়া যায়। এ আকরকে উত্তপ্ত করলে তার থেকে অক্সিজেনটুকু দূর হয়ে যায় এবং খাঁটি তামাটুকু পড়ে থাকে। এ ছাড়া ম্যালাকাইট থেকেও তামা নিষ্কাশন করতে শিখেছিল মানুষ। ম্যালাকাইট হচ্ছে তামা, কার্বন ও অক্সিজেনের সংমিশ্রণে গঠিত সবুজ রং-এর একটা খনিজ পদার্থ বা আকর। মিশরের এবং অন্যান্য স্থানের মানুষরা প্রাচীনকালে চোখে সুরমা দেবার জন্য এটা ব্যবহার করত।

প্রথম প্রথম ধাতুশিল্পী বা কর্মকার তামার পিণ্ডকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে বিভিন্ন আকারের হাতিয়ার বা যন্ত্র তৈরি করত। ৩০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের আগেই মানুষ তামা ঢালাই করে হাতিয়ার তৈরির কৌশল আবিষ্কার করে। এ পদ্ধতিতে, পাথর খোদাই

www.icsbook.info

করে বা মাটি দিয়ে প্রথমে একটা ছাঁচ তৈরি করে তাতে গলন্ত তামা ঢেলে দেয়া হত। পরে তা' জমাট বাঁধলে ছাঁচ থেকে তাকে আলাদা করে ঘষে-মেজে হাতিয়ার তৈরি করা হত। ৩০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের দিকে মেসোপটেমিয়াতে 'সিরে পারডু' বা 'মোম গলানো' পদ্ধতির প্রচলন ঘটে। এটা এক চমকপ্রদ কৌশল। যে রকম আকৃতির হাতিয়ার দরকার প্রথমে সে আকৃতির একটা মোমের আদল তৈরি করা হয়। তারপর মোমের আদরাটিকে চারদিকে কাদামাটি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়, কেবল দু'দিকে দুটো ফুটো থাকে। এরপর পুরো জিনিসটিকে আগুনে পোড়ালে মোম গলে বের হয়ে যায় এবং কাদামাটির প্রলেপটি আগুনে পোড়ার ফলে সেটা একটা শূন্যগর্ভ ছাঁচে পরিণত হয়। এখন একটা ফুটো বন্ধ করে অন্য ফুটো দিয়ে গলন্ত তামা বা অন্য ধাতু ঢেলে দিলে সেটা ভেতরে শূন্যস্থানের আকার পায়। তামা শক্ত হয়ে গেলে মাটির ছাঁচটি ভেঙে ফেলা হয় এবং ভেতর থেকে তখন যে শক্ত ধাতব পদার্থটি বের হয়ে আসে সেটার আকৃতি ঠিক মোমের আদরার আকৃতির অনুরূপ।

তামা বা ধাতু আবিষ্কারের ফলে মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেল। তামার হাতিয়ার পাথরের মতো ভঙ্গুর নয়। ভেঙ্গে গেলেও তাকে গলিয়ে আবার নতুন করে হাতিয়ার বানানো চলে, কিন্তু পাথরের হাতিয়ার ভেঙ্গে গেলে তা চিরকালের মতো নষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়া ছাঁচে ঢেলে তামার হাতিয়ার অল্প সময়ে অনেক বেশি সংখ্যায় তৈরি করা চলত। সবচেয়ে বড় কথা, তামা দিয়ে যে কোনো আকারের হাতিয়ার তৈরি করা চলত, কিন্তু পাথর দিয়ে তা সম্ভব হত না। বিশেষত, গাছ কাটা বা কাঠ চেরাই করা ইত্যাদি কাজ পাথরের হাতিয়ার দিয়ে করা সম্ভবই ছিল না, কিন্তু তামার হাতিয়ার দিয়ে সে কাজ হতে পারত। অবশ্য ব্রোঞ্জ ও লোহা আবিষ্কারের আগে তামা দিয়ে যে গাছ ও কাঠ কাটার কাজ খুব ভালভাবে করা যেত তা নয়।

ধাতুর আবিষ্কারের সাথে সাথেই যে পাথরের হাতিয়ারের ব্যবহার মানুষ বর্জন করেছিল এমন নয়। দীর্ঘকাল পর্যন্ত ধাতব হাতিয়ারের পাশাপাশি পাথরের হাতিয়ারের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। তা ছাড়া দুর্মূল্য তামার হাতিয়ার সকলের আয়ত্তের মধ্যেও ছিল না। এ কারণে মানব ইতিহাসের এ পর্যায়কে 'তাম্রযুগের' বদলে 'তাম্রোপলীয়' (বা তাম্র-প্রস্তর) যুগও বলা হয়। অবশ্য তামার হাতিয়ারই এ যুগের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। নতুন পাথরের যুগে ও তাম্রোপলীয় যুগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, যথা॥ লাঙল, চাকাওয়ালা গাড়ি, পালওয়ালা নৌকা, কুমারের চাক, লাঙল ও গাড়িতে পশুশক্তির ব্যবহার ইত্যাদির ভিত্তিতে এ যুগে যে সকল উৎপাদন মূলক কাজ হয়েছিল তাই পরবর্তীকালে ব্রোঞ্জযুগের নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার ভিত্তি নির্মাণ করেছিল। তাম্রোপলীয় যুগকে তাই বলা চলে নগর সভ্যতার প্রস্তুতির যুগ।

ওপরে যে সব যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের অধিকাংশ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, এখন কেবল চাকাযুক্ত গাড়ি ও পালতোলা নৌকো সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হবে।

প্রাচীন পাথরের যুগে বা মধ্য পাথরের যুগে মানুষ স্লেজ গাড়ি আবিষ্কার করেছিল, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। বরফের দেশে কুকুর বা বলগা হরিণ এ গাড়ি টানত। তৃণভূমি বা অন্য শুষ্ক ও মরু অঞ্চলে ঘোড়া বা গরুতে টানা স্লেজেরও প্রচলন হয়েছিল। কালক্রমে, প্রায় ছয় হাজার বছর আগে মানুষ চাকাযুক্ত গাড়ি আবিষ্কার করে।

www.icsbook.info

নতুন পাথরের যুগে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে এ আবিষ্কার গভীর ভাবে সম্পর্কিত। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামবাসীদের মধ্যে নানা প্রকার প্রয়োজনীয় পণ্য ও জিনিসপত্রের বাণিজ্যিক আদান প্রদান হত এ কথা আগেই বলা হয়েছে। স্লেজগাড়িতে খুব ভারি জিনিস বহন করা সম্ভব নয়। প্রথম প্রথম হয়তো ভারি পাথর ইত্যাদি পরিবহণের জন্যে গাছের গুঁড়ি ব্যবহার করা হত। পুরাতাত্ত্বিকরা আবিষ্কার করেছেন যে, প্রাচীনতম মিশরীয়রা কাঠের গোল গুঁড়ির ওপর পাথর ইত্যাদি চাপিয়ে দিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেত। অবশ্য গুঁড়ি এক পাক ঘোরার আগেই পাথরের টুকরোর সামনের দিকে নিচে আরেকটা গুঁড়ি স্থাপন করতে হত যাতে পাথরের টুকরোটা উল্টিয়ে পড়ে না যায়। ক্রমশ হয়তো গুঁড়ির মাঝের অংশ খোঁড়ল করে তাতে পাথর ইত্যাদি ভারি মাল বসানোর চেষ্টা হয়। এর অনুকরণেই হয়তো ক্রমশ দুটো চাকার কেন্দ্রস্থলকে গোলাকার দণ্ড দিয়ে সংযুক্ত করা হত। প্রথম দিকের চাকাযুক্ত গাড়িতে এ দণ্ডটি চাকার সাথে সাথে ঘুরত। পরবর্তীকালে চাকা দুটোর কেন্দ্রস্থলে ফুটো করে যে দণ্ড প্রবেশ করানো হত সেটি ঘুরত না, কেবল চাকাগুলোই ঘুরত— আজকালকার গরুর গাড়ির মতো।

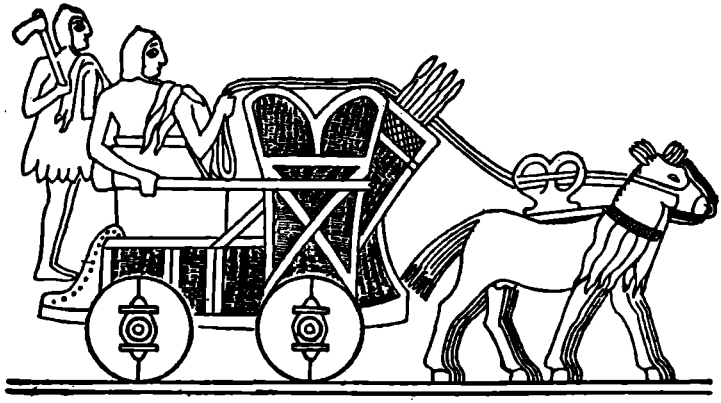

প্রাচীন সুমেরীয় যুদ্ধরথ

৩৫০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে মেসোপটেমিয়ার সুমেরে প্রচলিত যে চাকার সন্ধান পুরাতাত্ত্বিকরা পেয়েছেন, সেগুলো তিন খণ্ড কাঠ বা তক্তা জোড়া দিয়ে তৈরি হত। চাকার বাইরের দিকে তামার পেরেক ঠুকে ক্ষয়রোধ করা হত। তারপর চাকাটাকে তামার বেড়ি দিয়ে ঘেরার পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়। ক্রমশ ভরাট চাকার বদলে পাখিযুক্ত বা অরযুক্ত চাকার প্রচলন হয়। চাকার কেন্দ্র থেকে অরগুলো চাকার পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত হত। এ চাকাগুলো সর্বাংশে আজকালকার গরুর গাড়ির চাকার মতোই ছিল। প্রথম প্রথম যে গাড়ির প্রচলন হয় তা ছিল আসলে স্লেজ-এর নিচে চাকা বসানো গাড়ীবিশেষ। ক্রমশ উন্নত ধরনের চাকাযুক্ত গাড়ি ও রথ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়।

সুমেরে চাকাওয়ালা গাড়ি আবিষ্কৃত হবার কয়েকশ বছরের মধ্যেই এটা উত্তরে আসিরিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং ২৫০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যেই সিরিয়া, তুর্কিস্তান ও

www.icsbook.info

সিন্ধু অববাহিকায় এর প্রচলন ঘটে। আরো পাঁচশো বছরের মধ্যেই ক্রীটে ও এশিয়া মাইনরে চাকাওয়ালা গাড়ির প্রচলন ঘটে। মিশরে অবশ্য অনেক পরে, ১৬৫০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে চাকাওয়ালা গাড়ির প্রচলন শুরু হয়েছিল॥ এবং সেটা ঘটেছিল এশিয়ার বর্বর জাতি হিক্সস্‌দের আক্রমণের মাধ্যমে।

স্থলযানের সাথে সঙ্গতি রেখে জলযানেরও উন্নতি সাধিত হয়েছিল। মধ্য পাথরের যুগেই মানুষ ডোঙা প্রভৃতি আবিষ্কার করেছিল। নদীতীরে অথবা নদী অববাহিকায় নতুন পাথরের যুগের গ্রাম ও তাম্রোপলীয় সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করার পর পরিবহণের কাজে জলযান ব্যবহারের উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থার মিশরে নতুন পাথরের যুগ শুরু হবার অল্পকাল পরই ৪০-৫০ জন লোক পরিবহণের উপযুক্ত প্যাপিরাসের বা নলখাগড়ার তৈরি নৌকার প্রচলন ঘটে। ২৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে মিশরে পালওয়ালা নৌকার আবিষ্কার ঘটে।

ব্রোঞ্জযুগ

ধাতুশিল্প ও তামার ব্যবহার আয়ত্ত করার অল্পকাল পরেই মানুষ আবিষ্কার করে যে তামার সাথে টিন মেশালে একটা নতুন উন্নত ধরনের ধাতু উৎপন্ন হয়। তামার মতো টিনও একটা ধাতু। কিন্তু নির্দিষ্ট অনুপাতে তামা আর টিন গলিয়ে মেশালে একটা মিশ্র ধাতু বা সঙ্কর ধাতু উৎপন্ন হয়, তার নাম ব্রোঞ্জ। তামার চেয়ে ব্রোঞ্জ সহজে গলানো এবং ঢালাই করা চলে। অথচ এটা তামার চেয়ে শক্ত এবং ধারালো হয়ে থাকে।

ব্রোঞ্জের হাতিয়ার এবং নতুন পাথরের যুগের বিভিন গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সমূহকে অবলম্বন করে প্রথমে মিশর ও মেসোপটেমিয়াতে এবং তার কিছুকাল পরে সিন্ধু অববাহিকায় এবং চীন দেশের ইয়াংসি নদীর অববাহিকায় যে প্রাচীনতম নগর সভ্যতাসমূহ গড়ে ওঠে, তাদের নাম দেয়া হয়েছে ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতা। বোঞ্জযুগে ব্রোঞ্জের হাতিয়ারের সাহায্যে উৎপাদনের যথেষ্ট বিকাশ সাধন করা হয়েছিল। ধাতুশিল্প, খনিশিল্প, কাষ্ঠশিল্প,গৃহনির্মাণ ও স্থাপত্যশিল্প, পরিবহণশিল্প, রাস্তাঘাট, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির প্রসার ঘটেছিল এবং জ্ঞান বিজ্ঞানেরও বিকাশ ঘটেছিল। বস্তুত ব্রোঞ্জযুগে সমাজ এক সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মিশর, ব্যাবিলনিয়া, আসিরিয়া, সিন্ধু সভ্যতা, চীন সভ্যতা প্রভৃতির ইতিহাস বর্ণনার সময়ে আমরা ব্রোঞ্জযুগের এ সমাজ ও সভ্যতার পরিচয় প্রদান করব।

www.icsbook.info

www.icsbook.info

প্রাচীন মিশরের সভ্যতা

আজ থেকে সাত হাজার বছর আগে অর্থাৎ ৫০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে পৃথিবীর কোনো কোনো অংশে নতুন পাথরের যুগের গ্রাম-সংস্কৃতির বিলোপ ঘটে এবং তার স্থানে নগর কেন্দ্রিক সভ্যতার উদয় হয়। যতদূর জানা গেছে, মিশর এবং মেসোপটেমিয়াতে প্রায় একই সময়ে নগর সভ্যতার উদয় হয়েছিল। বর্তমানে যে অঞ্চলে ইরাক রাষ্ট্র অবস্থিত, তারই প্রাচীন নাম হচ্ছে মেসোপটেমিয়া।

এ দুই অঞ্চলের মধ্যে মেসোপটেমিয়াতেই সম্ভবত সভ্যতার উদয় প্রথম ঘটেছিল। কারণ মেসোপটেমিয়ার আদি সভ্যতার নানা প্রভাব মিশরের সভ্যতার ওপর দেখা যায়। অবশ্য এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, বিভিন্ন অঞ্চলে স্বতন্ত্রভাবে সভ্যতার উদয় হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু অনেক ইতিহাসবিদ আবার মনে করেন যে, সভ্যতার মৌলিক ও জটিল উপকরণসমূহ এক এক স্থানে আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত হয়েছে, সেখান থেকে অন্যান্য স্থানে বিস্তৃত হয়েছে। যেমন ধাতু ও ধাতুশিল্পের আবিষ্কার, লেখনপদ্ধতির আবিষ্কার, ইত্যাদি। লেখনপদ্ধতি যদিও প্রায় একই সময়ে মেসোপটেমিয়া, মিশরে প্রচলিত হয়েছিল, লেনার্ড উলি প্রমুখ পণ্ডিতদের অভিমত অনুসারে মেসোপটেমিয়াতেই এর উদ্ভাবন ঘটেছিল, পরে মিশরে তার প্রচলন ঘটে। এ সকল বিষয়ে আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করব। তবে মিশর মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকলেও ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতায় মিশরের নিজস্ব অবদানও যথেষ্ট রয়েছে। ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতায় মেসোটেমিয়ায় সভ্যতার পূর্বগামিতার দাবি থাকলেও ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতার কতগুলো বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণের সুবিধা হবে বলে আমরা মিশরের সভ্যতার বিবরণ প্রথমে প্রদান করেছি।

নতুন পাথরের যুগে পৃথিবীর সব অঞ্চলে নতুন পাথরের যুগের স্বনির্ভর গ্রামের বিস্তার ঘটলেও কোনো কোনো জায়গায় তা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। নীলনদ যেখানে ভূমধ্যসাগরে পড়েছে সেই ব-দ্বীপ অঞ্চলে আর দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী যেখানে পারস্য উপসাগরে পড়েছে সেখানে তখন ছিল জলাভূমি আর নলখাগড়া ইত্যাদির জঙ্গল। আবার এসব নদীতে জুন জুলাই আগস্ট মাসে বন্যা হত এবং তারপর ক্রমশ মাটি শুকিয়ে যেত। এ সকল নদীর অববাহিকায় কৃষিকাজ করতে হলে তাই প্রয়োজন ছিল বনজঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা, বাঁধ দিয়ে জলাভূমি থেকে জমি উদ্ধার করা, খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি। কিন্তু নতুন পাথরের যুগের স্বনির্ভর গ্রামের পক্ষে এসব কাজ করা সম্ভব ছিল না। দশ বিশ বা পঞ্চাশ একশটি গ্রামের লোক একসাথে মিলে কাজ করলে তবেই এ ধরনের ব্যাপক আকারের সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি সংগঠিত করা সম্ভব। আবার নতুন পাথরের যুগে সংস্কৃতি অনেকদূর অগ্রসর হবার আগে এজন্যে প্রয়োজনীয় সমাজ সংগঠন এবং কারিগরিবিদ্যা

www.icsbook.info

ও যন্ত্রপাতিরও সৃষ্টি হয়নি। কালক্রমে নীলনদ বা টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকার মানুষরা কয়েক গ্রামের মানুষ মিলে এক একটা অঞ্চলে বাঁধ দিয়ে জমি উদ্ধার করে বা খাল কেটে পানিসেচ দিয়ে দেখতে পেল যে, এর ফলে নতুন জায়গায়ও আবাদ করা যায়, আবার প্রতি বছর বন্যার ফলে জমির উর্বরতাও বাড়ে। এভাবে নতুন পাথরের যুগের গ্রাম থেকে পৃথক আরেক ধরনের সমাজের সূত্রপাত হল। এ সমাজে গ্রাম আর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল একক থাকল না। নতুন ব্যবস্থায় অনেক গ্রামের মানুষ মিলে নতুন একটি অর্থনীতি গড়ে তুলল। এ অর্থনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে নগর।

প্রাচীন মিশরের প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন ছিল, তার ফলেই সেখানে নগর সভ্যতার প্রথম উৎপত্তি সম্ভব হয়েছিল। মোহনার কাছাকাছি নীল অববাহিকায় ছিল প্যাপিরাস জাতীয় নলখাগড়ার জঙ্গল এবং খেজুর, ডুমুর ইত্যাদি নানা গাছ। এসব গাছ থেকে আবার ঘরবাড়ি তৈরির নানা সরঞ্জাম পাওয়া যেত। নীলনদের পূর্ব পাশে ছিল নুবিয়া মরুভূমি আর পশ্চিম পাশে ছিল লিবিয়ার মরুভূমি। কিন্তু প্রতি বছর বন্যা হবার ফলে নীল অববাহিকা ছিল রীতিমতো উর্বর পলিভূমি। এখানে তাই সহজে কৃষিকাজ করা চলতে পারত। আশেপাশের পার্বত্য অঞ্চলে গ্রানাইট, চুনাপাথর ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে ছিল আর নুবিয়ার পাহাড়ে ছিল প্রচুর সোনা। এক কথায়, নীল অববাহিকা ছিল উর্বর এবং প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ।

নীল অববাহিকায় মানুষ অনেক প্রাচীন কাল থেকেই বসতি স্থাপন করে। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত এখানে কৃষিকাজ বিশেষ অগ্রসর হতে পারেনি। বাঁধ দিয়ে জলাভূমি থেকে জমি উদ্ধার না করলে এবং খাল কেটে সেচের ব্যবস্থা না করলে এখানে লাভজনক ভাবে চাষাবাদ করা সম্ভব ছিল না। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো পরিবার বা কোনো গ্রামের লোকের পক্ষে এত বড় কাজ করা সম্ভব ছিল না। আবার অল্প পরিমাণ জমির জন্যে এত ব্যাপক ব্যবস্থা করাও লাভজনক নয়। নীল অববাহিকায় তাই ক্রমশ অনেকগুলো ক্ল্যান বা গ্রামের মানুষ দলবদ্ধ হয়ে এক একটা এলাকায় বাঁধ দিয়ে খাল কেটে জলসেচ করে জমিচাষের ব্যবস্থা করে। এসব সংগঠনকে বলা হত 'নোম'। আসলে অনেকগুলো নতুন পাথরের যুগের গ্রামকে নিয়ে এক একটি নোম গড়ে উঠেছিল। তবে নোমকে একটা বড় গ্রাম বলা চলে না। নোমকে বলা চলে একটা নগররাষ্ট্র। কারণ, এদের অর্থনৈতিক সংগঠন ছিল গ্রাম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। নতুন পাথরের যুগের গ্রামে যেমন সব পরিবার খাদ্য উৎপাদন এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সব কাজ করত, নগররাষ্ট্রে তা হত না। নীল অববাহিকায় বাঁধ নির্মাণ, সেচ ইত্যাদি পরিচালনার জন্যে কারিগর, শ্রমিক, পরিচালক ইত্যাদি অনেক ধরনের মানুষ দরকার হত। এরা খাদ্য উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতে পারত না অর্থাৎ চাষাবাদে সময় দিতে পারত না। কিন্তু এদের কাজের ফলে বেশি বেশি ফসল ফলানো সম্ভব হত। নগরের মানুষের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা খাদ্য উৎপাদন করে না, কিন্তু এমন সব বিশেষ ধরনের কাজ করে, যা সমাজের পক্ষে এবং খাদ্য উৎপাদনের পক্ষে জরুরি। নতুন পাথরের যুগের প্রথম পর্যায়ে সমাজের সবাই মিলে যে শস্য উৎপাদন করত সবাই মিলে তা খেয়ে কোনোক্রমে বেঁচে থাকত। ক্রমে লাঙ্গল ইত্যাদির প্রচলন হবার পর অল্প লোক মিলেই অনেক খাদ্য উৎপাদন করত। তাই, নগরবাসী কারিগররা কৃষকদের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত শস্য খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে॥ এ সুযোগ সৃষ্টি হবার পরই কেবল নগরকেন্দ্রিক

www.icsbook.info

অর্থনীতির জন্ম হতে পেরেছিল। তা ছাড়া, তামা ও লোহার হাতিয়ার, মাল পরিবহণের জন্য গাড়ি ও নৌকোর আবিষ্কার ইত্যাদি ছাড়াও নগর সভ্যতার জন্ম হতে পারত না। এক একটি নোম বা নগররাষ্ট্র প্রথমে সম্ভবত ঃ গড়ে উঠেছিল কয়েকটি করে গ্রাম নিয়ে। মাঝামাঝি অবস্থানের একটা গ্রামে, যেটাতে যাদুকর-ওঝার বাস বা যেখানে টোটেম দেবতা থাকেন, সেখানেই হয়তো সব গ্রামের উদ্বৃত্ত ফসল ইত্যাদি জড়ো করা হত। সেখান থেকেই হয়তো পরিচালক মানুষরা সব কাজের পরিকল্পনা নিত, কাজ সংগঠিত করত। কাজ অর্থ অবশ্য খাল কাটা, বাঁধ দেয়া ইত্যাদি। প্রথম প্রথম যারা সর্দার ছিল তারাই ক্রমশ নোম-এর শাসক হয়ে দাঁড়ায়।

শাসক ও শাসকশ্রেণীর প্রবর্তন নগর সভ্যতার এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শিকারী যুগে এবং নতুন পাথরের কৃষি যুগে সব মানুষের মধ্যে একটা সমতা ছিল। কিন্তু নগর সভ্যতার যুগের কিছু মানুষ সমাজ সংগঠন পরিচালনার এবং বিভিন্ন নির্মাণকাজ পরিচালনার দায়িত্ব পায়। আদিম সমাজে যারা যাদুকর, ওঝা, সর্দার প্রভৃতি ছিল তাদেরই বংশধররা সম্ভবত ক্রমশ সমাজ পরিচালনায় বিশেষজ্ঞ পুরোহিত হয়ে ওঠে। প্রাচীন পুরোহিতরাই ধর্ম-কর্ম পরিচালনা করত, অর্থনৈতিক পরিচালনার কাজও করত। সেকালে ধর্ম-আচরণ ছিল অন্য সব কাজের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এ পুরোহিতশ্রেণী ও শাসকরা মিলে নগর সভ্যতার শুরুর যুগে মানুষের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এক অভিজাতশ্রেণীর সৃষ্টি করে। প্রথম অবস্থায় অবশ্য এদের দায়িত্ব ছিল সমাজের উদ্বৃত্ত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার ভাগ বন্টনের ব্যবস্থা করা; ক্রমশ নগরের পরিচালকেরা এসব উদ্বৃত্ত সম্পদের মালিক হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে সমাজে ধনবৈষম্য দেখা দেয়। নগরগুলো তখন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পুরোহিত ও শাসকরা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিভিন্ন নির্মাণ কাজ ও অর্থনৈতিক কাজ করার জন্যে কৃষকদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত সম্পদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। এজন্য সিপাই-সান্ত্রী প্রভৃতিরও সৃষ্টি হয়। সমাজে ধনবৈষম্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অভিজাতশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যে পাহারাদারেরও সৃষ্টি হয়। এ পাহারাদাররাই সিপাই-সান্ত্রী। তবে ধনী ও অভিজাতশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছিল একথা ভাবা ঠিক নয়। আমরা এর আগে সমাজের ভাবাদর্শের কথা আলোচনা করেছি। নতুন পাথরের যুগ পর্যন্ত সব মানুষের মধ্যে সততা বজায় ছিল এবং সাম্যের চিন্তাও ছিল। তাহলে নগররাষ্ট্রের উৎপত্তির সাথে সাথে সে সব সৎ মানুষদের মধ্যে ধনলোভ এবং শোষণ ও কর্তৃত্বের চিন্তা এল কোথা থেকে? নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, আমাদের সমাজে সৎমানুষও আছে, চোর ডাকাতও আছে। কিন্তু সত্যিকারের সৎ মানুষরা সুযোগ পেলেও চুরি করে না, নরহত্যা করে না, কারণ তার চিন্তার মধ্যেই সে প্রবণতা নেই। তাহলে আদিম সমাজের নির্লোভ ও সাম্যবাদী মানুষদের মধ্যে ধনলোভ, শ্রেণী ভাগের চিন্তা ইত্যাদি এল কেমন করে?

আসলে নগরসভ্যতার উৎপত্তির যুগে বাস্তব অবস্থাটাই ছিল সমাজে শ্রেণীভেদের উৎপত্তির অনুকূল। নতুন পাথরের যুগের শেষ দিকে কৃষির এত উন্নতি হয়েছিল যে তার উদ্বৃত্ত শস্যের ওপর নির্ভর করে কিছু সংখ্যক কারিগর, শ্রমিক, পুরোহিতের পক্ষে অন্য ধরনের কাজ করা চলতে পারত। যেমন, কারিগর তামা বা ব্রোঞ্জের যন্ত্র ও হাতিয়ার তৈরি করত, নৌকো ও গরুর গাড়ি বানাত, শ্রমিকরা খাল কাটত, বাঁধ দিত, পুরোহিতরা কাজের পরিকল্পনা করত. পঞ্জিকা তৈরি করে হিসাব করত বছরের

www.icsbook.info

কোনো সময় বন্যা হবে, কখন শস্য বপন করতে হবে, কতখানি শস্য ভাণ্ডারে জমা রাখতে হবে, ইত্যাদি। পুরোহিত, কারিগররা খাদ্য উৎপাদন করত না; কিন্তু নগর সমাজের পক্ষে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারিগররা যে ব্রোঞ্জের যন্ত্র তৈরি করত তা দিয়ে কৃষিকাজের জন্যে প্রয়োজনীয় উন্নত ধরনের কাঠের ও পাথরের হাতিয়ার বানানো সম্ভব হত, খাল কাটা যেত, দালান বানানো যেত। আবার নতুন পাথরের যুগে কৃষির উৎপাদন এত বেশি ছিল না যে তা দিয়ে সমস্ত মানুষকে ধনী বানানো চলে, অর্থাৎ বসিয়ে খাওয়ানো চলে। কিন্তু অল্প সংখ্যক মানুষকে খাদ্য উৎপাদন থেকে মুক্তি না দিলে আবার উচ্চতর নগরসমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হত না। আর নগর অর্থনীতিতে কৃষির ফলন ছিল নতুন পাথরের যুগের চেয়ে অনেক বেশি, কারণ এতে সেচ ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। কথাটাকে গুছিয়ে অন্যভাবে বলা যায়। নতুন পাথরের যুগের শেষ পর্যায়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় সব কৃষকের হাতেই খানিকটা করে উদ্বৃত্ত সম্পদ অর্থাৎ শস্য জমা হতে শুরু করে। এ উদ্বৃত্ত সম্পদগুলোকে একত্রিত করতে পারলে তার সাহায্যে ব্রোঞ্জের হাতিয়ার তৈরি করা যেত, কারিগর, প্রকৌশলী, পুরোহিতদের পরিপোষণ করা যেত। কিন্তু এসব ছিল খুবই ব্যয়বহুল। ব্রোঞ্জ ছিল খুবই দুর্মূল্য। আর পুরোহিত প্রভৃতিকে অন্য কাজ থেকে মুক্তি না দিলে গণিত ও হিসাবের চর্চা করা সম্ভব ছিল না। পুরোহিতরাই ছিল সেই যুগের বৈজ্ঞানিক। তারা নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে দিনক্ষণের হিসাব রাখত, পঞ্জিকা প্রণয়ন করত। পঞ্জিকা ছাড়া কৃষিকাজ অচল। বছরের কোন সময় শস্য বুনতে হবে, কোন সময় বৃষ্টি হবে বা নীলনদের বন্যার পানি পাওয়া যাবে, তা পঞ্জিকার হিসাবে বের করতে হত। তাই নগরস ভ্যতার যুগে সমাজের একটা ছোট অংশকে খাদ্য উৎপাদনের কাজ থেকে মুক্তি দিয়ে পুরোহিত-কারিগর-প্রকৌশলী ইত্যাদির কাজ করার সুযোগ দিতে হয়। এ ছোট অংশটার কাজ ছিল উৎপাদন সংগঠিত করা, বিভিন্ন নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা করা এবং কৃষকদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত সম্পদ সংগ্রহ করে নিয়ে আসা। প্রথম প্রথম এই পুরোহিত, শাসক প্রভৃতির কাজ ছিল সত্যি সত্যি সংগঠনমূলক। তারা সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজ করত। তখনকার বাস্তব অবস্থাটাই ছিল এমন যে সমাজ দু'ভাগে ভাগ হয়ে তবেই কেবল সমগ্র সমাজের উন্নতি ঘটাতে পারত। এক ভাগ ছিল ব্যাপক কৃষকসমাজ, অন্যভাগে সংখ্যালঘু পুরোহিত শাসকসমাজ। সমাজের এ বাস্তব ভাগে অনুযায়ী সমাজে তার অনুরূপ চিন্তারও উদয় হয়। পুরোহিত ও শাসকরা সকলকে বোঝায় এবং সকলেই এ বিষয়ে একমত হয়ে যে, সমাজের মঙ্গলের জন্য সাধারণ ভাণ্ডারে উদ্বৃত্ত শস্য ও সম্পদ জমা দেয়া দরকার। এ সাধারণ ভাণ্ডারের রক্ষাকর্তারাই কালক্রমে সমাজের মালিকশ্রেণীতে পরিণত হয়। পুরোহিতরা ক্রমশ এক সংগঠিত পুরোহিততন্ত্রের সৃষ্টি করে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নগরসভ্যতার যুগে নতুন ভাবাদর্শ সৃষ্টির কালে সে সমাজের মানুষ অর্থাৎ পুরোহিত প্রভৃতিরা তার আগেকার সমাজের ভাবাদর্শ থেকে সাহায্য নিয়েছিল। যেমন, আদিম সমাজের টোটেম বিশ্বাসের অনুকরণে তারা টোটেম পশুর আকৃতির দেবতার পূজা শুরু করে। ট্রাইবের প্রতি আনুগত্যের স্থলে প্রবর্তিত হয় রাষ্ট্র ও রাজার প্রতি আনুগত্য।

নগররাষ্ট্রের উদ্ভবের সাথে সাথে সমাজের আরেকটা নতুন বৈশিষ্ট্য পৃথিবীতে

www.icsbook.info

প্রথমবারের মতো উদিত হয়। সেটা হল দাসের উৎপত্তি। এ দাসদের দিয়ে সবচেয়ে কঠিন কঠিন কাজ করানো হত, কিন্তু বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক লাভ বা সুফল ভোগ করা তাদের কপালে ছিল না। কারণ দাসরা ছিল সর্বাংশে তাদের মনিবের সম্পত্তি। দাসরা পরিশ্রম করে যে সব শস্য বা সম্পদ উৎপন্ন করত— দাসদের মালিকরা তা আত্মসাৎ করত। তা ছাড়া রাষ্ট্রের অর্থাৎ পুরোহিতশ্রেণী বা রাজার কর্তৃত্বাধীনেও অনেক দাস থাকত। খনি বা খাত থেকে সোনা ও অন্যান্য ধাতু, পাথর প্রভৃতি সংগ্রহের কাজে এ দাসদের নিয়োগ করা হত। স্বাধীন মানুষদের তুলনায় দাসদের সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করা হত। দাসরা পরিশ্রম করত অমানুষিক মাত্রায় কিন্তু খাবার পেত কম। অর্ধাহারে, উপবাসে থেকে কঠোর পরিশ্রম করার ফলে এরা তাড়াতাড়ি মারা যেত, তাদের স্থান নিত নতুন নতুন দাস।

দাসের উৎপত্তির বিষয়টা খুব আশ্চর্যের এবং গুরুত্বপূর্ণও বটে। আদিম সমাজে সব মানুষ ছিল সমান অধিকারসম্পন্ন এবং চিন্তার দিক থেকেও তারা ছিল সমতায় বিশ্বাসী। আদিম শিকারী সমাজ ও নতুন পাথরের যুগের কৃষি সমাজের মানুষ অন্য মানুষকে দাস বানানোর কথা কল্পনাও করতে পারত না। তা ছাড়াও, কোনো মানুষকে দাস বানানোতে কোনো সার্থকতাও ছিল না। আদিম সমাজে মানুষের শ্রমের উৎপাদনশীলতা ছিল খুবই কম। পড়পড়তায় একজন মানুষ যা উৎপাদন করত তাতে তার ভরণপোষণই শুধু চলত কায়ক্লেশে। এ জন্যেই ঐ সমাজে বিভিন্ন ট্রাইবের মধ্যে ঝগড়া বা লড়াই হলে শত্রুদের ও যুদ্ধবন্দীদের মেরে ফেলা হত। অথবা কোনো ক্ল্যানে লোক কমে গেলে কিছু কিছু যুদ্ধবন্দীকে কোনো একটা ক্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হত। কিন্তু কখনও কাউকে দাস বানানো হত না, তাতে কোনো লাভও ছিল না। কারণ কাউকে দাস বানালেও সে নিজে যা উৎপন্ন করত তার পরিমাণ এতই কম ছিল যে তার সবটাই তাকে খেতে হত শুধু বেঁচে থাকার জন্যেই।

কিন্তু নতুন পাথরের যুগের শেষ দিকে ক্রমশ হাতিয়ারের উন্নতির ফলে মানুষের শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ল, অর্থাৎ মানুষ কম পরিশ্রমে বেশি উৎপাদন করতে শিখল। তখন একজন মানুষ তার নিজের যেটুকু প্রয়োজন তার চেয়েও বেশি সম্পদ উৎপাদন করতে সক্ষম হল। এ অবস্থায় দাসশ্রম একটা লাভজনক ও বাস্তব অর্থপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। কারণ একজন মানুষকে দাস বানাতে পারলে এখন তার খাওয়া পরার জন্যে যেটুকু দরকার তাকে খাটিয়ে তার চেয়ে বেশি উৎপাদন করানো যায়। নগরসভ্যতার যুগে তাই ভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সাথে যুদ্ধ লাগলে যুদ্ধবন্দীদের আর মেরে ফেলা হত না, তাদের দাস বানিয়ে বাজারে বিক্রি করা হত। প্রাচীন মিশরে আগে যুদ্ধবন্দীদের বলা হত 'মড়া'। দাসপ্রথার প্রচলন হবার পর যুদ্ধবন্দীদের নাম দেয়া হয় 'জীবন্ত মড়া'; কারণ মড়াদের এখন থেকে বাঁচিয়ে রাখা হত। কালক্রমে যুদ্ধবন্দী ছাড়াও দেশের স্বাধীন কিন্তু দরিদ্র ঋণগ্রস্তদেরও নানা ছুতোয় দাস বানানোর রেওয়াজ চালু হয়।

এখানে অবশ্য একটা প্রশ্ন থেকে যায়। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দাসপ্রথার প্রচলন বাস্তবে সম্ভব হয়েছিল— এ কথা মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায়, সেকালের স্বাধীনচেতা মানুষরা এটাকে মেনে নিয়েছিল কেন? এর আগে আমরা যে ভাবাদর্শের কথা আলোচনা করেছি সে অনুযায়ী তো এমন হওয়া উচিত নয়।

www.icsbook.info

নতুন পাথরের যুগের স্বাধীন মানুষদের ভাবাদর্শে তো দাসের স্থান নেই। আসলে নগরসভ্যতার প্রবর্তনের সাথে সাথে সমাজের উৎপাদনের পদ্ধতি আমূল পরিবর্তিত হয়েছিল এবং সে অনুযায়ী তাদের ভাবাদর্শেরও পরিবর্তন হয়েছিল। নতুন ভাবাদর্শ অনুযায়ী সমাজে শ্রেণীভেদ এবং দাস কোনোটাই অস্বাভাবিক ছিল না। এ বিষয়ে পরে আমরা আবার আলোচনা করব। এখন শুধু এটুকু মনে রাখা দরকার যে, নগর সভ্যতার যুগে দাস প্রথার উৎপত্তি ঘটে এবং সমাজ দুটো অসম শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

প্রাক রাজবংশীয় যুগ

মিশরের নোম বা নগররাষ্ট্রের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দ শুরু হবার অল্পকাল পরেই (অর্থাৎ খ্রিষ্টের জন্মের চার হাজার বছর আগে) নোমগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে দুটো বড় রাজ্যের সৃষ্টি করে ঃ একটা উত্তর মিশর, আরেকটা দক্ষিণ মিশর। সামরিক বিজয়ের মাধ্যমে এগুলোকে একত্রিত করা হয়েছিল এ রকম কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সম্ভবত পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণভাবে এরা একত্রিত হয়েছিল, এবং সেটাই স্বাভাবিক। কারণ একই নদীর বন্যার ওপর নির্ভরশীল বলে বাঁধ দেয়া, সেচের ব্যবস্থা করা ইত্যাদির জন্য তাদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়া খুবই জরুরী ছিল।

উত্তর মিশর ও দক্ষিণ মিশর রাজ্য দুটি কিছুকাল আলাদা ভাবে থাকে। কালক্রমে ৩২০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে দক্ষিণ মিশরের রাজা মেনেস্-এর অধীনে এ দুটি রাজ্য ঐক্যবদ্ধ হয়। এরও একটা অর্থনৈতিক প্রয়োজন ছিল। নীলনদ একটি অতি দীর্ঘ নদী। চার হাজার মাইল লম্বা এ নদীটি আবিসিনিয়ার পর্বতমালা থেকে নেমে এসে উত্তরে প্রবাহিত হয়ে ভূমধ্যসাগরে পড়েছে। এ নদীর গতিপথে মাঝে মাঝে রয়েছে ছ'টি বড় বড় জলপ্রপাত। মোহনার দিক থেকে দক্ষিণে প্রথম জলপ্রপাতটি রয়েছে আসোয়ান শহরের কাছে। এ সকল জলপ্রপাতকে বাঁধ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত না করতে পারলে মোহনার কাছাকাছি অঞ্চলে চাষের কাজ চলতে পারে না। প্রধানত এই স্বাভাবিক প্রয়োজনেই এত প্রাচীনকালে মিশর ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীকালেও নীলনদকে তার উৎস থেকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজনে সর্বদা মিশরে একচ্ছত্র কেন্দ্রীয় শাসন বজায় রাখার দরকার হয়েছে।

৫০০০ থেকে ৩২০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত কালের মিশরের ইতিহাসকে বলা হয় প্রাক-রাজবংশীয় যুগ। ৩২০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে উত্তর ও দক্ষিণ মিশরের একত্রীকরণের মাধ্যমে মিশরে প্রথম বড় সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এর পর থেকে প্রায় তিন হাজার বছর পর্যন্ত প্রাচীন মিশরের একত্রিশটি রাজবংশ রাজত্ব করে। এ রাজবংশের যুগকে তিনটি প্রধান যুগে ভাগ করা হয়েছে ঃ প্রাচীন, মধ্য ও নতুন রাজত্বের যুগ।

মিশরের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে, প্রাক-রাজবংশ যুগের অবদান অল্প নয়। এ যুগে চকমকি পাথর, তামা ও সোনা থেকে হাতিয়ার, অস্ত্র ও গয়না নির্মাণের কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছিল। মৃৎপাত্রকে ঔজ্জ্বল্য প্রদান ও চিত্রশোভিত করার যে প্রক্রিয়া এ যুগে আবিষ্কৃত হয়, তা উপযোগিতা ও উৎকর্ষের দিক থেকে পরবর্তীকালের তুলনায়ও উচ্চমানের ছিল। এ ছাড়া উন্নত সেচব্যবস্থা, জলাভূমির পুনরুদ্ধার, উন্নতমানের

www.icsbook.info

ক্ষৌমবস্ত্র বয়ন ইত্যাদিও এ যুগেরই আবিষ্কার।

এ যুগে প্রচলিত প্রথার ওপর ভিত্তি করে এক প্রকার আইনের উদ্ভব ঘটেছিল। যদিও এ সকল আইনে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ছাপ পড়েছিল স্বাভাবিকভাবেই, তথাপি তা সমাজে এমন প্রভাব অর্জন করেছিল যে পরবর্তীকালে ফারাও নিজেও এর আওতামুক্ত হতে পারেননি। এ সময়ে প্রাথমিক ধরনের লেখন পদ্ধতিরও প্রচলন হয়েছিল বলে বোধ হয়, যদিও এ যুগের লেখার কোনো সত্যিকার নমুনা এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। প্রথম রাজবংশের আমলেই লেখন পদ্ধতি এত জটিল আকার ধারণ করেছিল যে স্পষ্টই বোঝা যায়, অনেক আগেই এর উদ্ভব ঘটেছিল। এ যুগের মিশরীয়দের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব হল॥ মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম সৌর পঞ্জিকার আবিষ্কার। আধুনিক মিশরবিদদের মতে, ৪২০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের সমকালে এ পঞ্জিকা প্রবর্তিত হয়েছিল। প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট দিনে নীলনদে বন্যা হত আর সেদিনই ভোরের আকাশে লুব্ধক তারার আবির্ভাব ঘটত। সম্ভবত এ সম্পর্কের আবিষ্কার থেকেই প্রাচীন মিশরীয়রা সৌরবছর আবিষ্কারে সক্ষম হয়। তাদের বছরে ছিল ৩০ দিনের ১২টি মাস এবং বছরের শেষে যুক্ত ৫টি দিন, মোট ৩৬৫ দিন। এত প্রাচীনকালে মোটামুটি নিখুঁত এ পঞ্জিকার উদ্ভব থেকে অনুমান করা চলে যে, গণিত এবং সম্ভবত অন্যান্য বিজ্ঞানও এ যুগে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছিল।

প্রাচীন রাজত্বের যুগ

৩২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রাজা মেনেস্ উত্তর ও দক্ষিণ মিশরকে এক রাজ্যে পরিণত করেন এবং নিজেই তার সম্রাট হন। মেনেস্ই প্রাচীন মিশরের প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এর পর ২৩০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত আরও পাঁচটি রাজবংশ মিশরে রাজত্ব করে।

প্রাচীন মিশরের সম্রাটদের বলা হত 'ফারাও'। ফারাওরা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। প্রাচীন রাজবংশের রাজাদের উপাধি দেয়া হয়েছিল 'উচ্চ ও নিম্ন মিশরের সম্রাট'। সম্রাটরা তখন দুটো মুকুট মাথায় পরতেন। একটা সাদা, আরেকটা লাল। ফারাও-এর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন একজন উজির বা মন্ত্রী। শাসন ব্যবস্থার সব দিকে দৃষ্টি রাখতে হত এ মন্ত্রীকে। রাজ্যের শস্যভাণ্ডার, স্বর্ণখনি, আঙ্গুরের বাগিচা, পশু সম্পদ, সামরিক বিষয়াদি, প্রার্থনানুষ্ঠান প্রভৃতি সকল কাজের তদারক মন্ত্রীকে করতে হয়। তা' ছাড়া ফারাওয়ের যাবতীয় কাজ, তোষাখানা, খাজাঞ্চিখানা বিচার-আচার প্রভৃতির তত্ত্বাবধানও তাঁকে করতে হত। উজির এবং সব দফতরের অধীনেই বহুসংখ্যক কর্মচারী, লিপিকার, কেরানি প্রভৃতি থাকত।

প্রাচীন রাজত্বের আমলেও অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজেই নিয়োজিত ছিল। নতুন পাথরের যুগের মতোই কৃষকদের গ্রামসমাজ কৃষিকাজ পরিচালনা করত। সর্দারের পরিষদ গ্রামসমাজ পরিচালনা করত। নতুন পাথরের যুগের তুলনায় এ সকল গ্রাম সমাজকে একটা সম্পূর্ণ নতুন কর্তব্য পালন করতে হত। নতুন পরিস্থিতিতে সম্রাটকে কর দিতে হত এবং বিভিন্ন রাজকীয় প্রকল্পের জন্যে অর্থাৎ রাস্তাঘাট নির্মাণ, মন্দির নির্মাণ, খনি খনন ইত্যাদি কাজের জন্যে কৃষকদের মজুর হিসাবে বেগার খাটতে হত। দাসদের সাধারণত সম্রাট ও অভিজাত রাজপুরুষদের (অর্থাৎ রাজ কর্মচারীদের) বড় বড় বাগিচায় বা খেত-খামারে খাটানো হত। প্রাচীন মিশরে মন্দিরের এবং

www.icsbook.info

পুরোহিতমণ্ডলীর বিপুল পরিমাণ ভূসম্পত্তি ছিল। এ সকল জমিতেও মন্দিরের অধীনস্থ দাসদের খাটানো হত।

প্রাচীন রাজত্বের ফারাওগণ সিনাই উপদ্বীপ ও নুবিয়া অঞ্চলের মানুষদের বিরুদ্ধে বারবার সামরিক অভিযান চালিয়ে ম্যালাকাইট, তামার আকর, সোনা, হাতির দাঁত ইত্যাদি প্রভূত সম্পদ ও বিপুল সংখ্যক যুদ্ধবন্দী সংগ্রহ করেন। যুদ্ধবন্দীদের দাস বানানো হয়।

প্রাচীন মিশরের অত্যাশ্চর্য কীর্তি পিরামিডসমূহ প্রাচীন রাজত্বের আমলেরই সৃষ্টি। পাথরের তৈরি বিশাল পিরামিডগুলো ছিল আসলে ফারাও ও অভিজাত মানুষদের সমাধি মন্দির বা কবর। ফারাও বা তাঁর উজির সভাসদরা নিজেরা বেঁচে থাকতেই তাঁদের মৃতদেহের বাসস্থানস্বরূপ এসব পিরামিড তৈরি করাতেন। এ রকম সত্তরটি পিরামিড এখন পর্যন্ত টিকে আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং বিখ্যাতটি হচ্ছে খুফু বা কিওপস্-এর পিরামিড। এ পিরামিডটির উচ্চতা ৪৭৫ ফুট এবং তার বর্গাকৃতি ভিত-এর প্রতি পার্শ্বের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৭৫০ ফুট। এটি নির্মাণ করতে ২৩ লাখ পাথরের টুকরো দরকার হয়েছিল, যার প্রতিটির ওজন ছিল ৫০ মণেরও বেশি। দূরের পাহাড় থেকে পাথর কেটে দাস ও কৃষক শ্রমিকরা এ সব পাথর দড়ি বেঁধে টেনে টেনে নিয়ে আসত। মিশরের গ্রামাঞ্চল থেকে প্রতি তিন মাসের জন্যে এক লাখ করে লোক সংগ্রহ করা হত এ পিরামিড নির্মাণের জন্য। এ পিরামিডটি তৈরি করতে এক লাখ লোকের কুড়ি বছর লেগেছিল।

মিশরীয়দের পিরামিড নির্মাণের রীতি তাদের ধর্মবিশ্বাস ও পারলৌকিক বিশ্বাসের সাথে জড়িত ছিল। প্রাচীন মিশরীয়রা মনে করত মানুষ মরে যাবার পরেও যদি তার দেহকে সংরক্ষণ করা যায়, তবে ঐ দেহে তার আত্মা ফিরে আসে। এ জন্য প্রাচীন মিশরীয়রা বিশেষ কৌশলে মৃতের শরীরে মলম মাখিয়ে মৃতদেহকে সংরক্ষণ করত এবং মৃতের কবরে খাদ্য, পানি ইত্যাদি রেখে দিত। এ সংরক্ষিত মৃতদেহকে বলা হয় 'মমি' (ইংরেজিতে Mummy)। মমি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে 'মমিয়াই' শব্দ থেকে। পারসিক ভাষায় মমিয়াই শব্দের অর্থ হচ্ছে মোম বা আলকাতরা।

মৃতদেহকে ঘিরে প্রাচীন মিশরীয়দের মধ্যে এ রকম আশ্চর্য চিন্তা ও রীতিনীতির উদ্ভবের বিশেষ কারণ আছে। সব সমাজেই ভাবাদর্শ ও চিন্তাধারা গড়ে ওঠে সমাজ ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে এবং ঐ সমাজের প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত্তিতে। প্রাচীন পাথরের ও নতুন পাথরের যুগে মৃতদের প্রতি বিশেষ আচরণ করা হত, আমরা আগেই দেখেছি। নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ মাটির নিচে পাথরের ঘরে মৃতদেহকে কবরস্থ করত। স্থানীয় অবস্থাভেদে অন্য স্থানে অন্য প্রথা জন্মলাভ করে। অস্ট্রেলিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলের আদিবাসীরা মৃতদেহকে গাছের ওপর মাচায় রেখে দেয়। প্রাচীন মিশরীয়রা তেমনি মৃতদেহকে পাতায় মুড়ে অগভীর মাটির নিচে কবর দিত। এতে মরুভূমির শুষ্ক উত্তপ্ত বালু মৃতদেহকে সম্পূর্ণ ঘিরে রেখে তার পচনকে রোধ করত এবং ফলে মৃতদেহের চুল, চামড়া ও নরম অংশসমূহ সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকত। মিশরের প্রাকৃতিক পরিবেশের দরুন মৃতদেহ স্বাভাবিকভাবেই সংরক্ষিত থাকত বলেই হয়তো মিশরীয়দের মনে এ বিশ্বাস ক্রমশ গড়ে ওঠে যে, মৃত্যুর পরেও মানুষের দেহ বেঁচে থাকে।

www.icsbook.info

এ বিশ্বাস থেকেই মিশরীয়রা মৃতদেহের কবরে খাদ্য, পানীয়, হাঁড়ি পাতিল, বাসন কোসন সব কিছু রাখতে লাগল, যেন মৃত ব্যক্তিরা মরার পরেও এসব ব্যবহার করতে পারে। এত জিনিসপত্র রাখার জন্যে কবর বড় করতে হল। কিন্তু প্রশস্ত পাথরের কবরে তপ্ত বালুর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকায় মৃতদেহতে আবার জীবাণুর ক্রিয়ায় পচন ধরতে থাকে। এর ফলে কৃত্রিমভাবে মৃতদেহকে সংরক্ষণের চেষ্টা শুরু হয় এবং কালক্রমে মিশরীয়রা এ কাজে বেশ সাফল্য অর্জন করে।

মিশরীয়রা অবশ্য সম্পূর্ণ মৃতদেহটাকে মমি বানিয়ে সংরক্ষণ করতে পারত না। প্রথমে তারা মৃতদেহের মাথা ফুটো করে মগজটা বের করে নিত এবং পেট কেটে ভেতরের অন্ত্র ও অন্যান্য অঙ্গসমূহ বের করে দেহের ভেতরটা ভাল করে ওষুধ দিয়ে ধুয়ে ফেলত আর অন্ত্র ইত্যাদিকে আলাদা ভাবে কাঁচের পাত্রে ওষুধে ডুবিয়ে রাখত। তারপর শরীরটাকে একটা ওষুধ ভর্তি কাঁচের পাত্রে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখা হত। ওষুধের প্রভাবে শরীরের চামড়া ও চর্বি গলে যেত। মৃতদেহটিকে তখন বের করে ভাল করে শুকানো হত। তারপর এক রকম আঠালো ওষুধ শরীরের ভেতর ভরে দেয়া হত এবং গায়ের ওপর বিশেষ এক ধরনের মলম মেখে তাকে কাপড় দিয়ে ভাল করে জড়িয়ে বাঁধা হত। মমি তৈরির পদ্ধতির আরও উন্নতি হবার পর, শরীরের ভেতরের অঙ্গগুলোকে আবার ওষুধ মাখা কাপড়ে মুড়ে শরীরের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া হত। এ ভাবে মমি তৈরি করলে মৃতদেহ আর পচে নষ্ট হত না,মিশরের শুষ্ক ও তপ্ত আবহাওয়ায় শুকিয়ে যেত। সমস্ত কাজ শেষ করতে প্রায় আড়াই মাস সময় লাগত।

মৃতদেহকে মমিতে পরিণত করা খুবই ব্যয়সাধ্য ছিল। শুধুমাত্র সম্রাট ও অভিজাত দাস-মালিকরাই মমি ও তার উপযুক্ত পিরামিড ও সমাধি-মন্দির তৈরি করাতে পারত। পিরামিড ও সমাধি-মন্দিরে অনেকগুলো ঘর থাকত। একটি ঘরে মৃতদেহের মমি, অন্য ঘরগুলোতে দাসদাসী, রাঁধুনি, কারিগর, দাস পরিচালক প্রভৃতির কাঠের বা মাটির মূর্তি এবং প্রচুর ধনরত্ন রাখা হত। ঘরের দেয়ালগুলোতে শস্যখেত, কামারশালা, চাষরত কৃষক প্রভৃতির ছবি আঁকা থাকত। প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করত যে কবরের ভেতর এসব ছবি ও মূর্তি প্রাণ পেয়ে সত্যিকার মানুষে পরিণত হয়ে মৃতের সেবা করবে। স্পষ্টতই, অভিজাত মিশরীয়রা মৃত্যুর পরেও অনন্ত কাল দাস-মালিক হয়েই থাকতে চাইত।

কৃষক ও সাধারণ মানুষদের জন্যে অবশ্য অন্য ব্যবস্থা ছিল। তাদের কবরে মৃতদেহের সাথে একটা কাঠ খোদাই করা মানুষের মূর্তি রেখে দেয়া হত। এ কাঠের মূর্তিটা ছিল মমির প্রতীক। মৃতদেহের পাশে পাত্র-ভর্তি খাবারও রাখা হত। দাসদের জন্যে কোনো কবরের ব্যবস্থা ছিল না। অনেকগুলো দাসকে এক একটা বড় গর্তে পুঁতে ফেলা হত, এই ছিল তাদের কবর।

মধ্য রাজত্বের যুগ

পুরোনো রাজত্বের যুগ শেষ হয় প্রায় ২৩০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে। এ সময়ে কেন্দ্রীয় শাসন কার্যত দুর্বল হয়ে পড়ে। পরবর্তী দু'শো বছর ধরে অবশ্য বিভিন্ন রাজবংশের নামমাত্র শাসন বজায় ছিল। কিন্তু তারা প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিল না। এ সময়ে স্থানীয়ভাবে নোমগুলো আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং নোম শাসক ও প্রাদেশিক শাসকরা অনেক

www.icsbook.info

স্থানে ক্ষমতা করায়ত্ত করে। করভারে জর্জরিত জনসাধারণও ঘন ঘন বিদ্রোহের আশ্রয় নেয়। এ সামাজিক অসন্তোষের যুগে নিগ্রো ও এশীয় জাতিসমূহের আক্রমণের ফলে অরাজকতা আরো বেড়ে যায়।

প্রায় ২১০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে একাদশ রাজবংশের উদয়ের পর এ অরাজক কালের অবসান ঘটে এবং মিশর আবার একটি কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়। মিশরের ইতিহাসের এ যুগকে বলা হয় 'মধ্য রাজত্বের যুগ'। আনুমানিক ১৭৫০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত এ যুগ স্থায়ী হয়েছিল।

প্রাচীন রাজত্বের তুলনায় মধ্য রাজত্বের যুগের শাসন ছিল অনেক দুর্বল। এ আমলে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজাতদের হাতেই ক্ষমতা রয়ে যায়। অবশ্য ২০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের পর দ্বাদশ রাজবংশের ফারাওরা আগের আমলের সম্রাটদের মতো ক্ষমতা কিছুটা ফিরে পায়।

মধ্য রাজত্বের কালে সেচব্যবস্থার উন্নতির জন্য, বিশেষত ফায়ুম মরূদ্যান অঞ্চলের জলসেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিস্তারের জন্য ব্যাপক নির্মাণকাজ সমাধা করা হয়। ব্যবসা বাণিজ্য এবং বিভিন্ন কারিগরি শিল্পের প্রসার ঘটে এ সময়ে। এ যুগের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে৷ কৃষক জনগণ ক্রমশ নিঃস্ব দরিদ্রে পরিণত হয়। বড় বড় নির্মাণকাজ ও ধনীদের বিলাসিতার ব্যয় বহন করতে হত কৃষক ও জনসাধারণকে। ফলে, সমাজে ধনবৈষম্য অর্থাৎ ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অবস্থার পার্থক্য খুব বেশি রকম বেড়ে যায়।

আনুমানিক ১৭৫০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে কৃষক, কারিগর ও দাসদের ব্যাপক সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে দ্বাদশ রাজবংশের অবসান ঘটে। বিদ্রোহী জনসাধারণ রাজা, উজির ও অভিজাতদের বাড়িঘর দখল করে; রাজভাণ্ডার, শস্যভাণ্ডার এবং মন্দির-পিরামিডের ধনরত্ন লুট করে নেয়; কর ও খাজনার দলিলপত্র পুড়িয়ে নষ্ট করে দেয়।

নতুন রাজত্বের যুগ

খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এশিয়া থেকে যাযাবর হিক্সস্ জাতি এসে মিশর আক্রমণ করে লুটতরাজ শুরু করে। হিক্সস্‌রা সমস্ত মিশর দেশ দখল করে নেয় এবং প্রায় দেড়শো বছর ধরে মিশরকে পদানত করে রাখে। হিক্সস্‌দের সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, এরা যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়া এবং অশ্বচালিত যুদ্ধরথ ব্যবহার করত। মিশরে ঘোড়া এবং রথের প্রচলন এরাই করেছিল। এ ছাড়াও সামরিক পরাক্রমশালী হিক্সস্‌দের কাছ থেকে মিশরীয়রা অনেক নতুন ও উন্নত যুদ্ধকৌশল শিখেছিল।

হিক্সস্‌রা নামে সারা মিশর দেশ অধিকার করলেও তাদের ক্ষমতা সম্ভবত বদ্বীপ অঞ্চলেই সীমিত ছিল। অন্যান্য অঞ্চলে স্থানীয় অভিজাত শাসকরাই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিল। আসলে দ্বাদশ রাজবংশের পতনের পর থেকেই কেন্দ্রীয় রাজশক্তি ছিল খুবই দুর্বল।

বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে মিশরে বিক্ষোভ ক্রমশ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে এবং হিক্সস্‌দের বিতাড়নের জন্যে প্রবল আন্দোলন ও বিদ্রোহ শুরু হয়। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে দক্ষিণ মিশরের শাসনকর্তাগণ হিক্সস্‌দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেন। ক্রমে সমগ্র মিশরের মানুষ এ আন্দোলনে যোগদান করে এবং ১৫৮০ খ্রিষ্ট

www.icsbook.info

পূর্বাব্দের মধ্যে হিক্সস্‌রা মিশর থেকে বিতাড়িত হয়। এ মুক্তি-আন্দোলনের নায়ক ১ম আহমোজ অষ্টাদশ রাজবংশ স্থাপন করেন। এর পর থেকে ইতিহাসে নতুন রাজত্বের যুগ শুরু হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ রাজবংশের মধ্যে হিক্সস্ রাজবংশও রয়েছে।

নতুন রাজত্বের যুগকে সাম্রাজ্যের যুগও বলা হয়ে থাকে। কারণ, এ সময়ে মিশর সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হয়। এ যুগ ১৫৮০ থেকে ১০৯০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল এবং তিনটি রাজবংশ, যথা--অষ্টাদশ, ঊনবিংশ এবং বিংশ রাজবংশের ফারাওরা এ আমলে রাজত্ব করেন।

সাম্রাজ্যের যুগে মিশর পরাক্রমশালী সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। অষ্টাদশ রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পর কেন্দ্রীয় রাজশক্তি তথা সম্রাটের শক্তিও বৃদ্ধি পায়। হিক্সস্‌দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় অধিকাংশ নোম-শাসক আহমোজের অভ্যুদয়ের বিরোধিতা করেছিলেন। আহমোজের চূড়ান্ত বিজয়লাভের পর তাই আঞ্চলিক শাসকদের শক্তি বিশেষভাবে খর্ব করা হয়।

হিক্সস্‌দের বিরুদ্ধে জয়লাভের পর মিশরের সামরিক আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই বেড়ে যায়। ফারাও প্রথম আহমোজ মিশরকে হিক্সস্‌দের হাত থেকে মুক্ত করার পর তাদের অনুসরণ করে পশ্চিম এশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এরপর তিনি নুবিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালান। তবে, মিশরের নতুন সামরিক শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন 'তৃতীয় তুথ্‌মোসিস'। ১৫২৫ থেকে ১৪৯১ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দব্যাপী রাজত্বকালে তিনি সতেরোটি অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্যালেস্টাইন, লিবিয়া ও নুবিয়া জয় করেন। তৃতীয় তুথ্‌মোসিস্ সেকালের হিসেবে এক অতি পরাক্রমশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর বাহিনীর পদাতিক সৈন্যরা তীর-ধনুক ও বল্লমে সজ্জিত ছিল এবং অশ্বারোহী বাহিনী যুদ্ধরথে সজ্জিত ছিল। এ ছাড়া তুথ্‌মোসিস্ এক বিশাল রণতরী বাহিনীরও অধিকারী ছিলেন। এ বিশাল সেনাবাহিনীর সহায়তায় তিনি টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস থেকে নীলনদের সুদূর দক্ষিণাঞ্চলে কয়েকটি জলপ্রপাত পর্যন্ত নিজ অধিকার বিস্তৃত করেন। ফিনিশীয়, কানানাইট (কানান দেশীয়), হিট্টাইট এবং আসিরীয়রা তাঁর আধিপত্য মেনে নিয়েছিল বা তাঁকে কর প্রদান করত।

এ সকল অভিযানের ফলে প্রভূত লুণ্ঠিত ধনসম্পদ ও শস্য রাজভাণ্ডারে আনা হল। এ ছাড়া হাজার হাজার দাস এবং পশুও সংগৃহীত হল। মন্দির এবং পুরোহিতগণ এ সকল ধনসম্পদের ভাগ পেল। যেমন, রাজধানী থিব্‌স্ নগরীর জনপ্রিয় দেবতা 'আমন রা'-এর মন্দিরকে লেবাননের এক বিস্তৃত অঞ্চল ও তিনটি শহর পুরোপুরি প্রদান করা হয়।

তুথ্‌মোসিস্-এর এ সকল বিজয় অবশ্য খুব স্থায়ী হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর সিরিয়ায় ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ সকল বিদ্রোহ সাময়িকভাবে দমিত হলেও পরাজিত জাতিগুলোর অসন্তোষ কখনও দুর হয়নি, বিদ্রোহ প্রচেষ্টাও বন্ধ হয়নি।

মন্দির ও পুরোহিত সম্প্রদায়কে ব্যাপক ধনসম্পদ প্রদান করায় তাদের শক্তিবৃদ্ধি হয় এবং দেশের রাজনীতিতেও পুরোহিততন্ত্রের প্রভাব বাড়তে থাকে। থিব্‌স্-এর আমন রা দেবতার মন্দিরের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ মন্দিরের অধীনস্থ দাস, প্রজা ও ভূসম্পত্তির পরিমাণ ছিল দেশের আর সব মন্দিরের মিলিত সম্পদের চেয়ে বেশি।

www.icsbook.info

থিব্‌স্-এর পুরোহিত সম্প্রদায় এর ফলে বিশেষ রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। এমনকি তারা ফারাও-এর হাত থেকেও কিছু কিছু ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে।

ফারাও ইখ্‌নাটন পুরোহিতদের ক্ষমতা খর্ব করার মানসে এক ধর্ম সংস্কারের প্রচেষ্টা নেন। এ সম্রাটের আসল নাম হচ্ছে 'চতুর্থ আমেন হোটেপ'। ১৪২৪ থেকে ১৩৮৮ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তিনি অন্য সব দেবতাকে বাদ দিয়ে 'সূর্যদেবতা এ্যাটনকে' একমাত্র উপাস্য দেবতা বলে ঘোষণা করেন। সারা দেশে এ্যাটন-এর নামে মন্দির নির্মিত হল। সম্রাটও আমেন হোটেপ নামের পরিবর্তে ইখ্‌নাটন (অর্থাৎ এ্যাটন-এর প্রিয়জন) নাম ধারণ করেন।

কিন্তু ইখ্‌নাটনের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটে এবং ইখ্‌নাটনের মৃত্যুর পর এ সংস্কার প্রচেষ্টা বর্জন করা হয়। পুরোহিততন্ত্র এরপর আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 'দ্বিতীয় রাম্‌সেস্'-এর রাজত্বকালে (১৩১৭-১২৫১ খ্রিঃপূঃ) মন্দিরের প্রচুর ভূসম্পত্তি হয় এবং পুরোহিততন্ত্র প্রায় একটি স্বতন্ত্র রাজশক্তিতে পরিণত হয়। এ সময়ে প্রধান পুরোহিতের পদটি সম্রাটের পদের মতোই বংশানুক্রমিক হয়ে ওঠে।

২য় রাম্‌সেস্-এর আমলে বড় বড় সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। সিরিয়াতে মিশরীয়দের প্রথম বারের মতো এক নতুন পরাক্রমশালী শক্তির সম্মুখীন হতে হল। এ নতুন শক্তি হল 'হিট্টাইট'। হিট্টাইটরা ততদিনে প্রায় সমগ্র সিরিয়া করতলগত করেছে। হিট্টাইটদের সাথে মিশরীয়দের লড়াই দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল, কিন্তু এর কোনো চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি। শেষ পর্যন্ত হিট্টইটরা উত্তর সিরিয়া এবং মিশরীয়রা দক্ষিণ সিরিয়া অধিকার করেই সন্তুষ্ট থাকে।

মিশরের শেষ পরাক্রমশালী ফারাও ছিলেন 'তৃতীয় রাম্‌সেস্'। ১১৯৮ থেকে ১১৬৭ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তারপর আরো কয়েকজন সম্রাট রাম্‌সেস্ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তাঁরা কেউই এ নামের যোগ্য ছিলেন না। খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই দুর্বল মিশর বর্বর জাতিগুলোর দ্বারা আক্রান্ত হতে থাকে এবং মিশরের সামাজিক অবক্ষয়ের লক্ষণসমূহও ফুটে উঠতে থাকে। লিবিয়া এবং নুবিয়ার বর্বর অধিবাসীরা পালে পালে মিশরে প্রবেশ করে বাস স্থাপন করতে থাকে এবং তাদের প্রভাবে মিশরের সাংস্কৃতিক মান ক্রমশ নিচে নামতে থাকে। এ সামাজিক অবক্ষয়ের যুগে মিশর সব রকম মননশীল প্রেরণা হারিয়ে ফেলে। মিশরের সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে এ সময় ধর্মান্ধতা,যাদুবিদ্যা ও কুসংস্কারের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়। যাদুবিদ্যার সাহায্যে অমরত্ব লাভই তাদের একমাত্র কাম্য হয়ে দাঁড়ায়। পুরোহিততন্ত্র এ অবক্ষয়ের প্রক্রিয়ায় সর্বপ্রকারে সাহায্য করে। শেষ পর্যায়ে পুরোহিত সম্প্রদায় এত শক্তিশালী হয়েছিল যে,রাজক্ষমতা তাদের করায়ত্ত হয়েছিল এবং সম্রাটের ফরমান পর্যন্ত পুরোহিতদের নির্দেশে রচিত হত।

২০তম রাজবংশের শেষ সম্রাট ছিলেন 'একাদশ রাম্‌সেস্'। এ রাজবংশের অবসানের সাথে সাথে মিশরে নতুন রাজত্বকালেরও অবসান ঘটে। এরপর মিশরে গৃহযুদ্ধ এবং অরাজকতা শুরু হয়। ১০৮৫ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে থিব্‌স্-এর প্রধান পুরোহিত সিংহাসন দখল করেন। এ সময়ে আবার উত্তরের বদ্বীপ অঞ্চলে অপর এক রাজা নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করে ২১তম রাজবংশ স্থাপন করেন।

www.icsbook.info

খ্রিষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ (আনুমানিক ৯৫০খ্রিঃ পূঃ) থেকে অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ (আঃ৭৩০ খ্রিঃপূঃ) পর্যন্ত লিবিয়ার বর্বর জাতি মিশরের সিংহাসন দখল করে রাখে।

এ লিবীয়রাই মিশরে ২২তম রাজবংশ স্থাপন করেছিল। এরপর ইথিওপিয়ার মানুষরা এসে মিশরের সিংহাসন অধিকার করে। ৬৭০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে আসিরীয়গণ স্বল্পকালের জন্য মিশর দখল করে নেয়। তবে ৬৬২ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে আসিরীয়দের পতনের পর মিশরীয়রা হৃত স্বাধীনতা ফিরে পায় এবং সাময়িক ভাবে মিশরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটে। কিন্তু ৫২৫ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে পারস্য রাজশক্তি মিশর অধিকার করলে তার সভ্যতা শেষ বারের মতো অস্তমিত হয়। এর পরে আর প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার পুনরুদয় ঘটেনি। এরপর অবশ্য মাঝে মাঝে পারসিক শাসন ব্যাহত হয়েছে। বস্তুত ৩০তম রাজবংশ ছিল সর্বশেষ মিশরীয় রাজবংশ। কিন্তু তারপর আবার ৩৪১ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে পারসিকরা মিশরের সিংহাসন অধিকার করে ৩১তম রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে।

গ্রীসীয় টলেমী রাজবংশের যুগ

এরপর ৩৩২ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার মিশর অধিকার করে নেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর এক গ্রীক সেনাপতি মিশর করায়ত্ত করে 'টলেমি রাজবংশ' স্থাপন করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মিশরের বিখ্যাত রাণী 'ক্লিওপেট্রা' এই গ্রীক টলেমী রাজবংশেরই মেয়ে।

রোমান আধিপত্যের যুগ

কালক্রমে রোমকরা সমগ্র গ্রীক জগতে অধিকার বিস্তার করলে মিশরও রোমকদের করায়ত্ত হয়েছিল। কিন্তু সে সব পরবর্তীকালের কথা। বস্তুত খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগেই প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা অস্তমিত হয়েছিল।

মিশরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয়

মিশরীয় ধর্ম

প্রাচীন মিশরীয়দের জীবনে ধর্ম বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। প্রথম অবস্থায় মিশরীয়রা পশুপাখির ওপর দেবত্ব আরোপ করত। কোনো নগরে বাজপাখি, কোনো নগরে ষাঁড়, কোথাও হরিণ দেবতার পূজা করা হত। এ সকল চিন্তাধারায় আদিম টোটেম বিশ্বাসের রেশ দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন রাজত্বের আমলে সমগ্র মিশর ঐক্যবদ্ধ হবার পর সবচেয়ে শক্তিশালী নোমের দেবতা সমগ্র জাতির দেবতায় পরিণত হল। এ সময় থেকে বিভিন্ন দেবতার স্থলে এক 'সূর্য দেবতা' কিংবা 'রা দেবের' পূজা প্রচলিত হয়। ক্রমশ কৃষি সমাজের অনুরূপ চিন্তাধারা সমস্ত সমাজে ব্যাপ্তি লাভ করে। যেমন ওসিরিস্ এবং আইসিস্-এর পূজা। মিশরীয়দের বিশ্বাস অনুসারে, ওসিরিস ছিলেন অতি প্রাচীন কালের এক ন্যায় পরায়ণ রাজা। তিনি প্রজাদের কৃষিকাজ ও অন্যান্য বিষয় শিখিয়েছিলেন। তাঁর ভাই তাঁকে হত্যা করে তাঁর দেহকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে। অবশেষে ওসিরিসের স্ত্রী আইসিস্ তাঁর দেহের টুকরোগুলোকে

www.icsbook.info

একত্রিত করে তাঁর দেহে আবার প্রাণসঞ্চার করেন। প্রাণ পেয়ে ওসিরিস্ কিছুকাল রাজত্ব করেন, তারপর পাতালে গমন করে সেখানে মৃতদের বিচারের কাজে নিয়োজিত হন। ওসিরিস্-এর পুত্র 'হোরাস' বড় হয়ে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এ কাহিনীর মধ্যে শস্যবীজের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন শস্যের জন্মের কাহিনী রূপকের আকারে লুকিয়ে আছে।

মধ্য রাজত্বের আমলে বিশেষ ভাবে সূর্য দেবতার পরিবর্তে ওসিরিস্-এর পূজা প্রসার লাভ করে। কিন্তু ওসিরিস্ ছিলেন মৃতের রাজা। ইহজীবনে তাঁর কাছ থেকে কোনো পুরস্কার লাভের সম্ভাবনা ছিল না। এ যুগে মিশরীয়দের মনও পর জীবনের দিকে আকৃষ্ট হয়।

পরলোক সম্পর্কে মিশরীয়দের ধারণা এ যুগেই বিকাশ লাভ করে। এ যুগে যে ধর্মবিশ্বাস প্রসার লাভ করে তা হল, মানুষের মধ্যে একটা 'বা' অর্থাৎ 'আত্মা' আছে এবং একটা 'কা' অর্থাৎ 'দ্বিতীয় সত্তা' আছে। মৃত্যুর পর দেহ যদি রক্ষা পায় তাহলে 'বা' এবং 'কা' ফিরে এসে দেহকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। এ কারণেই প্রাচীন মিশরীয়রা মৃতদেহকে মমির আকারে রক্ষা করার জন্য এত আগ্রহী ছিল। ক্রমশ পারলৌকিক জীবনের ধারণা আরও পূর্ণতা অর্জন করে। পরিবর্তিত বিশ্বাস অনুসারে, মৃতদের ওসিরিস্-এর সামনে উপস্থিত হয়ে কৃতকর্মের হিসেব দিতে হত। প্রথম পর্যায়ে তাদের প্রমাণ করতে হত যে তারা ৪২টি পাপ কাজ করেনি। এ সকল পাপের তালিকায় ছিল চুরি, নরহত্যা, লোভ, মিথ্যাচার, ক্রোধ, গর্ব, অসাধুতা প্রভৃতি। এরপর তাদের প্রমাণ করতে হত যে তারা কতগুলো সৎকাজ করেছে, যথা॥ ক্ষুধিতকে অন্ন, পিপাসার্তকে পানি, বস্ত্রহীনকে কাপড় ইত্যাদি দিয়েছে। শেষ পর্যায়ে মৃতের হৃদয়কে দাঁড়িপাল্লায় রেখে মাপা হত— তার কথার সত্যতা বিচারের জন্যে। বিচারে যারা সৎ বিবেচিত হত তাদের জন্যে ছল চিরসুখের জীবন। তারা ফলবাগানের পাশে বাড়ি বানিয়ে থাকতে পারত, নদীতে বা হ্রদে নৌকাভ্রমণ করতে পারত, পাখি শিকার করতে পারত ইত্যাদি। আর যারা সৎ জীবন যাপন করেনি তাদের চিরস্থায়ী ক্ষুধা-তৃষ্ণার কবলিত হয়ে চির অন্ধকার কারাগারে কাল কাটাতে হত।

মিশরীয় ধর্ম সর্বোচ্চ পূর্ণতা লাভ করে মধ্য রাজত্বের শেষ ভাগে এবং নতুন রাজত্বের প্রথম ভাগে। এ সময়ে সূর্য দেবতা এবং ওসিরিসের পূজা এমনভাবে মিশে যায় যে দুই ধর্ম বিশ্বাসেরই ভাল দিকগুলো বজায় থাকে। জীবিতদের দেবতা 'রা' মৃতদের দেবতা ওসিরিস্-এর সমান মর্যাদা লাভ করেন।

কিন্তু নতুন রাজত্বের প্রতিষ্ঠার পর মিশরীয় ধর্মে অবক্ষরের লক্ষণ দেখা দেয়। মিশরীয় ধর্মের নৈতিক চিন্তার দিকগুলো লোপ পায় এবং কুসংস্কার ও যাদুবিদ্যার প্রবণতা প্রসার লাভ করে। দীর্ঘস্থায়ী হিক্সস' আধিপত্য এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কালেই সম্ভবত মিশরীয়রা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সে সুযোগে পুরোহিতরা জনসাধারণের মধ্যে অযৌক্তিক চিন্তার প্রসার ঘটায়। এ সময় পুরোহিতদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব বেড়ে যায়। মানুষের পারলৌকিক ভয় ভীতি প্রভৃতির সুযোগ নিয়ে তারা অর্থের বিনিময়ে রক্ষাকবচ প্রভৃতি বিক্রি করতে শুরু করে। পুরোহিতরা কাগজের ওপর নানারকম মন্ত্রতন্ত্র লিখে মৃতদেহের সাথে তা কবরে রেখে দিত, যাতে পরলোকে বিচারে তারা শাস্তি না পায়।

www.icsbook.info

ধর্মের অধোগতি রোধ এবং পুরোহিতদের ক্ষমতা খর্ব করার মানসে ফারাও ইখনাটন এক ধর্ম সংস্কারের উদ্যোগ নেন— এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইখনাটন সব পুরোহিতকে মন্দির থেকে দূর করে দেন, প্রস্তরলিপি থেকে প্রাচীন দেবতাদের নাম মুছে ফেলেন এবং নতুন এক সূর্যদেবতা 'এ্যাটন'॥এর পূজার প্রচলন করেন। ইখ্নাটনের চিন্তায় এ দেবতা ছিলেন ন্যায়পরায়ণ এবং মানুষের পালকস্বরূপ। কিন্তু এ ধর্মসংস্কার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। ইখনাটনের মৃত্যুর পর পুরোহিততন্ত্র এবং কুসংস্কারের প্রতাপ আবার বেড়ে যায়। ধর্মীয় চিন্তার অবনতি মিশরের দর্শন, শিল্পকলা এবং শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের সূচনা করেছিল এবং কালক্রমে সমগ্র মিশরীয় সভ্যতাই অস্তমিত হয়েছিল।

মিশরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা

সামাজিক জীবন

নগর সভ্যতার উদয়ের পর পৃথিবীতে শ্রেণীবিভাগ দেখা দেয়, এ কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সমগ্র মিশর সাম্রাজ্যের অধীনস্থ অঞ্চলের (সিরিয়াকে বাদ দিয়ে) জনসংখ্যা ছিল সত্তর লক্ষ। মিশরীয় সমাজের মানুষ ছিল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত॥ দাস এবং স্বাধীন মানুষ। স্বাধীন মানুষদের মধ্যেও আবার শ্রেণীভেদ ছিল। সবচেয়ে ওপরে ছিল রাজকীয় পরিবারের স্থান, তার নিচে ছিল পুরোহিত এবং অভিজাত শ্রেণী, তাদের নিচে স্থান ছিল লিপিকার, বণিক, কারিগর এবং অবস্থাপন্ন কৃষকদের। তারও নিচে ছিল ভূমিদাস এবং দরিদ্র কৃষকদের অবস্থান। এই বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মধ্যে ধনের বৈষম্য ছিল পর্বতপ্রমাণ।

রাজকীয় পরিবার, সভাসদ, ধর্মমন্দিরের পুরোহিত এবং ধনী ভূস্বামীরা বাস করতেন দামী আসবাবপত্র ও অন্যান্য মহার্ঘ সামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত প্রাসাদোপম অট্টালিকায়। বিলাসিতার সকল উপকরণ সেখানে তাঁদের জন্য জমা থাকত। প্রাসাদগুলোর সংলগ্ন ছিল ফুল ও ফলের বৃক্ষশোভিত সুন্দর উদ্যান, ঝর্নার পানি বয়ে যেত তার মধ্য দিয়ে, পাখির সুকণ্ঠি গীত শোনা যেত। প্রাসাদের অধিবাসীগণ তাঁদের প্রিয়জনদের সাথে হর্ষচিত্তে উপভোগ করতেন বীণার মধুর সঙ্গীত ও লাস্যময়ী, রূপসী তরুণীদের অনুপম নৃত্যভঙ্গিমা। কখনও তাদের দেখা যেত পাশা খেলায় মগ্ন হতে। ইতস্তত ক্রীড়ারত তাদের শিশুদের কলহাস্যের সাথে মিলিত তাদের হাসি, গান ও আনন্দের ধ্বনিতে যেন সেখানে স্বর্গের পরিবেশ সৃষ্টি হত।

এদের নিচুতে অবস্থানরত ব্যবসায়ী, কারিগর, লিপিকার এবং অবস্থাসম্পন্ন কৃষকদের জীবনে বিলাসিতার তেমন সমাবেশ না ঘটলেও তাদের জীবন ছিল মোটামুটি স্বচ্ছল।

সর্বনিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দরিদ্র কৃষক ও মজুরশ্রেণীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত দুঃসহ। তাদের বাড়িঘর ছিল খড় ও মাটির তৈরি। আসবাব বলতে ছিল কয়েকটি কাঠের বাক্স ও টুল। আর ছিল কিছু মাটির তৈরি হাঁড়ি বাসন ইত্যাদি। গ্রামে কৃষকদের সর্বদা কর আদায়কারী রাজকর্মচারীর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতে হত। শহরে শ্রমিকদের জোর করে ধরে নিয়ে সরকারি রাস্তা তৈরির কাজে বা রাজকীয় শস্যক্ষেত্রে অথবা পিরামিড তৈরির জন্যে বিরাট বিরাট পাথর বহনের কাজে লাগান হত।

www.icsbook.info

মিশরীয়দের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানা যায়। ধনীরা দামী পোশাক পরিধান করতেন, দরিদ্রদের মধ্যে অনেককে আবার অর্ধ-উলঙ্গ থাকতেও দেখা যেত। ধনীদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ কানে, গলায় ও হাতে অলঙ্কার পরিধান করতেন। মহিলাগণ প্রসাধনীও ব্যবহার করতেন।

বিবাহিত জীবনে অধিকাংশ পুরুষ একটি স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। অনেক ধনীর গৃহে আবার হারেম রক্ষিত হত। তবুও, মোটামুটিভাবে বিবাহিত জীবন পরিচ্ছন্ন ছিল। শিশুহত্যা, অবাঞ্ছিত সন্তান হত্যা ইত্যাদি সাধারণত ঘটত না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ খুব কমই হত এবং স্ত্রীকে ব্যাভিচারিণী প্রমাণ করতে পারলেই কেবলমাত্র স্বামী তাকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারতেন।

সমাজে নারীর স্থান ছিল অতি উচ্চে। পুরুষের সমান মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন নারী। সমাজের কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রবল প্রতাপ দেখা যেত। অনেক ক্ষেত্রে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাবও ছিল। সন্তানেরা মায়ের সূত্রে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত। মিশরের ইতিহাসে কয়েকজন নারী রাজ-সিংহাসনেও উপবেশন করেছিলেন।

সমাজে দাসদের অবস্থান ছিল সবার নিচে। সব স্বাধীন মানুষরা, এমন কি দরিদ্র ভূমিদাসরাও তাদের ঘৃণা করত।

অর্থনৈতিক জীবন

মিশরের অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। মিশরীয় কৃষি যথেষ্ট উন্নত ছিল। নীলনদকে বাঁধ দিয়ে বিস্তীর্ণ জমিতে চাঁষ করে গম, যব, যোয়ার, তরিতরকারি, শন, তুলা, আঙুর ও অন্যান্য নানা প্রকার ফল উৎপন্ন করা হত। প্রাচীন রাজত্বের প্রথম দিক থেকে মিশরে বিভিন্ন শিল্পের বিকাশ ঘটতে থাকে। খনিশিল্প, ধাতুশিল্প, জাহাজ নির্মাণ, মাটির পাত্র, সূতিবস্ত্র, কাঁচশিল্প, চামড়াশিল্প, আসবাবশিল্প প্রভৃতিতে মিশর খ্যাতি অর্জন করে। সুন্দর সুন্দর বর্ণোজ্জ্বল কাঁচের সামগ্রী, সূক্ষ্ম কারুকার্যশোভিত পাথরের বাটি ও অনুপম কারুকার্যবিশিষ্ট অলঙ্কার শিল্প উন্নত মানের শিল্পজ্ঞানের পরিচয় বহন করে। পণ্য উৎপাদনের জন্যে ক্রমশ কারখানার প্রচলন হয়। এক একটা কারখানায় কুড়ি পঁচিশ জন বা তারও বেশি লোক নিয়োজিত হত।

প্রাচীন রাজবংশের রাজত্বকালে মিশর ব্যবসা বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি অর্জন করে, ফারাওদের জাহাজগুলো নীলনদ বেয়ে আরও দক্ষিণে আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মেহগনি কাঠ ও হাতির দাঁত সংগ্রহ করে আনত। ভূমধ্যসাগরে চলাচলের উপযোগী মালবাহী জাহাজ মিশরীয়রাই প্রথম তৈরি করেছিল।

মিশরীয় সাম্রাজ্যের বাণিজ্য মোটামুটি চারটি পথে পরিচালিত হত ঃ (১) বাণিজ্য জাহাজ চলাচলের সুবিধার জন্যে মিশরীয় বদ্বীপের পূর্বাঞ্চলের সাথে লোহিত সাগরের সংযোগ সাধন করে একটি খাল কাটা হয়েছিল। এটি ছিল পূর্বাঞ্চলীয় বাণিজ্যপথ; (২) দক্ষিণের অঞ্চলের সাথে বাণিজ্য চলত নীলনদ দিয়ে; (৩) স্থলপথে বাণিজ্য যোগযোগ ছিল মেসোপটেমিয়া ও দক্ষিণ সিরিয়ার সাথে; (৪) জাহাজ পথে মাল আনা-নেয়া করা হত সিরিয়ার উত্তরাঞ্চল, গ্রীসের মূল ভূখণ্ড, ক্রীট ও ভূমধ্যসাগরের অন্যান্য দ্বীপগুলো থেকে। মিশরের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল গম, লিনেন ও স্বর্ণালঙ্কার এবং প্রধান

www.icsbook.info

আমদানিদ্রব্য ছিল উটপাখির পালক, ধাতুনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র, মসলা, সূক্ষ্ম কারুকার্যময় পর্দা বা ঢাকনি, কাঠ, সোনা ও রূপা।

ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমেই মিশর তার কৃষ্টি ও সভ্যতা বিস্তার করে। ক্রীটের রাজপ্রাসাদে মিশরীয় কারিগরদের সামগ্রী ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হত। সুন্দর সুন্দর মিশরীয় অলঙ্কার ও কাঁচদ্রব্যের ব্যাপক প্রচলন ছিল গ্রীসে। মিশরীয় ধর্ম ও শিল্পের মূল দিকগুলোর সাথে ঈজিয়ান দ্বীপের জনগণের পরিচয় ঘটেছিল বাণিজ্যের মাধ্যমে, যা পরবর্তীকালে গ্রীকদের ওপরও প্রভাব বিস্তার করেছিল। একই ভাবে মিশরীয় সভ্যতাও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সভ্যতার দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

মিশরীয় বিজ্ঞান

প্রাচীন মিশরে বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার বিশেষ প্রসার লাভ ঘটেছিল। অবশ্য ব্রোঞ্জযুগের নগরসভ্যতার পরিবেশে এ সকল আবিষ্কার ঘটেছিল বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত। কারণ, ব্রোঞ্জযুগের সমাজে নানাবিধ সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা থেকেই এ সকল আবিষ্কারের সূচনা হয়েছিল। প্রাচীন মিশর ও মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন আবিষ্কারের সামাজিক পটভূমি আলোচনা করলে এ কথার সত্যতা পরিষ্কার বোঝা যাবে। মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা বলতে সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিরীয় ইত্যাদি সভ্যতাকে বোঝান হচ্ছে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মিশরীয়রা জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতচর্চায় যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। বাস্তব প্রয়োজন থেকেই বিজ্ঞানের এই দু' শাখার চর্চা হয়েছিল। আকাশে সূর্য এবং নক্ষত্রের অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে ঋতু পরিবর্তনের যে সম্পর্ক আছে, এ কথা নতুন পাথরের যুগের কৃষকরাই আবিষ্কার করেছিল। এ জ্ঞান ছাড়া কৃষি সভ্যতাই অচল। কারণ, কখন বৃষ্টি হবে, কখন শস্য বুনতে হবে॥ এ সব কথা আগে থেকে স্থির করতে না পারলে কৃষিকাজ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। বোর্নিওর কৃষিজীবী উপজাতীয় মানুষরা মাঠে একটা লম্বা কাঠের দণ্ড পুঁতে প্রত্যহ তার ছায়া পর্যবেক্ষণ করে। অভিজ্ঞতা থেকে তারা জানে যে, ছায়া যখন দীর্ঘতম হয়ে তারপর কমতে শুরু করে তখন চাষের জমি প্রস্তুত করার সময় হয়। আবার, নগরসভ্যতার বিস্তারের পর মিশরে নীলনদের বন্যার তারিখ এবং ঋতু পরিবর্তনের কাল নিখুঁতভাবে নিরূপণের জন্যে নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ ছাড়া পিরামিড ও মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা ও হিসাব, সেচ প্রকল্পের পরিকল্পনা, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনা প্রভৃতির জন্য গণিত চর্চারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। জমির পরিমাণ ও সেচের পানির অনুপাতে কর সংগ্রহ, রাজ ভাণ্ডারে মজুদ সম্পদের পরিমাণ নিরূপণ, ঋণের হিসাব প্রভৃতি বাস্তব প্রয়োজনের চাপে গণিতশাস্ত্র ও হিসাবশাস্ত্রের উদ্ভব ও উন্নতি ঘটে। শ্রেণীবিভক্ত নাগরিক সমাজে সম্রাট ও পুরোহিতবর্গের সম্পদের হিসাব লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন থেকে লেখার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এ সম্পর্কে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। অপরদিকে, সম্পদের ভাগাভাগি, ব্যবসায়ে লাভের ভাগাভাগি প্রভৃতির হিসাবের প্রয়োজনে মিশরে ও ব্যবিলনে ভগ্নাংশের আবিষ্কার একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নগর সভ্যতার আগে পর্যন্ত ভগ্নাংশের ধারণা মানুষের কাছে অজানা ছিল।

www.icsbook.info

প্রাচীন মিশরে বিভিন্ন কারখানার কাজের দৃশ্য ঃ প্রাচীন মন্দিরের দেয়াল চিত্র থেকে নেয়া। ছবিতে দড়ি, কাঠের বাক্স ইত্যাদি তৈরি; ইট ও গৃহনির্মাণ; ব্রোঞ্জ ঢালাই; মাটির পাত্রে রং করা, মূল্যবান ধাতু মাপা ইত্যাদি কাজের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

জ্যোতির্বিদ্যা

মিশরীয়রা অবশ্য বিশুদ্ধ বিজ্ঞানী ছিল না। বিশ্বজগতের প্রকৃত চিত্র জানার জন্যে তারা কখনও চেষ্টা করেনি। তাই জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রেও তারা খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। তবে তারা 'সৌর-পঞ্জিকার' আবিষ্কার ও ক্রমে তার উন্নতি সাধন করেছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, লুব্ধক নক্ষত্রের আবির্ভাবকাল পর্যবেক্ষণ করে প্রাক্-রাজবংশ কালের মিশরীয়রা ৩৬৫ দিনে বছর গণনার রীতি প্রবর্তন করে। তার আগে মিশরীয়রা

www.icsbook.info

চান্দ্রমাসের ভিত্তিতে বছরের হিসাব রাখত। কিন্তু চান্দ্রমাসের হিসাব যে ত্রুটিপূর্ণ, তা' তারা বুঝতে পারে নীল নদের বন্যার তারিখ মেলাতে গিয়ে। কারণ, নীলনদের বন্যা বছরের একটা নির্দিষ্ট দিনে হত; কিন্তু চান্দ্রমাসে বছর পুরো হয় না। তবে ৩৬৫ দিনের বছরের হিসাবেও একটু ভুল রয়ে গিয়েছিল। প্রকৃত সৌরবছরের দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা ৯ মিনিট ৯.৫ সেকেণ্ড অর্থাৎ মিশরীয় বছর প্রকৃত বছরের চেয়ে প্রায় সিকি দিন ($\frac{১}{৪}$ দিন) কম। প্রতি বছরে $\frac{১}{৪}$ দিন কম ধরলে প্রতি চার বছরে এক দিন বা ১৪৬১ (=৩৬৫ $\frac{১}{৪}$ × ৪) বছর পরে পুরো একটি বছরের পার্থক্য হয়। অর্থাৎ নতুন বছরের প্রথম দিন একবার লুব্ধক নক্ষত্র দেখা দেবার পর লুব্ধক নক্ষত্রের আবির্ভাবের সময় প্রতি বছর একটু একটু করে পিছিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে ১৪৬১ বছর পার হলে আবার ঠিক বছরের আরম্ভের দিন দেখা দেয়। প্রতি ১৪৬১ বছর পরপর এটা ঘটতে থাকে। অবশ্য এ অসঙ্গতি দূর করার জন্যে মিশরীয়রা এত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করত না, প্রতি চার বছর অন্তর ৩৬৫ দিনের পরিবর্তে ৩৬৬ দিনে বছর গণনা করে তারা নীলনদের বন্যার সাথে, অর্থাৎ ঋতুর সাথে বছরের হিসাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করত। এ অর্থে বলতে গেলে আমরা যাকে 'লিপ-ইয়ার' বলি তা' মিশরীয়দেরই আবিষ্কার।

মিশরীয়রা বিভিন্ন স্থির নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করতে পেরেছিল, বিভিন্ন নক্ষত্রমণ্ডল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছিল, নক্ষত্র-মানচিত্র রচনায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। ধ্রুব নক্ষত্রের নিকটবর্তী নক্ষত্রদের তারা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে। ধ্রুব নক্ষত্রের সাহায্যে দিকনির্ণয় করে তারা পূর্বমুখী মন্দির বা পিরামিড ইত্যাদি নির্মাণ করত।

মিশরীয়রা নক্ষত্রের গতি পর্যবেক্ষণের জন্যে একটা সরল ধরনের সুন্দর যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিল। একটা খেজুর পাতার মাঝখানে খানিকটা অংশ লম্বালম্বিভাবে কেটে তার ফাঁক বরাবর একটা ওলনদড়ি বা লম্বসূত্র ঝুলিয়ে দেয়া হত এবং একটা নক্ষত্র যখন সূতোটিকে অতিক্রম করত তখন সে ক্ষণটিকে লিপিবদ্ধ করা হত।

মিশরীয়রা সূর্যের আলোর ছায়া মেপে দিনের সময় নিরূপণের যন্ত্রও আবিষ্কার করেছিল। এটাকে বলা চলে ছায়াঘড়ি বা সূর্যঘড়ি। মিশরের সূর্যঘড়ি অবশ্য অনেক আগের আবিষ্কার; তবে সত্যিকার যে একটা পাথরের নির্মিত ছায়াঘড়ি পাওয়া গেছে, তা ১০০০ খিস্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ের। প্রায় এক ফুট লম্বা একটি পাথরের পাতের এক প্রান্তে খাড়া আরেকটা দণ্ড বা পাত সংযুক্ত আছে। নিচের ফলকটির গায়ে একটু পরপর দাগ কাটা আছে, খাড়া পাতটির ছায়া দাগ কোন বরাবর পড়লে কত সময় হয় তা জানা আছে। সকালে যন্ত্রটিকে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি করে বিছিয়ে দেয়া হয়, খাড়া অংশটি থাকে পূর্ব প্রান্তে; দুপুরের পর যন্ত্রটিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় পূর্বমুখী করে যাতে পশ্চিমের সূর্যের ছায়া পড়তে পারে। এর কিছুকাল পরে আরেকটু উন্নত ধরনের ছায়াঘড়ি আবিষ্কৃত হয়। এটি কাঠের নির্মিত এবং এতে খাড়া দণ্ডটি থাকে যন্ত্রের মাঝখানে, আর নিচের তক্তাটি থাকে দু'পাশে বিস্তৃত হয়ে। এটিকে তাই আর দুপুরের পর ঘুরিয়ে দিতে হয় না, পূর্বাহ্ণে ছায়া পড়ে পশ্চিমের অংশে, অপরাহ্ণে ছায়া পড়ে পূর্বের অংশে। এ যন্ত্রটি এখনো সময় মাপার কাজে মিশরে ব্যবহৃত হয়। ছায়াঘড়ি রাতে অচল, তাই মিশরীয়রা সময় মাপার অন্য যন্ত্রও আবিষ্কার করেছিল। এটা হল পানিঘড়ি বা জলঘড়ি— গ্রীকরা যার নাম দিয়েছিল 'ক্লেপসিড্রা।' গ্রীক ভাষায় ক্লেপসিড্রা মানে

www.icsbook.info

হল, 'পানি অপহারক'; পানি চুরি করে বলেই যন্ত্রটির এ নাম। কর্ণাকের মন্দিরে একটি পানিঘড়ি পাওয়া গেছে, এটি প্রায় ১৪০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে নির্মিত। এ ঘড়িটি আসলে একটি পাত্র, যার তলায় একটি ফুটো আছে। ফুটো দিয়ে অল্প অল্প করে পানি বের হয়ে যায় এবং পাত্রে পানির উচ্চতা ক্রমশ কমতে থাকে। পাত্রের ভিতর দিককার গায়ে দাগ কাটা আছে। পানির উপরিভাগ কোন দাগের কাছে কাছে সেটা দেখে বোঝা যায় কতক্ষণ সময় পার হয়েছে। ভর্তি পাত্রে পানির উচ্চতা বেশি বলে পানি তাড়াতাড়ি বের হয় এবং আধা-খালি পাত্র থেকে পানি আস্তে আস্তে বের হয়। ফুটো দিয়ে পানি নির্গত হবার বেগ যাতে সমান হয় এ উদ্দেশ্যে তাই পাত্রটির নিচের দিকের চেয়ে ওপরের দিককে চওড়া করা হয়েছে। এর ফলে পানির উচ্চতা সমান হারে কমতে থাকে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে, প্রাচীন কালে আরেক রকম সময় নিরূপক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। একটা পানিভর্তি পাত্রে একটা ছোট ছিদ্রবিশিষ্ট বাটি বসিয়ে দিলে ক্রমশ সেটি পানি ভর্তি হয়ে ডুবে যাবে। বাটি পানি ভর্তি হয়ে ডুবতে কত সময় লাগে জানা থাকলে সহজেই সময় মাপা যায়। আলজিরিয়াতে খেতে পানি দেবার সময়ের পরিমাপ নিরূপণের জন্যে এখনো এ রকম যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশেও কিছু কাল আগে পর্যন্ত পানিতে ছিদ্রবিশিষ্ট ঘটি বসিয়ে অনুরূপ পদ্ধতিতে সময় মাপা হত।

পাটীগণিত ও জ্যামিতি

গণিতশাস্ত্রের ক্ষেত্রে পাটীগণিত ও জ্যামিতিতে মিশরীয়রা কিছুদুর অগ্রসর হয়েছিল এবং এসব ক্ষেত্রে তাদের মৌলিক অবদানও কিছু কিছু আছে। অবশ্য মিশরীয়দের পাটীগণিত ছিল ব্যবিলনীয় বীজগনিত ও পাটীগণিতের তুলনায় নিকৃষ্ট। তবে মিশরীয়দের অনুসৃত পদ্ধতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছিল অভিনব।

প্রাচীন মিশরের গণিতচর্চা সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি কয়েকটা প্রাচীন মিশরীয় পাণ্ডুলিপি বা 'প্যাপিরাস' থেকে। মিশরীয়রা নলখাগড়ার ছাল থেকে এক রকম কাগজ তৈরি করতে শিখেছিল, তাকেই বলে প্যাপিরাস। মস্কোয় রক্ষিত 'মস্কো প্যাপিরাস' এবং ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত 'রাইণ্ড প্যাপিরাস' বা 'আহমেস্ প্যাপিরাস' থেকে আমরা মিশরীয় গণিত সম্পর্কে জানতে পেরেছি। উভয় পাণ্ডুলিপিই ১৫০০ বা ১৭০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে লিখিত। রাইণ্ড প্যাপিরাসের রচয়িতা 'আহমেস্' নামক একজন পুরোহিত।

মিশরীয়দের অঙ্কপাতন পদ্ধতি ছিল দশমিক অর্থাৎ দশভিত্তিক। তারা এক, দশ, শত, সহস্র প্রভৃতি সংখ্যা নির্দেশ করতে বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করত।

এক, দশ, একশ প্রভৃতির মধ্যবর্তী সংখ্যা লেখার জন্যে একই প্রতীককে বারবার ব্যবহার করা হত।

মিশরীয়রা যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ॥ এই চার প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিত ছিল। মিশরীয়দের গুণের প্রক্রিয়া একটু অভিনবই ছিল। তারা গুণ্য ও গুণককে বারবার দ্বিগুণ করে দুই সারিতে লিখত। তারপর গুণ্যের সারি থেকে প্রয়োজন মতো সংখ্যাগুলোকে যোগ করত। যেমন ২৭-কে ১৩ দিয়ে গুণ করতে হলে তারা নিচের পদ্ধতি অনুসরণ করত ঃ

www.icsbook.info

× ১	২৭
২	২৭
× ৪	১০৮
× ৮	২১৬
১৩	৩৫১

যেহেতু ১ + ৪ + ৮ = ১৩, সে কারণে ২৭-এর ১ গুণ, ৪ গুণ এবং ৮ গুণ সংখ্যাকে যোগ করলেই ২৭-এর ১৩ গুণ সংখ্যাকে পাওয়া যাবে।

মিশরীয়রা ভগ্নাংশের সাথে পরিচিত ছিল, তবে আমাদের মতো অনায়াসে ভগ্নাংশ লিখতে তারা পারত না। একাংশ (অর্থাৎ যেসব ভগ্নাংশের লব ১ সেগুলো) ছাড়া অন্য ভগ্নাংশ তাদের কাছে খুব বেশি অর্থবহ ছিল না। মিশরীয়রা তাই ভগ্নাংশের জন্যে কতগুলো তালিকা ব্যবহার করত।

জ্যামিতিতে মিশরীয়রা যথেষ্ট উন্নতি অর্জন করেছিল। ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বহুভুজ ও বৃত্তের ক্ষেত্রফল এবং সিলিণ্ডার, পিরামিড প্রভৃতির ঘনফল তারা নির্ণয় করতে পারত। বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতের প্রায় সঠিক মান তারা বের করতে সক্ষম হয়েছিল।

পিরামিডের ওপরের অংশকে কেটে বাদ দিলে যে অংশ থাকে তার নাম ফ্রাস্টাম। মিশরীয়রা ফ্রাস্টাম-এর আয়তন করতে পারত।

চিকিৎসাবিদ্যা

মধ্য রাজত্বের কাল থেকে মিশরীয়রা চিকিৎসাবিদ্যায় কিছু অগ্রগতি অর্জন করে। তার আগে চিকিৎসাবিদ্যা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। ১৭০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের একটি দলিল থেকে জানা যায় যে, ঐ সময়ে মিশরীয়রা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসাবিদ্যায় কিছুটা দক্ষতা অর্জন করেছিল। এ সময় মিশরে চক্ষুরোগ, দাঁতের রোগ, পেটের পীড়া, শল্যবিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা অনেক মূল্যবান বিষয় আবিষ্কার করেন। মিশরীয় চিকিৎসকরা হৃৎপিণ্ড ও নাড়ির তাৎপর্য আবিষ্কার করেন। মিশরীয় চিকিৎসাবিদরা রেচক ওষুধ আবিষ্কার করেন এবং অনেক বিভিন্ন ওষুধের রোগ-নিরাময়ক গুণ লিপিবদ্ধ করেন এবং 'মেটিরিয়া মেডিকা' বা ওষুধের তালিকা প্রণয়ন করেন।

বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে মিশরীয়রা খুব বেশি উন্নতির পরিচয় দিতে পারেনি। স্থাপত্যশিল্প ও পিরামিড নির্মাণে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিলেও পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের কোনো স্বচ্ছ জ্ঞান ছিল না। তবে, ধাতুশিল্পের উন্নতি সাধন, কাগজ তৈরি, কাঁচ নির্মাণ, সূর্যঘড়ি আবিষ্কার প্রভৃতি কৃতিত্বের দাবি মিশরীয়রা করতে পারে নিঃসন্দেহে।

মিশরীয় শিল্পকলা

প্রাচীন মিশরের শিল্পচর্চার অনুরূপ প্রকাশ ঘটেছিল স্থাপত্যশিল্পে। প্রাচীন মিশরের পিরামিড ও মন্দিরসমূহ স্থাপত্যবিদ্যায় মিশরীয়দের চরম উৎকর্ষের নির্দশন বহন করছে। মিশরে চিত্রাঙ্কন এবং ভাস্কর্যেরও বিকাশ ঘটেছিল। তবে তা ছিল মূলত স্থাপত্যশিল্পের সাথে যুক্ত।

www.icsbook.info

মিশরের পিরামিডের বর্ণনা আগেই দেয়া হয়েছে। কুড়ি বাইশ লাখ বিশাল পাথরের টুকরোকে নিখুঁতভাবে জোড়া দিয়ে দিয়ে চার পাঁচশো ফুট উঁচু পিরামিড তৈরি করতে যে বিজ্ঞান ও কারিগরি কৌশল জানা আবশ্যক, তা তারা আয়ত্ত করেছিল। পিরামিডের তাৎপর্য অনুধাবন করা খুব কঠিন। তবে পিরামিড নির্মাণের পেছনে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বিশেষ আছে বলে বোধ হয় না, বরং তার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় তাৎপর্য থাকতে পারে। পিরামিড সম্ভবত ছিল দেশের ও জাতির চিরস্থায়িত্বের প্রতীক। প্রাচীন মিশরে ফারাওকে মনে করা হত সমগ্র জীবনের মূর্ত রূপ। সুবিশাল পিরামিডের অভ্যন্তরে ফারাওয়ের মৃতদেহ বা মমিকে সংরক্ষিত রাখার রীতি হয়তো এ বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতি রেখে গড়ে উঠেছিল।

মধ্য ও নতুন রাজত্বের কালে পিরামিডের পরিবর্তে সুবিশাল মন্দিরসমূহ মূল স্থাপত্য কীর্তিরূপে স্থান অধিকার করে। ফারাওয়ের মৃতদেহকে মমিরূপে রাখার প্রবণতা এ যুগে দেখা যায় না, ফারাওকে সমগ্র জাতির প্রতীক হিসাবে দেখার প্রবণতাও লোপ পেয়েছিল। অপর পক্ষে জাতীয় পরাক্রম এবং স্থায়িত্বের প্রকাশ হিসাবে সুবিশাল আকারে মন্দির নির্মাণের রীতি প্রচলিত হয়। কর্ণাকের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনো নতুন রাজত্বের যুগের অত্যুচ্চ শিল্পরীতি ও কৌশলের পরিচয় বহন করছে।

প্রাচীন মিশরীয় মন্দিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার সুবিশাল আকৃতি। কর্ণাকের মন্দিরের দৈর্ঘ্য ছিল ১৩০০ ফুট। এ বিশাল মন্দিরের কেন্দ্রীয় হল ঘরেই ইউরোপের যে কোনো বড় গীর্জার স্থান অনায়াসে হতে পারত। কিন্তু মিশরীয় পুরোহিতবর্গ এতেও তৃপ্ত হয়নি। কৃত্রিম পদ্ধতি প্রয়োগ করে তারা এ মন্দিরকে আরও বৃহৎরূপে প্রতিভাত করে তোলার চেষ্টা করেছে। যেমন, মন্দিরের ছাদের উচ্চতা প্রবেশ দ্বার থেকে শুরু করে পিছনের দিকে ক্রমশ নামিয়ে আনা হয়েছিল, যাতে মন্দিরে প্রবেশ করলে মনে হয় মন্দিরের মেঝে অসীম দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মন্দিরের স্তম্ভগুলো ছিল সুবিশাল আয়তনের। সবচেয়ে বড় স্তম্ভগুলো ছিল সত্তর ফুট উঁচু আর সেগুলোর পরিধি ছিল ২০ ফুটেরও বেশি। হিসাব করে দেখা গেছে যে, এসব স্তম্ভের মাথায় একশো জন লোকের দাঁড়াবার জায়গা ছিল। মন্দিরের দেয়ালও ছিল চার পাঁচ ফুট চওড়া। অশক্ত বা দুর্বল মালমশলা দিয়ে মন্দির নির্মিত হয়েছিল বলে যে মন্দিরের দেয়াল ও থামগুলোকে চওড়া করতে হয়েছিল, তা নয়। বস্তুত মিশরীয়রা সবচেয়ে শক্ত পাথর ছাড়া অন্য কিছুই ব্যবহার করত না। তাই মনে হয়, রাজকীয় গৌরব, জাতীয় গর্ববোধ এবং রাষ্ট্রের পরাক্রম ও স্থায়িত্বের প্রতীকরূপেই এ ধরনের নির্মাণরীতি অবলম্বন করা হয়েছিল।

প্রাচীন মিশরে ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কনশিল্প প্রধানত স্থাপত্যশিল্পের অনুসঙ্গী রূপেই উদিত হয়েছিল। পিরামিড ও মন্দিরের অভ্যন্তরে স্থাপন ও মন্দির গাত্র অলঙ্করণের প্রয়োজনেই এ সকল শিল্পরীতির প্রবর্তন হয়েছিল। মিশরীয় ভাস্কর্যের সুপরিচিত দৃষ্টান্ত হচ্ছে সম্রাটদের সুবিশাল মূর্তি। নতুন রাজত্বের আমলে যে সব মূর্তি নির্মিত হয়েছিল সেগুলো ছিল পঁচাত্তর থেকে নব্বই ফুট পর্যন্ত উঁচু। ফারাওদের এ সকল বিশাল মূর্তির মধ্য দিয়ে তাদের এবং তাদের রাষ্ট্রের পরাক্রম ও শক্তিকেই প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছে। একই প্রয়াসের প্রকাশ দেখা যায় প্রাচীন আমলের 'স্ফিংস্'-এর মূর্তিতে। সিংহের দেহে ফারাওয়ের মুখ বসিয়ে দিলে হয় স্ফিংস। ফারাও যে সিংহের মতোই সাহসী ও শক্তিধর, স্ফিংস প্রতীকটির মধ্য দিয়ে এ ভাবটিই পরিস্ফুট করার চেষ্টা হয়েছে।

www.icsbook.info

মিশরীয় চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ নির্দশন হচ্ছে ইখ্‌নাটনের আমলের ও তাঁর ঠিক পরের আমলের চিত্রসমূহ। এ আমলের দেয়ালচিত্রে শিল্পীরা তাঁদের পরিচিত জগৎকে আশ্চর্য সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন। যেমন, জলাভূমির ছুটন্ত ষাঁড়, পলায়নরত হরিণ, ফুল ও ফলশোভিত গাছ প্রভৃতির রঙিন ছবি তখনকার মন্দিরের দেয়ালসমূহকে সুশোভিত করেছিল।

মিশরীয় চিত্রকলার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে মানুষের ছবি আঁকার ক্ষেত্রে। মানুষের চেহারা আঁকার সময়ে প্রাচীন মিশরীয় শিল্পীরা মুখের পার্শ্বভাগ এবং সম্মুখভাগ একই সাথে আঁকত। যেখানে অনেক মানুষের ছবি আঁকা হত সেখানে প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ছবি অন্যদের চেয়ে বড় আকারে আঁকা হত। অভিজাত ব্যক্তিদের চেহারাকে বাস্তবসম্মত ভাবে না এঁকে আদর্শ চেহারা রূপে আঁকা হত। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে রাজা বা অভিজাত ব্যক্তিদের চেহারার কোনো বিশেষ লক্ষণ থাকলে ঐ বৈশিষ্ট্যকে আঁকা চলত। মানুষের ছবি আঁকার সময় একটা অনুপাতের নিয়ম মেনে চলা হত। যেমন, চিত্রের পুরো দৃশ্যপটকে অনেকগুলো বর্গাকার ছকে বিভক্ত করা হত এবং একজন অভিজাত পুরুষ বা মহিলার ছবি কতগুলো ছক জুড়ে আঁকতে হবে তা আগে থেকেই ঠিক করা থাকত।

মিশরীয় চিত্রকলার যে রীতি মানুষের ছবি আঁকার ক্ষেত্রে অনুসৃত হত, অন্যান্য দৃশ আঁকার ক্ষেত্রেও ঐ একই রীতির অনুসরণ করা হত। অর্থাৎ, যে দৃশ্যের ছবি আঁকা হচ্ছে, ঐ স্থানে অবস্থানরত একজন দর্শকের চোখে দৃশ্যটা যেমন দেখাবে, ছবিটা সে অনুযায়ী আঁকা হবে না; ছবিটা আঁকা হবে ঐ দৃশ্যের উপাদানগুলোর প্রকৃত রূপ যেমন, সে অনুযায়ী। এ কথাটা মানুষ, পশুপাখি, ঘরবাড়ি সবকিছু সম্পর্কেই প্রযোজ্য। যেমন, প্রাচীন মিশরীয় চিত্রে ঘরবাড়ির ছবি আঁকা হত অংশত নকশার আকারে, অংশত উচ্চতা প্রদর্শন করে। আবার, গাছে ঘেরা একটা পুকুরের ছবি হয়তো এমন ভাবে আঁকা হত, যেমনটা আমরা দেখতে পাব ওপর থেকে পুকুরের দিকে তাকালে— একটা সমতলীয় পানির স্তরের মতো। ছইয়ে ঢাকা বড় নৌকায় করে গরুর পাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে— এ দৃশ্যটাকে প্রাচীন মিশরীয় চিত্রে আঁকা হবে এমন ভাবে যে মনে হয় গরুগুলো নৌকার ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যদিও বুঝে নিতে হবে যে, আসলে গরুগুলো দাঁড়িয়ে আছে ছইয়ের ওপরে নয়, ভেতরে। একই ভাবে, জাল পেতে পাখি ধরার দৃশ্য আঁকতে গিয়ে প্রাচীন মিশরীয় শিল্পীরা জালটাকে সমতলীয়ভাবে আঁকতেন, যাতে জালে আটকা পড়া পাখিগুলোকে স্পষ্টভাবে দেখতে ও গুণতে পারা যায়।

মিশরীয় শিল্পীরা বর্ণনামূলক বা ঘটনাপূর্ণ দৃশ্যের ছবি আঁকার জন্যে আনুভূমিক ছকের সাহায্য নিতেন। আমাদের রুলটানা কাগজের মতো আনুভূমিক সারিতে সাজিয়ে তাঁরা ছবি আকতেন। অনেক সময় বর্ণনামূলক চিত্রের বিভিন্ন উপাদানকে পৃথক করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন, একই ছবিতে আঙুরের খেত, যুদ্ধের দৃশ্য, ফসল কাটার দৃশ্য দেখানো হয়েছে, কোথায় কোনটার শুরু, কোথায় শেষ বোঝা যায় না।

কাছের আর দূরের জিনিসের ছবি আঁকার জন্যে বর্তমান কালের শিল্পীরা যে চিত্রানুপাত বা পার্সপেক্‌টিভ্‌ (ণেব্র্রযণর্ড ধশণ)-এর কৌশল অবলম্বন করেন, প্রাচীন মিশরীয় শিল্পীদের নিকট তা অজানা ছিল। দৃশ্যস্থলে উপস্থিত কোনো দর্শকের সবচেয়ে

www.icsbook.info

কাছের বস্তুগুলোকে চিত্রপটের নিচের অংশে আঁকা হত, আর ক্রম অনুসারে দূরের জিনিসকে ক্রমশ পটের ওপরের অংশে আঁকা হত॥ কাছের আর দূরের আঁকার জন্যে একই পরিমাপ (ওডটফণ) ব্যবহার করা হত। অর্থাৎ, এখনকার শিল্পীরা যেমন কাছের জিনিসকে বড় আর দূরের জিনিসকে ছোট করে আঁকেন, প্রাচীন মিশরীয় শিল্পীরা তা করতেন না। তাঁরা কাছের গরুটাকে চিত্রপটের নিচের দিকে আঁকতেন আর দূরের গরুটাকে পটের উপরের অংশে আঁকতেন। কিন্তু দুটো গরুর ছবিই সমান আকারের এবং একই মাপের হত।

লেখন ও লিপি

ব্রোঞ্জযুগের নগর সভ্যতার একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার হল লেখন পদ্ধতি ও লিপির আবিষ্কার। নগর সভ্যতার উদয়ের পর মেসোপটেমিয়া ও মিশরের মন্দির ও রাজবাড়িতে এত প্রভূত সম্পদ জড়ো হয়েছিল যে, তার হিসাব রাখার একটা ব্যবস্থা না করলেই চলছিল না। শুধু তো সম্পদের হিসাব রাখা নয়, ব্যবসায়ী বা অন্যান্য মানুষকে যেসব জিনিস ঋণ, সাহায্য বা অগ্রিম হিসাবে দেয়া হত, তা ফিরে পাবার জন্যে শুধু স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে থাকা নগর সভ্যতায় সম্ভব ছিল না। প্রথম প্রথম ছবির সাহায্যে এ সব হিসাব রাখা হত। যেমন পাঁচটা ভেড়ার ছবি বা ভেড়ার মাথা আঁকলে বোঝানো যেত যে পাঁচটা ভেড়ার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এটাকে ঠিক লিপি বলা চলে না। এটা হল আসলে স্মৃতি-সহায়ক লিপি। ছবির সাহায্যে শুধুমাত্র কোনো কোনো ভাব প্রকাশ করে চলে, তাই এটাকে বলা হয় ভাবব্যঞ্জক লিপি বা চিত্রলিপি।

আমরা যে পদ্ধতিতে লিখি তাকে বলা হয় 'ধ্বনিলিপি'। ধ্বনিলিপিতে এক এক রকম চিহ্ন দিয়ে এক এক রকম ধ্বনি বোঝান হয়। ফলে, কথা বলার সময় আমরা যে রকম শব্দ উচ্চারণ করি, ধ্বনিলিপিগুলো পড়ে গেলেও সে রকম শব্দ উৎপন্ন হয়। কারণ তাতে ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণমালা আছে। ইংরেজি ফরাসি জার্মান প্রভৃতি পৃথিবীর অধিকাংশ লিখিত ভাষাই বর্ণমালাভিত্তিক। কিন্তু এটা ধ্বনিলিপির সবচেয়ে উন্নত পর্যায়। বর্ণমালা ছাড়াও ধ্বনিলিপি সম্ভব। তাদের বলা হয় 'শব্দাংশ' (ওহফফটঠফণ) বা অক্ষরভিত্তিক ধ্বনিলিপি। যেমন, দাঁড়কাক লিখতে আমরা যদি একটা দাঁড় এবং একটা কাকের ছবি বসিয়ে দিই এবং পরপর পড়ে যাই দাঁড়কাক তাহলে এটা হবে অক্ষরভিত্তিক ধ্বনিলিপির একটা দৃষ্টান্ত। বাস্তবেও এভাবেই চিত্রলিপি থেকে প্রথমে অক্ষরলিপি এবং তারপরে ক্রমশ বর্ণমালার আবিষ্কার হয়েছিল।

ব্রোঞ্জযুগে মেসোপটেমিয়ার সুমের অঞ্চলে এবং মিশরে প্রায় একই সময়ে (আজ থেকে পাঁচ ছ'হাজার বছর আগে) অক্ষরভিত্তিক ধ্বনিলিপির প্রচলন হয়েছিল। মিশরের লিপিকে বলা হয় 'হায়ারোগ্লিফ' (Hieroglyph); এর অর্থ 'পবিত্র লিপি'। সুমের ও পরবর্তিকালে ব্যবিলনিয়ার লিপিকে বলা হয় 'কিউনিফর্ম'। ব্যবিলনিয়ার নরম মাটির চাকতির উপর সরু কাঠি দিয়ে লিখে চাকতিগুলোকে পুড়িয়ে শক্ত করা হত। লেখাগুলো তাই দেখতে হত কীলকের মতো। তাই এ লেখাগুলোর নাম দেয়া হয়েছে 'কীলকলিপি' বা কিউনিফর্ম(Cuneiform)। এ দু' ধরনের লিপিরই যে চিত্রলিপি থেকে উদ্ভব হয়েছে তা লিপিগুলোর ক্রমবিবর্তন দেখলেই বোঝা যায়। মিশরের হায়ারোগ্লিফ লিপিতে পাখি,

www.icsbook.info

মানুষ, চাবুক, আঙুল ইত্যাদির ছবি অপরিবর্তিত আকারেই রয়ে গেছে। কিন্তু দেখতে ছবি হলেও এগুলো আসলে ধ্বনির প্রতীক, পাখি বা মানুষ ইত্যাদির প্রতীক নয়। যেমন ইংরেজি 'বী' (ঈণণ) শব্দের অর্থ মৌমাছি। এ শব্দটি যদি প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় হত তবে তারা হায়ারোগ্লিফ লিপিতে মৌমাছির ছবি দিয়ে 'বী' ধ্বনিটিকে বোঝাত, মৌমাছিকে নয়। সুমেরীয় ভাষা থেকে দৃষ্টান্ত নিলে আমরা দেখব, এ ভাষায় 'টি' শব্দটির অর্থ ছিল দুটো॥ তীর এবং জীবন। এখন, তীরের চিহ্ন আঁকা যত সহজ, জীবনের প্রতীক আঁকা তত সহজ নয়। কিউনিফর্ম লিপি যখন চিত্রলিপি থেকে অক্ষরভিত্তিক ধ্বনিলিপিতে রূপান্তরিত হয় তখন তীরের ছবি এঁকে জীবনকে বোঝান চলত। কারণ, তীরের ছবি এখন আর তীরের প্রতীক নয়, 'টি' ধ্বনিটির প্রতীক এবং 'টি' শব্দের অর্থ জীবনও হতে পারে।

ব্রোঞ্জযুগের নগর সভ্যতা লেখন পদ্ধতি ও লিপি ছাড়া অচল হত। ব্রোঞ্জযুগের বিভিন্ন নগর সভ্যতায় অক্ষরভিত্তিক ধ্বনিলিপির প্রচলন দেখা যায়। আবার, ব্রোঞ্জযুগের সামাজিক অবস্থাও লেখন পদ্ধতির আবিষ্কারের অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু অনুকূল সামাজিক পরিস্থিতি থাকলেই যে একটা জটিল আবিষ্কার সহজ হতে পারে এমন নয়। অর্থাৎ এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে, প্রাচীন কালে যত জায়গায় ব্রোঞ্জযুগের নগর সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল সব জায়গাতেই লেখন পদ্ধতি ও লিপির আবিষ্কার নতুন করে পৃথক পৃথক ভাবে ঘটতে পারত। কারণ, লেখন পদ্ধতির মতো জটিল একটা বিষয় আবিষ্কৃত হবার জন্যে অনুকূল পরিবেশ ছাড়াও আরো অনেক জটিল শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক। যেমন, লেখন পদ্ধতির আবিষ্কারের জন্যে ভাষাতত্ত্বের দিক থেকেও কতগুলো শর্ত পূরণ হওয়ার দরকার ছিল। প্রাচীনকালে প্রচলিত সব ভাষাই লেখন পদ্ধতির জন্ম দেবার অনুকূল ছিল না। পুরাতত্ত্ববিদ স্যার লেনার্ড উলি 'হিস্ট্রি অব ম্যানকাইণ্ড' গ্রন্থে পুরাতত্ত্বের সাক্ষ্য থেকে সুন্দর ভাবে প্রমাণ করেছেন যে, দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার সুমের অঞ্চলেই প্রথম লেখন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছিল। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, সুমেরীয় ভাষা লেখন ও লিপির উদ্ভবের অনুকূল ছিল। সুমেরীয় ভাষার মূল শব্দ অধিকাংশই ছিল এক বা দুই সিলেব্‌ল্‌বিশিষ্ট। ফলে ঐ সব শব্দের চিত্ররূপসমূহকে পাশাপাশি স্থাপন করলে এবং পর পর পড়ে গেলে নতুন শব্দ গঠিত হতে পারে, ঠিক যেভাবে পর পর ধ্বনি উচ্চারণ করলে শব্দ উচ্চারিত হয়। এ সকল বিবেচনা থেকে লেনার্ড উলি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, প্রাচীন মেসোপটেমিয়াতেই প্রথম লেখন পদ্ধতি ও ধ্বনি লিপির উদ্ভব হয়েছিল। আমরা মনে করি, পরে সেখান থেকে তা' মিশরে, চীনে, মহেঞ্জদাড়োতে বিস্তার লাভ করেছে। এ কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য যে, মিশর, চীন, বা মহেঞ্জদাড়ো ঐ লেখন পদ্ধতি গ্রহণ করার সময় নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষা ও চিত্রলিপির সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন ধ্বনিলিপির সৃষ্টি করেছে। এ কারণেই মেসোপটেমিয়ার লিপির সাথে মিশর, মহেঞ্জদাড়ো বা চীনের প্রাচীন লিপির যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এখানে বলা দরকার, কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে লেখন পদ্ধতি বিভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্র ভাবে আবিষ্কৃত হয়ে থাকতে পারে। আবার, অন্যান্য অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন যে, শুধু লেখন পদ্ধতিই নয়, ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতা ও সমাজ কাঠামো প্রথম সুমেরে উদ্ভাবিত হয়েছে এবং সেখান থেকে মিশরে তার বিস্তার ঘটেছে। মিশর ও মেসোপটেমিয়া থেকে আবার তার বিস্তার ঘটেছে মহেঞ্জদড়ো, চীন

www.icsbook.info

প্রভৃতি স্থানে! এ অভিমতকে অবহেলা করা চলে না। ব্রোঞ্জযুগের বিভিন্ন জটিল যন্ত্রপাতি ও কারিগরি আবিষ্কার এবং সমাজ সংগঠন মিশর, ব্যবিলনিয়া, ভারতীয় উপমহাদেশ, চীন প্রভৃতি স্থানে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র ভাবে বারবার আবিষ্কৃত হয়েছিল এ কথা মেনে নেয়া সত্যিই কঠিন। তার চেয়ে সহজ হল এ কথা মেনে নেয়া যে, একস্থানে এ সভ্যতা ও সংস্কৃতি আবিষ্কৃত হবার পর তার অনুকরণে অন্যান্য স্থানে ব্রোঞ্জযুগের এ সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল। অবশ্য, মনে রাখা দরকার যে, প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার অনুকরণে মিশরে, বা মিশর-মেসোপটেমিয়ার অনুকরণে ভারতীয় উপমহাদেশ ও চীনে এ সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটলেও তারপর থেকে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতি রেখে এসব অঞ্চলে সভ্যতা স্বতন্ত্র ধারায় বিকাশ লাভ করেছিল। এ কারণে বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতাসমূহের মধ্যে সূক্ষ্ম বিষয়ে কিছু কিছু অমিলও দেখা যায়। মেসোপটেমিয়া, ভারতীয় উপমহাদেশ, চীন প্রভৃতির প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা কালে আমরা এ সকল প্রাচীন সভ্যতার পারস্পরিক সংযোগ ও প্রভাব সম্পর্কে আরো আলোচনা করব।

চিত্রলিপি থেকে প্রথম যে ধ্বনিলিপির উদ্ভব হয়েছিল, তা ছিল শব্দাংশ বা অক্ষরভিত্তিক (Syllable)। লেখন পদ্ধতির বিকাশে পরবর্তী ধাপ হল বর্ণমালাভিত্তিক ধ্বনিলিপি। অক্ষরভিত্তিক ধ্বনিলিপিতে এক একটা লেখনচিহ্ন বা প্রতীক দিয়ে এক একটা শব্দাংশ বোঝান হয়। আর বর্ণমালা ভিত্তিক লেখন পদ্ধতিতে এক একটা বর্ণ দিয়ে এক একটা বিশুদ্ধ ধ্বনি বোঝান হয়। যেমন, বাংলাভাষা হল বর্ণমালাভিত্তিক, তাই ক, খ, চ প্রভৃতি দিয়ে মুখে উচ্চারিত এক একটা বিশেষ ধ্বনিকে মাত্র বোঝানো হয়। বর্ণমালাভিত্তিক লিপি অবশ্যই আগেকার অক্ষরভিত্তিক লেখন পদ্ধতি থেকে উন্নত।

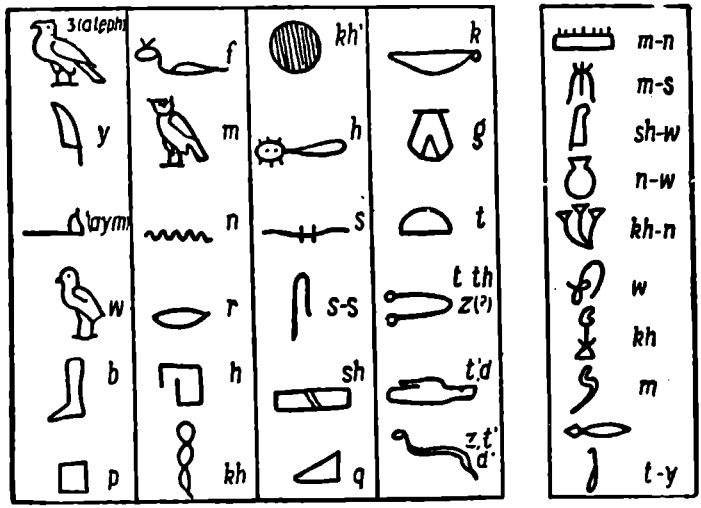

প্রাচীন মিশরীয়দের হায়ারোগ্লিফিক লিপির নমুনা। ছবিতে বিভিন্ন ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রতীক দেখা যাচ্ছে।

www.icsbook.info

কারণ পঁচিশ তিরিশটা বর্ণ শিখে নিলেই সহজে ছোট ছেলেমেয়েরাও যে কোনো বই পড়তে পারে। অপর পক্ষে, অক্ষরলিপিতে একটা চিহ্ন দিয়ে একটা শব্দাংশ বোঝানো হয় বলে এতে অনেক বেশি চিহ্ন লিখতে হয়। অক্ষরভিত্তিক লিপিতে অনেক ক্ষেত্রেই শত শত বা হাজার হাজার চিহ্ন শিখতে হয় লেখাপড়া জানার জন্যে; কারণ, এক একটা চিহ্ন সেখানে এক একটা পৃথক শব্দ বা শব্দাংশের জন্যে ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন মিশরের ছাত্রদের তাই পড়তে শিখতেই দশ পনেরো বছর সময় লাগত। মিশর ব্যাবিলনে তাই লেখাপড়া শেখানোর কাজটা পুরোহিততন্ত্রের কুক্ষিগত থাকতে পেরেছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে তা খুব বেশি প্রসার লাভ করতে পারেনি। বর্ণমালাভিত্তিক লেখন পদ্ধতি শেখা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ হলেও খুব সহজে এর আবিষ্কার ঘটেনি। আমরা পরে দেখব যে বর্ণমালাভিত্তিক লেখন পদ্ধতি আবিষ্কারের অনুকূল সামাজিক পরিস্থিতির উদয় ঘটেছিল অনেক পরে— লৌহযুগে। ব্রোঞ্জযুগের সমাজ কাঠামোর পরিসরে বর্ণমালার আবিষ্কারের সুযোগ ছিল না। ব্রোঞ্জযুগে সর্বত্র কেবল অক্ষরলিপিরই প্রসার ঘটেছে। অবশ্য সে যুগে এ লিপিই যথেষ্ট যুগান্তকারী ও বিপ্লবাত্মক ছিল।

কিউনিফর্ম

প্রাচীন সুমেরে 'কিউনিফর্ম' লিপির প্রচলন ছিল একথা আগেই বলা হয়েছে। এটা ছিল অক্ষরভিত্তিক বর্ণলিপি। এ লিপি কখন আবিষ্কৃত হয়েছিল তা বলা কঠিন তবে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের মাঝামাঝি (প্রায় ৩৫০০ খ্রিঃ পূঃ) থেকে এর ব্যবহার দেখা যায়। কিউনিফর্ম লিপির যে সব প্রাচীনতম নমুনা পাওয়া গেছে সেগুলো স্পষ্টতই বিভিন্ন বস্তু ও প্রাণীর প্রতীক। এ বিষয়ে তাই কোনো সন্দেহ নেই যে, চিত্রলিপি থেকেই কিউনিফর্ম লিপির উদ্ভব ঘটেছিল। এ সব চিত্র-প্রতীক ক্রমশ ধ্বনিব্যঞ্জক হয়ে উঠেছে অর্থাৎ এক একটা চিত্র দিয়ে এক একটা ধ্বনির সমষ্টিকে বোঝানো শুরু হয়েছে। চিত্রগুলোও ক্রমশ রূপান্তরিত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ধারণ করেছে। যেমন, চিত্রলিপিতে যেটা মানুষের মাথা ছিল, ক্রমে তা রূপান্তরিত হয়ে এমন কতগুলো রেখায় পর্যবসিত হল যে, না বলে দিলে বোঝার জো নেই যে সেটি মানুষের মাথা। কিন্তু সুমেরীয়রা বা ব্যাবিলনীয়রা এ রেখাগুলোকেই মানুষের মাথা হিসাবে শিখত এবং তাই বলত। অবশ্য, সুমেরীয় ভাষায় ঐ শব্দটি ছিল 'কা' এবং মানুষের মাথার প্রতীকটিকে কিউনিফর্ম লিপিতে 'কা' ধ্বনিটির প্রতীক হিসেবেই নেয়া হত।

হায়ারোগ্লিফ্

প্রাচীন মিশরে হায়ারোগ্লিফ্ লিপির প্রচলন ছিল একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। খ্রিঃ পূঃ চতুর্থ সহস্রাব্দের শেষভাগে এর প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া গেছে; কিন্তু কত আগে এর প্রথম উদ্ভব বা প্রচলন ঘটেছিল তা এখনও জানা যায়নি।

হায়ারোগ্লিফ্ যে চিত্রলিপি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, হায়ারোগ্লিফ লিপির দিকে তাকালে সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। অবশ্য এটাও ধ্বনিলিপি (Phonetic script) ছিল, যদিও তা ছিল অক্ষর ভিত্তিক (Syllabic) ধ্বনিলিপি। হায়ারোগ্লিফ্ লিপির

www.icsbook.info

অক্ষরচিহ্নগুলোতে পাখি, মানুষ, চাবুক, দোয়াত, কলম প্রভৃতি বাস্তব পদার্থের চিত্র অপরিবর্তিত আকারেই রয়ে গেছে। অবশ্য এ অক্ষরগুলো ঐ সব পদার্থের প্রতীক নয়, এ অক্ষরগুলো বিভিন্ন ধ্বনির প্রতীক। যেমন, পেঁচার ছবি হচ্ছে 'ম' ধ্বনিটির প্রতীক।

চিত্রলিপি থেকে উদ্ভূত হলেও হায়ারোগ্লিফ্ লিপির যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছিল। চিত্রলিপির সাথে ধ্বনি সংযুক্ত হয়ে কালক্রমে ভাব ও ধ্বনিজ্ঞাপক এক রকম মিশ্র প্রতীকের সৃষ্টি হয়। ক্রমে বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনি প্রকাশের জন্যে হায়ারোগ্লিফ্ লিপিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকের ব্যবহার শুরু হয়। অবশ্য এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম অনুসৃত হয়নি। যেমন, কতগুলো প্রতীক একটিমাত্র ব্যঞ্জনধ্বনিকে (যথা, গ্ ম্ প্রভৃতি) প্রকাশ করত। কতগুলো প্রতীক আবার দুই বা তিনটি ব্যঞ্জনধ্বনির সমষ্টিকে প্রকাশ করত। হায়ারোগ্লিফ্ লিপিতে একক ব্যঞ্জন ধ্বনিবিশিষ্ট ২৪টি প্রতীক এবং দুই ব্যঞ্জন ধ্বনিবিশিষ্ট ৭৫টি প্রতীকের ব্যবহার দেখা যায়। প্রতীকের সাহায্যে ব্যঞ্জনধ্বনির রূপায়ণ দেখে অনেকে ধারণা করেছেন যে, এ থেকেই প্রাথমিক বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছে। আসলে হায়ারোগ্লিফ্ লিপির একক ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতীকগুলিও ছিল শব্দাংশেরই প্রতীক— বর্ণমালা নয়। তা' ছাড়াও এ লিপিতে একই ব্যঞ্জনধ্বনি বিভিন্ন প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশিত হয়েছে। ফলে হায়ারোগ্লিফ্ লিপিকে বর্ণমালারূপে ব্যবহার করার সুযোগ ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বর্ণমালার মূল নীতি বা পদ্ধতিকে উপলব্ধি করাই সম্ভব হয়নি এ যুগে। বর্ণমালা আবিষ্কারের অনুকূল সামাজিক পরিবেশের উদয় ঘটেছিল লৌহযুগে এবং বর্ণমালাভিত্তিক লেখন পদ্ধতির আবিষ্কারও ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ লৌহযুগের প্রাক্কালে। এ বিষয়ে আমরা পরে বিস্তৃত আলোচনা করব।

হায়ারোগ্লিফ্ লিপি সাধারণত ডান থেকে বাঁয়ে লেখা হত। অনেক সময় বাঁ থেকে ডানেও লেখা হত। প্রাচীন মিশরীয় ভাষার উপযোগী এবং তার সাথে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল এ লিপি। মেসোপটেমিয়ার কিউনিফর্ম লিপিকে মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিম এশিয়ার অনেক জাতি গ্রহণ করে তার মাধ্যমে নিজেদের ভাষাকে প্রকাশ করেছিল। কিন্তু হায়ারোগ্লিফ্ লিপি মিশরীয় ভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষার বাহন হতে পারেনি।

প্রাচীন মিশরে আরো দু'টি লিপির প্রবর্তন ঘটেছিল, তাদের নাম হল হায়ারেটিক ও ডিমোটিক লিপি। এরা অবশ্য হায়ারোগ্লিফ্ লিপিরই অপভ্রংশ। রাজকীয় ও ধর্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ে এবং মন্দির ও পিরামিডের দেয়ালের লেখার ব্যাপারেই প্রধানত হায়ারোগ্লিফ্ লিপির ব্যবহার নিবদ্ধ ছিল বলে আকৃতিগত শোভা ও সৌন্দর্য বজায় রাখা প্রয়োজন ছিল। এ লিপি তাই সাধারণ কাজের উপযোগী ছিল না। ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে বাহুল্য বর্জিত ও টানা লেখার উপযোগী হিসেবে প্রথমে হায়ারেটিক ও তারপর ডিমোটিক লিপির উদ্ভব ঘটে। ডিমোটিক লিপির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে হায়ারেটিক লিপির ব্যবহার ক্রমশ লোপ পায়। ডিমোটিক লিপি মিশরে খ্রিঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

রসেটা ফলকের কথা বলে আমরা প্রাচীন মিশরের লিপির প্রসঙ্গ শেষ করব। প্রাচীন মিশরীয় লিপির পাঠোদ্ধারের কাজে পাথরের ফলকটির বিশেষ ভূমিকা আছে। ১৭৯৯ সালে ফরাসী সেনানায়ক (পরবর্তীকালে ফরাসী সম্রাট) নেপোলিয়নের মিশর অভিযানের কালে রসেটা দুর্গে এ প্রস্তরখণ্ডটি আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে এটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে

www.icsbook.info

সংরক্ষিত আছে। রসেটা ফলকটি হল সম্রাট 'পঞ্চম টলেমী এপি ফানেসের' সম্মানার্থে ১৯৭-৯৬ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে রচিত পুরোহিতদের একটি ঘোষণাপত্র। ঘোষণাটি গ্রীক ও মিশরীয় দুই ভাষায়ই লেখা— মিশরীয় অংশটি আবার হায়ারোগ্লিফিক ও ডিমোটিক দুই ধরনের লিপিতে লেখা। এ ফলকটি পাবার ফলেই গ্রীক ও মিশরীয় অংশের মধ্যে তুলনা করে ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক 'জাঁ ফ্রাঁশোয়া শাঁপোলিয়ঁ' (Jean Francois Champollion) সর্বপ্রথম ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে হায়ারোগ্লিফ্ লিপির পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

www.icsbook.info

মেসোপটেমীয় সভ্যতা

৪০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের আগেই আধুনিক ইরাক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ডে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় এক প্রাচীন সভ্যতার উদয় হয়েছিল। এ সভ্যতাকে আগে 'ব্যবিলনীয়' অথবা 'ব্যবিলনীয়-আসিরীয়' নামে আখ্যায়িত করা হত। পরে জানা গেছে যে, ব্যবিলনীয় অথবা আসিরীয়রা কেউই এ সভ্যতার জনক নয়, এর প্রতিষ্ঠাতা হল সুমেরীয় নামে এক জাতি এবং সুমেরীয়, ব্যবিলনীয়, কাসাইট, আসিরীয়, ক্যালডীয় প্রভৃতি জাতির অবদানে দীর্ঘকাল ধরে এ সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়েছিল। তাই, সামগ্রিকভাবে এ সভ্যতাকে মেসোপটেমীয় সভ্যতা বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

দুই নদীর দেশ

'মেসোপটেমিয়া' নামটা গ্রীকদের দেয়া, এর অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ। দুই নদী বলতে অবশ্যই বোঝানো হচ্ছে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসকে। মেসোপটেমিয়ার উত্তরাংশের নাম ছিল আসিরিয়া, দক্ষিণাংশের নাম ব্যবিলনিয়া। ব্যবিলনিয়ার ছিল দুটি অংশ— দক্ষিণে সুমের ও উত্তরে আক্কাদ।

মেসোপটেমিয়ার প্রাকৃতিক পরিবেশ সর্বত্র একই রকম ছিল না। উত্তরাংশে ছিল ক্ষুদ্র পাহাড়ী অঞ্চল, সেখানে বৃষ্টিপাত হত এবং ছোট ছোট নদী ছিল। মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশ হচ্ছে জলাভূমি। প্রতি বছর মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত বরফগলা পানিতে টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিসের দু'তীর প্লাবিত হয়ে যেত, তীরে পলি জমত এবং তারপর পানি সরে গেলে মাটি শুকিয়ে উঠত। তাই এখানে কৃষি কাজের উপযুক্ত উর্বর জমি থাকলেও তার জন্যে পানি সরবরাহকে নিয়ন্ত্রিত করার আবশ্যকতা ছিল।

মিশরের তুলনায় মেসোপটেমিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ কম ছিল। অবশ্য কোনো কোনো স্থানে চুনাপাথর ও কাদামাটি ছিল; এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদের মধ্যে ছিল খেজুর ও নলখাগড়া, চারপাশের পাহাড়সমূহে ছিল গবাদি পশু, ছাগল, বরাহ ও সিংহ, আর নদীতে ছিল প্রচুর মাছ।

সুমের ও আক্কাদ

৫০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের সমকালে সুমেরীয় নামে পরিচিত একজাতের মানুষ মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশে এবং পারস্য উপসাগরের উপকূল ধরে বাস স্থাপন করে। এদের উৎপত্তিস্থল এখন পর্যন্ত অজানা, তবে অনুমান করা হয়, মধ্য এশিয়ার মালভূমি থেকে এরা এসেছিল। সুমেরীয়দের আগমনের পূর্বে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় যারা বাস করত তারা তখন নতুন পাথরের যুগ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরণের অবস্থায় এসে

www.icsbook.info

মাত্র পৌঁছেছিল। সুমেরীয়রা স্থানীয় অধিবাসীদের সহজেই পরাস্ত করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

সুমেরীয়রাই প্রথম এ অঞ্চলে খাল খনন, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে সেচব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং তার ভিত্তিতে নগরসভ্যতা নির্মাণ করে। ৩৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় প্রায় কুড়িটি নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। নগররাষ্ট্রের শাসকদের বলা হত 'পাতেজি', এঁরা ছিলেন একাধারে পুরোহিত, সেনানায়ক ও সেচব্যবস্থার তত্ত্বাবধায়ক। পানির অধিকার নিয়ে এবং আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে এ সকল নগররাষ্ট্রের মধ্যে অনবরত মারামারি লেগেই থাকত।

একই সময়ে উত্তর ব্যবিলনিয়া বা আক্কাদে সেমিটিক ভাষাগোত্রের একটি দল বাস করত, এরা সম্ভবত আরবের মরুভূমি থেকে এসেছিল। এ আক্কাদীয়রা কৃষিকাজ আয়ত্ত করে এবং নগররাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। আক্কাদীয়রা অনেককাল ধরেই সুমেরীয় নগরসমূহ অধিকার করার চেষ্টা চালিয়ে যায়, কিন্তু তাদের উন্নত অস্ত্রের সাথে শক্তিতে পেরে ওঠে না। অবশেষে আক্কাদের শাসক ১ম সারগন সুমেরের নগররাষ্ট্রসমূহ অধিকার করে নেন। সারগন ছিলেন এক প্রতিভাবান শাসক ও সামরিক নেতা। তিনিই ইতিহাসে সর্বপ্রথম গ্রাম কমিউনের গরিব কৃষকদের থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে নিয়মিত সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। সারগন পরাজিত সুমেরীয়দের সভ্যতা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য, মাঝে মাঝে গৃহযুদ্ধ ও বিদ্রোহ ঘটা সত্ত্বেও, দু'শ' বছরের বেশি টিকে ছিল। সারগন মেসোপটেমিয়ার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত 'এলাম' রাজ্য জয় করেন এবং সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাদের অংশবিশেষ অধিকার করেন। সারগন প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের রাজারা নিজেদের 'সুমের ও আক্কাদের রাজা' বলে পরিচয় দিতেন।

সারগন প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সারগনের মৃত্যুর পরেই সুমেরীয়গণ বারবার বিদ্রোহ করতে থাকে। সারগন প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র এতে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং গূর্তি নামক এক বর্বর জাতি এ রাষ্ট্রশক্তিকে উৎখাত করে। অবশেষে ২১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে উর নগরীর নেতৃত্বে সুমেরীয়গণ গূর্তিদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সাথে বিদ্রোহ করে এবং সমগ্র সুমের এবং আক্কাদের ওপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। নতুন সাম্রাজ্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সম্রাট ছিলেন 'ডুঙি'। এ সম্রাটের আমলেই সর্বপ্রথম সুমেরীয়গণ একজন সুমেরীয় শাসকের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

ব্যবিলনীয় সভ্যতার উদয়

সুমের-আক্কাদ সাম্রাজ্য ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়লে ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের প্রাক্কালে আরব অঞ্চল থেকে আগত আমোরাইট জাতি আক্কাদ অধিকার করে নেয় এবং এলামদেশীয় একটি দল সুমের দখল করে। এদের মধ্যে ক্রমশ লড়াই বেধে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত এলাম-দেশীয়রা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। বিজেতাদের রাজ্য 'ব্যবিলন' নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং ব্যবিলন অতি দ্রুত এক বড় সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ ব্যবিলনীয় সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল আমোরাইটদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সম্রাট 'হাম্মুরাবির' আমলে (১৯৭২-১৭৫০ খ্রিঃ পূঃ)। পরবর্তীকালের নব ব্যবিলনীয় তথা ক্যালডীয় সভ্যতার সাথে

www.icsbook.info

পার্থক্য বোঝানোর জন্যে এ সভ্যতাকে প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতাও বলা হয়ে থাকে। মেসোপটেমীয় সভ্যতার বিবর্তনের এটি দ্বিতীয় পর্যায়। হাম্মুরাবি ব্যবিলনের উত্তরে অবস্থিত মারি রাজ্য অধিকার করেন এবং উত্তরে আসিরিয়া পর্যন্ত নিজ অধিকার বিস্তার করেন। হাম্মুরাবি কেবল বড় শাসক হিসেবেই নন, বিখ্যাত আইন-সংহিতার প্রণয়নকারী রূপেও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছেন। হাম্মুরাবির আইন-সংহিতা থেকে প্রাচীন ব্যাবিলনের সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়— পুরোহিত, ভূস্বামী, বণিক, ভূমিদাস ও দাস ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত তৎকালীন সমাজের চিত্রও পাওয়া যায়।

হাম্মুরাবির পর তাঁর সাম্রাজ্য ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। ১৬৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে কাসাইটগণ ব্যবিলন রাজ্য জয় করে নেয় এবং প্রায় ৬০০ বছর তাদের আধিপত্য বজায় থাকে। কাসাইটরা পূর্বাঞ্চলের পাহাড় থেকে এসেছিল। এরা ছিল বর্বর জাতি এবং ব্যাবিলনের সংস্কৃতিতে তারা ছিল নিতান্তই আগ্রহশূন্য। তাদের একমাত্র অবদান হল, মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে ঘোড়ার প্রচলন। কাসাইটদের সমকালে উত্তর মেসোপটেমিয়ায় 'মিতানি' নামক একটি আর্যভাষী দল রাজ্য স্থাপন করে। এ উভয় রাজ্যই ক্রমশ ইতিহাস থেকে লোপ পেয়ে যায় এবং এ অঞ্চলে উদিত হয় সুবিখ্যাত আসিরীয় সাম্রাজ্য— যারা প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সংস্কৃতিতে অংশগ্রহণ করে তাকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে।

আসিরীয় সাম্রাজ্য

৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে একটি সেমিটিক ভাষাভাষী দল উত্তর মেসোপটেমিয়ার আসুর নামক নগররাষ্ট্রে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করে। এরাই কালক্রমে আসিরীয় নামে পরিচিত হয়। টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস অববাহিকায় তাদের আধিপত্য বিস্তার মেসোপটেমীয় সভ্যতার তৃতীয় পর্যায়ে উত্তরণের সূচনা করে।

আসিরীয় শক্তির বিকাশ ঘটতে শুরু করে ১৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে এবং তার অল্পকালের মধ্যেই তারা সমগ্র উত্তর মেসোপটেমিয়ার কর্তৃত্ব অর্জন করে। খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দীর দিকে তারা ব্যাবিলনিয়া থেকে অবশিষ্ট কাসাইট শক্তিকে উৎখাত করে। আসিরীয় সাম্রাজ্যের পরিপূর্ণ বিস্তৃতি ঘটে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম ও সপ্তম শতাব্দীতে। '৩য় তিগলাথ পিলেসার' (৭৪৫-৭২৭ খ্রিঃপূঃ) অনেকগুলো সফল অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি সিরিয়া ও ফিনিশিয়া অধিকার করেন উরারতু রাজ্যকে পরাজিত করে। টায়ার ও ইসরায়েলের রাজারা তাঁকে কর প্রদানে স্বীকৃত হন। সবশেষে তিনি ব্যাবিলনিয়া পুরোপুরি জয় করে নেন। পরবর্তী সম্রাটগণের, যথা, ২য় সারগান (৭২২-৭০৫ খ্রিঃপূঃ), সেন্নাচেরিব (৭০৫-৬৮৯ খ্রিঃ পূঃ), এসারহাদন (৬৮০-৬৬৯ খ্রিঃপূঃ) এবং আসুরবানিপাল (৬৬৮-৬২৬ খ্রিঃপূঃ)-এর আমলেও আসিরীয়দের বিজয় অভিযান অব্যাহত থাকে। এ ভাবে আসিরিয়া রাষ্ট্র এশিয়া মাইনরের মধ্য ও পূর্ব অংশ, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, ফিনিশিয়া, ইসরায়েল ও মিশরের একাংশ স্বকবলিত করে এক বিশাল সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। সেকালের হিসেবে আসিরিয়া নিঃসন্দেহে এক বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়েছিল। সেন্নাচেরিব-এর আমল থেকে আসিরিয়ার রাজধানী ছিল নিনেভে নগরী।

www.icsbook.info

আসিরিয়া ছিল সমরনায়ক ও দাসমালিক পরিচালিত রাষ্ট্র। মিশর বা ব্যবিলনিয়ার চেয়ে এখানে দাসপ্রথা অনেক বেশি বিকাশ লাভ করেছিল। আসিরিয়ার সম্রাটের আজ্ঞাধীন শত সহস্র দাস ছিল— যাদের রাস্তা তৈরি, খাল খনন, এমনকি পুরো নগরনির্মাণের কাজে নিয়োগ করা হত।

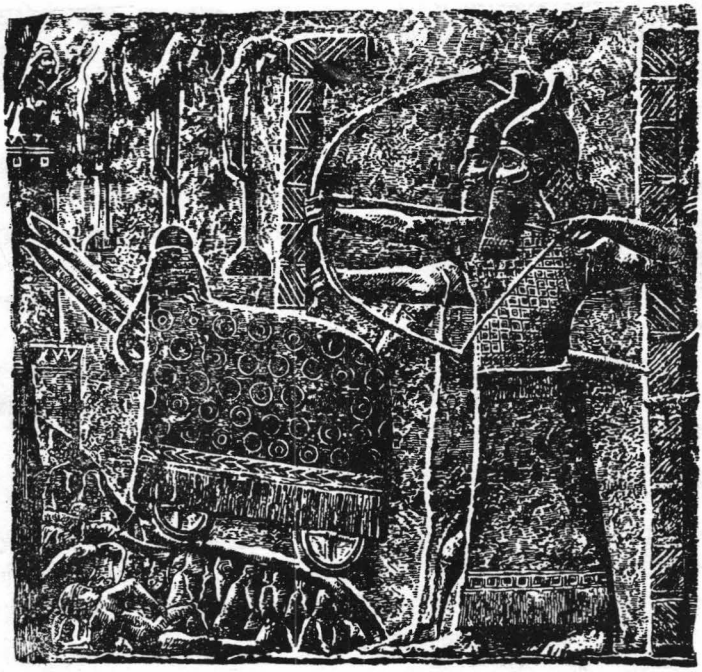

আসিরীয়গণ একটি দুর্গকে আক্রমণ করছে।

আসিরীয়দের সাফল্যের কারণ

আসিরীয় সম্রাটদের বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের সাফল্যের পশ্চাতে তিনটি কারণ বিদ্যমান ছিল।

প্রথমত আসিরীয়দের ছিল পরাক্রমশালী সেনাবাহিনী।

দ্বিতীয়ত আসিরীয় সেনাবাহিনীর অগ্রগতিকে বাধাদানকারীদের নিষ্ঠুর ভাবে দমন করা হত।

তৃতীয়ত আসিরীয়দের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল তৎকালীন সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা।

আসিরীয়দের বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেনাবাহিনীর দ্বারা এবং সেনাবাহিনীর স্বার্থে। এ বাহিনী ছিল তৎকালীন বিশ্বে সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে সুশিক্ষিত। এ সেনাবাহিনী ছিল সম্পূর্ণভাবে লৌহনির্মিত সমরাস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত। এদের প্রধান অস্ত্র

www.icsbook.info

ছিল লৌহফলকবিশিষ্ট তীর ও ধনুক। আসিরীয়দের আক্রমণ কৌশল ছিল নিম্নরূপ।

প্রথমে শত্রুর দিকে সুনির্দিষ্ট ভাবে নিক্ষিপ্ত শত সহস্র তীরের আঘাতে তারা শত্রুকে দুর্বল করে দিত। তারপর তাদের ভারি রথসমূহ ও অশ্বারোহী বাহিনী শত্রুর ব্যূহভেদ করে মুহূর্তে তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ধূলিসাৎ করে যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করত। সে যুগের সকল জাতি এই দুর্ধর্ষ সামরিক বাহিনীকে ভয় পেত। বিজয়ী সৈন্যরা এরপরে তাদের বিজয় উৎসব পালন করত। সৈন্যরা তাদের লুণ্ঠিত মালামাল প্রদর্শন করত প্রদর্শনীর মাধ্যমে। সাথে সাথে তারা এনে হাজির করত সেই সমস্ত ধৃত যুদ্ধবন্দীদের যাদেরকে অচিরেই নিষ্ঠুরতম অত্যাচার দ্বারা মৃত্যুর পরপারে পাঠিয়ে দিত। সমষ্টিগত বাহিনীর আনন্দ, পান ও ভোজনের মাধ্যমে এই বিজয়োৎসবের সমাপ্তি ঘটত।

আসিরীয়ার রণসাফল্যের আরেকটি বিশেষ কারণ তাদের নিষ্ঠুরতম অত্যাচার ব্যবস্থা— যার দ্বারা তারা সকল শত্রুকে ভয় পাইয়ে দিতে সক্ষম হত। প্রাচীন বিশ্বে এদের মতো নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন আর কেউ ছিল না। বিজিত আসিরীয় সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়ে থাকা আহত শত্রু সৈন্যদের মাথাগুলো কেটে নিয়ে সেগুলো সংগ্রহ করত। তার পরে প্রচণ্ড উল্লাসে তারা পৈশাচিকতার সাথে গণহত্যায় লিপ্ত হত; নগরের পর নগরে অগ্নিসংযোগ করত এবং যুদ্ধবন্দীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করত।

একজন আসিরীয় সম্রাট গর্বভরে লিখে গেছেন॥ "আমি তাদের (শত্রুর) ধন-সম্পদ, গবাদিপশু ও ভেড়াগুলি নিয়ে এলাম। অনেক বন্দীকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেললাম। আমি জীবিতদের পরস্পরের উপর সাজিয়ে একটি স্তম্ভ তৈরি করলাম ও মাথাগুলি দিয়ে আর একটি স্তম্ভ নির্মাণ করলাম, শহরের প্রকাশ্য স্থানে বৃক্ষের ডালে ডালে আমি মস্তকগুলি ঝুলিয়ে দিলাম, তাদের ছেলেমেয়েদের আমি অগ্নিতে নিক্ষেপ করলাম। আমি পুরো শহরটা বিধ্বস্ত করলাম, খুঁড়ে ফেললাম, তাতে অগ্নিসংযোগ করলাম এবং সর্বশেষে নিশ্চিহ্ন করে দিলাম।" এভাবেই প্রতিটি আসিরীয় সম্রাট তাদের বিজয়াভিযান সম্পন্ন করেছিলেন।

আসিরীয়দের সাফল্যের তৃতীয় কারণ তাদের শাসকদের দ্বারা নির্মিত রাষ্ট্র শাসনপদ্ধতি। আসিরীয় সম্রাটগণ বিজিত রাজ্যের প্রজাদের তাদের বাসভূমি থেকে উৎখাত করে অন্য রাজ্যে নির্বাসিত করতেন। এভাবে এক রাজ্যের প্রজাকে অন্যরাজ্যে স্থাপন করে যদিও তারা নিষ্ঠুরতারই পরিচয় দিয়েছেন— তথাপি এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিশ্রণে এক আন্তর্জাতিক সভ্যতার সূচনা হয়েছিল। আসিরীয়রা একটি আন্তর্জাতিক ও কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে মিশরীয়দের থেকে উৎকৃষ্ট একটি শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছিল। সম্রাটের বার্তাবাহকগণ সর্বদা রাজনির্দেশ বহন করে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কাছে পৌঁছে দিত। কেন্দ্রে সাথে প্রদেশের যোগাযোগের জন্য তৈরি হয়েছিল উৎকৃষ্ট সড়ক ও জনপথসমূহ। তদুপরি আসিরীয়রাই তৈরি করেছিল পৃথিবীর প্রথম ডাকব্যবস্থা। এভাবে সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে সংযোগ স্থাপন করে আসিরীয় সম্রাটগণ তাদের শাসনব্যবস্থা সাফল্যের সাথে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

www.icsbook.info

ক্যালডীয় বা নব-ব্যবিলনীয়সাম্রাজ্য

আসিরীয় শক্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আসিরীয় সম্রাটরা বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। নির্মম স্বৈরাচারী আসিরীয় শাসনের অধীনে পদানত জাতিসমূহ বিদ্রোহোন্মুখ হয়ে থাকে এবং ব্যবিলনবাসী ক্যালডীয়রা (ইরান মালভূমির মেডেসদের সাথে মিলিত হয়ে) ৬১২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আসিরীয় রাজশক্তিকে চূর্ণ করে। ক্যালডীয়া স্থানটি ছিল মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মোহনার কাছে। এখানে প্রাচীনকালে সম্ভবত আরব থেকে আগত একটি সেমিটিকভাষী দল বাস স্থাপন করেছিল। এবাই পরবর্তীকালে 'ক্যালডীয়' নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল।

আসিরীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ক্যালডীয়দের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন 'নোবোপোলাসর'। তাঁর পুত্র নেবুচাদনেজার-এর রাজত্বকালে (৬০৪-৫৬১ খ্রিঃ পূঃ) ক্যালডীয় সাম্রাজ্য এক নতুন বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়। ক্যালডীয় রাজশক্তির বিকাশ মেসোপটেমীয় সভ্যতার চতুর্থ ও শেষ পর্যায়ের সূচনা করল। এ পর্যায়কে প্রায়শ 'নব-ব্যবিলনীয়' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কারণ ক্যালডীয়রা পুনরায় ব্যবিলনে রাজধানী স্থাপন করেছিল এবং হাম্মুরাবির আমলেব সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিল।

নেবুচাদনেজার আসিরীয় সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সকল অংশই অধিকার করেন। এমনকি আসিরীয়রা যাকে পদানত করতে পারেনি, সেই 'জুদা' রাজ্য পর্যন্ত তিনি করায়ত্ত করেন এবং সে দেশ থেকে কয়েক সহস্র লোককে দাস হিসেবে ব্যাবিলনে নিয়ে যান। কিন্তু এ সাম্রাজ্যও স্থায়ী হয়নি। এক শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে, ৫৩৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে, এ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। পারস্যদেশীয় রাজা কাইরাস-এর হাতে এর পতন ঘটে একরূপ বিনাযুদ্ধে— কারণ, পুরোহিতশ্রেণী এবং অভিজাত ও প্রভাবশালী শ্রেণীসমূহ ও ইহুদিগণ পারসিকদের সহায় হয়েছিল।

নেবুচাদনেজারের চল্লিশ বছরেব রাজত্বকালে ব্যবিলন জাঁকজমক ও বৈভবে নিনেভের স্থান অধিকার করেছিল। প্রবাদ অনুসারে, নেবুচাদনেজার তাঁর মেডেস দেশীয় রানীর মনোরঞ্জনার্থে প্রাসদের ছাদে এবং নগরপ্রাচীরের ওপরে যে উদ্যান নির্মাণ করেছিলেন, আজও তা 'ব্যবিলনের শূন্যোদ্যান' নামে প্রাচীনকালের সপ্তমাশ্চর্যের অন্যতমরূপে পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে আছে।

পারস্য রাষ্ট্র অবশ্য সমস্ত মেসোপটেমীয় সাম্রাজ্যকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। কিন্তু এ ছাড়াও অন্যান্য অনেক অঞ্চলও পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তদুপরি পারস্য সাম্রাজ্য ছিল এক সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির বাহন। ক্যালডীয় সাম্রাজ্যের পতনকেই তাই মেসোপটেমীয় সভ্যতার ও মেসোপটেমিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসের সমাপ্তিরূপে গণ্য করা চলে।

মেসোপটেমীয় সংস্কৃতির পরিচয়

আমরা সচারাচর যাকে এক কথায় 'মেসোপটেমীয় সংস্কৃতি' বলে থাকি, তা আসলে প্রধানত চারটি বিভিন্ন সভ্যতার অবদান নিয়ে গড়ে উঠেছে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে এ চারটি সভ্যতা হলঃ 'সুমেরীয়', 'ব্যবিলনীয়', 'আসিরীয়' এবং 'ক্যালডীয়'। অনেক সময় ব্যাবিলনীয় সভ্যতাকে 'আদি ব্যাবিলনীয়' এবং ক্যালডীয় সভ্যতাকে 'নব-ব্যাবিলনীয় সভ্যতা' বলা হয়ে থাকে।

www.icsbook.info

সুমেরীয় সংস্কৃতি

অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা

সুমেরীয় অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ মিশরীয়দের মতো অতখানি কঠোর ছিল না। রাজা রাজ্যের সমস্ত ভূখণ্ডের মালিক ছিলেন না। ব্যবসা- বাণিজ্যও সম্পূর্ণরূপে সরকারি নিয়ন্ত্রণে ছিল না। বরং বিপুল পরিমাণ জমি ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন পুরোহিতরা। যেহেতু ঋতুচক্রের আবর্তন কালের সময় নিরূপণ ও খালকাটার যান্ত্রিক কৌশল একমাত্র পুরোহিতদেরই জানা ছিল, অতএব সেচব্যবস্থা পুরোপুরি তাঁরাই নিয়ন্ত্রণ করতেন। বাকি জনগণের অধিকাংশই ছিল ভূমিদাস। এদের মধ্যে অনেকে আবার ঋণের দায়ে ক্রীতদাসে পরিণত হত। তবে মিশর বা ব্যবিলনের মতো সুমেরীয় ক্রীতদাসদের অবস্থা ততখানি শোচনীয় ছিল না। তারা সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত, মনিবদের কাছ থেকে অবসর পেলে অন্যত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করতে পারত, এমনকি কোনো স্বাধীন রমণীকে বিয়েও করতে পারত।

কৃষিই ছিল সুমেরীয়দের প্রধান জীবিকা। প্রায় প্রতিটি সুমেরীয় কৃষক উন্নতমানের কৃষিকাজ জানতেন। শহরগুলোর বাইরে বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র, উর্বর জমিতে লাঙল দিয়ে, বীজ ছিটিয়ে, উন্নত ধরনের সেচব্যবস্থাব প্রচলন করে সুমেরীয় কৃষকরা তাতে ওট, যব, খেজুর ও বিভিন্ন ধরনের ফল ফলাত। সুমেরীয়রাই প্রথম চাকা লাগানো গাড়ি ও রথের ব্যবহার শুরু করেছিল। তাদের কাছ থেকেই মিশরীয়রা চাকা লাগানো যানবাহনের ব্যবহার শেখে। সুমেরীয়রা ছাগল ও অন্যান্য গৃহপালিত পশুও পালন করত।

তাদের দ্বিতীয় প্রধান উপজীবিকা ছিল বাণিজ্য। দেশের সম্পদের একটি বিরাট উৎস ছিল এই বাণিজ্য। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে সুমেরের উন্নত বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সমুদ্র ও স্থল— এই দু' পথেই বাণিজ্য চলত। ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক, যেমন— বিল, রসিদ, হিসাবপত্র, হুণ্ডি, প্রভৃতির প্রচলন ছিল। চুক্তি সম্পাদন হত লিখিতভাবে, সাক্ষীর উপস্থিতিতে। ব্যবসায়ীরা মাল বিক্রির জন্যে লোক নিযুক্ত করতেন, যারা কমিশনের বিনময়ে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে মাল বিক্রি করত। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে নির্দিষ্ট ওজনের সোনা ও রুপার চাকতি ব্যবহৃত হত।

মিশরীয়রা খুব নিকটে বাস করার ফলে সুমেরীয়দের সভ্যতার সাথে মিশরীয় সভ্যতার বিপুল মিল পরিলক্ষিত হয়। মিশরীয়দের মতো সুমেরীয়দের সমাজে পুরোহিত শ্রেণীর আধিপত্য প্রবল ছিল। সমাজের কর্তা ছিলেন রাজা, পুরোহিত, উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মচারী ও সামরিক ব্যক্তিরা। দেশের জমি ও অন্যান্য সম্পদের অধিকাংশের মালিক ছিলেন তাঁরাই। বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যেকার পার্থক্য আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল।

আইন

সুমেরীয়দের আইন গড়ে উঠেছিল তাদের প্রচলিত সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। পরবর্তীকালে এগুলোকে সংকলিত করেন সুমেরীয় সম্রাট 'ডুঙি'। সুমেরীয় আইন ছিল পরবর্তী অন্যান্য সভ্যতার, যথা— ব্যবিলনীয়, আসিরীয়, ক্যালডীয় ও হিব্রু আইনের মূল ভিত্তি। ব্যবিলনের বিখ্যাত আইন প্রণেতা 'হাম্মুরাবীর' আইন, সংকলন মূলত সুমেরীয় আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুমেরীয় আইনের মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ ঃ

www.icsbook.info

(১) অপরাধীকে প্রতিটি অপরাধের জন্য তদ্রুপ শাস্তির বিধান দেয়া হত, যথা— চোখের পরিবর্তে চোখ, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত বা প্রতিটি অঙ্গের জন্যে সেই অঙ্গ ছেদন।

(২) বেসরকারি ও রাষ্ট্রীয় উভয় উদ্যোগে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পরিবারকে উদ্যোগী হয়ে অপরাধীকে আদালতে হাজির করতে হত। আদালত বাদী-বিবাদীর মধ্যে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করত, রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে শুধুমাত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে নয়।

(৩) সামাজিক মর্যাদা হিসেবে বিচার করা। সুমেরীয় আইনে সমাজের জনগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল— (ক) অভিজাত, (খ) সাধারণ বা ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং (গ) ভূমিদাস ও ক্রীতদাস। অপরাধীর শাস্তি বিধান হত তার সামাজিক মর্যাদা হিসেবে। কখনো কখনো অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে। একজন সাধারণ নাগরিক বা ভূমিদাস অথবা ক্রীতদাসের স্থলে কোনো অভিজাতকে হত্যা বা পঙ্গু করা হলে অধিকতর গুরুতর শাস্তি দেয়া হত। অনুরূপভাবে একজন অভিজাত যদি অপরাধী হতেন তাহলে একজন সাধারণ বা ভূমিদাস অপেক্ষা তাকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করা হত। এর কারণ সম্ভবত এই যে, সামরিক বাহিনীতে একমাত্র অভিজাতরাই প্রবেশাধিকার লাভ করতেন এবং সুমেরীয় সামরিক বাহিনী কঠোরভাবে তার আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখত।

(৫) ইচ্ছাকৃত অপরাধ ও আকস্মিক ক্রোধজনিত কারণে সংঘটিত অপরাধের মধ্যেকার পার্থক্য ছিল সামান্যই। উভয়ক্ষেত্রেই অপরাধীকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হত।

ধর্ম

আইনের মতো সুমেরীয়দের ধর্মেও তাদের সমাজব্যবস্থা ও কৃষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে। মিশরীয়দের মতো সুমেরীয়দের জীবনে ধর্ম একটি প্রধান স্থান দখল করে রেখেছে। সুমেরীয়রা অনেক দেবতায় বিশ্বাসী ছিল; তাদের সূর্যদেবতা ছিলেন শামাশ, এনলিল ছিলেন বৃষ্টির ও বায়ুর দেবতা। দেবী ইশতার ছিলেন নারী জাতির প্রতীক। সুমেরীয়দের প্রধান দেবতা ছিলেন নার্গাল। দেবতারা ভাল ও মন্দ উভয় কাজেই পারদর্শী ছিলেন; যেমন, শামাশ সূর্যের দেবতারূপে পথিবীতে আলো ও উত্তাপ পাঠিয়ে মানুষের উপকার সাধন করতেন,তেমনি আবার তার প্রখর তেজে মাটি ও গাছপালাকে দগ্ধ করে মানুষের ক্ষতিসাধনও করতেন।

সুমেরীয়দের ধর্মীয় বিশ্বাস শুধুমাত্র ইহলোককে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। পরলোক বলতে সুমেরীয়দের ধারণায় ছিল একটি অস্পষ্ট,ছায়াময় জগতের অস্তিত্ব— যেখানে মৃত মানবের আত্মা মাত্র অল্প কিছুকাল অবস্থান করে চিরকালের জন্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। পরকালে আবার মৃত আত্মার পুনরুজ্জীবন লাভ কিংবা স্বর্গ ও নরক প্রভৃতি সম্বন্ধে সুমেরীয়দের মধ্যে কোনো ধারণাই জন্ম লাভ করেনি। সে জন্যেই সুমেরীয়রা মিশরীয়দের মতো সাড়ম্বরে মৃতদেহকে মমি বানাত না বা সমাধির ওপর বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করত ন।। তারা সাধারণভাবে মাটির নিচে মৃতদেহকে কবর দিত।

সুমেরীয়দের দেবতারা ছিলেন মানুষের মতোই সুখ-দুঃখ ও অন্যান্য অনুভূতিসম্পন্ন। তাদের কাজ ছিল ইহজগতেই মানুষের কল্যাণসাধন, যেমন ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন বা প্রচুর শস্য উৎপাদন ইত্যাদি। সুমেরীয়দের ধর্মসঙ্গীতে

www.icsbook.info

দেবতারা সত্যপ্রিয়, মঙ্গলসাধক ও ন্যায়বান প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত। দেবী ন্যাঙ্গেকে উল্লেখ করা হয়েছে অনাথ শিশুদের প্রতিপালন, বিধবাদের কষ্ট দূর করার জন্যে তাদের এ পৃথিবী থেকে তুলে নেয়া ও অত্যাচারীকে ধ্বংস করার দেবী হিসেবে। এ সকল দেব দেবীরাই আবার মিথ্যার, ঝগড়া-বিবাদ প্রভৃতি সৃষ্টির মাধ্যমে একজন মানুষের চরিত্র নষ্ট করতে পরতেন।

সুমেরীয় ধর্মের প্রধান প্রকাশ ঘটেছিল তাদের সৃষ্টিতত্ত্বে এবং প্লাবনের কাহিনীতে। সুমেরীয় বিশ্বাস অনুসারে তাদের ঈশ্বর মার্দুক মাটি ও ড্রাগনের রক্ত থেকে মানুষকে তৈরি করেছিলেন। একবার মার্দুক মানুষের ওপর বিরক্ত হয়ে প্লাবন সৃষ্টি করেছিলেন। সুমেরীয়দের অনেক ধর্মবিশ্বাস পরবর্তীকালে হিব্রুদের ধর্মবিশ্বাসে স্থান পেয়েছিল।

সুমেরীয় সাহিত্য

সুমেরীয় সাহিত্য এক অর্থে মিশরীয়দের থেকে উন্নত ছিল— কারণ, সুমেরীয়রাই প্রথম মহাকাব্য রচনা করেছিল। তাদের বিখ্যাত মহাকাব্যের নাম 'গিলগামেশ'। সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের আগেই এ মহাকাব্য রচিত হয়েছিল। এর নায়ক গিলগামেশ একজন পৌরাণিক রাজা, যিনি নিজের অপরিসীম আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্যে প্রজাদের উপর নির্মম অত্যাচার করতেন। গিলগামেশ অমরত্ব লাভ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ মহাকাব্যে পৌরাণিক উপাখ্যানের সকল উপাদান, যেমন— বীরত্ব, প্রেম, বন্ধুত্ব, ব্যর্থতা সব কিছুই বিদ্যমান।

স্থাপত্য ও শিল্প

সুমেরীয়দের স্থাপত্যশিল্প মিশরীয়রে মত উৎকর্ষ ও স্থায়িত্ব লাভে সমর্থ হয়নি। পাথরের দুষ্প্রাপ্যতার দরুন সুমেরীয়রা পোড়া ইট দিয়ে ইমারত বানাত। ফলে প্রচণ্ড বাত্যাপ্রবাহ ও মহাপ্লাবনের সম্মুখে এসব ইমারত দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারেনি। সুমেরীয়রা নগরসভ্যতা গড়ে তুলেছিল। রাজপ্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সুমেরীয়দের নগর পরিকল্পনা নিখুঁত ছিল। সুমেরীয়রাই প্রথম খিলান, ভল্ট ও গম্বুজনির্মাণের কৌশল শিখেছিল। দালানের দেয়ালগুলো ছিল ইটের এবং ছাদগুলো ছিল কাঠের তৈরি।

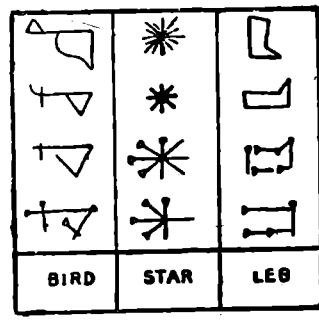

কিউনিফর্ম লিপির বিবর্তন

সুমেরীয়দের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাদের জিগ্‌গুরাট বা ধর্মমন্দির। প্রতিটি শহরে একটি করে জিগ্‌গুরাট ছিল এবং এটি সেই শহরের দেবতার নামে উৎসর্গিত ছিল।

সুমেরীয়রা ধাতুশিল্পে উৎকর্ষ সাধন করেছিল। তারা অস্ত্রশস্ত্র, গহনা, মাটির পাত্র প্রভৃতির ওপর সুন্দর সুন্দর নক্‌শা তৈরি করত। সুমেরীয়দের তৈরি সীলের ওপরও সুন্দর শিল্পকর্মের নিদর্শন বর্তমান। এই সীলগুলো ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান।

www.icsbook.info

সুমেরীয়দের লিপি ও বিজ্ঞান

সুমেরীয়দের বিশিষ্ট কীর্তি হল সুবিখ্যাত 'কিউনিফর্ম' লেখন পদ্ধতির আবিষ্কার। এটি ছিল চিত্রলিপি। কালক্রমে তা' শব্দাংশভিত্তিক লিপিতে পরিণত হয়েছিল। এ সম্পর্কে আগেই বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। সুমেরীয়রা সংখ্যা গণনা ও অঙ্কপাতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। তাদের গণনাপদ্ধতি ছিল ষাটভিত্তিক। সুমেরীয়দের মুদ্রা, ওজন এবং পরিমাণ পদ্ধতিও ছিল ষাটের এককভিত্তিক। সুমেরীয়রা গুণ, ভাগ, বর্গমূল নির্ণয় ও ঘনমূল নির্ণয় করতে পারত। সুমেরীয়রা পানি–ঘড়ি এবং চান্দ্রমাস আবিষ্কার করেছিল।

ব্যবিলনীয় যুগের সংস্কৃতি

সুমেরীয়দের পতনের পর আমোরাইট জাতি সুমের ও আক্কাদ জয় করে ব্যবিলনীয় সভ্যতা গড়ে তোলে, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। এ সভ্যতাকে প্রাচীন ব্যবিলনীয় সভ্যতাও বলা হয়ে থাকে। আমোরাইটদের নিজেদের সংস্কৃতি বিশেষ উন্নত ছিল না, তারা মেসোপটেমিয়ায় সাম্রাজ্য স্থাপন করে সুমেরীয়দের সভ্যতা সংস্কৃতিকেই গ্রহণ করেছিল। ব্যাবিলনীয় যুগে তাই সভ্যতা সংস্কৃতির আংশিক অবক্ষয় ঘটে। এ যুগে সুমেরীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাথে নতুন কোনো আবিষ্কার যুক্ত হয়নি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ যুগে কিছু উন্নতি লক্ষ করা যায়। গিলগামেশ কাব্যকে এ যুগে আরো বিস্তৃতভাবে লেখা হয়। ব্যবিলনীয় যুগে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের সাথে সাথে কুসংস্কার বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ যুগে জ্যোতিষচর্চা, ভাগ্যগণনা ও অন্যান্য যাদুবিদ্যার ব্যাপক প্রসার ঘটে। ভূত-প্রেতের পূজাও এ যুগে বিশেষ রকম বৃদ্ধি পায়।

আসিরীয় সংস্কৃতি

আসিরীয় সাম্রাজ্য ছিল সমরবাদী। এ রাজশক্তির কথা আগেই বলা হয়েছে। এ যুগে তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বা সাংস্কৃতিক বিকাশ আশা করা যায় না। তথাপি সামরিক প্রয়োজনে আসিরীয় যুগেও কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। আসিরীয়রা সম্ভবত বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রীতে বিভক্ত করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। ভূ-পৃষ্ঠকে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের ধরনে ভাগ করে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়ের পদ্ধতিও সম্ভবত তারা আবিষ্কার করেছিল। তারা পাঁচটি গ্রহ আবিষ্কার করেছিল ও তাদের নামকরণ করেছিল। তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আগে থেকে গ্রহণকাল নির্দেশ করতেও পারত। সৈন্যদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনে সে যুগে চিকিৎসাবিদ্যা ও ভেষজবিদ্যার চর্চাও হয়েছিল। এ যুগে পাঁচ শতাধিক উদ্ভিজ্জ ও খনিজ ওষুধের তালিকা প্রণয়ন করে তাদের গুণাগুণ ও ব্যবহারপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। বিভিন্ন রোগের লক্ষণের বিবরণও লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। সাধারণত রোগের কারণকে প্রাকৃতিক বলেই মনে করা হত তবে যাদুমন্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে ভূত-প্রেতকে বিতাড়িত করাকেও চিকিৎসার অঙ্গ বলে বিবেচনা করা হত।

আসিরীয় স্থাপত্য ও শিল্প

নিজেদের গৌরবগাথা বৃদ্ধি ও প্রচারের উদ্দেশ্যে আসিরীয় সম্রাটগণ বিশাল বিলাসপূর্ণ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। খোর্সাবাদে অবস্থিত সারগনের প্রাসাদ সম্রাটের শৌর্য ও

www.icsbook.info

ক্ষমতার নিদর্শন। উঁচু চাতালের ওপর অবস্থিত, পুরু ও ভারি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত প্রাসাদটি একটি দুর্গবিশেষ। এর মধ্যে অবস্থিত ছিল রাজকীয় ভবনসমূহ, রাজকীয় অশ্বশালা, একটি মন্দির ও একটি জিগ্‌গুরাট। প্রাসাদের প্রতিটি তোরণ ছিল ব্যবিলনীয়দের মতো খিলান-শোভিত।

প্রাসাদের প্রধান তোরণগুলোর দুপাশে নির্মিত ছিল প্রকাণ্ড মনুষ্যমস্তক বিশিষ্ট ডানাওয়ালা পাথরের তৈরি ষাঁড়দ্বয়। মানুষ বা পশুর মূর্তি নির্মাণে আসিরীয়রা তাদের শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় দান করত। প্রাসাদের দেয়ালে অঙ্কিত রিলিফ চিত্রে আসিরীয়রা তাদের নির্মম ও নিষ্ঠুর চরিত্রের পরিচয় দান করত। বেশির ভাগ চিত্রেই ছিল যুদ্ধ ও পশু শিকারের দৃশ্য। মনুষ্যচিত্রগুলি থেকে পশুচিত্রগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত বাস্তবধর্মী। মনুষ্যচিত্রগুলো অধিকাংশ প্রকাণ্ড মস্তকবিশিষ্ট অনড় ও নিষ্প্রাণ। অন্যদিকে পশুচিত্রগুলি তাদের চলমান ভঙ্গি ও নিষ্ঠুর অথবা ভয়ার্ত রূপ নিয়ে অধিকতর বাস্তবধর্মী। আসিরীয়দের অধিকাংশ চিত্রে ঘোড়া ও সিংহের মূর্তি দেখা যায়, তবে মাঝে মাঝে অন্যান্য পশু অর্থাৎ গাধা, কুকুর, হরিণ, ছাগল ও বিভিন্ন ধরনের পাখির চিত্র অঙ্কিত রয়েছে।

আসিরীয় রাজাদের অতীত ইতিহাস সংরক্ষণের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা গেছে। রাজা আসুরবানিপাল ২২ হাজারেরও অধিক কাদা মাটির লিপির পাত সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর তৈরি গ্রন্থাগারে এগুলো সংরক্ষিত ছিল। সুমেরীয়দের প্রার্থনার সংগীত, ধর্মীয় অনুষ্ঠানবীতিসমূহ, ব্যাকরণ ও চিকিৎসাবিধিসমূহ এই লাইব্রেরিতে লিপিবদ্ধ ছিল। এ ছাড়া ছিল অসংখ্য চিঠিপত্র, ব্যবসাসংক্রান্ত কাগজপত্র এবং সামরিক অভিযানের বিবরণ। রাজা নিজে তাঁর আত্মজীবনীও লিখে গেছেন। এগুলো প্রত্যেকটি আসিরীয়দের ইতিহাসের মূল্যবান সূত্ররূপে বিবেচিত হয়।

ক্যালডীয় সংস্কৃতি

আসিরীয়দের পতনের পর মেসোপটেমিয়ায় ক্যালডীয়দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্যালডীয় যুগই মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতার সর্বশেষ পর্যায়। এ যুগকে 'নব-ব্যাবিলনীয় যুগ'ও বলা হয়ে থাকে।

ক্যালডীয় যুগে বিজ্ঞানের বিশেষ বিকাশ ঘটেছিল। মেসোপটেমিয়ার ইতিহাসে ক্যালডীয় বিজ্ঞানীরা অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে আছেন। ক্যালডীয় বিজ্ঞানীদের অবদান অবশ্য প্রধানত জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রেই সীমিত রয়েছে। সাতদিনে সপ্তাহ ধরার হিসেব এরাই প্রবর্তিত করেছিল। ক্যালডীয়রা একদিনকে ১২টি জোড়া-ঘন্টায় ভাগ করেছিল, প্রত্যেক জোড়া ঘন্টায় ছিল ১২০ মিনিট করে সময়। আজ পর্যন্ত আমরা এই হিসাবই মেনে চলি। ক্যালডীয় জ্যোতির্বিদরা ৩৫০ বছর ধরে বিভিন্ন জ্যোতিষীর পর্যবেক্ষণ (যথা, গ্রহণ কাল ইত্যাদি) লিপিবদ্ধ করেছেন। ক্যালডীয়দের সাম্রাজ্যের পতনের পরও দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ হিসেব রাখার কাজ অব্যাহত ছিল। ক্যালডীয়রা বছরের দৈর্ঘ্য প্রায় নিখুঁতভাবে নিরূপণ করতে পেরেছিল; এ হিসেবে মাত্র ২৬ মিনিটের ভুল ছিল।

www.icsbook.info

ক্যালডীয় ধর্ম

জ্যোতির্বিদ্যায় ক্যালডীয়দের উৎসাহের পেছনে প্রধানত কাজ করেছে তাদের ধর্মীয় উদ্দীপনা। ক্যালডীয়রা এক জ্যোতিষীয় ধর্মের প্রচার করেছিল। দেবতাদের গতিবিধি থেকে মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা থেকেই ক্যালডীয়রা জ্যোতির্বিদ্যায় উৎসাহী হয়েছিল। ক্যালডীয় দেবতারা গ্রহ-নক্ষত্রের পরিচয়ে পরিচিত হতেন। এভাবে 'মার্দুক' হলেন 'জুপিটার' (বৃহস্পতি) ও 'ইস্তার' হলেন 'ভেনাস' বা শুক্র। কিন্তু ক্রমশ তারা মানুষের নাগালের বাইরে চলে যান এবং যাদুবিদ্যার দ্বারা তুষ্ট করে বা ভয় দেখিয়ে তাঁদের আর বশ করা যেত না। তাঁরা কেবল যান্ত্রিকভাবে জগৎটাকে চালিয়ে যেতেন। তাঁদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মানুষ অবহিত হলেও তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সব সময়েই মানুষের বোধগম্যের বাইরে থাকত।

এর ফল হল এই যে, মানুষ সম্পূর্ণভাবে হতাশার কবলে নিমজ্জিত হল। দেবতাদের মনের নাগাল পাওয়া যায় না, নিজের শক্তিতে অবস্থা পরিবর্তন করার ইচ্ছাশক্তিও ক্রমশ বিলুপ্ত হল এবং তার ফলে মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিল। ক্যালডীয়রা পরকালে বিশ্বাসী ছিল না, তাদের ধর্ম ছিল ইহজগৎকেন্দ্রিক। যা' কিছু পাবার তারা এ জগতেই লাভ করার বাসনা পোষণ করত। তবুও সামগ্রিক হতাশাবোধ যখন তাদের প্রবলভাবে আচ্ছন্ন করল, তখন অদৃষ্টের হাতে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় রইল না।

এই অদৃষ্টবাদ ও হতাশাবাদ থেকে জন্ম নিল মানুষের হীনমন্যতাবোধ। ক্যালডীয়দের প্রার্থনা-সংগীতে মানুষকে চিরন্তন পাপী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। মানবসন্তানরা সেখানে হাত-পা বাঁধা বন্দীরূপে চিত্রিত। তাদের এই দুঃখের কারণ তাদের পাপ।

এতদসত্ত্বেও ক্যালডীয়রা মধ্যযুগের ইউরোপের খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের মতো আত্মনিগ্রহ ও আত্মনির্যাতনের পথ বেছে নেয়নি— বরং তারা নিজেদের আমোদ প্রমোদ ও বিলাসিতায় নিমজ্জিত রেখেছিল। তারা এটা ধরেই নিয়েছিল যে, মানুষ চেষ্টা করলেও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পাপমুক্ত রাখতে পারবে না। অতএব পার্থিব সুখের অন্বেষণ করাই যুক্তিযুক্ত। ক্যালডীয় প্রার্থনা- সংগীতে কখনো কখনো শ্রদ্ধা, দয়া, পবিত্রতা প্রভৃতিকে মানুষের গুণ এবং নির্যাতন, মিথ্যা অপবাদ আরোপ ও ক্রোধকে দোষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তথাপি ক্যালডীয়রা দেবতাদের উদ্দেশ্যে যখন প্রার্থনা করত তখন তারা পবিত্র মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে চাইত না, তাদের আবেদন ছিল দেবতা যেন তাদের দীর্ঘজীবন দান করেন, তাদের ঘর যেন সন্তান ও সম্পদে ভরে ওঠে।

ক্যালডীয়রা নতুন করে ব্যবিলনীয় সভ্যতার পুনরুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করলেও পুরোপুরি সাফল্য লাভ করেনি— কেননা আসিরীয়দের রাজত্বকালে ব্যবিলনীয় সভ্যতা অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়। তা ছাড়া ক্যালডীয় নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পুরোনো সভ্যতা ছিল, যাকে তারা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে পারেনি। তা' সত্ত্বেও তারা পুরোনো আইন ও সাহিত্যের পুনরুত্থান ঘটিয়েছিল, ফিরিয়ে এনেছিল অনেক প্রাচীন প্রথা ও আদর্শ, প্রতিষ্ঠিত করেছিল পুরোনো ব্যবিলনীয় শাসনপদ্ধতি এবং শিল্প ও বাণিজ্যসমৃদ্ধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

www.icsbook.info

মেসোপটেমীয় সভ্যতা, বিশেষত ক্যালডীয় সংস্কৃতির প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। পারসিকরা ক্যালডীয় সংস্কৃতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। হিট্টাইট, ফিনিশীয় এবং হিব্রুরাও মেসোপটেমীয় সভ্যতার দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়েছিল। মেসোপটেমীয় সভ্যতার অনেক উপাদান ও উপকরণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও প্রবেশ করেছে। আমাদের সময় মাপার হিসেব, কোণ মাপার হিসেব (যথা ৩৬০ ডিগ্রীতে চার সমকোণ) ইত্যাদি আমরা পেয়েছি মেসোপটেমীয়দের কাছ থেকে। এমন কি কোষ্ঠিগণনা, রাশিচক্র ইত্যাদি অপবিজ্ঞান এবং কুসংস্কারও আমরা পেয়েছি ক্যালডীয়দের কাছ থেকে।

www.icsbook.info

প্রাচীন পারস্য সভ্যতা

৫৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারসিকরা মেসোপটেমিয়া জয় করে এবং তার অল্পকাল পরে সমগ্র ক্যালডীয় সাম্রাজ্য অধিকার করে নেয়। পারসিকরা ক্যালডীয়দের কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করলেও তাদের প্রাচীন সংস্কৃতিকে রক্ষা করার কোনো চেষ্টাই পারসিকরা করেনি, বরং অন্যান্য সূত্র থেকে অনেক নতুন উপাদান আহরণ করেছিল। পারসিকদের ধর্ম ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং তাদের শিল্পকলা ছিল বিভিন্ন বিজিত জাতিসমূহ থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন উপাদানের সমবায়ে গঠিত।

পারস্য সাম্রাজ্য ও তার ইতিহাস

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর আগেকার পারসিকদের সম্পর্কে অল্পই জানা যায়। ঐ সময় পর্যন্ত তারা পারস্য উপসাগরের পূর্ব উপকূলে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছিল। উপকূলীয় পর্বতশ্রেণী চাষের পক্ষে বাধাস্বরূপ হলেও পর্বতের পাদদেশ বনজ সম্পদ, সোনা, রূপা, লোহা, তামা ও সীসা ইত্যাদি ধাতু এবং মার্বেল ইত্যাদি সম্পদে পূর্ণ ছিল। দেশের অভ্যন্তরে গম, যব ইত্যাদির চাষ ও পশুপালনের সুবিধা ছিল। আমাদের আলোচ্যকালের শুরুতে পারসিকরা কোনো স্বাধীন জাতি ছিল না, এরা ছিল স্বজাতীয় মিডিয়াবসী মেডেসদের অধীন। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে মিডিয়া ছিল এক পরাক্রমশালী রাষ্ট্র। পারসিকদের ভাষা ছিল সংস্কৃত ও ইউরোপীয় ভাষাসমূহের সাথে সম্পর্কিত, যে কারণে তাদের ভারত-ইউরোপীয় ভাষা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়।

৫৫৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে 'কাইরাস' (রাজত্বকাল ৫৫৯-৫২৯ খ্রিঃপূঃ) দক্ষিণ পারসিক গোষ্ঠী দলের রাজা হন এবং পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি সমগ্র পারসিক জাতির শাসকে পরিণত হন। অতঃপর মিডিয়ার শেষ রাজা যখন মেসোপটেমিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানে রত তখন কাইরাসের নেতৃত্বে পারসিকরা তিন বছর যুদ্ধ করে মিডিয়া জয় করে নেয়।

মিডিয়ার প্রভুতে পরিণত হবার পর কাইরাস অনেকগুলো সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। সর্বমোট কুড়ি বছরের মধ্যে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পারসিক বাহিনীকে পুনর্গঠিত করে অশ্বারোহী বাহিনীকে মূল আক্রমণকারী বাহিনীরূপে গড়ে তোলেন। তবে সামরিক শক্তি ছাড়াও বিজিতদের প্রতি ধৈর্যশীল নীতি অনুসরণও তাঁর সহজ সাফল্যের অন্যতম কারণ। ৫৪৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কাইরাস আর্মেনিয়া ও কাপাডোসিয়া জয় করেন এবং ৫৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে লিডিয়া জয় করে প্রভূত বৈভবের অধিকারীও হন। এ বিষয়ে একটি চমকপ্রদ কাহিনী প্রচলিত আছে। পারসিকদের আক্রমণাভিলাষ অনুমান করে লিডিয়ার বিখ্যাত রাজা ক্রিসাস মিশর ও স্পার্টার সঙ্গে জোট বাঁধেন ও সম্ভাব্য যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে দৈববাণী লাভের

www.icsbook.info

মানসে ডেলফির মন্দিরে ধরনা দেন। ঐতিহাসিক হেরোডোটাস-এর বিবরণ অনুযায়ী, ঐ দৈববাণী উত্তর দেয় যে 'ক্রিসাস' অবিলম্বে পারসিকদের আক্রমণ করলে তিনি এক বিশাল সৈন্যবাহিনী ধ্বংস করতে সক্ষম হবেন। ক্রিসাস ধ্বংস করেছিলেন ঠিকই, তবে সেটা ছিল তাঁর নিজেরই বাহিনী। যুদ্ধে তাঁর সেনাবাহিনী পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় এবং লিডিয়া পারস্য সাম্রাজ্যের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়।

এ সকল বিজয়ের ফলে মেসোপটেমিয়ার চারপাশের প্রায় সকল দেশই কাইরাসের অধীনে চলে আসে। ৫৩৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তিনি ব্যবিলন দখল করে নেন। এবং তারপর দ্রুত সমগ্র ক্যালডীয় সাম্রাজ্য দখল করে নেন। এ বিষয়ে ব্যবিলনের ইহুদী সম্প্রদায় ও অসন্তুষ্ট ক্যালডীয় পুরোহিতরা তাঁর সহায়ক হয়েছিল। ব্যবিলন দখল করেই কাইরাস এক ফরমান জারি করেছিলেন, যাতে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, ব্যবিলনীয় শাসন ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে, তার দেব-দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হবে এবং ব্যবিলনের সমৃদ্ধি সাধন করা হবে। এ থেকে বোঝা যায় যে, কাইরাস শুধু সামরিক নেতা নন, সুদক্ষ রাজনীতিক এবং কূটনীতিকও ছিলেন।।

কাইরাস প্যালেস্টাইন এবং ফিনিশিয়ার বিরুদ্ধেও অনুরূপ পন্থায় অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি তাঁর অভিযানের শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যের ওপর জোর দেন এবং জেরুজালেম ও কতগুলো ফিনিশীয় নগরের পুনর্গঠনের জন্যে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেন। কার্যত অবশ্য ফিনিশিয়া ও প্যালেস্টাইন বিজয় মিশর বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে, যদিও ৫২৯ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দে বর্বরদের হাতে নিহত হবার ফলে তিনি এ কাজ সম্পন্ন করে যেতে পারেননি।

কাইরাসের পুত্র ক্যামবিসেস (রাজত্বকাল ৫২৯-৫২২ খ্রিঃপূঃ) ৫২৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মিশর জয় করেন এবং পিতার অনুসৃত নরম নীতি পরিহার করে সেখানে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। পারস্য সাম্রাজ্য একটি বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু একই কালে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ শুরু হয় এবং মিশর থেকে ফেরার পথে ক্যামবিসেস আততায়ীর হাতে নিহত হন। অতঃপর অভিজাত শ্রেণী থেকে আগত দারিয়ুস নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোহ দমন করে সম্রাট হন।

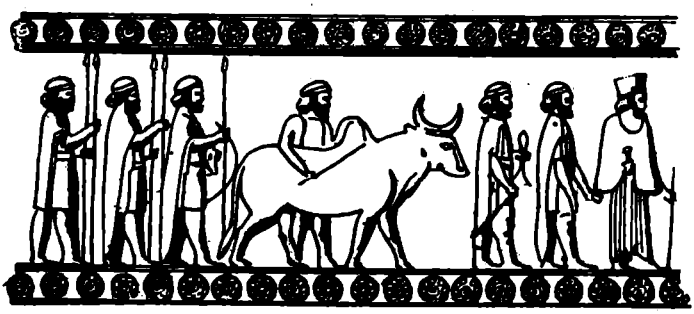

পার্সিপোলিস-এর প্রাসাদের দেওয়ালে খোদাই করা চিত্র ঃ পারস্য সম্রাটের জন্য উপঢৌকন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

www.icsbook.info

প্রথম দারিয়ুস বা তথাকথিত মহান দারিয়ুস ৫২২-৪৮৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বের প্রথম দিক বিদ্রোহ দমনে এবং রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার উন্নতি সাধনেই ব্যয় হয়। তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যকে বহুসংখ্যক সাট্রাপি বা প্রদেশে ভাগ করেন। সাধারণত এক একটি বিজিত রাজ্য একটি পৃথক সাট্রাপিরূপে গণ্য হত (যথা, মিশর, লিডিয়া ইত্যাদি)। এ সকল প্রদেশের শাসকদের সম্রাট স্বয়ং নিয়োগ করতেন এবং তাদের বলা হত সাট্রাপ। সাট্রাপিসমূহকে মুদ্রায় ও ফসলে কর দিতে হত। যেমন, মিশরকে বছরে ১ লাখ ২০ হাজার সৈন্যের উপযুক্ত গম দিতে হত। এসব কর আদায়ের ফলে দারিয়ুসের রাজভাণ্ডার প্রভূত ধনে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

দারিয়ুস মুদ্রাসংস্কার প্রবর্তন করেন। ইতিহাসে এই প্রথম নানা ধরনের রাজ্য নিয়ে গঠিত এই বিশাল সাম্রাজ্যে একই ধরনের মুদ্রার প্রচলন করা হয়। এটা ছিল 'দারিক' নামক এক স্বর্ণমুদ্রা, শুধু সম্রাটই এটা প্রস্তুত করতে পারতেন। সাট্রাপরা অবশ্য রূপা ও তামার মুদ্রা তৈরি করতে পারতেন। দরিক-এর প্রবর্তনের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে এবং বাণিজ্যিক ও সামরিক স্বার্থে দারিয়ুস সরকার রাস্তা নির্মাণ ও পথের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করেন। এ সময় পারস্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী পথঘাট নির্মিত হয় এবং রাস্তার পাশে পাশে পনের মাইল অন্তর সরাইখানা ও পাহারার ব্যবস্থা হয়। দারিয়ুস নীল নদ থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত একটি প্রাচীন খালের সংস্কারসাধন করেন ও তাকে সম্পূর্ণ করেন।

বিজিত জাতিসমূহের প্রতি দারিয়ুস ধৈর্যশীল নীতি অনুসরণ করতেন। তিনি প্রাচীন মন্দিরসমূহ ও স্থানীয় আচার-বিশ্বাসের পরিপোষকতা করেন এবং মিশরের সাট্রাপকে নির্দেশ দেন স্থানীয় পুরোহিতদের সাথে আলোচনাপূর্বক মিশরীয় আইনকে সূত্রবদ্ধ করার জন্যে।

দারিয়ুস সামরিক সংস্কারের প্রবর্তন করেন। বিভিন্ন সাট্রাপিতে স্থায়ী সামরিক বাহিনী স্থাপন করা হয় এবং সমগ্র সাম্রাজ্যকে সাট্রাপি-নির্বিশেষে পাঁচটি সামরিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়। সামরিক অঞ্চলসমূহের সেনাপতিরা সম্রাটের প্রত্যক্ষ অধীনে ছিলেন। দারিয়ুস তাঁর ক্ষমতার বাইরে গিয়ে সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখেন। তিনি হেলেস্পন্ট (দার্দানেলিস) অতিক্রম করে থ্রেসীয় উপকূলের এক বড় অংশ জয় করে নেন এবং এ কারণে এথেনীয়দের বিরাগভাজন হন। এ ছাড়া তিনি এশিয়া মাইনরের উপকূলে আয়োনীয় গ্রীসীয়দের ওপর উৎপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দেন (এরা লিডিয়ার পতনের ফলে পারসিকদের অধীনে এসেছিল)। এদের উপর দারিয়ুস করের বোঝা বাড়িয়ে দেন, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করেন ও নিজ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে তাদের বাধ্য করেন। এর আশু ফলস্বরূপ আয়োনীয় নগরসমূহে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, এথেন্স তাতে সাহায্য করে। বিদ্রোহে সহায়তা করার জন্যে দারিয়ুস এথেনীয়দের শাস্তি দিতে উদ্যত হলে তিনি প্রায় সমস্ত গ্রীক নগররাষ্ট্রসমূহের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। গ্রীসীয়-পারসিক যুদ্ধ চলাকালেই দারিয়ুস-এর জীবনাবসান ঘটে।

দারিয়ুসের পরে প্রথম জারেক্সেস ও আর্টাজারেক্সেস নিষ্ফলভাবে এ যুদ্ধ চালিয়ে যান। ৪৭৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই পারসিকরা প্রায় সমগ্র গ্রীস থেকে বিতাড়িত হয়। অতঃপর পারসিকরা সাময়িকভাবে আয়োনীয় দ্বীপমালা করায়ত্ত করতে এবং এশীয় ভূখণ্ডে এক বৃহৎ শক্তি হিসেবে টিকে থাকতে সক্ষম হয়; কিন্তু ইউরোপীয় ভূখণ্ডে

www.icsbook.info

তাদের আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টার এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে। পারস্য সাম্রাজ্যের শেষ দেড় শতাব্দীর ইতিহাস রাজহত্যা, প্রাদেশিক শাসকদের বিদ্রোহ ও বর্বর আক্রমণের কাহিনীতে ভরপুর। অবশেষে ৩৩০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গ্রীক বীর দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার পারস্য সাম্রাজ্যের স্বাধীন অস্তিত্ব ধ্বংস করলে এ প্রাচীন সভ্যতার অবসান ঘটে। পারস্য বা ইরানের পরবর্তী ইতিহাস খুব তাৎপর্যপূর্ণ না হলেও বর্ণনার যোগ্য। গ্রীসীয় রাজবংশ ৩৩০ থেকে ২৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ইরান শাসন করে। এর অল্পকাল পরেই পহ্লব বা পার্থিয়ানদের এক রাজবংশ (আরদাসেস বংশীয়) উত্তর-পূর্ব ইরানে ক্ষমতায় আসে।

২২৬ খ্রিষ্টাব্দে সাসানী রাজবংশের রাজা 'প্রথম আরদাশির' শেষ পার্থিয়ান রাজাকে পরাজিত করে ইরানের রাজা হন। ৬৫২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ রাজবংশ ইরানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকে। এ সময়ের মধ্যে তাঁরা রোম ও বাইজেন্টাইনের বিরুদ্ধে এবং হুন, মঙ্গোল ও তুর্কিদের বিরুদ্ধে বিরামহীন যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, মেসোপটেমিয়া ইত্যাদি অঞ্চল অধিকারের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ৬৫২ খ্রিষ্টাব্দে আরবদের কাছে পরাজিত হবার ফলে সাসানী রাজবংশের পতন ঘটে।

পারস্য সাম্রাজ্যের নানাবিধ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নিকট প্রাচ্যের অন্যান্য অধিকাংশ সভ্যতার তুলনায় এর স্থান অনেক উচ্চে ছিল। পারস্য সভ্যতা আসিরীয় সভ্যতার মতো সন্ত্রাসমূলক ছিল না। বিজিত রাজ্যসমূহের ওপর করের বোঝা আরোপ করলেও পারসিকরা তাদের আচার, সংস্কৃতি, ধর্ম, আইন ইত্যাদি বজায় রাখতে দিত। বস্তুত পারস্য সাম্রাজ্যের প্রধান গুরুত্ব এইখানে যে, এটা নিকট প্রাচ্যের বিভিন্ন সংস্কৃতি, যথা॥ পারস্য, মেসোপটেমিয়া, এশিয়া, মাইনর, সিরিয়া-প্যালেস্টাইন উপকূল ও মিশরের সংস্কৃতির মিলন এবং সংমিশ্রণ ঘটার সুযোগ সৃষ্টি করেছিল।

তত্ত্বগতভাবে পারস্য সম্রাট নিজেকে আলোর দেবতার বরপ্রাপ্ত স্বৈরাচারী নৃপতি হিসেবে জাহির করতেন। বাস্তবে অবশ্য তাঁকে অভিজাতদের ও সাট্রাপদের পরামর্শমত চলতে হত এবং মেডেস ও পারসিকদের প্রাচীন আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হত। পারস্য সম্রাটরা বিজিত রাজ্যের অভিজাত নেতাদের উচ্চ রাজপদে আসীন করতেন। সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে পারস্য সম্রাটরা চমৎকার রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছিলেন, একথা আগেই বলা হয়েছে। সবচেয়ে প্রশস্ত 'রাজপথ'টি ছিল ১৬০০ মাইল লম্বা, এটি ছিল পারস্য উপসাগরের নিকটবর্তী 'সূসা' থেকে এশিয়া মাইনরের উপকূলবর্তী 'ইফেসাস্' পর্যন্ত বিস্তৃত। এ পথটি এত সুরক্ষিত ও সুসংরক্ষিত ছিল যে, সম্রাটের বার্তাবহ দিনরাত চলে এক সপ্তাহের কম সময়ে এ সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে পারত। অন্যান্য রাজপথ বিভিন্ন প্রদেশের সাথে পারস্যের চারটি রাজধানী সুসা, পার্সিপোলিস, ব্যবিলন ও একবাটানার সংযোগ সাধন করেছিল।

পারসিক সংস্কৃতি ও তার প্রভাব

পারসিক সংস্কৃতির অনেকগুলো উপাদানই ছিল পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলোর কাছ থেকে পাওয়া। মননশীলতা ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে সত্য। এ দু'ক্ষেত্রে পারস্য সাম্রাজ্য বিশেষভাবে মেসোপটেমিয়া, মিশর, লিডিয়া ও উত্তর প্যালেস্টাইনের কাছে ঋণী। পারসিকদের লিখনব্যবস্থা আদিতে ছিল ব্যবিলনীয় 'কিউনিফর্ম'

www.icsbook.info

লিখনপদ্ধতি অনুরূপ। কালক্রমে পারসিকরা আরামীয়দের বর্ণমালার ভিত্তিতে ৩১টি বর্ণবিশিষ্ট এক বর্ণমালার সৃষ্টি করে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ফিনিশীয়রা সর্বপ্রথম বর্ণমালাভিত্তিক লেখন পদ্ধতির সৃষ্টি করেছিল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পারসিকদের নিজস্ব অবদান বিশেষ কিছু ছিল না, তারা মিশর ও মেসোপটেমিয়ার বিজ্ঞানকে কিছু পরিমাণে গ্রহণ করেছিল। পারসিকরা অবশ্য মিশরের সৌরপঞ্জিকার কিছু সংস্কার সাধন করেছিল। লিডিয়ার আবিষ্কৃত মুদ্রার ব্যাপক প্রচলনের কৃতিত্ব পারসিকদের। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে মুদ্রার প্রচলন পারসিকদের মাধ্যমেই প্রথমে ঘটেছিল।

স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে পারসীকরা প্রধানত ব্যবিলনীয় ও আসিরীয় রীতি অনুসরণ করেছে, তবে এক্ষেত্রে মিশরীয় এবং গ্রীসীয় রীতির প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, মেসোপটেমিয়ার নির্মাণ-কৌশলের একটা মূল বৈশিষ্ট্য তথা খিলানের ব্যবহার পারসিক স্থাপত্যে দেখা যায় না। খিলানের পরিবর্তে পারসিকরা মিশরীয় রীতি অনুযায়ী স্তম্ভ ও স্তম্ভশ্রেণী ব্যবহার করেছে। স্তম্ভের শীর্ষভাগে যে সর্পিল অলঙ্করণ পারসিক স্থাপত্যে দেখা যায় তাতে আয়োনীয় গ্রীক স্থাপত্যরীতির প্রভাব পরিস্ফুট হয়েছে। পারসিক স্থাপত্যশিল্পের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্মীয় ক্ষেত্রের চেয়ে জাগতিক ক্ষেত্রেই এর বেশি প্রকাশ ঘটেছে। এ' স্থাপত্যের প্রকাশ ঘটেছে মন্দিরনির্মাণে নয়, বরং প্রাসাদ নির্মাণে। পারসিক স্থাপত্যের প্রধান নিদর্শন হচ্ছে পার্সিপোলিসে নির্মিত সুরম্য রাজ-প্রাসাদ। এ প্রাসাদ ছিল দারিয়ুস ও জারেক্সেস-এর বাসভবন ও প্রধান দফতর।

পারস্য সাম্রাজ্যের সমসাময়িক ও তার পরবর্তী সভ্যতাসমূহের ওপর পারসিক ধর্মের গভীর প্রভাব পড়েছিল। পারসিকদের এ ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জরথুস্ত্র, তাই এ ধর্মের নাম দেয়া হয়েছে 'জরথুস্ত্রবাদ'। জরথুস্ত্র খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। জরথুস্ত্রবাদ অনুসারে দু'জন শক্তিমান দেবতা বিশ্বজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করেন। 'আহুর মাজদা' হচ্ছেন মঙ্গলের দেবতা। আর আহ্‌রিমান হলেন অমঙ্গলের দেবতা। এ দু' দেবতার মধ্যে বিরামহীন সংগ্রাম চলছে এবং শেষ পর্যন্ত আলোর দেবতা 'আহুর মাজদা' অন্ধকারের শক্তি আহ্‌রিমানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবেন। জরথুস্ত্রবাদ অনুসারে আহুর মাজদার জয়লাভের পর সমস্ত মৃত ব্যক্তিদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং সৎব্যক্তিদের স্বর্গে ও দুষ্টব্যক্তিদের নরকে প্রেরণ করা হবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নরকবাসীরাও উদ্ধার পাবে, কারণ পারসিক নরক চিরস্থায়ী নয়। জরথুস্ত্রবাদ ছিল এক নৈতিক ধর্ম। এ ধর্ম অনুসারে সৎকাজে পূণ্য ছিল এবং অসৎ কাজে পাপ হত। এ ধর্মকে এক অর্থে ঐশীধর্ম বলা চলে— কারণ এ ধর্মমত অনুসারে এ ধর্মের অনুসারীরা ঈশ্বরের সম্পর্কে গুপ্তজ্ঞান লাভ করত এবং ঐ জ্ঞানই ছিল একমাত্র সত্য। জরথুস্ত্রবাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম 'আবেস্তা'। জরথুস্ত্রবাদীরা বিশ্বাস করত যে ঐ গ্রন্থের সমস্ত বাণী ঈশ্বরের কাছ থেকে জরথুস্ত্রের কাছে প্রেরিত হয়েছিল।

জরথুস্ত্রবাদ বেশি দিন অবিকৃত থাকতে পারেনি। আদিম কুসংস্কার, যাদুবিদ্যা, পুরোহিততন্ত্র প্রভৃতির সংযোগে এ ধর্মমত অনেকাংশে রূপান্তরিত হয়। তদুপরি ভিন্ন দেশের ধর্মমত, বিশেষত ক্যালডীয় ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবের ফলেও জরথুস্ত্রবাদের অনেক পরিবর্তন ঘটে। জরথুস্ত্রবাদের সাথে এ সকল বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন ধর্মমতের উদয় ঘটে। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস হল মিথ্রাসবাদ

www.icsbook.info

(মিথাইজম্)। আহুর মাজদার প্রধান সহচর মিথ্রাস্-এর নাম অনুসারে এ মতের নামকরণ হয়েছে। কালক্রমে মিথ্রাস্ ব্যাপকসংখ্যক পারসিকদের প্রধান উপাস্য দেবতায় পরিণত হয়েছিলেন। সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যেই মিথ্রাসবাদ একটি প্রধান ধর্মমতে পরিণত হয়েছিল। আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যের পতনের পর যে সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়, সে সময় মিথ্রাসবাদ সে সকল অঞ্চলে দ্রুত প্রসার লাভ করে। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যে রোমেও এর প্রসার ঘটে। প্রধানত রোমের সাধারণ সৈন্য, দাস ও বিদেশীরাই এ ধর্মমত গ্রহণ করেছিল। মিথ্রাসবাদ ক্রমশ রোমের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্মমত সমূহের একটিতে পরিণত হয় এবং রোমের পৌত্তলিক ধর্ম ও খ্রিষ্টধর্মের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়। তবে খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষদিক থেকে মিথ্রাসবাদের প্রভাব দ্রুত কমতে থাকে। মিথ্রাসবাদের কিছু কিছু বিশ্বাস ও আচার-আচরণ সম্ভবত খৃষ্টধর্মের মধ্যে স্থান লাভ করেছিল।

আরেকটি ধর্মমতের মাধ্যমে পারসিক সংস্কৃতির প্রভাব বিদেশে বিস্তার লাভ করেছিল। এ ধর্মবিশ্বাসের নাম ছিল 'মানিবাদ' এর প্রবর্তক ছিলেন মানি নামক একজন অভিজাত পুরোহিত। মানি আনুমানিক ২৫০ খ্রিষ্টাব্দে একবাটানায় তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। জরথুস্ত্রের মতো মানিও ছিলেন একজন ধর্ম সংস্কারক। ২৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মানি তাঁর পারসিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। মানির মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যগণ পশ্চিম এশিয়ায় তাঁর ধর্মের প্রচার করে। ৩৩০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মানিবাদ ইটালিতে প্রবেশ করে। মানিবাদের অনুসারীরা শেষ পর্যন্ত খ্রিষ্টধর্মকে বরণ করেছিল।

মিথ্রাসবাদ ও মানিবাদ ছাড়াও পারস্য থেকে উন্নত আরো কয়েকটি ধর্মমত পশ্চিম এশিয়া ও ইটালিতে বিস্তার লাভ করেছিল। পরবর্তী সভ্যতার ওপর এ সকল ধর্মমতের মিলিত প্রভাব ছিল অপরিসীম। ৩০০ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দের দিকে আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়লে প্রাচীন জগতে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সীমান্তসমূহ ভেঙে পড়েছিল, প্রাচীন ব্যবস্থাসমূহ ভেঙে পড়ছিল এবং এক অঞ্চলের মানুষ উৎখাত হয়ে অন্য অঞ্চলে গিয়ে বাস স্থাপন করছিল। এর ফলে এ সময়ে মানুষের মধ্যে যে অস্থিরতা ও শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তার সুযোগ নিয়েই পারসিক ধর্ম ও সংস্কৃতির পারলৌকিক ও মরমীবাদী প্রভাব মানুষের মনে স্থান করে নিতে পেরেছিল। হেলেনিস্টিক যুগের অর্থাৎ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর ঠিক পরবর্তীকালের গ্রীক দর্শন এবং খৃষ্ট ধর্ম প্রভৃতির মাধ্যমে পারসিক ধর্মের বিভিন্ন দিক মানুষের মনে স্থান লাভ করেছিল।

www.icsbook.info

পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য সভ্যতা

হিব্রু সভ্যতা

নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যের যে সকল প্রাচীন সভ্যতা আধুনিক বিশ্বকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে হিব্রু সভ্যতা তাদের অন্যতম (পরবর্তীকালে হিব্রুদের ইহুদি রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে)। স্মরণ করা যেতে পারে খ্রিস্টধর্মের অনেকখানি পটভূমিই হিব্রুজাতির কাছ থেকে আহরিত হয়েছে। হিব্রুদের নৈতিকতার ধারণা আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, বিশেষত সে সব দেশে, যেখানে ক্যালভিনপন্থীরা শক্তিশালী ছিল। অবশ্য হিব্রু সভ্যতা শূন্য থেকে উদিত হয়নি, এর অনেক উপাদানই মিসরীয় ও ব্যবিলনীয় উৎস থেকে সংগৃহীত। আমরা দেখতে পাবো, হিব্রু দর্শন ছিল অংশত মিসরীয় ও অংশত গ্রীসীয় প্রভাবযুক্ত। তা সত্ত্বেও অবশ্য হিব্রু সভ্যতার মৌলিক অবদানও ছিল।

হিব্রু জাতির উৎপত্তি ও ইতিহাস

হিব্রুদের উৎপত্তির ইতিহাস রহস্যাবৃত। নৃতাত্ত্বিক অর্থে এরা কোনো নির্দিষ্ট জাতি নয়। পণ্ডিতদের মতে হাবিরু (পরদেশী) বা আপিরু শব্দ থেকে হিব্রু শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে হিব্রুদের আদি বাসভূমি আরবের মরুভূমি। তবে ইসরায়েলী জাতির আদি প্রতিষ্ঠাতাদের প্রথম সুস্পষ্ট আবির্ভাব ঘটে উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়াতে। সেখানে ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে 'আব্রাহাম'-এর নেতৃত্বে একদল হিব্রু বাস স্থাপন করে। পরে 'আব্রাহামে'র পৌত্র 'জেকব'-এর নেতৃত্বে একদল পশ্চিম দিকে যাত্রা করে ও প্যালেস্টাইন অধিকার করতে শুরু করে। প্রাচীন প্যালেস্টাইন ছিল ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম উপকূল জুড়ে লেবানন পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ থেকে আরব মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। 'জেকব'-এর অপর নাম 'ইসরায়েল' থেকেই উক্ত জাতির নামকরণ হয়েছে 'ইসরায়েলী'। ১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে ইসরায়েলীদের কিছু দল অন্যান্য হিব্রুদলের সাথে মিলে দুর্ভিক্ষ এড়ানোর মানসে মিশরে যায় এবং সম্ভবত সেখানে 'ফারাও' তাদের দাসে পরিণত করেন। ১৩০০-১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে 'এরা মোসেস'-এর নেতৃত্বে দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সিনাই উপদ্বীপে ফিরে আসে এবং তাঁর নির্বন্ধাতিশয্যে 'ইয়াহ্ওয়েহ্' (যেহোভা) নামক দেবতার উপাসনা করতে শুরু করেত। ইতিপূর্বে ইয়াহ্ওয়েহ্ ছিলেন সিনাই অঞ্চলের হিব্রু মেষপালকদের সাধারণ দেবতা। ইয়াহ্ওয়েহ্ দেবতার উপাসনাকে কেন্দ্র করে 'মোসেস' বিভিন্ন গোত্রকে ঐক্যবদ্ধ করেন। এই সম্মিলিত গোত্ররা কানান ভূমি তথা প্যালেস্টাইন বিজয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল।

www.icsbook.info

প্যালেস্টাইনের অধিকাংশ তখন কয়েক শতাব্দী যাবত সেমিটিক ভাষাভাষী কানানবাসীরা দখল করে ছিল। ব্যবিলনীয়, হিট্টাইট ও মিশরীয়দের সংস্পর্শে এসে এরা এক উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল। এরা লোহার ব্যবহার জানত, লেখার কৌশল আয়ত্ত করেছিল এবং হাম্মুরাবির আইনকে নিজেদের প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে গ্রহণ করেছিল। তাদের ধর্মও মূলত ব্যবিলনীয়দের থেকে আহরিত হয়েছিল। হিব্রুদের পক্ষে কানানভূমি বিজয় ছিল এক দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। দীর্ঘকালের মধ্যে তারা কয়েকটি অনুর্বর উপত্যকা ছাড়া কিছুই দখল করতে পারেনি, কিন্তু যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে তারা কানানবাসীদের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে তাদের সংস্কৃতিকে অনেক পরিমাণে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। হিব্রুদের কানানবিজয় সম্পূর্ণ হবার আগেই উভয়ের চেয়ে শক্তিশালী ফিলিস্টিন নামক জাতি এশিয়া মাইনর ও ঈজিয়ান উপসাগরীয় দ্বীপসমূহ থেকে এসে সমগ্র অঞ্চল অধিকার করে। ফিলিস্টিন থেকেই প্যালেস্টাইন নামের উৎপত্তি হয়েছে।

ফিলিস্টিন বিজয়ের ফলে হিব্রুরা হতোদ্যম না হয়ে বরং ঐক্যবদ্ধ হল এবং এরই প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে ১০২৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে হিব্রু রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হল। প্রথম রাজার নাম ছিল 'সউল'। এর আগে পর্যন্ত বিচারপতিগণই শাসন পরিচালনা করতেন। সউলকে অপসারিত করে অতঃপর রাজা হন 'ডেভিড' এবং তিনি প্রায় চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। ডেভিডের রাজত্বকাল হিব্রু ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। তিনি ফিলিস্টিনদের রাজ্যকে সংকুচিত করে নিজের অধীনে এক শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, বারোটি হিব্রু গোষ্ঠীকে নিজ রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং জেরুসালেমে এক মনোরম রাজধানী নির্মাণ শুরু করেন।

ডেভিডের পর তাঁর পুত্র 'সলোমন' রাজা হন, তিনিই ঐক্যবদ্ধ রাজ্যের শেষ রাজা। হিব্রু লোককাহিনীতে সলোমনকে জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ ও সুপণ্ডিতরূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

প্যালেস্টাইনে দাসশ্রম ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হত। কানানবাসীদের অনেককেই দাসে পরিণত করা হয়েছিল। রাজার ও মন্দিরের জমিতে দলবদ্ধ দাসদের দিয়ে কাজ করানো হত।

সলোমনের মৃত্যুর পরে দেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং উত্তরের দশটি হিব্রু গোত্র ইসরায়েল রাজ্য স্থাপন করে। দক্ষিণের দুটো গোত্রের বাসভূমি এর পর থেকে 'জুডা' রাজ্য নামে পরিচিত হয়। ৭২২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আসিরীয়রা ইসরায়েল রাজ্য অধিকার করে তার অধিবাসীদের বিশাল আসিরীয় সাম্রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়; অতঃপর এদের আর কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। 'জুডা' রাজ্য আরো শতাধিক বছর টিকে থাকে; কিন্তু ৫৮৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ক্যালডীয় সম্রাট নেবুচাদনেজার জেরুসালেম লুট করে এ রাজ্যের নাগরিকদের দাস বানিয়ে ব্যবিলনে নিয়ে যান। পারিসকরা ক্যালডীয় সাম্রাজ্য জয় করে নেবার পর সম্রাট 'কাইরাস' ইহুদিদের মুক্ত করে দেন। এরপর থেকে ৩৩২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডারের বিজয় পর্যন্ত প্যালেস্টাইন ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের আশ্রিত রাজ্য। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরে এ রাজ্য মিশরের গ্রীক বংশীয় টলেমী রাজবংশের অধীনে চলে যায়। ৬৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এটা রোমের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। ৭০ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদিরা বিদ্রোহ করায় রোমকরা শাস্তিস্বরূপ জেরুসালেম লুট করে

www.icsbook.info

নেয় ও এ রাজ্যকে রোম সাম্রাজ্যের প্রদেশে পরিণত করে। অতঃপর এ রাজ্যের রাজনৈতিক অস্তিত্ব লুপ্ত হয় এবং এর অধিবাসীরা ক্রমশ রোম সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের অধিবাসীদের সাথে মিশে যায়।

হিব্রু ধর্ম

মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীন হিব্রু জাতির একমাত্র ধর্মীয় ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো অবদান রক্ষিত হয়নি। বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে হিব্রু ধর্মের বিবর্তন ঘটেছে। এই স্তরগুলোকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) মানব জাতির অভ্যুদয় কাল থেকে ১১০০ খ্রিঃ পূঃ পর্যন্ত কালকে হিব্রু ধর্মের বিবর্তনের প্রথম স্তর ধরা যেতে পারে। এ' যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল পশুপূজা এবং বৃক্ষ, পর্বত, পবিত্র কূপ, ঝর্ণা ও এমনকি বিভিন্ন আকারের পাথরের মধ্যে বসবাসকারী কাল্পনিক আত্মার পূজা করা। এ যুগে বিভিন্ন ধরনের যাদুবিদ্যার আবির্ভাব ঘটে ধর্মের অঙ্গরূপে।

এ ছাড়া মড়াপূজা, মৃতদেহ দ্বারা ভবিষ্যৎবাণী করা, অনুকরণমূলক যাদুবিদ্যা, ছাগলের ওপর পাপের বোঝা চাপিয়ে নিজেদের পাপস্খালন করা প্রভৃতির প্রচলন ঘটে। পরবর্তীকালে পশুপূজার স্থলে মনুষ্যমূর্তিসম্পন্ন দেবতার পূজাব প্রচলন শুরু হয়। প্রত্যেক দেবতাকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়; তবে প্রত্যেক দেবতাকে সাধারণ নাম 'এল' বা ঈশ্বর বলে ডাকা হত। নির্দিষ্ট স্থান ও গোত্রের নির্দিষ্ট দেবতা ছিলেন রক্ষাকর্তা হিসেবে। তখনো পর্যন্ত হিব্রুদের মধ্যে 'ইয়াহ্ বেহ্'-এর পূজা প্রচলিত হয়নি।

(২) হিব্রু ধর্মের দ্বিতীয় স্তরের স্থায়িত্বকাল ১২০০ থেকে ৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। এ যুগের বৈশিষ্ট্য হল অন্যান্য দেবতাদের অস্বীকার না করেও মূলত একটি দেবতার পূজো করা। ইহুদিরা প্রধানত তাদের পয়গম্বর মূসার প্রভাবেই এক ঈশ্বরের উপাসনায় লিপ্ত হয়। এই ঈশ্বর তাদের কাছে 'ইয়াহ্বে' বা 'যেহোভা' নামে পরিচিত। কিন্তু হিব্রুদের যেহোভা সাকার এবং মনুষ্যোচিত দোষ-গুণবিশিষ্ট। মাঝে মাঝে তিনি খামখেয়ালি কোপণ স্বভাবসম্পন্ন, প্রচণ্ড রাগী, এমনকি ভুল করে অপরাধ করলেও কাউকে ক্ষমা করেন না। তবে তাঁর ক্ষমতা শুধু হিব্রুদের ওপরই সীমাবদ্ধ। সেজন্য তাঁকে সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন বলা যায় না। যেহোভা হিব্রু জাতির পথ প্রদর্শক, বিধবা ও এতিমদের রক্ষাকর্তা এবং একই সাথে জাতির ভুলত্রুটি সংশোধনকারী।

হিব্রুদের ধর্ম এক্ষেত্রে নৈতিক মানদণ্ডকে সর্বোচ্চে তুলে ধরেছে। এ যুগে ধর্ম শুধু ইহকালের পুরস্কারের বিধান দিয়েছে, পরকাল সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেনি। কালক্রমে এ ধর্ম বস্তুপূজা, যাদুবিদ্যা ও কুসংস্কারের প্রভাবে পড়ে এবং সর্পপূজা থেকে শুরু করে বলিদান পর্যন্ত সর্বপ্রকারের সব ধরনের প্রথা এতে প্রচলিত হয়।

খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দীর দিকে হিব্রুধর্ম এতখানি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যে, এর আশু সংস্কারের প্রয়োজন হয়। হিব্রুধর্মের উপর বাইরের ধর্মের প্রভাব বিপুলভাবে এসে পড়ে। যেহোভার পূজার সাথে প্রতিবেশী ফিনিশীয় ও কানানীয়দের 'বে'ল' দেবতার পূজা একত্রীভূত হয়ে যায়।

হিব্রুদের মধ্যে কয়েকজন সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা তাঁদের ধর্মকে বৈদেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। বিখ্যাত ধর্ম সংস্কারক 'ইলাইজা' হিব্রু

www.icsbook.info

ধর্মমন্দির থেকে 'বে'ল' দেবতার পূজারী পুরোহিতদের জোর করে টেনে বের করে নিজ হাতে তাদের হত্যা করেন। তিনি অন্যান্য হিব্রু দেবতাদের অস্বীকার না করলেও ঘোষণা করেন যে, হিব্রুরা কেবলমাত্র যোহোভারই পূজো করবে।

(৩) ধর্ম সংস্কারকদের সংস্কারকার্যের মধ্যে দিয়ে হিব্রু ধর্ম তৃতীয় স্তরে প্রবেশ করে। প্রধান ধর্ম সংস্কারক ছিলেন— আমোস, হোসিয়া, ইসাইয়াহ্ এবং মিকাহ্। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম ও সপ্তম শতক ছিল ধর্মসংস্কারের যুগ। হিব্রু ধর্ম সংস্কারকগণ ধর্মের ক্ষেত্রে এক নতুন দার্শনিক তত্ত্বের সূত্রপাত করেন। তাঁদের মূল বক্তব্য ছিলঃ (ক) একেশ্বরবাদ— পৃথিবীর একমাত্র প্রভূ হলেন যেহোভা; অন্য জাতিদের দেবতাদের কোনো অস্তিত্ব নেই (খ) যেহোভা শুধুমাত্র ন্যায়ের দেবতা, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নন; কেবলমাত্র ন্যায় ও মঙ্গলসাধনই তাঁর কাজ। পাপ ও অন্যায় কাজ কেবল মানুষের দ্বারাই সম্পন্ন হয়— ঈশ্বরের দ্বারা নয়। (গ) ধর্মের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র নৈতিক; যেহোভা কোনোরূপ আনুষ্ঠানিকতার বা অর্ঘ্য গ্রহণের প্রত্যাশী নন— সুতরাং মানুষের কাজ হবে ন্যায় বিধান করা, নির্যাতিতকে রক্ষা করা, এতিম ও বিধবাদের আশ্রয় দান করা। এই নতুন দার্শনিক ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে হিব্রুদের প্রাচীন ধর্মকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। নতুন তত্ত্বের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সে যুগে ধনসম্পদ কুক্ষিগত হয়েছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে। হাজার হাজার ক্ষুদ্র চাষী তাদের স্বাধীনতা হারিয়ে কয়েকজন ধনী ভূস্বামীর অধীনস্থ প্রজায় পরিণত হয়েছিল, উৎকোচ প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত, তদুপরি আসিরীয়গণ কর্তৃক আক্রমণের ভয় প্রতিনিয়ত বিদ্যমান। এ সকল ভীতির মোকাবেলা করার জন্যে প্রয়োজন ছিল সামাজিক দুর্নীতির উচ্ছেদসাধন এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে সমগ্র জাতিকে একটি সুসংবদ্ধ ধর্মের ছত্রচ্ছায়ায় সংঘবদ্ধ করা।

এই ধর্মীয় বিপ্লবের ফলে হিব্রুধর্মের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় এবং অন্যান্য ধর্মের সূত্রে প্রাপ্ত এর অভ্যন্তরের বিভিন্ন বর্বর প্রথার অবসান ঘটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেকালের হিব্রু ধর্ম বর্তমান ইহুদী ধর্ম থেকে বহুলাংশে পৃথক ছিল। হিব্রু ধর্মের আধ্যাত্মিক দিক বলে কিছুই ছিল না। এই ধর্ম ছিল সম্পূর্ণরূপে ইহলৌকিক জগৎকে কেন্দ্র করে গঠিত। এর উদ্দেশ্য ছিল নৈতিক ও সামাজিক— একটি ন্যায়ভিত্তিক সুসংবদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা। পরলোকে আত্মার মুক্তি সম্বন্ধে কিংবা স্বর্গ, নরক বা শয়তানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এ ধর্ম কোনো কিছু উল্লেখ করেনি। ধর্মসংস্কারের প্রভাব হিব্রু ধর্মে অল্প কিছুকাল মাত্র স্থায়ী হয় এবং এর পরে এ ধর্মে আবার অন্যান্য ধর্মের প্রভাব এসে পড়ে।

(৪) ৫৮৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ক্যালডীয় সম্রাট নেবুচাদনেজার কর্তৃক জেরুসালেম দখল করে সমগ্র ইহুদীদের দাস বানিয়ে ব্যবিলনে নিয়ে যাওয়া থেকে ৫৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারস্য সম্রাট 'কাইরাস' কর্তৃক ব্যবিলন দখল করে ইহুদিদের মুক্ত করে দেয়া পর্যন্ত সময়কালকে ইহুদীদের ইতিহাসে 'ব্যবিলনীয় বন্দী দশা' বলা হয়। এ সময়কাল হিব্রু ধর্মের বিবর্তনের চতুর্থ স্তর। ক্যালডীয়দের হাতে বন্দীদশা হিব্রুজাতির মনে বিস্তার করে প্রবল হতাশা, ফলে এযুগে তাদের ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নৈরাশ্যবাদ। যেহোভা তখন তাদের কাছে সর্বশক্তিমান অথচ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তিনি অত্যন্ত পবিত্র অথচ নির্বিকার এবং পূর্বের মতো সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আর আগ্রহী নন।

www.icsbook.info

তবুও মানুষ তাঁরই ইচ্ছার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। এ যুগে হিব্রুধর্মের আঙ্গিকেও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। জাতি হিসেবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্যে হিব্রুরা কতগুলো ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-আচরণ মেনে চলতে শুরু করে। খাদ্য ও অন্যান্য বিষয়ে বাছবিচারের প্রতি এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার ওপর অধিক মাত্রায় জোর দেয়ার ফলে সমাজে পুরোহিতশ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৫) হিব্রুধর্মের পঞ্চম বা সর্বশেষ স্তর ৫৩৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এসময়ে হিব্রুধর্ম পারস্য ধর্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়।

ইহুদীরা ক্রমশ শয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয় এবং তাকে সকল পাপ কাজের উৎস বলে মনে করতে আরম্ভ করে। তারা আরো বিশ্বাস করে যে, ভবিষ্যতে একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে, যিনি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলবেন এবং সমগ্র অধঃপতিত মানবজাতিকে ত্রাণ করবেন। 'শেষ বিচারে'র দিন এবং পরলোক সম্বন্ধেও তারা ক্রমশ আস্থাবান হয় এবং ইহজগৎ অপেক্ষা পরজগতের প্রতি তারা অধিকতর মনোনিবেশ করে। এ সময়ই ইহুদীদের ধর্মপুস্তক 'ইজেকিয়েল' আবির্ভূত হয়। পরবর্তীকালে অবশ্য তাদের মধ্যে যেহোভা কর্তৃক তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত বলে পরিচিত কয়েকটি ধর্মপুস্তকের প্রচলন ঘটে। এভাবেই প্রাচীন একেশ্বরবাদী হিব্রুধর্ম থেকে বর্তমানে প্রচলিত ইহুদীধর্মে রূপান্তর সাধিত হয়।

হিট্টাইট ও ফ্রিজীয় সভ্যতা

আজ থেকে একশ' বছর আগে হিট্টাইটদের সম্পর্কে তাদের নাম ছাড়া আর বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। কিন্তু ১৮৭০ সালে সিরিয়ার এক অঞ্চলে কিছু প্রস্তরলিপি পাওয়া যায়। আরো অনুসন্ধান চালানোর ফলে ১৯০৭ সালে আনাতোলিয়া অঞ্চলের বোঘজ কুই গ্রামের কাছে এক প্রাচীরঘেরা সুরক্ষিত নগরীর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে প্রায় ২০ হাজার দলিলপত্র, চিঠি, শিলালিপি ইত্যাদি পাওয়া গেছে এবং তাদের অনেকগুলোরই পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে। এ সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং দলিলপত্র থেকে জানা গেছে যে, হিট্টাইটরা এককালে এশিয়া মাইনর-এর সমস্ত অঞ্চল জুড়ে তাদের সাম্রাজ্যবিস্তার করেছিল। এমনকি কিছুকাল সিরিয়া এবং ফিনিশিয়া ও প্যালেস্টাইনের অংশবিশেষও হিট্টাইট সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হিট্টাইট রাজশক্তির উদয় ঘটেছিল প্রায় ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বব্দের দিকে এবং ১২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত তা' এক পরাক্রমশালী শক্তি হিসেবে বিরাজ করছিল। এরপর হিট্টাইট সভ্যতা অবশ্য আরো কয়েকশ' বছর শক্তিহীন অবস্থায় টিকে ছিল।

১৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের সমকালে সম্রাট 'লাবারনাশ' এশিয়া মাইনরের বিস্তৃত অঞ্চলে হিট্টাইট সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তার করেন। লাবারনাশকেই হিট্টাইট রাজশক্তির প্রতিষ্ঠাতা বলে গণ্য করা হয়। হিট্টাইট রাজবংশের অপর এক বিখ্যাত সম্রাট হচ্ছেন 'প্রথম মুর্শিলিশ'। এই পরাক্রমশালী সম্রাট ব্যবিলন অধিকার এবং লুণ্ঠন করেছিলেন।

হিট্টাইট রাজশক্তির সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে খ্রিষ্টপূর্ব পনেরো শতকে সম্রাট 'শুপ্পিলুলিউমাশ'-এর আমলে। এ সম্রাটের নেতৃত্বে হিট্টাইটরা এশিয়া মাইনরের দক্ষিণাংশ এবং টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস-এর উত্তরাংশে অবস্থিত মিতানি রাজ্য অধিকার করে। শুপ্পিলুলিউমাশ-এর উত্তরসুরীগণ মিশরের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সিরিয়া এবং

www.icsbook.info

প্যালেস্টাইন করায়ত্ত করেন। খ্রিষ্টপূর্ব চৌদ্দ-তের শতাব্দীতে মিশর এবং হিট্রাইট শক্তির মধ্যে ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত এক সন্ধির মধ্যে দিয়ে লড়াইয়ের অবসান ঘটে। সন্ধি অনুযায়ী উত্তর সিরিয়া হিট্রাইটদের করায়ত্ত থাকে। কিন্তু এ শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধে মিশর এবং হিট্রাইট উভয় রাজশক্তিই দুর্বল হয়ে পড়ে।

১২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পর থেকে হিট্রাইট সাম্রাজ্যের শক্তি খর্ব হতে থাকে। এ সময়ে ঈজিয়ান উপসাগর অঞ্চল থেকে দুর্ধর্ষ জাতির মানুষরা এসে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি অঞ্চল আক্রমণ করতে থাকে এবং এদের হাতেই কালক্রমে হিট্রাইট সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। এর পরেও ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী 'কারকেমিশ' নগরকে কেন্দ্র করে হিট্রাইট সভ্যতা কিছুকাল টিকে ছিল। কিন্তু এ নগর কোনো সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল না, এটা ছিল এক বাণিজ্যকেন্দ্র। অবশেষে ৭১২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আসিরিয়ার হাতে অবশিষ্ট হিট্রাইট রাজ্যের পতন ঘটে।

হিট্রাইট সভ্যতা যথেষ্ট উচ্চমান অর্জন করেছিল। আধুনিক কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, হিট্রাইট সভ্যতা মিশর ও ব্যবিলনের সভ্যতার সমপর্যায়ভুক্ত ছিল। অবশ্য এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে অন্তত বৈষয়িক উৎকর্ষের দিক থেকে হিট্রাইটরা যে যথেষ্ট উন্নতি করেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কৃষি বিষয়ে হিট্রাইটরা উন্নত জ্ঞানের অধিকারী ছিল এবং সাধারণভাবে তাদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপও যথেষ্ট বিকাশ লাভ করেছিল। হিট্রাইটরা খনি থেকে প্রচুর পরিমাণ রূপা, তামা ও সীসা আহরণ করত এবং প্রতিবেশী জাতিসমূহের কাছে তা' বিক্রি করত। বিশ্বসভ্যতায় হিট্রাইটদের একটা প্রধান অবদান হল, এরা লোহা আবিষ্কার করেছিল অর্থাৎ লোহার আকরকে উত্তপ্ত করে লোহা নিষ্কাশনের কৌশল আবিষ্কার করেছিল। হিট্রাইটরা খনি থেকে লোহার আকর সংগ্রহ করত এবং আকর থেকে লোহা নিষ্কাশন করে তার সাহায্যে বিভিন্ন অস্ত্র ও হাতিয়ার নির্মাণ করত। লোহার হাতিয়ার এবং অস্ত্র ব্রোঞ্জের হাতিয়ারের চেয়ে সহজলভ্য ও সস্তা, অথচ অনেক বেশি উপযোগী ছিল। হিট্রাইটদের কাছ থেকে অবশিষ্ট সভ্যজগৎ ক্রমে ক্রমে লোহা তৈরির পদ্ধতি জানতে পারে।

বিশ্বসভ্যতার বিকাশে হিট্রাইটরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। হিট্রাইটদের মাধ্যমেই মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতার বিভিন্ন উপাদান হিক্সস, কানানবাসী প্রভৃতি জাতির মধ্যে এবং সম্ভবত ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল। এভাবে হিট্রাইটরা ইউরোপে প্রাচীন এশীয় সভ্যতার বিস্তার সাধনে সহায়তা করেছিল।

হিট্রাইটদের কৃষ্টি ও সামাজিক রীতিনীতি ফ্রিজীয় (দেরহথধটভ) নামক অপর এক জাতিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল। প্রাচীনকালে এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যভাগ জুড়ে অবস্থিত ফ্রিজিয়া নামক অঞ্চলে এরা বাস করত। ফ্রিজীয়রা জাতিগতভাবে গ্রীকদের সাথে সম্পর্কিত ছিল বলে অনুমান করা হয়। ফ্রিজীয়রা এককালে সম্ভবত হিট্রাইটদের অধীনে ছিল। তবে ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পর ফ্রিজীয়রা স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করতে থাকে। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, ফ্রিজীয়দের বিস্তার লাভের ফলেই হিট্রাইটদের শক্তি অনেকাংশে কমে গিয়েছিল। ৬১০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে লিডীয়রা ফ্রিজিয়া জয় করে নেয়, কিন্তু ফ্রিজীয়রা তারপর ক্রমশ আংশিক স্বাধীনতা

www.icsbook.info

অর্জন করে। এ সময় ফ্রিজীয়দের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-শিল্প বিশেষ বিকাশ লাভ করে। অবশেষে ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে ফ্রিজীয়দের বাসভূমি সেলুকাসের সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত ৩০০ খ্রিস্টাব্দের পর 'বাইজেন্টাইন' সাম্রাজ্যের অধীনে ফ্রিজীয়দের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়।

ফ্রিজীয়দের মাধ্যমে এশিয়ার অনেক সাংস্কৃতিক উপাদান গ্রীসীয় ও রোমকদের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল। ফ্রিজীয়দের প্রধান দেবী 'সিবিলি'-র উপাসনা গ্রীক ও রোমকদের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল।

লিডীয় সভ্যতা

খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে হিট্রাইট সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে তার সাবেক রাষ্ট্র- শক্তির মূল অংশে লিডিয়া রাজ্যের উদয় ঘটে। আনাতোলিয়া বা এশিয়া মাইনরের (বর্তমান তুরস্কের অন্তর্গত) পশ্চিমাংশ জুড়ে লিডীয়দের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এদের আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ৫৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারস্য সম্রাট 'কাইরাস' লিডিয়ার শেষ রাজা 'ক্রিসাসকে' পরাস্ত করে লিডিয়া জয় করেন।

লিডিয়াবাসীরা ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষ। সম্ভবত স্থানীয় অধিবাসী ও পূর্ব ইউরোপ থেকে আগত মানুষদের সংমিশ্রণে এদের উৎপত্তি হয়েছিল। সুবিধাজনক অবস্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের জন্যে লিডিয়াবাসীরা প্রাচীনকালের তুলনায় প্রায় উচ্চতম মানের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল। ধনদৌলত, বিলাসদ্রব্য ও বর্মসজ্জিত রথের জন্যে লিডীয়রা জগতে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। ধনকুবের রূপে রাজা 'ক্রিসাস'-এর জগদ্ব্যাপী খ্যাতি অর্জন থেকে লিডীয়দের সম্পদের প্রাচুর্য অনুমান করা যায়। তাদের সম্পদের মূল উৎস ছিল নদী থেকে (অর্থাৎ নদীবাহিত সোনাবহুল বালি থেকে) আহরিত সোনা, পাহাড়ে বিচরণরত শত সহস্র ভেড়া থেকে আহরিত পশম এবং টাইগ্রীস-ইউফ্রেটিস উপত্যকা ও ঈজিয়ান সাগরের মধ্যেকার ব্যাপক বাণিজ্য থেকে আহরিত মুনাফা। তদুপরি উর্বর জমিতে ফসলও ফলত প্রচুর পরিমাণে।

একটি গুরুত্বপূর্ব মৌলিক আবিষ্কারের মাধ্যমে লিডিয়া মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। সেটি হল ধাতব মুদ্রা। লিডীয়রাই সর্বপ্রথম নির্দিষ্ট মানের মুদ্রার প্রচলন করে। মুদ্রার জন্যে তারা ইলেকট্রাম ব্যবহার করত। সোনা ও রূপার সংমিশ্রণে উৎপন্ন এ স্বাভাবিক সংকর ধাতুটি লিডিয়ার একটি নদীর বালিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এর আগে পর্যন্ত সোনার পাত দিয়ে মুদ্রার কাজ চালান হত। লিডীয়রা নির্দিষ্ট ওজনের ইলেকট্রামকে মুদ্রার আকার দান করে এক পাশে সিংহের মাথা ও অন্য পাশে ধনুর্বাণসজ্জিত মূর্তির ছাপ দিয়ে দিত। পরবর্তীকালে রাজা ক্রিসাস স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন করেন।

লিডীয়দের ধর্মবিশ্বাস এশিয়া মাইনরের অন্যান্য জাতির অনুরূপ ছিল। লিডীয়রা পাশা খেলার আবিষ্কার অথবা প্রচলন করেছিল বলে কথিত আছে।

www.icsbook.info

ফিনিশীয় সভ্যতা

ফিনিশিয়া দেশটি ছিল সিরিয়ার উত্তরাংশে, সিরিয়া মরুভূমির পশ্চিমে, লেবানন পর্বতশ্রেণী ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ উপকূল অঞ্চলে। আবাদযোগ্য জমি দেশে কম থাকায় ফিনিশীয়রা প্রাচীনকাল থেকেই সমুদ্র পথে নতুন স্থানের সন্ধান করতে বাধ্য হয়। কারণ এশিয়ার দুর্ধর্ষ জাতিসমূহের জন্যে দেশের অভ্যন্তরে যাবার কোনো সুযোগ ছিল না। পর্বতের গায়ের প্রচুর সিডার গাছ জাহাজনির্মাণের কাজে সহায়ক হয়েছিল। ফিনিশীয়গণ প্রাচীনকাল থেকেই জাহাজ নির্মাণে ও নৌকা চালনায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিল।

ফিনিশিয়ার অবস্থান ও বন্দরের সুবিধা তাকে বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী করে তুলেছিল এবং ফিনিশিয়ার নগরসমূহ ছিল বড় বড় বাণিজ্য কেন্দ্র। ফিনিশিয়া কোনো ঐক্যবদ্ধ রাজ্য ছিল না, এটা ছিল অনেকগুলো স্বতন্ত্র স্বাধীন নগররাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত সংযুক্ত রাজ্য ধরনের একটি দেশ ও সভ্যতা। এসব নগরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল টায়ার, সিডন ও বিব্‌লস।

১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর থেকে ফিনিশীয় নগরসমূহ ছিল মিশরীয় বা হিট্টাইট শাসনের অধীন। খ্রিঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে এগুলো স্বাধীনতা লাভ করে এবং এদের মধ্যে টায়ার নেতৃস্থান অধিকার করে। টায়ার-এর রাজা 'প্রথম হিরাম' (৯৬৯-৯৩৬ খ্রিঃ পূঃ) সাইপ্রাস ও আফ্রিকাতে একাধিক সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময়ে টায়ার নগরী বিব্‌লস ও সিডন-এর উপর আধিপত্য বিস্তার করে ও একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। টায়ার-এর নেতৃত্বে ফিনিশিয়ার সভ্যতা-সংস্কৃতির অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে খ্রিস্টপূর্ব দশম থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফিনিশিয়া প্রথমে ক্যালডীয় ও পরে পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। ৩৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার টায়ার অবরোধ করে তাকে ধ্বংস করেন।

ফিনিশীয় সভ্যতার সাধারণ পরিচয়

ফিনিশিয়ার প্রধান ফসল ছিল শস্য ও আঙুর। ফিনিশিয়াতে কৃষি বা শ্রমশিল্পে দাস নিয়োগের প্রথা ছিল না, বস্তুত সেখানে দাসশ্রমের ব্যাপক ব্যবহার কখনো হয়নি। শহরের লোকরা প্রধানত শ্রমশিল্পে ও ব্যবসাতে নিয়োজিত ছিল। ফিনিশীয়রা মদ্য ও কাঠ এবং কারিগরনির্মিত বিভিন্ন দ্রব্যাদি রপ্তানি করত। সমগ্র প্রাচীন বিশ্বে ফিনিশীয়রা তাদের কাঁচ, ধাতব শিল্প এবং একপ্রকার শামুক থেকে পাওয়া রক্ত-বেগুনী রঙের জন্যে বিখ্যাত ছিল; নানা দেশেই রাজা ও অভিজাতদের কাপড় রাঙানোর জন্য এ রং ব্যবহৃত হত। এ ছাড়া ফিনিশীয়রা এক দেশের জিনিস কিনে অন্য দেশে বিক্রিও করত।

ফিনিশীয়রা ভূগোলবিশারদ ও নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। বাণিজ্যের প্রয়োজনে ফিনিশীয়রা ঈজিয়ান ও ভূমধ্যসাগরের দেশসমূহে গমন করে এবং সর্বপ্রথম জিব্রাল্টার অতিক্রম করে। যেখানেই মূল্যবান দ্রব্যাদির সরবরাহের সম্ভাবনা ছিল, সেখানেই ফিনিশীয়রা কলোনি বা উপনিবেশ স্থাপন করেছে। এ ধরনের উপনিবেশ তারা ঈজিয়ান সাগরের রোড্‌স প্রভৃতি দ্বীপে এবং ভূমধ্যসাগরের সাইপ্রাস, মাল্টা, সিসিলি প্রভৃতি দ্বীপে এবং স্পেনের কয়েক স্থানে স্থাপন করেছিল। আফ্রিকার উত্তর উপকূলে তারা কার্থেজ নামে যে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল সেটা পরবর্তীকালে এক সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে

www.icsbook.info

পরিণত হয় এবং নিজেই একাধিক উপনিবেশ স্থাপন করে। একদল ফিনিশীয় আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করেছিল বলে কথিত আছে। ফিনিশীয়রা নৌচালনায় এতদূর দক্ষতা অর্জন করেছিল যে, রাত্রিকালে নক্ষত্র দেখে তারা জাহাজ চালাতে পারত। এ কারণে প্রাচীনকালে অন্যান্য জাতির কাছে 'ধ্রুবতারা' ফিনিশীয় তারা রূপে পরিচিত হয়েছিল। নৌ-চালনায় দক্ষতার কারণে ফিনিশীয় জাহাজ ও নাবিকদের বিভিন্ন রাজারা নিজেদের প্রয়োজনে নিয়োগ করতেন।

ফিনিশীয় সভ্যতার বিকাশের বিশেষ সামাজিক কারণ আছে। ব্রোঞ্জ যুগের শেষ পর্যায়ে লোহার আবিষ্কার মানবসমাজের সামনে যে অবাধ বিকাশের সুযোগ উপস্থিত করেছিল তার সদ্ব্যবহার করতে পারত কেবল সেসব জাতি, যারা সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিশেষ সুযোগ পেয়েছিল। মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্ক এতদূর শিকড় গেড়ে বসেছিল যে, নতুন উৎপাদন পদ্ধতি তার বিশেষ পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি। পারসিকরা ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ দান করত, কিন্তু তারাও প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মূল উৎপাদনব্যবস্থায় হাত দেয়নি। এ পরিস্থিতিতে ডোরিয়ান আক্রমণের ফলে ক্রীট ও মাইসিনির বাণিজ্যিক ঐতিহ্যের যে ক্ষতি সাধন হয় ও তাতে যে ছেদ পড়ে তারই সুযোগ গ্রহণ করে ফিনিশীয় নগরসমূহ সমৃদ্ধি অর্জন করে।

বাণিজ্যিক কার্যকলাপ

প্রাচীনকালে ফিনিশিয়া বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেছিল তার বাণিজ্যিক কার্যকলাপের জন্যে। ফিনিশিয়া প্রভূত বনজ সম্পদের অধিকারী ছিল। আবার, ফিনিশিয়ার অবস্থান ছিল উত্তর আরব, মধ্য প্যালেস্টাইন এবং দক্ষিণ সিরিয়া থেকে আগত স্থল-বাণিজ্য পথসমূহের মিলনস্থলে। ব্রোঞ্জযুগে মিশরের সাথে যে উপকূলীয় বাণিজ্য প্রচলিত ছিল তা খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দের দিকে আবার নতুন করে প্রচলিত হয়। এ সময়ে টায়ার এবং সিডন উভয় স্থানে জোড়া বন্দর (উত্তর ও দক্ষিণ) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ফিনিশিয়ার সামুদ্রিক বাণিজ্য বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে। বিবলস্ নগরেও একটা ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল। ফিনিশিয়ার মূল ভূমির কিছুটা উত্তরে অবস্থিত আরাডাস (আরভাদ) নামক ক্ষুদ্র দ্বীপটিও ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ বন্দর-দ্বীপ। ঈজিয়ান অঞ্চল এবং দক্ষিণ আনাতোলিয়া অভিমুখী সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের উপরে ছিল এ দ্বীপের অবস্থান। টায়ার এবং আরভাদ ছিল দুর্ভেদ্য দুর্গের দ্বীপ।

পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি

লেবাননের পাহাড়ের গায়ে যে সিডার ও জুনিপার গাছের বনভূমি ছিল সেটাই ছিল ফিনিশিয়ার মূল দেশজ সম্পদ। মিশর এবং আসিরিয়াতে এ কাঠের প্রচুর চাহিদা ছিল। বিবলস্ এবং আর্কে নামক বন্দর থেকে এসব কাঠের চালান যেত। এ ছাড়া ফিনিশীয় বণিকরা সাইপ্রাস থেকেও কাঠ রপ্তানি করত। কাঠের ব্যবসায় সাফল্য অর্জনের সাথে সাথে ফিনিশিয়া জাহাজনির্মাণ শিল্পেও দক্ষতা অর্জন করে। ফিনিশিয়া শুধু যে তার মাল পরিবহণের জন্যেই জাহাজ নির্মাণ করত তা নয়, ফিনিশিয়া জাহাজ নির্মাণকে

www.icsbook.info

একটি শিল্প হিসেবে গড়ে তুলেছিল। অর্থাৎ, ফিনিশিয়া চাহিদা অনুযায়ী জাহাজ নির্মাণ করে বিক্রি করত। এ ছাড়া কাঠের ব্যবসার উপজাত হিসাবে সিডার ও জুনিপার কাঠের তেল নিষ্কাশন করে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ উপার্জন করত।

ফিনিশিয়ায় তৈরি কাপড়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ফিনিশিয়ায় তৈরি কাপড় এবং পোশাক এত উচ্চ মানের ছিল যে, আসিরীয় সম্রাটরা ফিনিশিয়া আক্রমণ করে যে সব সম্পদ লুণ্ঠন করে দিয়ে যেতেন তাদের তালিকায় এ মূল্যবান কাপড়ের নাম পাওয়া গেছে। এ ছাড়া রক্ত-বেগুনি রঙে রঞ্জিত পোশাক প্রস্তুত করার জন্যেও ফিনিশিয়া খ্যাতি অর্জন করেছিল। ফিনিশীয়রা এক প্রকার শামুক থেকে রক্ত-বেগুনি রং প্রস্তুত করতে পারত। এ রংটা হয়তো অন্যান্য দেশও প্রস্তুত করতে শিখেছিল, কিন্তু ফিনিশীয়রা এ মূল রং থেকে যতগুলো বিভিন্ন ধরনের রং প্রস্তুত করতে পারত তা অন্য কোনো দেশ পারত না।

ফিনিশীয়রা সূক্ষ্ম কারুকার্যপূর্ণ ছোট-বড় নানা ধরনের বিলাসদ্রব্য নির্মাণ করত এবং বিদেশে রপ্তানি করত। বাইবেলে এবং হোমারের রচনায় এ তথ্যের উল্লেখ আছে। ফিনিশীয়রা হাতির দাঁত এবং ব্রোঞ্জ দিয়ে কারুকার্য পূর্ণ জিনিসপত্র তৈরি করত। তারা কাঠের গায়ে হাতির দাঁত খোদাই করে বসিয়ে সুদৃশ্য খাট-পালং, চেয়ার, আলমারি-সিন্দুক প্রভৃতি তৈরি করত। ফিনিশীয়রা শিল্পকর্মে মৌলিকত্বের পরিচয় দিতে পারেনি, কিন্তু সুন্দর অলঙ্করণযুক্ত এবং নিপুণ দক্ষতার সাথে নির্মিত হত বলে বিদেশে ফিনিশীয় পণ্যের চাহিদা ছিল। ফিনিশীয়রা খোদাই করা সুন্দর সুন্দর ধাতব পাত্র নির্মাণ করতে পারত। তারা হাতির দাঁত এবং ধাতু দিয়ে সুন্দর মূর্তি তৈরি করত।

ফিনিশীয়রা নানাপ্রকার পণ্য তৈরি করে বিদেশের বন্দরে বন্দরে বিক্রি করত। এসব পণ্যের অনেক নিদর্শন বিদেশে পাওয়া গেছে, কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত ফিনিশীয় ভূমিতে ফিনিশীয়দের তৈরি পণ্যের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি ফিনিশিয়ার সারাকান্দ নামক স্থানে মাটির নিচে ফিনিশীয় পণ্যের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে।

বর্ণমালার আবিষ্কার

ফিনিশীয় সংস্কৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে বর্ণমালার আবিষ্কার ও তার ব্যাপক প্রচলন। সম্ভবত ১২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের সমকালে এ আবিষ্কার সংঘটিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার এবং দ্রুত ও ঘন ঘন হিসাব ও দলিলপত্র প্রণয়নের আবশ্যকতাই ফিনিশীয় বর্ণমালা আবিষ্কারের অনুকূল সামাজিক পটভূমি রচনা করেছিল বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। আমরা জানি, অনুরূপ সামাজিক কারণেই ইতিপূর্বে মিশর ও ব্যাবিলনিয়ায় লেখন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল, কিন্তু তা ছিল চিত্রলিপি পর্যায়ের। ফিনিশীয়রা দূর-দূরান্তের স্বল্পমূল্যের জনপ্রিয় দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করত। এসব ছোট ছোট জিনিসের খুচরা বিক্রির হিসাব রাখতে হত বণিকদের নিজেদেরই এবং এ কাজটা ছিল পুরোহিততন্ত্রের অল্প ধরনের বৃহৎসংখ্যক জিনিসের হিসাব রাখার চেয়ে ভিন্নতর। ফলে ফিনিশীয়দের কালে অল্পসংখ্যক চিহ্নরাশির সাহায্যে বহু সংখ্যক জিনিসের হিসাব রাখার ব্যবস্থাটা অর্থনৈতিক বিকাশের পূর্বশর্ত রূপে দেখা দিয়েছিল। এ পরিস্থিতিতে ফিনিশীয়গণ কিউনিফর্ম ও হায়ারোগ্লিফ লিপির ভিত্তিতে ২২টি

www.icsbook.info

ব্যঞ্জনবর্ণের এক বর্ণমালার সৃষ্টি করে। এতে একটিও স্বরবর্ণ ছিল না। পরবর্তীকালে গ্রীসীয়গণ ১০০০ থেকে ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে ফিনিশীয়দের কাছ থেকে এ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে। তারা পূর্বোক্ত বর্ণমালায় স্বরবর্ণ সংযোজন করে তার উন্নতি সাধন করে। পরবর্তীকালে এট্রুস্কান ও রোমকগণ ইটালির গ্রীসীয়দের কাছ থেকে এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে এবং ক্রমে প্রায় সমগ্র সভ্যজগতে বর্ণমালাভিত্তিক লেখন পদ্ধতির প্রচলন ঘটে।

চিত্রলিপির সাথে বর্ণমালাভিত্তিক লিপির পার্থক্য এখানে যে, বর্ণমালার এক-একটি অক্ষর মানুষের কণ্ঠ দিয়ে উচ্চারিত এক-একটি ধ্বনির প্রতীক রূপে কাজ করে। বর্ণমালা সৃষ্টির ফলে মানুষ চিত্রলিপির প্রতীকধর্মিতার গণ্ডি ছাড়িয়ে বিমূর্ত চিন্তার প্রসার ঘটাতে সক্ষম হল। তদুপরি, হায়ারোগ্লিফিক লিপিতে লেখাপড়ার কাজটা ছিল কঠিন, তাই তা ছিল পুরোহিতদের একচেটিয়া অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। স্বল্পসংখ্যক অক্ষরবিশিষ্ট বর্ণমালার আবিষ্কারের ফলে লেখাপড়ার কাজটা সহজ হল এবং সভ্যতার ব্যাপকতর বিস্তার সম্ভব হল।

মাইনোসীয়—মাইসিনীয় সভ্যতা

ঘটনাক্রমে হিট্টাইট সভ্যতা এবং মাইনোসীয়-মাইসিনীয় সভ্যতা॥ উভয়ের অস্তিত্বের আবিষ্কার প্রায় একই সময়ে ঘটে। ১৮৭০ সালের আগে কেউ ধারণাও করেনি যে, ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপমালায় এবং এশিয়া মাইনরের উপকূলে গ্রীসীয় সভ্যতার উদয়ের আগে এক অত্যুচ্চ সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল। ১৮৭০ সালে হাইনরিখ শ্লিমান নামক একজন জার্মান ব্যবসায়ী ও সৌখিন পুরাতাত্ত্বিক 'ইলিয়াড' মহাকাব্যে বর্ণিত ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বের করার মানসে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য শুরু করেন এবং এ কাজে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেন। তিনি এশিয়া মাইনরে ট্রয় এবং মূল গ্রীক ভূখণ্ডে মাইসিনী ছাড়াও আরো একটি নগরের ধ্বংসাবশেষ উদ্‌ঘাটন করেন। অতঃপর ইংরেজ পুরাতাত্ত্বিক স্যার আর্থার ইভান্স প্রাচীন ক্রীটের রাজধানী নোসস্ আবিষ্কার করে প্রাচীন ক্রীটীয় সভ্যতার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। প্রাচীন ক্রীটের রাজাদের 'মাইনোস' নাম অনুসারে ক্রীটীয় সভ্যতাকে মাইনোসীয় সভ্যতা নামেও অভিহিত করা হয়। ক্রীটীয় সভ্যতা ও মাইসিনীয় সভ্যতাকে একত্রে 'মাইনোসীয়-মাইসিনীয়' সভ্যতারূপে অভিহিত করা হয়। এ উভয় সভ্যতাকে ঈজিয়ান সভ্যতাও বলা হয়ে থাকে।

ইতিপূর্বে আমরা যে নগর-বিপ্লবের বিবরণ দিয়েছি তার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, যে পলিভূমির উদ্বৃত্ত ফলনের ওপর নির্ভর করে ধাতুশিল্পভিত্তিক সভ্যতা গড়ে উঠত, সে সকল পলিভূমিতে স্বভাবতই খনিজ সম্পদের স্বল্পতা ছিল। এ সকল অঞ্চলে তাই ধাতু আমদানি করতে হতঃ তামা আসত ইরান, আর্মেনিয়া, সিরিয়া, সিনাই থেকে; সোনা আর্মেনিয়া ও নুবিয়া থেকে; রূপা ও সীসা কাপাডোসিয়া থেকে। বাণিজ্য ছিল তাই এ সব ব্রোঞ্জযুগীয় অর্থনীতির জীবনস্বরূপ এবং যতই এর প্রসার ঘটে ততই তা নতুন পাথব যুগে গ্রাম ও পার্বত্য গোষ্ঠীসমূহকে সভ্যতার আওতায় টেনে আনে।

৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যেই তামার ব্যবহার সারা মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ে; কিন্তু তা সার্বজনীন ছিল না। এ ধাতু যেসব জায়গায় প্রচুর উৎপন্ন হত সেখানেও লোকেরা তার সাহায্যে স্থানীয় শিল্প গড়ে না তুলে তা রপ্তানি করত। তাই মেসোপটেমিয়া ও

www.icsbook.info

মিশরের বাইরের যেসব নগরের উদয় হয়েছিল তা ছিল মূলত বাণিজ্যকেন্দ্র। যেমন, সিরিয়াতে যেখানে তামা, টিন ও কাঠের প্রাচুর্য ছিল— সেখানে বিব্‌লস্, উগারিট প্রভৃতি একগুচ্ছ নগর গড়ে ওঠে, যাদের মূল অর্থনৈতিক ভিত্তিই ছিল মিশর, মেসোপটেমিয়া ও আনাতোলিয়ার সাথে বাণিজ্য।

সভ্যতা এ পর্যন্ত অগ্রসর হবার পর নগর-বিপ্লব ভূমধ্যসাগরের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ছিল সস্তায় জলপথে চলাচলের সুবিধা। কিন্তু সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সাইপ্রাসের সভ্যতার বিকাশ ব্যাহত হয়েছিল। এর একটা কারণ সম্ভবত এই যে, সিরীয় উপকূলের উন্নত সভ্যতার কাছাকাছি থাকার ফলে সাইপ্রাসবাসীরা তামাশিল্পভিত্তিক সভ্যতা না গড়ে তামা রপ্তানি করত। তা ছাড়া আনাতোলিয়ার দক্ষিণ উপকূলের নিকটবর্তী অবস্থান বাণিজ্যের পক্ষে অনুকূলও ছিল না।

কিন্তু ক্রীটের অবস্থা ছিল অন্যরকম। সিরিয়া ও মিশর থেকে সমদূরস্থিত এ দ্বীপটি ঈজিয়ান সাগরের প্রায় প্রবেশমুখে অবস্থিত ছিল। ক্রীটের কৃষিসম্পদ মিশর ইত্যাদির তুলনায় কম হলেও তা ছিল সীমিত আয়তনের। সেখানে ছিল চারণভূমি, আর ছিল শস্য, জলপাই, আঙ্গুর ইত্যাদির উপযুক্ত উর্বর ভূমি, কিন্তু দ্বীপের বৃহৎ অংশই ছিল পাহাড় ও জঙ্গলে পূর্ণ। অপরপক্ষে, জলযান নির্মাণের উপযুক্ত কাঠের প্রাচুর্য ও ভাল বন্দরের সুযোগ থাকায় দ্বীপবাসীরা অনেক আগে থেকেই জলপথে চলাচলের সুবিধা গ্রহণ করে। ফলে ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকেই ক্রীটের অধিবাসীরা বাণিজ্যভিত্তিক নগরসভ্যতা গড়ে তোলে। এরা রপ্তানির জন্য প্রস্তুত করত প্রধানত মদ্য ও জলপাইয়ের তেল, মৃৎপাত্র, রত্ন ও আঙ্গুরীয়, ছুরি ও কৃপাণ এবং কারিগর-নির্মিত বিভিন্ন দ্রব্যাদি, আর আমদানি করত খাদ্যদ্রব্য ও ধাতু। এ ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে দেশটি সমৃদ্ধ নগরমালা সমন্বিত এক শিল্প-সমৃদ্ধ সভ্যতায় পরিণত হয় এবং নিকটস্থ সভ্যজগতের সাথে তার ব্যাপক সংযোগ স্থাপিত হয়।

ক্রীটীয় সভ্যতার প্রথম পর্যায়ে (২৯০০-২২০০ খ্রিঃ পূঃ), তখন ধাতুর প্রচলন হয়েছে, বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল মিশর ও সাইক্লেড্‌স্ দ্বীপপুঞ্জের সাথে এবং নগর বিকাশ তখন দ্বীপের পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্তে সীমিত ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে (২২০০-১৬০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ) আমরা লক্ষ্য করি জনসংখ্যার ক্রমিক বৃদ্ধি, ব্রোঞ্জের প্রচলন, মিশরের সাথে ব্যাপক বাণিজ্য ও সিরিয়ার সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের অনতিকাল পরে কাসাইটরা ব্যাবিলন আক্রমণ করলে প্রাচ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং সিরিয়ার সাথে সংযোগ ছিন্ন হয়; ক্রীটীয়রা তখন ঈজিয়ানের দিকে মুখ ফেরায়। তারা সাইক্লেড্‌স্-এর সাথে সম্পর্ক জোরদার করে এবং মধ্যগ্রীস পর্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে নোসস্ ও ফিস্টস্ নগরদ্বয়ের নেতৃত্বে ক্রীটীয় সভ্যতা উচ্চ পর্যায়ে আরোহণ করে। সম্প্রতি ক্রীটের পূর্ব উপকূলে কাটো জাক্রোস্ নামে আরেকটি সমৃদ্ধ নগরীর সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানে ২৫০টি কক্ষবিশিষ্ট এক বিরাট প্রাসাদ ও সাঁতারের পুকুর এবং হাজার হাজার অলঙ্করণযুক্ত মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। ক্রীটীয় সভ্যতার শেষ পর্যায়ে (১৬০০-১২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) নোসস্-এর রাজা বহুসংখ্যক রাস্তা তৈরি করেন ও তার পাশে পাশে সুরক্ষিত দুর্গ স্থাপন করে সমস্ত দ্বীপের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং সাগরপারে সাইক্লেড্‌স্, আগোলিস, এ্যাটিকা ও সম্ভবত সিসিলি পর্যন্ত তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু এ সমৃদ্ধি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

www.icsbook.info

খ্রিস্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে পরবর্তীকালে একিয়ান নামে পরিচিত একদল গ্রীক বর্বর গোষ্ঠীর মানুষ উত্তর পেলোপনেসাস্ থেকে অগ্রসর হয়ে ক্রমে মাইসিনি অধিকার করে। ক্রমশ পরাজিত জাতির বৈষয়িক সংস্কৃতি আয়ত্ত করে তারা সম্পদশালী হয়ে ওঠে এবং সমুদ্রের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে তারা নোসস্ জয় করে নেয় এবং তার অনতিকাল পরেই সমগ্র ক্রীটে তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। এরপর সাবেক ক্রীটীয় সাম্রাজ্য মাইসিনিকে কেন্দ্র করে কয়েক শতাব্দী টিকে ছিল। মাইসিনীয় আধিপত্যের যুগে ক্রীটীয় সংস্কৃতির অবনতি ঘটেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মাইসিনীয়রা ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়, কিন্তু তার দু'শো বছরের মধ্যে নিজেরাই বর্বর আক্রমণের শিকার হয়ে পড়ে। এ নবাগত দলও ছিল গ্রীসীয়, তবে তারা ছিল ডোরিয়ান দলের এবং সম্ভবত বলকান উপদ্বীপ থেকে এরা এসেছিল। এদের সংস্কৃতি ছিল আদিম ধরনের, তবে এরা লোহার ব্যবহার শিখেছিল। কয়েক শতাব্দী ধরে এরা গ্রীসীয় ভূখণ্ডে বসবাস করেছিল; তারপর তারা ক্রমশ দক্ষিণে অগ্রসর হয়। ১২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে এরা মাইসিনীয় নগরসমূহ জয় করে নেয়। এর দু'শো বছর পরে ক্রীটীয়-মাইসিনীয় সভ্যতার চিহ্ন ইতিহাসের অঙ্গন থেকে মুছে যায়।

মাইসিনীয় সভ্যতার দ্রুত অবসানের বিশেষ কারণ ছিল। তারা মাইনোসীয় সংস্কৃতির কারিগরি অবদানসমূহকে যুদ্ধে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় আরোহণ করেছিল। বিশেষত তারা ঘোড়া ও যুদ্ধরথ, নতুন ধরনের তলোয়ার, শিরস্ত্রাণ, দেহবর্ম ইত্যাদির প্রচলন করেছিল। কিন্তু উৎপাদনযন্ত্রের বিকাশের তারা কোনো চেষ্টাই করেনি। ফলে নতুন আক্রমণকারীদের সামনে তারা টিকতে পারেনি। কারণ, নবাগতরা লোহার অস্ত্রের ব্যবহার জানত। তদুপরি, ডোরিয়ানরা আদিম গোষ্ঠীগত ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল বলে সভ্য জাতিসমূহের মতো তাদের অস্ত্র কোনো বিশেষ শ্রেণীর কুক্ষিগত ছিল না, তাদের লোহার অস্ত্র দলের সকল মানুষের আয়ত্তে ছিল। তাই এ বিষয়টা লক্ষণীয় যে, ঈজিয়ান বক্ষে ব্রোঞ্জযুগের অবসান গ্রীসীয় সমাজের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সাথে যুক্ত ছিল।

মাইনোসীয় সভ্যতা সম্ভবত ছিল নিকট-প্রাচ্যের সভ্যতাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মুক্ত, স্বাধীন ও প্রগতিশীল। ক্রীটীয় শাসকরা ফারাও-এর অনুকরণে মাইনোস উপাধি ধারণ করলেও এঁরা কোনো যুদ্ধবাজ শাসক ছিলেন না। তাঁদের স্থায়ী সেনাবাহিনীর আকার ছিল ছোট, তাঁদের কোনো সুরক্ষিত নগরী ছিল না এবং বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যসংগ্রহের কোনো নজিরও পাওয়া যায় না। তাদের অবশ্য বৃহৎ নৌবাহিনী ছিল, কিন্তু তা' ছিল বাইরের আক্রমণ রোধ ও বাণিজ্য-বহরের সংরক্ষণের জন্যে, প্রজার বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে নয়। ক্রীটের নগর পরিকল্পনার মধ্যেও সহজ ও স্বাধীন সামাজিক সম্পর্কের লক্ষণ অনুভব করা যায়। মাইনোসীয় নগর গড়ে উঠত রাজপ্রাসাদ ও তার সংলগ্ন চত্বরকে কেন্দ্র করে। এ রাজা আবার প্রধান পুরোহিতও ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন মূলত বণিক-রাজা। রাজপ্রাসাদের চারপাশে থাকত অন্যান্য বণিকদের প্রাসাদ, তার চারপাশে কারিগর ও সাধারণ মানুষের বাড়ি। কিন্তু রাজা, অভিজাত ও বিভিন্ন স্তরের মানুষের বাসগৃহের মধ্যে কোনো রকম প্রাচীরের ব্যবধান ছিল না। বাণিজ্যের অগ্রগতির ফলে ভূস্বামীদের হাতে সম্পদ তথা ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে পারেনি; সে কারণেই মিশর-ব্যবিলন থেকে ভিন্নতর ধারায় সামাজিক বিকাশ এখানে সম্ভব হয়েছিল।

www.icsbook.info

এ বিষয়ে মাইনোসীয় সভ্যতা থেকে মাইসিনীয় সভ্যতার পার্থক্য ছিল। মাইসিনীয় নগর গড়ে উঠত সুরক্ষিত দুর্গকে কেন্দ্র করে। দুর্গ-প্রাকারের অভ্যন্তরে থাকত রাজপ্রাসাদ, রাজভাণ্ডার, তার চারপাশে থাকত অভিজাতদের প্রাসাদ। দুর্গ-প্রাচীরের বাইরে থাকত কারিগর ও ব্যবসায়ীদের বাসগৃহ। এরা রাজবাড়ির প্রয়োজন মেটাত। মাইসিনীয় সভ্যতায় শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতায় আরোহণ করেছিল ব্রোঞ্জের একচেটিয়া আধিপত্যের ভিত্তিতে।

www.icsbook.info

গ্রীসীয় সভ্যতা

এ পর্যন্ত আমরা মূলত মিশর ও এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। গ্রীসীয় সভ্যতার বিবরণদান প্রসঙ্গে আমরা ইউরোপের আদি সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে এখন আলোচনা করব।

প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার, ভৌগোলিক বা জাতিগত— কোনো অর্থেই ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে কোনো চিহ্নিত সীমারেখা নেই। ভৌগোলিক অর্থে ইউরোপ হচ্ছে ইউরেশিয়া মহাদেশের পশ্চিমাংশ। অনুরূপভাবে ইউরোপের প্রধান জাতিসমূহের প্রায় সবগুলোরই উৎপত্তিস্থল এশিয়া এবং তৎপরবর্তী কালেও বিরামহীন আক্রমণ -অভিযান এবং উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে ইউরোপীয় জাতিসমূহের সাথে এশীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। তথাপি একথা সত্যি যে, এশীয় বা প্রাচ্যদেশীয় সমাজ, চিন্তাধারা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার থেকে পৃথক এক ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির অস্তিত্ব রয়েছে। এ সভ্যতার আদি উৎপত্তিস্থল গ্রীস। কিন্তু এ ইউরোপীয় বা গ্রীসীয় বৈশিষ্ট্যের কারণ গ্রীসীয়দের জাতিগত বা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিহিত নেই। এর কারণ নিহিত রয়েছে গ্রীসের সমাজব্যবস্থার মধ্যে— যে সমাজব্যবস্থা প্রাচ্য সমাজ থেকে মূলগতভাবে পৃথক হলেও তারই অনুসৃতিস্বরূপ। মিশর-ব্যবিলন, ক্রীট ও ফিনিশিয়ার সভ্যতার মধ্য দিয়ে যে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় মানবসভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল তারই পরিণত রূপ ছিল গ্রীসের সভ্যতা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রীসীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের আদি উৎস ছিল মিশর ও ব্যবিলনীয় সভ্যতা, তাদের বর্ণমালা ছিল ফিনিশীয়দের কাছ থেকে নেয়া, তাদের স্বাধীনতা ও সৌন্দর্যবোধ ছিল মাইনোসীয়-মাইসিনীয় সভ্যতার প্রভাবেরই ফল।

ভৌগোলিক পরিবেশ

গ্রীসীয় সভ্যতার বিকাশের কাহিনী বুঝতে হলে তার ভৌগোলিক পরিবেশ জানা দরকার।

প্রাচীন গ্রীস ভূখণ্ড ছিল বলকান উপদ্বীপের দক্ষিণাংশ জুড়ে বিস্তৃত। পার্বত্যভূমি, স্বল্প বৃষ্টিপাত ও ভগ্ন উপকূল রেখা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। গ্রীসে বৃষ্টিপাত কম— কেবল শীতকালে মাস দুই বৃষ্টি হয়, বাকি সারাবছর আকাশ মেঘমুক্ত থাকে। গ্রীষ্মকালের আবহাওয়া শুষ্ক ও গরম।

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে গ্রীসকে তিনভাগে ভাগ করা চলে॥ দক্ষিণ, মধ্য ও উত্তর গ্রীস।

www.icsbook.info

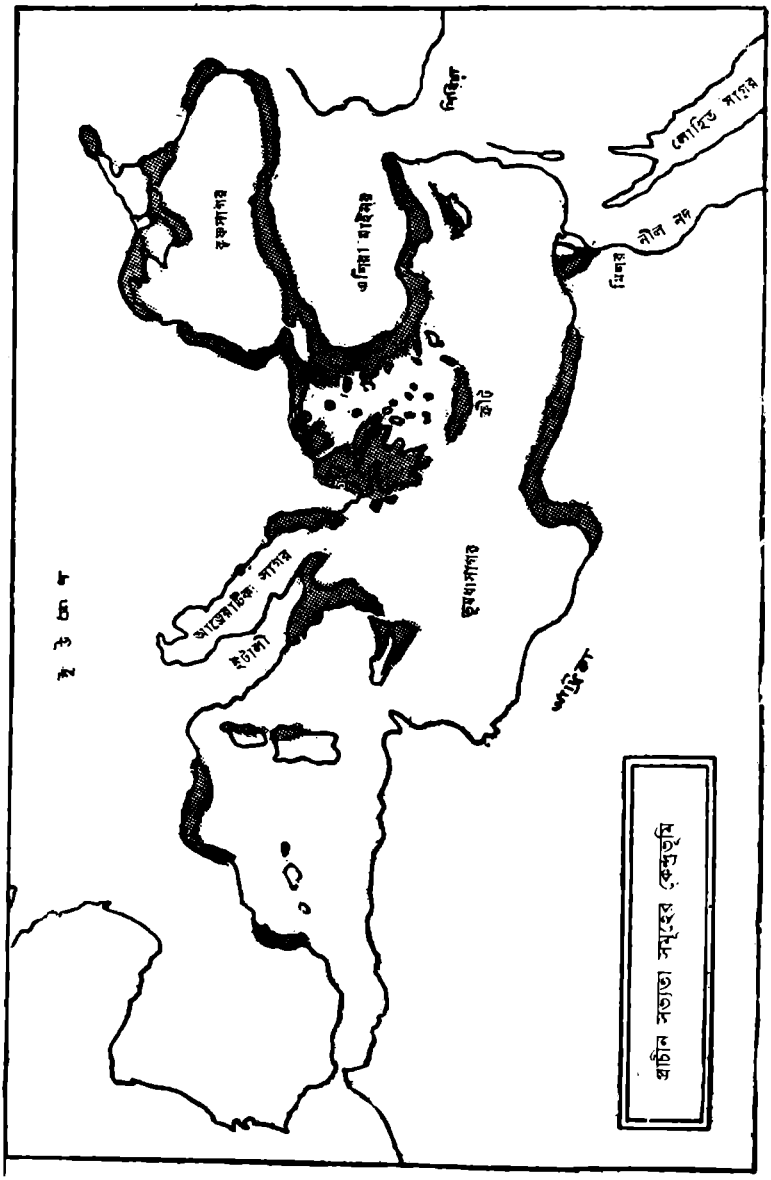

প্রাচীন গ্রীস ও তার উপনিবেশ সমূহ

www.icsbook.info

দক্ষিণ গ্রীস বা পেলোপনেসাস্ ছিল অবশিষ্ট গ্রীসের ভূভাগ থেকে সুগভীর উপসাগর দ্বারা বিচ্ছিন্ন, কেবল একটি যোজক দ্বারা এটি মধ্যগ্রীসের সাথে যুক্ত। মধ্য ও উত্তর গ্রীস পাহাড় দ্বারা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। মধ্য থেকে উত্তর গ্রীসে একমাত্র থার্মোপাইলি গিরিপথ দিয়ে যাওয়া চলত। পর্বতগুলো খুব উঁচু ছিল না, কিন্তু এগুলো ছিল খাড়া খাড়া এবং এগুলো দেয়ালের মতো উঠে বিভিন্ন সমতলভূমিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। এ সকল বিচ্ছিন্ন অংশগুলোই ব্যাপকসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র নগররাষ্ট্রের আধারে পরিণত হয়েছিল; প্রত্যেক নগররাষ্ট্রের জীবনযাত্রা ছিল অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং প্রত্যেকের নিজস্ব আইন, সংবিধান ও সেনাবাহিনী ছিল। গ্রীসীয়রা প্রত্যেকে যার যার নগররাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ছিল এবং তাদের মধ্যে আঞ্চলিক দেশপ্রেমের মনোভাব খুব প্রবল ছিল।

প্রাচ্য সভ্যতাসমূহের বিকাশে নদীর যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল গ্রীসের ক্ষেত্রে তেমন হয়নি। সমগ্র বলকান উপদ্বীপে একটাও বড় নদী ছিল না। অপর পক্ষে গ্রীসীয় সমাজের বিকাশে সমুদ্রের প্রভাব ছিল অপরিসীম। গ্রীসের তিন দিকের উপকূল আর্ড্রিয়াটিক সাগর, ভূমধ্যসাগর ও ঈজিয়ান সাগর দ্বারা বিধৌত। এ সকল সাগর দেশের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে, যে কারণে গ্রীস ভূখণ্ডের কোনো অংশই সমুদ্র থেকে চল্লিশ মাইলের বেশি দূরবর্তী নয়। ভগ্ন উপকূলরেখার জন্যে বহুসংখ্যক বন্দর স্থাপন সম্ভব হয়েছে। তদুপরি, এশিয়া মাইনরের নৈকট্য এবং ঈজিয়ানবক্ষে অসংখ্য দ্বীপমালার অস্তিত্ব গ্রীসীয়দের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যে উৎসাহী করে তুলেছিল। ঈজিয়ান দ্বীপমালা গ্রীস ও এশিয়া মাইনরকে এমনভাবে যুক্ত করেছিল যে, গ্রীসীয় নাবিকগণ মাটিকে চোখের আড়াল না করে, শুধু চোখের নজর দ্বারা চালিত হয়ে ছোট ছোট জাহাজ নিয়ে এশিয়া মাইনর বা কৃষ্ণসাগর উপকূলে পৌঁছাতে পারত। প্রাচীন গ্রীস খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ ছিল—ল্যাকোনিয়াতে (পেলোপনেসাস্-এ) ছিল লোহা, এ্যাটিকাতে (মধ্য গ্রীসে) ছিল রূপা, থ্রেস-এ (ঈজিয়ানদের উত্তর উপকূলে) ছিল সোনা। এ ছাড়া ছিল কাদা-মাটি, বাড়ি বানানোর মতো পাথর আর মার্বেল পাথর। গ্রীসের জমি সাধারণভাবে ছিল অনুর্বর, কেবল মাঝে মাঝে কৃষির উপযুক্ত উর্বর সমভূমি ছিল, যথা— দক্ষিণে ল্যাকোনিয়া ও মেসেনিয়াতে, মধ্যগ্রীসে বিওথিয়াতে এবং উত্তরে থেসালীতে।

অনুর্বর জমি ও খনিজসম্পদের প্রাচুর্য ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও কারিগরি শিল্পের বিকাশের সহায়ক হয়েছিল। তবে, উল্লেখ করা যেতে পারে, বিশ্ব-পর্যায়ে মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতি একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছানোর পরই কেবল এ সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়েছিল।

গ্রীসীয় সভ্যতার আদি পর্যায়

গ্রীসের আদি ইতিহাসকে দুই অংশে ভাগ করা চলে— ১৬০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত মাইসিনীয় বা একিয়ান যুগ এবং ১২০০ থেকে ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত হোমারীয় অথবা অন্ধকার যুগ। আমরা আগেই জেনেছি, খ্রিস্টপূর্ব ষোলো শতকে একিয়ান নামে পরিচিত গ্রীসীয় মানুষের দল তাদের আদি বাসভূমির গণ্ডি ছাড়িয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয়। কালক্রমে এরা মাইসিনি অধিকার করে সেখানেই তাদের শক্তি

www.icsbook.info

কেন্দ্রীভূত করে। এরপর থেকে এরা গ্রীসের ইতিহাসে মাইসিনীয় নামে পরিচিত হয়, যদিও এথেন্স, থিব্‌স্ (গ্রীসে অবস্থিত, মিশরের থিব্‌স্ নয়), পাইল্‌স্ ও অন্যান্য স্থানে এদের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। ১৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এরা নোসস্ অধিকার করে নেয়। মাইসিনীয়রা ছিল অর্ধবর্বর জাতি, এদের সামাজিক ও রাজনৈতিকব্যবস্থা প্রাচ্যদেশীয়দের অনুরূপ ছিল। সুরক্ষিত নগরে এদের যেসব রাজা বিরাজ করতেন, তাঁরা উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য কাজে একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করতেন বলে অনুমিত হয়। তাঁদের প্রজাদের মূল কাজই ছিল রাজার ধনবৃদ্ধির জন্যে পরিশ্রম করা।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ঐতিহাসিক যুগের গ্রীকরা আসলে এক মিশ্রজাতি। আদিমতম গ্রীকরা অনেককাল আগে সম্ভবত ইউরোপের ডানিয়ুব নদীর অববাহিকায় বাস করত। সেখান থেকে ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তারা ক্রমে ক্রমে গ্রীক উপদ্বীপে অধিকার বিস্তার করে। এখানকার স্থানীয় ভূমধ্যসাগরীয় আদিবাসীদের সাথে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বহু শতাব্দী ধরে একিয়ান, ডোরিয়ান প্রভৃতি গ্রীকদের সংমিশ্রণের মাধ্যমেই পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক যুগের গ্রীক জাতির সৃষ্টি হয়েছে।

হোমারীয় যুগ

১২০০ থেকে ৮০০ খ্রিঃ পূঃ পর্যন্ত কালের গ্রীসের ইতিহাস 'হোমারীয় যুগ' নামে পরিচিত। খ্রিষ্টপূর্ব নবম বা অষ্টম শতাব্দীর গ্রীসীয় মহাকবি হোমারের রচিত দুই সুবিখ্যাত মহাকাব্য 'ইলিয়াড' এবং 'ওডিসি'তে ঐ যুগের গ্রীসের সমাজ ও জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। এ কারণেই ঐ যুগের নামকরণ হয়েছে 'হোমারীয় যুগ'। গ্রীসে হোমারীয় যুগের সমাজ গড়ে উঠেছিল ডোরিয়ান আক্রমণে মাইসিনীয় সভ্যতার পতন ঘটার পর। গ্রীকরা কিভাবে ট্রয় বা ইলিয়ন নগর জয় করেছিল সে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ইলিয়াড মহাকাব্যে। আর ট্রয়ের যুদ্ধের পর গ্রীক সেনাপতি ওডিসিয়াস কিভাবে বিভিন্ন বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে স্বদেশে ফিরলেন তার বর্ণনা আছে ওডিসি মহাকাব্যে।

হোমারীয় যুগে একিয়ান, ডোরিয়ান ও আয়োনীয় সব গ্রীকদের সংস্কৃতি প্রায় একই রকম ছিল। এবং এ সংস্কৃতি ছিল আদিম ধরনের। ডোরিয়ান আক্রমণে একিয়ান তথা মাইসিনীয় সভ্যতার পতন ঘটায় সমাজব্যবস্থার সাময়িক অবনতি ঘটেছিল। হোমারের কাব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, তৎকালীন গ্রীসের মানুষ কৃষি ও পশুপালনেই প্রধানত নিয়োজিত ছিল। এ সকল আদিম গ্রামসমাজগোষ্ঠীর ভিত্তিতেই সংগঠিত হত। এটা স্বাভাবিক, কারণ ডোরিয়ানরা ছিল বর্বরসমাজের মানুষ। ডোরিয়ান আক্রমণের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হয়েছিল এবং নাগরিক সভ্যতার পতন ঘটেছিল। হোমারীয় যুগকে তাই গ্রীক ইতিহাসের অন্ধকার যুগও বলা হয়। এ যুগের গ্রীকরা লিপি এবং লেখন পদ্ধতির সাথে পরিচিত হয়নি। অবশ্য একিয়ানরা একটি লেখন পদ্ধতি আয়ত্ত করেছিল; কিন্তু সেটা তারা স্পষ্টতই ক্রীটীয়দের কাছ থেকে পেয়েছিল এবং ডোরিয়ান আক্রমণে তা' লুপ্তও হয়ে গিয়েছিল। সাধারণভাবে বলা চলে, হোমারীয় যুগের গ্রীকসমাজ লেখন পদ্ধতির সাথে অপরিচিত ছিল।

অবশ্য হোমারীয় যুগের গ্রীক সমাজ যে পুরোপুরি আদিম নতুন পাথরের যুগের সমাজে পর্যবসিত হয়েছিল, তা' বলা চলে না। ব্রোঞ্জ যুগের ঈজিয়ান অঞ্চলের কৃষকদের

www.icsbook.info

মধ্যে প্রচলিত আঙুর ও জলপাইয়ের চাষের রেওয়াজ অন্ধকার যুগেও লোপ পায়নি। মাইসিনীয় যুগের মাটির পাত্র নির্মাণের কৌশল এবং ক্রীটের ধাতুশিল্পের জ্ঞানও গ্রীসীয়দের মধ্যে অব্যাহত ছিল। ক্রীটীয় এবং ফিনিশীয়দের কাছ থেকে গ্রীসীয়রা নৌবিদ্যায়ও পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। ১০০০ থেকে ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে গ্রীসীয়রা ফিনিশীয়দের কাছ থেকে বর্ণমালাভিত্তিক লিপি এবং লেখন পদ্ধতিও আয়ত্ত করে। লৌহযুগের গ্রীকদের তাই সম্পূর্ণ বর্বর অবস্থা থেকে কোনো অলৌকিক উপায়ে নতুন যুগের বিজ্ঞান, কলাকৌশল, অর্থনীতি ইত্যাদি গড়ে তুলতে হয়নি। ক্রীটীয় এবং মাইসিনীয় সভ্যতার মাধ্যমে ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতার সকল মূল অবদানসমূহ পরবর্তীকালের গ্রীসীয় সমাজের হাতে পৌঁছেছিল। এ সকল কারিগরি শিল্প ও উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তিতে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর পরে গ্রীসে নতুন সমাজ গড়ে উঠেছিল।

প্রাচীন যুগের ইতিহাস

৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর থেকে প্রাচীন গ্রীসে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি ঘটতে থাকে। ব্রোঞ্জ যুগের এবং লৌহ যুগের কারিগরি ও অন্যান্য অবদানের ভিত্তিতে গ্রীকসমাজের নতুন বিকাশ ঘটে। গ্রীসের বিভিন্ন দ্বীপ ও নগরে লোহার হাতিয়ার ঢালাই ও ঝালাই করার প্রক্রিয়ার প্রচলন হয়েছিল। মাটির পাত্র, তাঁতের কাপড়, পাথরের অট্টালিকা নির্মাণ প্রভৃতিরও প্রচলন হয়েছিল। এ ভাবে নতুন নতুন পেশা ও ব্যবসাা-বাণিজ্যের উদয় ঘটে। ফিনিশিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলের সাথে বাণিজ্যিক যোগযোগ নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যবসার প্রসারের সাথে সাথে মুদ্রার প্রচলন ঘটে। মুদ্রা অবশ্য প্রথম পশ্চিম এশিয়ার লিডিয়াতে আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল ইলেকট্রামের (অর্থাৎ সোনা ও রূপার মিশ্র ধাতুর) তৈরি উচ্চমানের মুদ্রা। লিডিয়ার অনুকরণে পারস্যে সোনার এবং গ্রীসে রূপার যে মুদ্রার প্রচলন হয় সেগুলোও ছিল উচ্চমানের মুদ্রা। উচ্চমানের মুদ্রার সাহায্যে ধনী কৃষক মহাজনরা বড় বড় লেনদেনের কাজ চালাতে পারলেও ছোট ছোট কৃষক কারিগররা এর ফলে বিন্দুমাত্রও উপকৃত হয়নি। কিন্তু ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের অল্পকাল পরে এথেন্স্, করিন্থ্ প্রভৃতি গ্রীক নগররাষ্ট্রে তামা বা রূপার তৈরি কম মানের ছোট মুদ্রার প্রচলন হওয়ার ফলে গ্রীসের ব্যাপকসংখ্যক দরিদ্র কৃষক-কারিগরও মুদ্রা অর্থনীতির আওতায় চলে আসতে পারল। যেমন, যে কৃষকের সামান্য পরিমাণ উদ্বৃত্ত জলপাই বা আঙুর ছিল, তার পক্ষেও তা' বিক্রি করে টাকা জমানো সম্ভব হয়েছিল অল্প মানের মুদ্রার আবিষ্কারের ফলে। এ জমানো টাকা দিয়ে পরে প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা তার পক্ষে সম্ভব হত। এর ফলে একদিকে গ্রীসে জাতীয় সঞ্চয় এবং জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং শিল্প ও কারিগরি উৎপাদন উৎসাহিত হয়েছিল। অল্প মানের মুদ্রা এভাবে গ্রীসের অর্থনীতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। এ দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে যে, গ্রীস কেবল প্রাচীন কালের আবিষ্কারসমূহকে সফলভাবে প্রয়োগই করেনি-অনেক ক্ষেত্রে তার উন্নতি এবং বিকাশসাধনও করেছিল।

কারিগরি শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলেই ক্রমশ গ্রীসে হোমারীয় যুগের গ্রামসমাজ ভেঙে পড়ল। তার জায়গায় উদিত হল বড় আকারের অর্থনৈতিক কেন্দ্র অর্থাৎ নগর। গ্রীসের এ সকল নগরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এগুলো কেবল অর্থনৈতিক

www.icsbook.info

কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র নয়, উপরন্তু রাজনৈতিক কার্যক্রমের কেন্দ্রেও পরিণত হয়। এ সকল নগর তার চারপাশের এক বড় অঞ্চলের সামাজিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। বস্তুত এ সকল গ্রীক নগর ছিল এক-একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র। তাই এদের বলা হয় নগররাষ্ট্র। এসকল নগরে বড় বড় অট্টালিকা থাকত অভিজাত নাগরিকদের জন্যে, সার্বজনীন চত্বর (এ্যাগোরা) থাকত ব্যবসা-বাণিজ্য, সভা-সমিতি প্রভৃতির জন্যে; মন্দির ইত্যাদিও থাকত; এছাড়া থাকত প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে প্রতি নগরে একটি করে সুরক্ষিত স্থান বা এ্যাক্রোপোলিস। বস্তুত এ্যাক্রোপোলিসকে কেন্দ্র করেই নগর রাষ্ট্রগুলো গড়ে উঠত। গ্রীক, জগতের সর্বত্রই এ রকম নগররাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন, মধ্যগ্রীসের এ্যাটিকা নামক স্থানে ছিল এথেন্স নগররাষ্ট্র; দক্ষিণ পেলোপনেসাস্-এর ল্যাকোনিয়া নামক স্থানে ছিল স্পার্টা নগররাষ্ট্র; পেলোপনেসাস্-এর সাথে মধ্য গ্রীসের সংযোগকারী যোজকের ওপর অবস্থিত ছিল নগররাষ্ট্র করিন্থ; এশিয়া মাইনরের উপকূলে ছিল মাইলেটাস ইত্যাদি। এগুলো অবশ্য সুবিখ্যাত নগররাষ্ট্র। এ রকম শত শত নগররাষ্ট্র গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে এবং ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ ও উপকূলের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। অধিকাংশ নগররাষ্ট্রের আয়তন ছিল একশো বর্গমাইলের মধ্যে আর লোকসংখ্যা হত দশ-পনের হাজার থেকে ষাট-সত্তর হাজার। তবে বড় আকারের নগররাষ্ট্রও ছিল। যেমন, এথেন্সের আয়তন ছিল এক হাজার বর্গমাইল, স্পার্টার চার হাজার বর্গমাইল, আর এ দুই নগররাষ্ট্রেরই লোকসংখ্যা ছিল প্রায় চার লক্ষ করে।

গ্রীসে নগররাষ্ট্রের উদ্ভবের কালে অর্থাৎ ৮০০ থেকে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে গ্রীকরা ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে অজস্র উপনিবেশ স্থাপনেও উদ্যোগী হয়েছিল। এজন্য গ্রীক ইতিহাসে এ যুগ উপনিবেশ বিস্তারের যুগ নামেও পরিচিত।

উপনিবেশ বা কলোনি বলতে আমরা আজকাল যা বুঝি, গ্রীকরা কিন্তু সে রকম বুঝত না। আধুনিক কালে, কোনো উন্নত দেশ অপর কোনো অনুন্নত দেশকে নিজ পদানত করে রাখলে সেই পরাধীন দেশকে বলা হয় 'উপনিবেশ'। আর প্রাচীনকালে গ্রীকরা বিদেশে গিয়ে নতুন নগর নির্মাণ করে সেখানে বাস স্থাপন করলে তাকেই বলা হত 'উপনিবেশ'। কোনো একটি নগররাষ্ট্র থেকে উদ্যোগ নিয়েই অবশ্য নতুন জায়গায় উপনিবেশ স্থাপন করা হত। কিন্তু এ উপনিবেশ কোনোক্রমেই তার প্রতিষ্ঠাতা নগররাষ্ট্রের অধীন হত না। প্রত্যেকটি উপনিবেশের নিজস্ব সংবিধান, নাগরিকত্ব আইন, আদালত ও মুদ্রা ছিল। বস্তুত প্রতিটি নব-প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশই ছিল এক একটি স্বতন্ত্র নগররাষ্ট্র। গ্রীসে এক একটি নগররাষ্ট্রের উদ্যোগেই নতুন উপনিবেশ স্থাপিত হত; এ প্রক্রিয়ায় তাই বিশিষ্ট গ্রীক সংস্কৃতি অর্থাৎ তার বিশেষ ধরনের জীবনযাত্রা, চিন্তাধারা, ভাব-ভাষা ইত্যাদি সমস্ত গ্রীক নগররাষ্ট্রে বিস্তার লাভ করেছিল।

গ্রীক নগররাষ্ট্রসমূহে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির অভাব দেখা দেবার দরুনই প্রধানত গ্রীকরা দলে দলে নতুন জায়গায় গিয়ে উপনিবেশ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিল। এ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারের প্রয়োজনেও নতুন নতুন স্থানে উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। এভাবে ঈজিয়ান সাগরের সমগ্র উপকূলে, কৃষ্ণসাগরের সমগ্র উপকূলে, আফ্রিকার উত্তর উপকূলে, ইটালিতে, সিসিলিতে, স্পেনে এবং ঈজিয়ান সাগর ও ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে অজস্র গ্রীক নগর-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নতুন জায়গায় উপনিবেশ স্থাপনের সময় গ্রীকরা দল বেঁধে নৌকায় করে কৃষক, কারিগর, বণিক, পূজারী প্রভৃতি নিয়ে যেত এবং উন্নত ধরনের লোহার অস্ত্রাদির সাহায্যে স্থানীয়

www.icsbook.info

অধিবাসীদের পরাস্ত করে প্রয়োজনীয় ভূমি দখল করত। স্থানীয় অধিবাসীদের পরাজিত করে দাসে পরিণত করা হত।

এযুগের গ্রীকসভ্যতা তাই ক্রমশ দাসশ্রমভিত্তিক হয়ে পড়ে। এর আগের, অর্থাৎ হোমারীয় যুগেও গ্রীকসমাজে দাসের প্রচলন ছিল, কিন্তু সেসব দাস সংখ্যায়ও কম ছিল এবং তারা সাধারণত বাড়িঘরের কাজেই নিয়োজিত হত। কিন্তু নতুন যুগে দাসের সংখ্যাও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের উৎপাদনের কাজেও নিয়োগ করা শুরু হয়। গ্রীসের নগররাষ্ট্রসমূহে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে কারখানায়, খামারে এবং খনিতে ব্যাপক হারে দাসনিয়োগের প্রথা প্রচলিত হয়।

গ্রীকদের উপনিবেশ বিস্তারের ফলে গ্রীক ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থনীতি ও সমাজ গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। উপনিবেশসমূহের সাথে বাণিজ্যের ফলে গ্রীসের পণ্যের চাহিদা বাড়ে। তার ফলে গ্রীসের শিল্প উৎপাদন বিকাশ লাভ করে। ফলে গ্রীসের অর্থনীতিতে শিল্পোৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধান স্থান অধিকার করে। অনেক উপনিবেশ মাতৃভূমি থেকে পণ্য আমদানি করত এবং বিনিময়ে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কাঁচামাল রপ্তানি করত। এর ফলে অনেক মূল গ্রীক নগররাষ্ট্র বিশেষ ধরনের শিল্পপণ্য উৎপাদনে মনোনিবেশ করতে পেরেছিল। এর দরুন গ্রীসের নগরের অধিবাসীর সংখ্যা বাড়তে থাকে, গ্রীসের সভ্যতা সংস্কৃতি ক্রমশ নগরকেন্দ্রিক হতে শুরু করে। উপনিবেশসমূহের মাধ্যমে দাস সংগৃহীত হওয়ার দরুন গ্রীসীয় নগরসমূহে দাসের সংখ্যা বাড়তে থাকে। যে সকল অঞ্চলে গ্রীক উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানেও ক্রমশ গ্রীসীয় শিল্প বিকাশ লাভ করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। গ্রীক সংস্পর্শের দরুন স্থানীয় পশ্চাৎপদ জনগণও দ্রুত সভ্যতার পথে অগ্রসর হয়।

এ যুগে গ্রীক-জগতে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজনৈতিক ব্যবস্থারও দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সমস্ত গ্রীক নগররাষ্ট্রে একই ধরনের রাজনৈতিক বিকাশ ঘটেছিল। গ্রীক নগররাষ্ট্রসমূহে প্রথমদিকে রাজতন্ত্রের প্রচলন ছিল। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে তার স্থলে অভিজাত পরিষদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রায় একশো বছর পরে বিভিন্ন স্থানে অভিজাত পরিষদের স্থান অধিকার করে স্বৈরাচারী শাসক বা 'টায়রান্ট।' যে ব্যক্তি বে-আইনীভাবে ক্ষমতা অধিকার করত, গ্রীকরা তাদের নাম দিয়েছিল টায়রান্ট। এ স্বৈরাচারীরা সবাই যে অত্যাচারী প্রজাপীড়ক হতেন এমন নয়, এঁদের অনেকেই ছিলেন বিবেচক ও প্রজাপালক। সবশেষে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ, পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীসের প্রায় সব নগররাষ্ট্রেই জনসাধারণের শাসন তথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্পার্টা

গ্রীক নগররাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক বিকাশের সাধারণ ধারায় স্পার্টার ইতিহাস ছিল এক ব্যতিক্রম। পেলোপনেসাস্-এর দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত ল্যাকোনিয়া প্রদেশে ছিল 'স্পার্টার' অবস্থান। স্পার্টা ও ল্যাকোনিয়ার জমি ছিল খুব উর্বর। তার পশ্চিমে অবস্থিত মেসেনিয়ার জমি ছিল চাষাবাদ এবং পশুচারণের পক্ষে আরো বেশি উপযোগী।

স্পার্টা এবং পেলোপনেসাস্-এর প্রাচীনতর অধিবাসী ছিল সম্ভবত একিয়ানগণ। নবাগত বিজয়ী জাতি ডোরিয়ান গ্রীকরা তাদের পরাজিত করে ল্যাকোনিয়ায় বাস স্থাপন

www.icsbook.info

করে এবং কালক্রমে স্পার্টান বা স্পার্টাবাসী নামে পরিচিত হয়। গ্রীসের অন্যান্য অঞ্চলে যেমনঙ একিয়ান, ডোরিয়ান ও অন্যান্য জাতির মানুষের সংমিশ্রণে গ্রীসীয় সংস্কৃতির মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল, স্পার্টার ক্ষেত্রে তেমন হয়নি। স্পার্টার বিজয়ী ডোরিয়ানরা পরাজিত একিয়ান কৃষকদের পদানত করে রাখে এবং কার্যত দাসে পরিণত করে। ডোরিয়ান জাতিভুক্ত হলেও স্পার্টানরা তাদের দেশে গ্রীসের অন্যান্য অঞ্চলের মতো গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। স্পার্টার প্রচলিত শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী একনায়কত্বমূলক। সংস্কৃতির বিকাশের দিক থেকেও স্পার্টা গ্রীসের অন্যান্য অংশের চেয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল। স্পার্টার উত্তর ও পশ্চিমের পর্বতমালা তাকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল এবং তার কোনো ভাল সমুদ্রবন্দর ছিল না। ফলে বাইরের পৃথিবীর উন্নতি থেকে স্পার্টাবাসীরা বিশেষ লাভবান হতে পারেনি। স্পার্টার অর্থনীতি প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল, শিল্পবাণিজ্যের বিশেষ বিকাশ সেখানে ঘটেনি। স্পার্টার শাসকরা সে দেশে মুদ্রার প্রচলনকে পর্যন্ত বেআইনী করেছিলেন। স্পার্টা ছিল সব রকম প্রগতি ও পরিবর্তনের বিরোধী। হোমারের মহাকাব্য সারা গ্রীক জগতের সংস্কৃতি ও চিন্তাধারাকে গঠিত করলেও স্পার্টায় তার প্রবেশ ঘটেছে সবচেয়ে দেরিতে। স্পার্টার সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার এ একটা কারণও বটে, লক্ষণও বটে।

স্পার্টার পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ তার সমরবাদী নীতি। স্পার্টানরা পূর্ব পেলোপনেসিয়ায় এসেছিল হানাদার হিসেবে। কয়েকশো বছর ধরে তাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে স্থানীয় মাইসিনীয় (একিয়ান) অধিবাসীদের পরাস্ত করার জন্যে। অবশেষে যখন ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে তারা সমগ্র ল্যাকোনিয়ার ওপর চূড়ান্তভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়, ততদিনে সামরিক অভ্যাস তাদের এমন মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, তা আর পরিত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। পরাজিত একিয়ানদের তারা অস্ত্রের জোরে দাস বা ভূমিদাস বানিয়ে রাখে। এ দাসদের নাম দেয়া হয় 'হেলট'। এ ছাড়া স্পার্টানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তারা উপনিবেশ বিস্তার না করে অস্ত্রের বলে প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ জয় করে নেয়। এভাবে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে স্পার্টানরা মেসেনিয়া অধিকার করে। এর কিছুকাল পরে মেসেনিয়াবাসীরা বিদ্রোহ করলে এক মরণপণ যুদ্ধের সৃষ্টি হয়, তবে স্পার্টানরা শেষ পর্যন্ত অতি কষ্টে জয়লাভে সমর্থ হয়। বিদ্রোহী যোদ্ধাদের একাংশ দেশত্যাগ করে চলে যেতে সক্ষম হয়। স্পার্টানরা পরাজিত মেসেনিয়াবাসীদের মধ্যে থেকে সমর্থ যুবকদের হত্যা করে এবং অবশিষ্টদের পদানত করে দাসে পরিণত করে।

স্পার্টানদের জীবনের সমস্ত দিক তাদের সামরিক প্রয়োজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। শত্রুদের পদানত রাখতে গিয়ে স্পার্টানরা নিজেরাই বন্দী হয়ে পড়েছিল। কারণ হেলটদের পদানত রাখাতেই তাদের সমস্ত চিন্তা, কাজ এবং শক্তি নিয়োজিত ছিল, ফলে নিজেদের স্বাধীন বিকাশের জন্য তারা প্রায় কিছুই করতে পারেনি। স্পার্টা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর থেকে তাদের অস্তিত্বের শেষ দিন পর্যন্ত কয়েক শতাব্দী ধরে স্পার্টানরা কেবল পদানত হেলটদের বিদ্রোহের আতঙ্কের মধ্যে কালযাপন করেছে। এ আতঙ্কের দরুনই স্পার্টানরা সব রকম পরিবর্তনের বিরোধিতা করেছে, পাছে কোনো রকম নতুন চিন্তা বা প্রক্রিয়া তাদের লৌহকঠিন সমাজব্যবস্থায় ফাটল ধরায়। এ একই

www.icsbook.info

কারণ তাদের পশ্চাৎপদতা ও কৃষ্টিহীনতার জন্যে দায়ী। বৃহত্তর পৃথিবীর বিপদজ্জনক চিন্তা পাছে তাদের দেশে প্রবেশ করে, এ ভয়ে স্পার্টানরা বিদেশ ভ্রমণ ও বিদেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করে। বিপুলসংখ্যক দাস-জনগণের ওপর অল্প সংখ্যক স্বাধীন স্পার্টান নাগরিকদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য লৌহকঠিন শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ প্রয়োজন হয়েছিল, নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার শিকার হয়েছিল স্বাধীন স্পার্টান নাগরিকগণই। গুপ্ত ও প্রকাশ্য চরের সাহায্যে স্পার্টান রাষ্ট্র স্পার্টানদের সমস্ত কার্যকলাপ ও চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণ করত। স্পার্টান নাগরিকরা ছিল শাসকশ্রেণীভুক্ত, তাই তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করে স্পার্টানদের তথাকথিত সার্বজনীন সমাজ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এ সার্বজনীন সমাজব্যবস্থা স্পার্টানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিস্তৃত ছিল। হেলটদের দমন করার কাজে স্পার্টানদের এ যৌথ বা সার্বজনীন সমাজব্যবস্থা ছিল সবচেয়ে বড় অস্ত্র। আর হেলটদের পদানত রাখার জন্যে স্বভাবতই স্পার্টানরা যে সন্ত্রাস ও ঘৃণার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল স্পার্টানদের পশ্চাৎপদতার জন্যে তাও অনেকখানি দায়ী।

স্পার্টার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি সংবিধান ছিল। এ সংবিধানে হোমারীয় যুগের অনেক প্রশাসনিক ব্যবস্থা বজায় ছিল। স্পার্টার শাসন পরিচালনা করতেন দু'জন রাজা এবং একটি অভিজাত পরিষদ। এছাড়া নাগরিকদের একটি সাধারণ পরিষদ ছিল, কিন্তু সব স্পার্টানরা এর সদস্য হতে পারত না। কেবল সম্পত্তিবান যোদ্ধাপুরুষরাই এ সাধারণ পরিষদের সদস্য হতে পারত। সাধারণ পরিষদ আভিজাত পরিষদের প্রস্তাব বিবেচনা করত এবং উচ্চ পদসমূহের জন্যে কর্মচারী নির্বাচিত করত। তবে, স্পার্টা সবচেয়ে বেশি ক্ষমতার অধিকারী ছিল সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত পাঁচ জনের একটি পরিষদ (এফোরেট)। এফোরেট-সদস্য (বা এফোর) এক বছরের জন্যে নির্বাচিত হলেও, তাদের বারবার নির্বাচিত হতে কোনো বাধা ছিল না। এফোরেট সদস্যরা অভিজাত পরিষদ সাধারণ পরিষদ, শিক্ষাব্যবস্থা, ভূ-সম্পত্তির বন্টনব্যবস্থা, আইন প্রণয়ন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতেন, নাগরিকদের জীবনযাত্রার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন এবং নবজাত শিশুদের ভাগ্য নির্ধারণ করতেন, অর্থাৎ শিশু রুগ্ন হলে তাকে মেরে ফেলার নির্দেশ দিতেন।

ল্যাকোনিয়ার মানুষদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম শ্রেণীতে ছিল স্পার্টানগণ, এরা হল বিজেতা ডোরিয়ানদের বংশধর। সমস্ত জমির মালিক ছিল স্পার্টানরা, সমস্ত কৃষি জমিকে প্রায় সমান আয়তনের খামারে বিভক্ত করে স্পার্টানদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। স্পার্টানরা জমির মালিক হলেও চাষের কাজ তারা করত না। জমি চাষ করত ভূমিদাস হেলটরা। একমাত্র স্পার্টানরাই পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার ভোগ করত। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল বহিরাগত নানা জতির মানুষ। এরাও স্বাধীন ছিল, তবে তাদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। এরা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কারিগরী শিল্পে নিয়োজিত ছিল। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল ভূমিদাস ও দাস, এদের বলা হত হেলট। এরা হল পরাজিত একিয়ানদের বংশধর। এরা ছিল জমির সাথে গাঁথা। স্পার্টানরা জমির সাথে সাথে কয়েকটি হেলট পরিবারেরও মালিক হত। এ হেলটরাই জমি চাষ করত এবং ফসলের একাংশ লাভ করত। হেলটদের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা বা অধিকার ছিল না। তারা প্রকৃতপক্ষে ছিল দাস এবং তারা ছিল

www.icsbook.info

স্পার্টার রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। হেলটদের মালিকরা পর্যন্ত তাদের মুক্তি দিতে বা দেশের বাইরে বিক্রি করতে পারত না। এ হেলটদের শ্রমই ছিল সমগ্র স্পার্টার সুখ সম্পদের মূল উৎস।

স্পার্টানরাই ছিল স্পার্টার একমাত্র স্বাধীন শ্রেণীর মানুষ, কিন্তু এ শ্রেণীতেও যে শিশুরা জন্মাত তাদের কপালে জীবনের অধিকাংশ সময়ের জন্যে অসম্মানজনক দাসত্ব ছাড়া কিছুই জুটত না। স্পার্টা ছিল একটি যুদ্ধশিবিরের মতো। এ রাষ্ট্রের যুদ্ধবাজ নীতির স্বার্থে প্রতিটি স্পার্টান নাগরিককে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কঠোর শৃঙ্খলা মেনে চলতে হত। স্পার্টানদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ও রীতিনীতির একমাত্র লক্ষ ছিল সামরিক প্রশিক্ষণ। শিশুর জন্ম হলে পিতা তাকে কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থিত করতেন। শিশু স্বাস্থ্যবান বিবেচিত হলে তাকে একখণ্ড জমি প্রদান করা হত এবং শিশুকে প্রতিপালনের অনুমতি দেয়া হত তার পিতাকে। আর শিশু যদি অসুস্থ বা দুর্বল বলে বিবেচিত হত তবে তাকে পাহাড়ের ওপর থেকে ফেলে দেয়া হত। সাত বছর থেকে স্পার্টান বালকদের শিক্ষাশিবিরে রেখে শিক্ষা দেয়া হত। শিক্ষা বলতে প্রধানত সামরিক প্রশিক্ষণ বোঝানো হত। অবশ্য সামান্য পরিমাণ পড়তে এবং লিখতেও শেখানো হত তাদের। শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল স্পার্টানদের মধ্যে সাহস, উদ্যম, সহ্যশক্তি, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি সঞ্চার করে ভাল যোদ্ধারূপে তাদের গড়ে তোলা। এ উদ্দেশ্যে তাদের খুব কম পরিমাণের ও সাধারণ ধরনের খাদ্য দেয়া হত, প্রচণ্ড শীতের মধ্যে তাদের খালি গায়ে, খালি পায়ে চলতে বাধ্য করা হত এবং নির্দয়ভাবে চাবুক মেরে তাদের শরীর শক্ত করা হত। কুড়ি থেকে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত সব স্পার্টানদের সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হত। এ বয়সের সব পুরুষদের সামরিক ছাউনিতে থাকতে হত। কুড়ি বছর বয়স হলে স্পার্টানদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হত কিন্তু তাদের পারিবারিক জীবনযাপনের অধিকার ছিল না। স্পার্টান মেয়েদেরও অনুরূপ সামরিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হত।

এ সকল অস্বাভাবিক নিয়মনীতির সাহায্যে স্পার্টা সারা গ্রীসের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। স্পার্টা দক্ষিণ গ্রীসের কোনো কোনো স্থান জয় করে নিয়েছিল, এবং অন্যান্য কতগুলি নগররাষ্ট্রের সাথে মিলে এক সামরিক জোট গঠন করেছিল। এ সামরিক জোটের নাম ছিল পেলোপনেসীয় লীগ এবং স্পার্টা ছিল তার নেতা।

সামরিক শক্তির সাহায্যে হেলটদের পদানত রেখে স্পার্টানরা পার্থিব সুখ ভোগ করতে সক্ষম হলেও তার জন্যে তাদের কঠোর মূল্য দিতে হয়েছিল। স্পার্টার সমস্ত শক্তি সামরিক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হবার ফলে তাদের শিল্প, বাণিজ্য এবং সংস্কৃতির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। স্পার্টা নগর ছিল এক বিরাট সামরিক শিবিরের মতো। কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ প্রতিটি স্পার্টান নাগরিককে নিষ্ঠুর যোদ্ধারূপে গড়ে তুলত। কিন্তু স্পার্টানরা যেমন হেলটদের ঘৃণা করত হেলটরাও তেমনি তাদের ঘৃণা করত। স্পার্টানরা তাই সারা জীবনে এক মুহূর্তের জন্যে অস্ত্র ছাড়া চলত না। সব সময় তাদের হাতে একটা বল্লম থাকতই। এ রকম ঘৃণা, শঙ্কা ও সন্ত্রাসের পরিবেশে বাস করার ফলেই স্পার্টা মানবিক ও সুকুমার বৃত্তির চর্চার সুযোগ বা অবকাশ কখনো পায়নি। মাইলেটাস ও এথেন্সের সমসাময়িক একটি সমৃদ্ধ নগররাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও, স্পার্টা বিশ্ব

www.icsbook.info

সংস্কৃতি বা মানবপ্রগতির ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অবদান রাখতে পারেনি। স্পার্টার ইতিহাস থেকে যে শিক্ষা পওয়া যায় তা হল, অন্য জাতিকে শৃঙ্খলিত করলে প্রকারান্তরে নিজেদেরই শৃঙ্খলিত করা হয়।

এথেন্স

মধ্য গ্রীসের এ্যাটিকা নামক স্থানে এক পার্বত্য এবং অনুর্বর ভূমিতে এথেন্স নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। এথেন্সের ইতিহাস ছিল শুরু থেকেই স্পার্টা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। এ্যাটিকায় গ্রীকদের প্রবেশ ঘটেছিল ধীরে ধীরে এবং শান্তিপূর্ণভাবেই। ফলে এখানে কোনো যুদ্ধবাজ শাসকগোষ্ঠীর উদয় ঘটেনি। তা ছাড়া এ্যাটিকায় কৃষির বিকাশের বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না, ফলে এখানে শুধুমাত্র ভূমিদাসদের শোষণের ওপর নির্ভর করার সুযোগ ঘটেনি স্পার্টার মতো। এ্যাটিকার প্রধান সম্পদ ছিল খনিজ, ধাতু ইত্যাদি, আর ছিল ভাল ভাল বন্দর ও পোতাশ্রয়। কৃষিসম্পদের মধ্যে ছিল জলপাই আর আঙুরের বাগান। এথেন্সে তাই শিল্পবাণিজ্য এবং নাগরিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে এথেন্স বাইরে থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ এ্যাটিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ শস্য উৎপাদন করা সম্ভব ছিল না।

খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত আর সব গ্রীক নগররাষ্ট্রের মতো এথেন্সেও একজন রাজা রাজ্যশাসন করতেন। এরপর রাজতন্ত্রের পরিবর্তে এথেন্সে অভিজাত পরিষদের শাসন প্রবর্তিত হয়। অভিজাতদের দ্বারা নির্বাচিত নয় জনের একটি পরিষদ তখন থেকে শাসনকাজ চালাতেন। এ সময়ে গ্রীসে আঙুর ও জলপাইয়ের চাষ প্রবর্তিত হবার ফলে ধনী অভিজাতদের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছিল। আঙুর-জলপাইয়ের চাষে লাভ করতে দীর্ঘ সময়ের দরকার হয়। তাই গরিব চাষীরা এ ব্যবসায়ে টিকতে পারেনি। তার ওপর বিদেশ থেকে আমদানি করা খাদ্যশস্যের দাম খুব বেশি হবার ফলে গরিব চাষীরা ধনী ভূস্বামীদের কাছে প্রথমে জমিজমা, তারপর স্ত্রী-পুত্র এবং সবশেষে নিজেদের বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত ঋণের দায়ে এসব গরিব চাষী ঋণদাসে পরিণত হয়।

এ সময়ে এথেন্সের স্বাধীন নাগরিকদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলত। প্রথম শ্রেণীতে ছিলো ধনী অভিজাত মানুষঃ এঁরা পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার ভোগ করতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল জনসাধারণ অর্থাৎ কৃষক, কারিগর, ব্যবসায়ী, বণিক, নাবিক প্রভৃতি। এদের নাগরিক অধিকার থাকলেও রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল ভিনদেশ থেকে আগত মানুষরা। এরা সাধারণত শিল্প-উৎপাদন এবং ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকত। এদের কোন নাগরিক বা রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। স্বাধীন নাগরিক ছাড়াও এথেন্সে বহুসংখ্যক দাস ছিল। দাসরা মানুষ হিসেবেই গণ্য হত নাঙ দাসরা ছিল তাদের মনিবের সম্পত্তি।

এথেন্সে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে ব্যাপকসংখ্যক কৃষক-কারিগর নিঃস্ব হয়ে পড়লে রাজনৈতিক অসন্তোষ ও বিরোধ বাড়তে থাকে এবং সারা দেশে বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দেয়। গরিব কৃষকরা জমি ফেরত পাওয়ার এবং ঋণদাসত্ব বাতিলের দাবি করে। এ অবস্থায় সব দল মিলে ৫৯৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে 'সোলোন' নামক একজন

www.icsbook.info

জনপ্রিয় নেতাকে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের ক্ষমতা দেয়। সকলেই বুঝতে পেরেছিল যে, ব্যাপক সংস্কার ছাড়া ঐ সমাজর পক্ষে আর টিকে থাকা সম্ভব নয়। ঋণের জন্যে স্বাধীন গ্রীক নাগরিককে দাসে পরিণত করার ফলে ঐ ঋণদাস এবং ক্রীতদাসদের একযোগে বিদ্রোহ করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এ ছাড়া শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীও রাজনৈতিক অধিকার দাবি করছিল।

সোলোন এথেন্সের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনেকগুলো ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। তিনি সমস্ত বন্ধকী ঋণ বাতিল করে দেন, ঋণদাসদের মুক্ত ঘোষণা করেন এবং ঋণের দায়ে দাস বানানোর প্রথাকে নিষিদ্ধ করেন। তিনি এথেন্সের নাগরিকদের সম্পত্তির পরিমাণ অনুসারে চার শ্রেণীতে ভাগ করেন। এর ফলে অভিজাতদের বংশানুক্রমিক আধিপত্য খর্ব হয়। নিম্নশ্রেণী থেকে উদ্ভূত নব্য-ধনিকরাও এখন থেকে সুবিধাভোগী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

সোলোন ৪০০ জন সদস্যের একটি নতুন পরিষদ প্রবর্তন করেন। এটি ক্রমে অভিজাত পরিষদকে অধিকারচ্যুত করেছিল। নাগরিকদের সাধারণ পরিষদের অধিকারও সেলোন বৃদ্ধি করেন। জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি সুপ্রীম কোর্টেরও প্রবর্তন করেছিলেন তিনি। যেসব বিদেশীরা এথেন্সে স্থায়ীভাবে বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরও নাগরিক বলে গণ্য করা হয়। সোলোনের সংস্কারের ফলে এথেনীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা সাধারণভাবে গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হয়েছিল।

সোলোনের সংস্কারের ফলে অভিজাত শ্রেণী অনেক অধিকার হারিয়েছিল, আবার জনসাধারণও পুরো অধিকার পায়নি। দুই দলই তাই অসন্তুষ্ট ছিল। এ অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে একজন স্বৈরাচারী 'টায়রান্ট' শাসক এথেন্সের ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু কিছুকাল পরে স্বৈরাচারের অবসান ঘটিয়ে এথেন্সে আবার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এবার ৫১০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ক্লিস্থেনিস নামক একজন জনপ্রিয় নেতা নতুন কতগুলো ব্যাপক গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি রাজ্যের সব স্বাধীন অধিবাসীদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার দেন। তিনি নতুন একটি ৫০০ জন সদস্যের পরিষদ প্রবর্তন করেন। ক্লিস্থেনিসের সংস্কারের ফলে অভিজাত শ্রেণীর বংশানুক্রমিক অধিকার এবং রাজনৈতিক আধিপত্য চূড়ান্তভাবে খর্বিত হয় এবং গণতন্ত্রের অধিকতর বিকাশের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে পেরিক্লিসের সময়ে (৪৬১-৪২৯ খ্রিঃ পূঃ) এথেন্সে গণতন্ত্রের চরম বিকাশ ঘটেছিল।

গ্রীসীয়-পারসিক যুদ্ধ

গ্রীকরা যখন বহুসংখ্যক নগররাষ্ট্র নির্মাণের কাজে নিয়োজিত ছিল, পারস্য সম্রাট তখন একের পর এক রাজ্য জয় করে মধ্যপ্রাচ্যে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। ৫৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারস্য সম্রাট 'কাইরাস' লিডিয়া রাজ্য জয় করে নেয়ার ফলে এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত গ্রীক উপনিবেশসমূহ অর্থাৎ আয়োনিয়ার গ্রীক নগররাষ্ট্রসমূহ পারস্য সাম্রাজ্যের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। এর অল্পকাল পরেই পারস্য সম্রাট আয়োনিয়ার গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলোর উপর অধিকার বিস্তার করে। এশিয়া মাইনরের গ্রীক নগরসমূহ অধিকার করার পর পারস্য সম্রাট গ্রীসের মূল ভূখণ্ডের নগরসমূহকে করায়ত্ত করার জন্যে উদ্যোগী হন।

www.icsbook.info

কিন্তু এর মধ্যেই ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আয়োনিয়ার সমৃদ্ধতম গ্রীক নগররাষ্ট্র মাইলেটাস পারসিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সাথে সাথে এশিয়া মাইনরের অন্যান্য গ্রীক নগরসমূহও মাইলেটাস-এর নেতৃত্বে পারসিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। মাইলেটাস ছিল এ যুগের গ্রীকসভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল কেন্দ্রস্বরূপ। মাইলেটাস কৃষ্ণসাগরের উপকূলে বহুসংখ্যক নগররাষ্ট্র স্থাপন করেছিল। কৃষ্ণসাগর অঞ্চলের সাথে বাণিজ্যের মাধ্যমে মাইলেটাস প্রভূত সম্পদ উপার্জন করত। এশিয়ার অভ্যন্তরভাগ এবং মিশরের সাথেও মাইলেটাস-এর বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। গ্রীক সভ্যতার প্রারম্ভিক যুগে শিল্পপণ্য উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল মাইলেটাস। এ কারণে প্রথমে গ্রীক বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যচর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় মাইলেটাস।

বিশাল পারসিক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে আয়োনিয়ার রাষ্ট্রসমূহ অন্যান্য গ্রীক নগররাষ্ট্রসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করে। এতে সাড়া দিয়ে এথেন্স ২০টি এবং অপর একটি নগররাষ্ট্র ৫টি যুদ্ধজাহাজ পাঠায়। এ সামান্য সাহায্যে আয়োনিয়ার বিশেষ কোনো উপকার হয় না, পারসিকরা তাদের বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করেন। কিন্তু এ সাহায্যকে উপলক্ষ্য করে পারস্য সম্রাট দারিয়ুস মূল গ্রীক ভূখণ্ডের নগরসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে আয়োনিয়ার নগররাষ্ট্রসমূহ পারসিক আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে গ্রীক সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে মাইলেটাস-এর প্রাধান্য খর্ব হয়। আয়োনিয়ার গ্রীক দার্শনিক-বিজ্ঞানীরা দেশত্যাগ করে ইটালির গ্রীক নগরসমূহে বাস স্থাপন করেন।

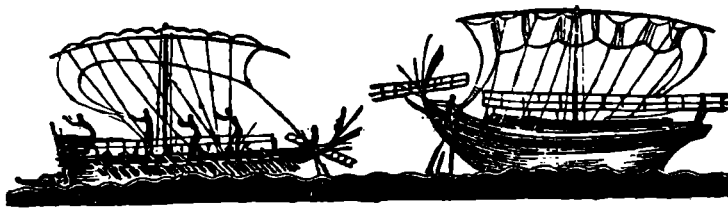

প্রাচিন গ্রীসের জাহাজ (খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর একটির মাটির পাত্রের গায়ে আঁকা ছবি) ডানদিকেরটি মালবাহী জাহাজ, এটি পালে চলত। বাঁ দিকেরটি যুদ্ধজাহাজ, তাতে পালও ছিল দাঁড়ও ছিল।

পরবর্তীকালে গ্রীসের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্ররূপে উদিত হয়েছিল এথেন্স নগরী। গ্রীসের মূল ভূখণ্ড জয় করার লক্ষ্য নিয়ে পারস্য সম্রাট দারিয়ুস প্রথমে ঈজিয়ান সাগরের উত্তর উপকূল এবং এশিয়া মাইনর ও গ্রীসের মধ্যবর্তী গ্রীক নগরসমূহ দখল করে নেন। এরপর ৪৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দারিয়ুসের এক বিশাল বাহিনী জাহাজযোগে ঈজিয়ান সাগর পার হয়ে এ্যাটিকায় অবতরণ করে। এথেন্সের সৈন্যদল তাদের বাধা দিতে অগ্রসর হলে ম্যারাথন নগরীর কাছে দুই দল পরস্পরের মুখোমুখি হয়। ম্যারাথনের যুদ্ধে এথেন্সের মাত্র দশ হাজার সৈন্য তাদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি সৈন্যের পারসিক বাহিনীকে পরাস্ত করে।

ম্যারাথনের যুদ্ধে পরাজিত হবার দশ বছর পর পারস্য আবার গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করে। ইতোমধ্যে দারিয়ুসের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে জারেক্সেস পারস্যের সম্রাট

www.icsbook.info

হয়েছেন। চার বছর ধরে তিনি গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। হেলেস্পন্ট্ বা দাবর্দানেলিস্ প্রণালীর ওপর দিয়ে একটি সেতু নির্মাণ করা হল। অন্যত্র একটা খাল কেটে যুদ্ধজাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করা হল।

গ্রীকরাও যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। স্পার্টার নেতৃত্বে গ্রীক নগররাষ্ট্রসমূহের একটা প্রতিরক্ষা জোট গঠিত হয়। স্পার্টার মত ছিল স্থলযুদ্ধের পক্ষে। এথেন্সের ধনী ভূস্বামীরাও তাতে সায় দেয়। কিন্তু এথেন্সের উদীয়মান নেতা ও সেনানায়ক থেমিস্টোক্লিস্ বলেন যে, স্থলযুদ্ধে পারসিকদের পরাস্ত করা দুঃসাধ্য। তিনি নৌযুদ্ধের পক্ষে মত দেন এবং এথেনীয় নৌবাহিনী গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন।

৪৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারসিক বাহিনী থ্রেস্-এর উপকূল দিয়ে অগ্রসর হয়ে উত্তর গ্রীস পর্যন্ত অধিকার করে নেয়। সৈন্যদলের একাংশ জাহাজে করে উপকূল ধরে অগ্রসর হয়। পারসিক স্থলবাহিনী থার্মোপাইলি গিরিপথের মুখে এসে প্রথম গ্রীক সেনাবাহিনীর কাছে বাধা পায়। এ সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়েই মধ্য গ্রীসে এবং এথেন্সে যাওয়া চলত। পারসিকদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতাকামী গ্রীকরা বীরত্বের সাথে লড়াই করে পারসিকদের আক্রমণ প্রতিহত করে। কিন্তু কোনো একজন গ্রীক নাগরিক বিশ্বাসঘাতকতা করে অন্য একটা পথ দিয়ে একদল পারসিক সৈন্যকে গ্রীক সৈন্যদলের পিছনভাগে নিয়ে আসে। এভাবে পরিবেষ্টিত হয়ে গ্রীক সৈন্যরা থার্মোমিপাইলি গিরিপথে বীরত্বের সাথে লড়াই করে প্রাণ বিসর্জন দেয়। গ্রীকরা অবশ্য ইতিমধ্যে নৌযুদ্ধে পারসিকদের একবার পরাস্ত করেছিল। কিন্তু পারসিকরা থার্মোপাইলির যুদ্ধের পর এথেন্স দখল করে তাকে ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে গ্রীকরা পিছিয়ে এসে সালামিস দ্বীপের পাশে সালামিস প্রণালীতে পারসিক নৌবাহিনীকে বাধা দেবার আয়োজন করে।

সালামিসের নৌযুদ্ধের পরিকল্পনা করেছিলেন পূর্বোক্ত থেমিস্টোক্লিস্। এথেনীয় নৌবাহিনী নিয়ে তিনি পারসিক নৌবাহিনীকে বাধা দিতে অগ্রসর হন। অন্যান্য গ্রীক নগরীর নৌবাহিনীও এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তবে এথেন্সের নৌবাহিনীই ছিল তাদের মধ্যে সর্ববৃহৎ। গ্রীক রণতরীগুলো ছিল হাল্কা ও বেগবান। পারসিকদের যুদ্ধজাহাজগুলো ছিল মস্ত বড় আর ভারি। খোলা সমুদ্রে যুদ্ধের জন্য এগুলো ছিল খুবই উপযোগী, কিন্তু সালামিস প্রণালীতে এগুলো ছিল একেবারেই বেমানান। পারসিক নৌবহর সালামিস প্রণালীতে প্রবেশ করামাত্র গ্রীক রণতরীগুলো পারসিক যুদ্ধ জাহাজসমূহকে আক্রমণ করে তাদের হাল, দাঁড় ইত্যাদি ভেঙে দেয় এবং অনেকগুলো জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। অবশিষ্ট জাহাজগুলো রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যায়। সম্রাট জারেক্সেস স্বয়ং বন্দী হবার আশঙ্কায় কিছু সৈন্য মাত্র সাথে নিয়ে দেশে ফিরে যান। সালামিসের যুদ্ধে পারসিকরা এভাবে গ্রীকদের হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। এরপর থেকে পারসিকরা একের পর এক গ্রীকদের কাছে যুদ্ধে হারতে থাকে। ৪৭৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সম্মিলিত গ্রীক বাহিনী গ্রীসে অবস্থানরত পারসিক বাহিনীকে পরাজিত করে। এশিয়া মাইনরের উপকূলের কাছে আরেকটি নৌযুদ্ধেও পারসিক বাহিনী পরাজিত হয়। এর পর এশিয়া মাইনরের গ্রীক নগরগুলো পারসিক কবলমুক্ত হয়। গ্রীক থেকে পারসিকরা বিতাড়িত হবার পরও গ্রীসীয়-পারসিক যুদ্ধ আরো প্রায় তিরিশ বছর ধরে চলেছিল। এ সময়ের মধ্যে ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলো থেকে পারসিকরা বিতাড়িত হয়। শেষ পর্যন্ত পারস্যের সম্রাট সন্ধি

www.icsbook.info

করতে বাধ্য হন এবং গ্রীক নগরসমূহের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন। ঈজিয়ান সাগরে পারসিক যুদ্ধজাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এভাবে স্বাধীনতাপ্রিয় গ্রীক জাতি ক্ষুদ্র সামরিক শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সাহস ও স্বদেশপ্রেমের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বিশাল ও একদা অপরাজেয় পারসিক রাজশক্তিকে পরাজিত করতে পেরেছিল। এর ফলে গ্রীসের নতুন স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শ এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও মুক্ত সংস্কৃতি প্রাচ্যের স্বৈরাচারী ভাবধারার প্রভাবে কলুষিত না হয়ে স্বাধীনভাবে বিকাশলাভ করতে সক্ষম হয়।

এথেনীয় শক্তির অভ্যুদয়

পারস্যের বিরুদ্ধে গ্রীসের জয়লাভ ছিল সমস্ত গ্রীকজগতের পক্ষেই এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু গ্রীসীয়-পারসিক যুদ্ধের শেষ বছরগুলোতে লড়াই সমুদ্রবক্ষেই হয়েছিল। এ সকল নৌযুদ্ধে এথেন্স বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কারণ, এথেন্সের নৌবহর ছিল সবচেয়ে বড়। ফলে গ্রীক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এথেন্স এক উঁচু স্থান অধিকার করে।

গ্রীসীয়-পারসিক যুদ্ধ চলাকালেই এথেন্সের নেতৃত্বে একটি নৌশক্তির জোট গঠিত হয়। এ জোটের নাম ছিল 'ডেলিয়ান লীগ'। কারণ, ডেলোস দ্বীপে এ প্রতিষ্ঠানের সভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। আড়াই শতাধিক গ্রীক নগররাষ্ট্র এ জোটে যোগ দিয়েছিল। সদস্য রাষ্ট্রগুলো এ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ তহবিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিত, বড় রাষ্ট্রগুলো জাহাজ দিয়েও সাহায্য করত। গ্রীসীয়-পারসিক যুদ্ধে গ্রীস যখন ক্রমশ জিততে থাকে, এ জোটের চরিত্রও ততই বদলাতে থাকে। এ জোটের সামরিক নেতৃত্ব এথেন্সের হাতে থাকার ফলে জোটের সব বিষয়েই ক্রমশ এথেন্সের প্রাধান্য বাড়তে থাকে। ডেলিয়ান লীগ নৌশক্তি জোটটি ক্রমে ক্রমে এথেনীয় নৌশক্তিতে পরিণত হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলো কার্যত পরিণত হয় এথেন্সের তাঁবেদার রাষ্ট্রে এবং এথেন্স তাদের কাছ থেকে কার্যত কর আদায় করতে থাকে। নৌশক্তি জোটের সাধারণ অর্থভাণ্ডার ডেলোস থেকে এথেন্সে স্থানান্তরিত হয় এবং সাধারণ তহবিলের অর্থে যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ করে এথেন্স তার নিজস্ব নৌশক্তি বৃদ্ধি করে। এরপর কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে ডেলিয়ান লীগ থেকে বেরিয়ে যাবার উপায় ছিল না। পারস্যের আক্রমণের আশঙ্কা সম্পূর্ণ দূর হয়ে যাবার পর অনেক নগরই এ জোট থেকে বের হয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু এথেনীয় শক্তি নির্দয়ভাবে এ সকল প্রচেষ্টা দমন করে। ডেলিয়ান লীগ এখন এথেনীয় সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। এথেন্সের রাজ কর্মচারী এখন সব নগররাষ্ট্রে উপস্থিত থাকে, অন্যান্য নগররাষ্ট্রের মামলা-মোকদ্দমা এখন থেকে নিষ্পত্তির জন্যে এথেন্সের আদালতে আনতে হয়।

ডেলিয়ান লীগের প্রতিষ্ঠা এবং পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভের ফলে এথেন্সের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। সাথে সাথে দাসপ্রথারও প্রসার ঘটে। এ সময়ে পারসিক যুদ্ধের আগের তুলনায় গ্রীসে দাসের সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কারণ, যুদ্ধবন্দীদের অধিকাংশকে দাসে পরিণত করা হত। যেমন, এশিয়া মাইনরের উপকূলে একবার আক্রমণ চালিয়ে এথেনীয় বাহিনী ২০ হাজার লোককে বন্দী করেছিল; তাদের সবাইকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়া হয়। এ সময়ে দাসব্যবসাও খুব প্রসার লাভ করে। জলদস্যুরা বিভিন্ন স্থানে হামলা করে বিপুলসংখ্যক

www.icsbook.info

লোককে বন্দী করে দাস-বাজারে বিক্রি করে দিত। দাস কেনাবেচার বাজার সব বড় বড় নগরেই ছিল। এ ছাড়া, ক্রীতদাসদের সন্তানরাও তাদের মালিকদের দাসরূপে গণ্য হত। তবে এ রকম বংশগত দাসের সংখ্যা খুব কম ছিল। কারণ, গ্রীসে দাসদের জীবনযাত্রা এত কঠিন ছিল যে, দাসশিশুরা অল্প বয়সেই মরে যেত। ক্রীতদাসের দাম নির্ভর করত তাদের দক্ষতার ওপর। ধাতুবিদ ইত্যাদি দক্ষ কারিগর এবং শিক্ষক, ডাক্তার ইত্যাদি শিক্ষিত দাসের দাম ছিল বেশি, আর কাজ না জানা অদক্ষ দাসের দাম ছিল কম। শিক্ষিত দাসের কথায় অবাক হবার কিছু নেই। সে যুগে যুদ্ধে বা জলদস্যুর হাতে বন্দী হয়ে দাসে পরিণত হবার দুর্ভাগ্য যে কোনো সভ্য দেশের লোকের পক্ষে ঘটতে পারত। শিক্ষিত দাস এত সহজলভ্য ছিল যে, গ্রীসের লোকেরা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে বাজার থেকে শিক্ষিত দাস কিনে তাকে গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করত। প্রাচীন গ্রীসে কারখানা, খনি ইত্যাদিতে ব্যাপকসংখ্যায় দাসশ্রম নিয়োগ করা হত। সাধারণত সবচেয়ে কঠোর দৈহিক পরিশ্রমের কাজই দাসদের দিয়ে করানো হত। স্বাধীন গ্রীকরা যত গরিবই হোক, খনি বা খাতে কাজ করত না। লরিয়নের রূপার খনি এবং অন্যান্য খনি ও খাতে হাজার হাজার দাস নিয়োগ করা হত। খনির ভেতর, সরু সরু সুড়ঙ্গের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে বা শুয়ে শুয়ে দাসরা শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে মূল্যবান ধাতুর আকর খুঁড়ে বের করত। খনির বাইরে আরেক দল দাস এসব আকর জাঁতায় ভেঙে গুঁড়ো করত। গাধা বা ঘোড়ার সাহায্যে এসব জাঁতা ঘোরানো অবশ্য সম্ভব ছিল; কিন্তু দাসমালিকরা এসব পরিশ্রমসাধ্য কাজে দাস নিয়োগ করাই পছন্দ করতেন। কারণ, দাসের শ্রম ছিল তুলনামূলকভাবে সস্তা। কারখানাগুলোতেও সবচেয়ে পরিশ্রমের কাজ দাসদের দিয়ে করানো হত। যেমন, কুমারের কারখানায় মাটি, পানি ইত্যাদি আনা, কাদামাটি তৈরি করা, কুমারের চাক ঘোরানো ইত্যাদি কাজ করত দাসরা, কিন্তু মাটির পাত্র তৈরি এবং তার গায়ে ছবি আঁকার কাজ করত স্বাধীন কারিগররা। অনিচ্ছুক এবং অদক্ষ দাসদের কাছ থেকে সূক্ষ্ম বা উঁচুদরের কাজ আদায় করা খুব কঠিন ছিল। গ্রীসের খেতে-খামারে দাসশ্রম নিয়োগের রেওয়াজ কম ছিল। কৃষকরা নিজেরাই ছোট ছোট জমি চাষ করত। অবস্থাপন্ন কৃষকদের অবশ্য দাস ছিল। এ দাসরা ঝুড়িভর্তি ফসল বাজারে নিয়ে যেত, পেষণযন্ত্রে বা পা দিয়ে জলপাই ও আঙুর পিষত, এবং বিভিন্ন পরিশ্রমের কাজ করত।

আর সব দাসভিত্তিক সমাজের মতো এথেন্সেও দাসদের অদৃষ্ট খুব কষ্টের ছিল। দাসদের অধিকার বলতে কিছুই ছিল না, তারা ছিল তাদের মালিকদের সম্পত্তি। অস্থাবর সম্পত্তির মতোই মালিকরা দাসদের কেনাবেচা করতে পারত। ফলে স্বাধীন গ্রীকরা, এমনকি দরিদ্রতম কৃষকরাও দাসদের খুব ঘৃণার চোখে দেখত। দাস-মালিকরাও দাসদের পশুরূপে বিবেচনা করত। দাসরাও কেবল শাস্তির ভয়েই কাজ করত। দাসরা কাজে ঢিলেমি দিলেই পাহারাদারদের চামড়ার চাবুক পড়ত তাদের পিঠে। প্রাচীন একটি গ্রীক গ্রন্থে দাসদের প্রতি যে শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে তা হল ঃ চাবুক মারা, শ্বাসরুদ্ধ করা, পদদলিত করা, আগুনে পোড়ানো, চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া, মুচড়িয়ে হাত-পা ভেঙে দেয়া, নাকে সির্কা ঢেলে দেয়া, পেটে পাথর চাপা দেয়া ইত্যাদি।'

দাসরাও অবশ্য সুযোগ পেলেই প্রতিশোধ নিত। তারা যন্ত্রপাতি নষ্ট করে ফেলত,

www.icsbook.info

গরু-ভেড়াকে বিকলাঙ্গ করে দিত এবং যথাসম্ভব খারাপভাবে কাজ করত। সুযোগ পেলেই তারা পালাবার চেষ্টা করত, যদিও তারা জানত যে, ধরা পড়লে তাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করা হবে। অনেক সময় তারা নিষ্ঠুর দাস-মালিকদের হত্যা করত। মাঝে মাঝে একজোট হয়ে তারা বিদ্রোহ করত। তবে এ সব সত্ত্বেও দাসশ্রমই ছিল গ্রীক নগরসমূহের সুখ ও সমৃদ্ধির মূল ভিত্তি।

পেরিক্লিসের যুগ

ডেলিয়ান লীগ কালক্রমে এথেনীয় সাম্রাজ্যে পরিণত হবার ফলে এথেন্সের রাষ্ট্রশক্তি, প্রশাসনব্যবস্থা, সমাজজীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অপূর্ব বিকাশ লাভ করে। সাথে সাথে এথেন্সে গণতন্ত্রেরও বিকাশ ঘটে। এথেন্সের ইতিহাসে এ ছিল এক স্বর্ণযুগ। পেরিক্লিস নামক অভিজাত বংশীয় একজন এথেনীয় নাগরিকের নেতৃত্বে এথেন্সের এরূপ অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল বলে এ যুগ 'পেরিক্লিসের যুগ' নামেও পরিচিত হয়েছে।

গ্রীসীয়-পারসিক যুদ্ধের ফলে এথেনীয় নৌবহরের যে বিকাশ ঘটেছিল তা ছিল এথেন্সে গণতন্ত্রের বিকাশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এথেনীয় পদাতিক বাহিনীতে যারা যোগদান করত তাদের নিজেদের দেহবর্ম নিজ খরচে সংগ্রহ করতে হত। এ সকল দেহবর্ম যথেষ্ট ব্যয়বহুল হবার দরুন অবস্থাপন্ন লোক ছাড়া আর কেউ সৈন্যদলে যোগ দিতে পারত না। কিন্তু নৌবহরের নাবিকদের এ রকম কোনো দেহবর্ম দরকার হত না। তাই নৌবহরের নাবিক, মাঝি-মাল্লা প্রভৃতি নেয়া হত দরিদ্র জনসাধারণ থেকে। যুদ্ধে নৌবহরের গুরুত্ব যত বাড়ল এবং নৌবহরের আয়তন যত বাড়ল, এথেন্সের রাজনীতিতেও সাধারণ স্তরের মানুষদের প্রভাব ততই বাড়তে লাগল। ফলে সোলোন এবং ক্লিস্থেনিসের গণতান্ত্রিকসংস্কার সমূহকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল।

পেরিক্লিসের আমলে এথেন্স ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। অধীনস্থ নগরসমূহের কাছ থেকে যে বিপুল পরিমাণ কর আদায় হত, সে অর্থে এথেন্স তার এ্যাক্রোপলিসে সুন্দর সুন্দর ভবন, মন্দির, তোরণ সৌধ, ভাস্কর্য প্রভৃতি নির্মাণ করেছে। এ সকলের মধ্যে এথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'এথেনার' মন্দির 'পার্থেনন্' সবচেয়ে বিখ্যাত। এ মন্দিরের মধ্যে দেবী এথেনার এক সুবিশাল প্রতিমূর্তি ছিল, সেটা নির্মাণ করেছিলেন সুবিখ্যাত ভাস্কর 'ফিডিয়াস'। তা ছাড়া এথেন্সে কবি, নাট্যকার, দার্শনিক, বাগ্মী প্রভৃতির সমাবেশ ঘটেছিল। এঁদের মধ্যে অনেকে এথেনীয়, অনেকে আবার গ্রীসের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এথেন্সে উপস্থিত হয়েছিলেন। সুবিখ্যাত দার্শনিক ও পণ্ডিতরা এথেন্সে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এথেন্সের থিয়েটার (উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চ) ছিল গ্রীসের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। পেরিক্লিস তাঁর চারপাশে সারা গ্রীসের বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের আকৃষ্ট করেছিলেন। এঁদের মধ্যে দার্শনিক এ্যানাক্সাগোরাস, নাট্যকার ইউরিপাইডিস প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এস্কাইলাস, সোফোক্লিস, এ্যারিস্টফেনিস প্রমুখ নাট্যকারও পেরিক্লিসের এথেন্সের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন।

পেরিক্লিস অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রবর্তন করেছিলেন। পেরিক্লিসের আমলে গণ পরিষদ আইন প্রণয়নের এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার লাভ করে। গণপরিষদ গঠিত হত সমস্ত নাগরিকদের নিয়ে। গণপরিষদের অধিবেশন প্রতি দশ দিন অন্তর অনুষ্ঠিত হত। এথেন্সের যে কোনো

www.icsbook.info

নাগরিক এ অধিবেশনের যে কোনো প্রস্তাব রাখতে বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করতে পারতেন। সব রকম প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হত। প্রত্যেক নাগরিকের সমস্ত রকম রাষ্ট্রীয় উচ্চ পদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার এবং নির্বাচিত হবার অধিকার ছিল। পেরিক্লিসের সময়ে রাষ্ট্রীয় পদসমূহের জন্যে বেতন দেবার প্রথা প্রবর্তিত হবার ফলে দরিদ্র লোকেরাও এ সকল পদে নির্বাচিত হবার সুযোগ পায়। পরবর্তীকালে গণপরিষদের সদস্যদেরও বেতন দেয়া হত। পেরিক্লিস গরিব লোকদের থিয়েটার দেখার সুযোগ করে দেবার জন্যে 'থিয়েটার তহবিল' নামে একটি তহবিল গঠন করেছিলেন। গ্রীসে থিয়েটার শুধু বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ছিল না, এটি ছিল রাজনৈতিক শিক্ষালাভের কেন্দ্রস্বরূপ।

গণপরিষদ ছাড়া এথেন্সে ৫০০০ জনের এক পরিষদ ছিল। এর কাজ ছিল আইনের প্রয়োগ যাতে ঠিকমতো ঘটে তার তদারক করা। এথেন্সে আরেকটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা ছিল জেনারেলদের পরিষদ (১০ জনের)। এর ভূমিকা ছিল অনেকটা আধুনিক ব্রিটিশ মন্ত্রীপরিষদের মতো। গণপরিষদ এঁদের নির্বাচিত ও এঁদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করত। পেরিক্লিস একাদিক্রমে তিরিশ বছর এই জেনারেলদের পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এথেন্সে আদালত এবং বিচারকমণ্ডলীও গণতান্ত্রিক পর্যায়ে নির্বাচিত হতেন। বিচারকরা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ী বিচারের নিষ্পত্তি করতেন। এর চেয়ে অধিকতর কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কল্পনা করা কঠিন।

তবে এথেন্সের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটিও ছিল। বিপুলসংখ্যক দাসরা সব রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। বহিরাগত মানুষদেরও কোনো রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করত কেবলমাত্র স্বাধীন এথেনীয় নাগরিকগণ। তার মধ্যেও আবার মেয়েরা সব রকম রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ফলত, এথেন্সে বা অনুরূপ কোনো গ্রীক নগররাষ্ট্রে গণতন্ত্র শুধুমাত্র জনসাধারণের এক ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে সীমিত ছিল।

কিন্তু এ কারণে গ্রীক গণতন্ত্র বা তার গুরুত্বকে খাটো করে দেখলে ভুল হবে। এ কথা মনে রাখা দরকার যে, সীমিত গণ্ডির ভেতর হলেও আধুনিককালের চেয়ে এথেন্সে গণতন্ত্র অনেক বেশি ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হত। এথেনীয় গণতন্ত্র আধুনিককালের মতো প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল না, সেটি ছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র এবং আইনসভা থেকে বিচারালয় পর্যন্ত সর্বত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের নীতি অনুযায়ী সব প্রশ্নের মীমাংসা হত। জনস্বার্থমূলক প্রতিটি বিষয়ে এথেন্সের প্রতিটি নাগরিকের মত প্রকাশের অধিকার ছিল। দাসসমাজের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এথেন্স ও অন্যান্য গ্রীক নগররাষ্ট্রে ব্যাপক জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ করেছিল বলেই প্রাচীন গ্রীসে বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যা, দর্শনচিন্তা প্রভৃতির অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল। মিশর, ব্যবিলন, পারস্য প্রভৃতি প্রাচ্য সাম্রাজ্যের স্বৈরাচার শাসিত পরিবেশের তুলনায় গ্রীসের গণতান্ত্রিক সমাজের পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ও উচ্চতর পর্যায়ের। এ গণতান্ত্রিক পরিবেশে প্রাচীন গ্রীসের মানুষদের মধ্যে যে মুক্ত চিন্তা ও মনোভাব জন্ম নিয়েছিল তা ছিল মানব সমাজের পক্ষে এক নতুন সম্পদ। গ্রীসের গণতান্ত্রিক পরিবেশে বন্ধনমুক্ত জনগণ যে অভূতপূর্ব সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে তা গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তিরই পরিচয় বহন করে। গণতন্ত্রের এ মুক্ত পরিবেশে গ্রীসে যে সকল

www.icsbook.info

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আবিষ্কার ঘটেছিল তা পরবর্তীকালে সমাজ বিবর্তনের সহায়ক হয়েছে। তাই বলা চলে যে, সমাজ বিকাশের ইতিহাসে, বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও কারিগরি আবিষ্কারের ইতিহাসে, মানুষের চিন্তাধারা ও ভাবাদর্শের ইতিহাসে গ্রীক গণতান্ত্রিক সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে।

পেলোপনেসীয় যুদ্ধ (খ্রিস্টপূর্ব ৪৩১–৪০৪ অব্দ)

গ্রীসীয়-পারসিক যুদ্ধ শেষ হবার অর্ধ শতাব্দী পরেই গ্রীক জগৎ আরেকটি বড় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। গ্রীক নগররাষ্ট্র সমূহের দুটো প্রধান জোটের মধ্যে রেষারেষিই এ যুদ্ধের প্রধান কারণ । খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে গ্রীক জগতে পেলোপনেসীয় লীগ এবং এথেনীয় সাম্রাজ্য— এ দুটো প্রধান জোটের উদ্ভব হয়েছিল। পেরিক্লিসের নেতৃত্বে এথেনীয় সাম্রাজ্য গৌরবের শিখরে আরোহণ করেছিল। কিন্তু এথেন্স যখন শুধু ঈজিয়ান সাগরে আধিপত্য বিস্তার করেই সন্তুষ্ট থাকল না, গ্রীসের পশ্চিম উপকূল এবং ইটালি সিসিলিতে পশ্চিম সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্নও দেখতে শুরু করল তখন স্পার্টা শঙ্কিত হয়ে উঠল। এথেন্স যখন পেলোপনেসীয় লীগের অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো নগরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা শুরু করল তখন স্পার্টা তীব্রভাবে বাধা দিল। এথেন্সের লক্ষ্য ছিল করিন্থ উপসাগরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা। কারণ,ইটালি ও সিসিলির সাথে বাণিজ্যের এটাই ছিল প্রধান পথ। স্বার্থের দ্বন্দ্ব ছাড়াও রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য স্পার্টা এবং এথেন্সের মধ্যে সংঘাতের সূচনা করেছিল। এথেন্স ছিল গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এবং উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী, আর স্পার্টা ছিল অভিজাততান্ত্রিক, রক্ষণশীল, পশ্চাৎমূখী এবং অনুন্নত সংস্কৃতির অধিকারী। ফলে এ দুই রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পরের প্রতি মনোভাব ছিল খুবই বিদ্বেষমূলক।

এথেন্স স্পার্টানদের অশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবর্জিত জাতি হিসাবেই বিবেচনা করত। আর স্পার্টানদের অভিযোগ ছিল যে, এথেন্স পেলোপনেসাস-এর হেলটদের বিদ্রোহে উস্কানি দেয় এবং গণতান্ত্রিক অংশকে সমর্থন করে। অপর পক্ষে স্পার্টা নিজেই এথেনীয় নগরসমূহের অভিজাত অংশকে সমর্থন প্রদান করত। এ পরিস্থিতিতে এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে যে যুদ্ধ শুরু হয় সেটি 'পেলোপনেসীয় যুদ্ধ' নামে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। প্রচীন গ্রীসের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। সাতাশ বছর স্থায়ী এ যুদ্ধে এথেন্স এবং স্পার্টা উভয়েরই অপরিমেয় ক্ষতি সাধিত হয়েছিল এবং সমস্ত গ্রীক জগৎ সঙ্কটে নিমজ্জিত হয়েছিল।

৪৩১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে স্পার্টানরা এথেন্স আক্রমণ করলে পেলোপনেসীয় যুদ্ধ শুরু হয়। করিন্থের সাথে এথেন্সের বিবাদকে উপলক্ষ করে স্পার্টা এ যুদ্ধ শুরু করে (করিন্থ ছিল স্পার্টার মিত্র)। পেরিক্লিসের নেতৃত্বে এথেনীয় বাহিনী সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে নগরের দুর্গে আশ্রয় নেয়। স্পার্টনরা যখন এ্যাটিকার শস্যক্ষেত্র এবং ঘরবাড়ি নষ্ট করতে শুরু করে তখন সব মানুষ এসে এথেন্স নগরে আশ্রয় নেয় । ফলে নগরে খাদ্যের অভাব এং নানা রকম রোগ, মহামারী দেখা দেয়। এ ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে পেরিক্লিস জনসাধারণের আস্থা হারিয়ে ফেলেন। এর অল্পকাল পরেই ৪২৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পেরিক্লিস রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তী সমর নায়কদের নেতৃত্বে এথেনীয় নৌবাহিনী স্পার্টার কোনো কোনো অংশ অধিকার করে নেয়। স্পার্টাও গ্রীসের উত্তরাঞ্চলে কিছু কিছু

www.icsbook.info

এথেনীয় নগর অধিকার করে নেয়। অবশেষে এক বড় যুদ্ধে উভয় পক্ষই শক্তিক্ষয়ের ফলে অবসন্ন হয়ে পড়ায় ৪২১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে দুই দলের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়।

কিন্তু এ শান্তি স্থায়ী হয়নি। অল্পকাল পরেই এথেন্সে সমরবাদী দল সিসিলি দ্বীপের সায়রাকিউজ নগর আক্রমণের প্রস্তাব করে এবং দক্ষিণ ইটালি অধিকারের পরিকল্পনা করে। সায়রাকিউজ নগররাষ্ট্রটি ছিল করিন্থের উপনিবেশ, আর করিন্থ ছিল পেলোপনেসীয় লীগের সদস্য। ৪১৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আলসিবিয়াডিস নামক সমরনায়কের নেতৃত্বে এথেনীয় বাহিনী আড়াই শতাধিক যুদ্ধজাহাজ এবং ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে সায়রাকিউজ আক্রমণ করে। কিন্তু এ অভিযানের ফল এথেন্সের পক্ষে শুভ হয়নি। স্পার্টা এবং সিসিলির মিলিত বাহিনীর হাতে এথেন্স নৌযুদ্ধে পরাজিত হয়। তদুপরি এথেন্সের দুর্ভাগ্যক্রমে অন্তর্কলহের কারণে আলসিবিয়াডিস দলত্যাগ করে স্পার্টার পক্ষে যোগ দেন। পরাজিত এথেনীয় বাহিনী স্থলপথে পশ্চাদপসরণের চেষ্টা করে, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সিসিলীয়রা এথেনীয় সৈন্যদের বন্দী করে দাসে পরিণত করে। এভাবে পেলোপনেসীয় যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব শেষ হয়। সিসিলীয় অভিযানে বিপর্যস্ত হবার ফলে এথেন্সের নৌশক্তি ভেঙে পড়ে এবং অনেক নগর এথেন্সের কবল থেকে বেরিয়ে যায়।

ইতিমধ্যে এথেন্স অপর এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ৪১৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে স্পার্টা এ্যাটিকাতে সৈন্য সমাবেশ করে। এ সময় ২০ হাজার এথেনীয় দাস স্পার্টানদের পক্ষে চলে গেলে এথেন্স আরও দূর্বল হয়ে পড়ে। এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে গণতন্ত্রবিরোধীরা এথেন্সে ক্ষমতা দখল করে এবং গণতান্ত্রিক সংবিধান বাতিল করে। এ সংবাদ এথেনীয় নৌবহরে পৌঁছালে নাবিকরা আলসিবিয়াডিস-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে এথেন্সের অভিজাততন্ত্রকে পরাজিত করে। আলসিবিয়াডিস ইতিমধ্যে স্পার্টার পক্ষ ত্যাগ করে। গ্রীসীয় যুদ্ধের এ পর্যায়ে পারসিক রাজশক্তি স্পার্টার পক্ষ নিয়ে নতুন করে গ্রীসীয় যুদ্ধে প্রবেশ করে। পারস্যের লক্ষ্য ছিল এশিয়া মাইনরের উপকূলে তার আধিপত্য ও সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। যুদ্ধে পারস্যের প্রবেশের ফলে সমুদ্র পথে এথেন্সে শস্য আমদানির পথ বন্ধ হয়ে গেল। স্পার্টার আক্রমণের ফলে এ্যাটিকায় শস্যের চাষও এক রকম বন্ধ ছিল। এ অবস্থায় দার্দানেলিসে এথেনীয় নৌবহর স্পার্টানদের হাতে বিধ্বস্ত হওয়ায় এথেনীয় শক্তি চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত হল। এরপর ৪৪০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে স্পার্টানরা এথেন্স অধিকার করে এথেন্সের সব যুদ্ধজাহাজ বাজেয়াপ্ত করে এবং এথেন্স থেকে পাইরিউস পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ প্রাচীর ভেঙে ফেলে। এথেন্স এর পর স্পার্টার আধিপত্য ও নেতৃত্ব স্বীকার করে নেয়।

স্পার্টার সেনাবাহিনীর সহায়তায় এথেন্সের গণতন্ত্রবিরোধীরা স্বৈরাচারের প্রবর্তন করেছিল, কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি। ৪০৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এথেন্সে আবার গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পেলোপনেসীয় যুদ্ধে সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এথেন্স। তার কৃষককুল সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল; ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তবে যুদ্ধের ফলে স্পার্টাও কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। পেলোপেনেসীয় যুদ্ধের মাধ্যমে স্পার্টানরা গ্রীক জগতের সর্বপ্রধান শক্তিতে পরিণত হলেও, স্পার্টা ছিল এ ভূমিকা পালনে একান্তই অপারগ। এ দিকে পারসিকরা ইতিপূর্বে যুদ্ধে স্পার্টানদের যে সাহায্য প্রদান করেছিল তার বিনিময়ে এখন এশিয়া মাইনরের গ্রীক নগরগুলো দাবি করে বসে। স্পার্টা এ দাবি অগ্রাহ্য করলে

www.icsbook.info

পারসিকরা বিভিন্ন গ্রীক নগররাষ্ট্রকে নিয়ে স্পার্টার বিরুদ্ধে একটা জোট গঠন করে। এভাবে নতুন করে 'করিন্থের যুদ্ধ' শুরু হয়। যুদ্ধশেষে যে শান্তিচুক্তি হয় তাতে স্পার্টার প্রাধান্য মেনে নেয়া হলেও গ্রীসের বিভিন্ন সমস্যায় পারস্য সম্রাটকে প্রধান সালিস হিসাবেও স্বীকার করে নেয়া হয়।

এরপর স্পার্টা বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। স্পার্টার সৈন্যদলের সহায়তা নিয়ে সব নগররাষ্ট্রের অভিজাততন্ত্রীরা গণতন্ত্র উচ্ছেদ করে অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। স্পার্টা প্রায় তিরিশ বছর ধরে সারা গ্রীসের ওপর আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। তারপর থিব্‌স্ নগররাষ্ট্র এথেন্সের সাথে জোট গঠন করে স্পার্টার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়। ৩১৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে থিব্‌স্ ও স্পার্টার মধ্যে এক যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে থিব্‌স-এর সেরা সেনাপতি এপামিননডাস-এর নতুন রণকৌশলের কাছে অপরাজেয় স্পার্টান বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এর পর স্পার্টা গ্রীকজগতের কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে এবং শুরু হয় থিব্‌স-এর আধিপত্যের যুগ। কিন্তু থিব্‌স-এর ক্ষমতা স্থায়ী হয়নি,৩৬২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এপামিননডাসের মৃত্যুর সাথে সাথে থিব্‌স-এর প্রতিপত্তির অবসান ঘটেছিল। ইতিমধ্যে গ্রীসের উত্তরাঞ্চলের ম্যাসিডোনিয়া রাজ্য নতুন শক্তি নিয়ে জেগে ওঠে এবং সমগ্র গ্রীকজগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

দেখা যাচ্ছে পেলোপনেসীয় যুদ্ধ গ্রীকজগতের স্থিতিশীলতাকে দারুণভাবে বিপর্যস্ত করেছিল। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিভিন্ন নগররাষ্ট্রগুলোর মধ্যে তীব্র রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলেছিল। এ সময় বিভিন্ন নগররাষ্ট্র নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করার চেষ্টা করে, কিন্তু কেউই বেশিদিন প্রাধান্য বজায় রাতে পারেনি। এ সময়ে এক সর্বব্যাপী বিক্ষোভ ও অস্থিরতা সমগ্র গ্রীকসমাজকে আলোড়িত করেছিল যার প্রতিফলন ঘটেছিল অর্থনৈতিক অবক্ষয়ে এবং নগরে নগরে বিরামহীন যুদ্ধে।

আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উত্তর গ্রীসের ম্যাসিডন রাজ্য ক্রমশ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। ম্যাসিডন-রাজ ফিলিপ অতি অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র গ্রীকজগতের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র মহাবীর আলেকজাণ্ডার মাত্র ১০ বছরের মধ্যে বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য ও অন্যান্য অনেক দেশ জয় করেন। বস্তুত আলেকজাণ্ডার সিন্ধুনদ থেকে নীলনদ পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভূভাগ জয় করেন। এর পর গ্রীকসভ্যতা ও সংস্কৃতির এক নতুন যুগের সূচনা হয়। নতুন যুগে গ্রীক ও প্রাচ্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের মাধ্যমে এক নতুন সংস্কৃতির উদয় হয়েছিল। এ সংস্কৃতির নাম হয়েছে হেলেনিস্টিক বা আলেকজান্দ্রিয়-সংস্কৃতি। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরী ছিল এযুগের সভ্যতা সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র। মনে রাখা যেতে পারে যে, প্রাক আলেকজান্দ্রীয় যুগের বিশুদ্ধ গ্রীক সংস্কৃতির নাম দেয়া হয়েছে 'হেলেনিক সংস্কৃতি'।

গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত হলেও ম্যাসিডোনিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো অন্যান্য গ্রীক নগরের চেয়ে পৃথক ছিল। এ দেশটা ছিল সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন, তাই সামুদ্রিক বাণিজ্যের সুযোগ তার বিশেষ ছিল না। ফলে গ্রীসের অন্যান্য অংশের তুলনায় ম্যাসিডোনিয়া ছিল অনেক পশ্চাৎপদ। এটা ছিল এক কৃষিনির্ভর দেশ এবং এর

www.icsbook.info

অধিবাসীরা ছিল প্রধানত কৃষক ও পশুপালক। এথেন্স যখন বিকাশের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল, ম্যাসিডোনিয়া তখনো হোমারীয় সভ্যতার পর্যায়ে পড়ে ছিল।

পেলোপনেসীয় যুদ্ধের পর থেকে ম্যাসিডোনিয়া গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি আত্মস্থ করতে শুরু করে। রাজা ফিলিপ (৩৫৯-৩৩০ খ্রিঃ পূঃ) ম্যাসিডোনিয়ায় এক বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। ফিলিপ যে নতুন ধরনের সৈন্যব্যূহ গঠন করতেন তা "ম্যাসিডোনিয়ার ফ্যালাংস" (Macedonian Phalanx) নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। ফিলিপ যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিলেন থিব্‌স্-এর এপামিনোনডাসের কাছে। ম্যাসিডোনিয়ার ফ্যালাংস-এ ১৬ থেকে ২০ সারি সৈন্য থাকত এবং তাদের হাতের বল্লম ছিল ১৫ ফুট পর্যন্ত লম্বা। পেছনের সারির সৈন্যরা সামনের সারির সৈন্যদের কাঁধে বল্লম রাখত। সৈন্যরা বিশাল ঢাল দিয়ে নিজেদের আবৃত রাখত। ব্যূহের দু'পাশে থাকত সুশিক্ষিত অশ্বারোহী বাহিনী। শত্রুর দুর্গ অবরোধ এবং জয় করার উপযুক্ত যন্ত্র এবং অস্ত্রপাতি ম্যাসিডোনীয় বাহিনীর ছিল।

নতুন যুদ্ধসরঞ্জাম ও রণকৌশলের সাহায্যে রাজা ফিলিপ অতি অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র উত্তর গ্রীস অধিকার করে নেন। ঈজিয়ান উপকূল এবং কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। এর ফলে ম্যাসিডোনিয়া একটি নৌশক্তিতে পরিণত হয় এবং গ্রীস থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত জলপথ সমূহ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।

ম্যাসিডন এরপর সমগ্র গ্রীসের কর্তৃত্ব অর্জনের জন্যে সচেষ্ট হল। ম্যাসিডন-শক্তির সম্প্রসারণে বাধা দেবার ক্ষমতা একমাত্র এথেন্সেরই ছিল। এথেন্সের বাণিজ্যিক স্বার্থও ক্ষুণ্ন হয়েছিল ম্যাসিডেনের শক্তির বিকাশের ফলে। কিন্তু এথেন্স এ সময়ে দুটো দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল ছিল ফিলিপের সাথে মৈত্রী স্থাপনের পক্ষে, অপর দল ছিল ফিলিপের অধীনতা স্বীকার করার বিরুদ্ধে। সুবিখ্যাত বাগ্মী ডেমোস্থেনিস-এর বিরামহীন প্রচেষ্টার ফলে এথেনীয় জনগণ শেষ পর্যন্ত ফিলিপের বিরুদ্ধাচারণ করাই স্থির করে। এথেন্স এবং থিব্‌স্ ফিলিপের বিরুদ্ধে জোট গঠন করে। স্পার্টা ও অন্যান্য পেলোপনেসীয় রাষ্ট্র এ বিবাদে নিষ্ক্রিয় থাকে। অবশেষে ৩৩৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ম্যাসিডোনিয়া ও এথেন্সের মধ্যে এক যুদ্ধে বিবাদের পরিসমাপ্তি ঘটে। যুদ্ধে ম্যাসিডোনীয় বাহিনীর হাতে গ্রীক বাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। ম্যাসিডোনীয় বাহিনীর এক অংশের সেনাপতি ছিলেন ফিলিপের ছেলে আলেকজাণ্ডার, তাঁর বয়স তখন মাত্র ১৮ বছর। যুদ্ধে জয়লাভের পর সম্রাট ফিলিপ করিন্থ নগরীতে গ্রীক নগরসমূহের এক মহাসম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলনে গ্রীক রাষ্ট্রসমূহের এক জোট গঠন করা হয় এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়। ম্যাসিডোনিয়ার নেতৃত্বে পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করারও সিদ্ধান্ত নেয় গ্রীক নগরসমূহ।

সম্রাট ফিলিপ পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ৩৩৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তাঁর সেনাবাহিনী এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করলে পারস্যের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু ঠিক এ সময়ে ফিলিপ গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। এর ফলে তাঁর পুত্র আলেকজাণ্ডার মাত্র ২০ বছর বয়সে ম্যাসিডনের তথা গ্রীক সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ বয়সেই অবশ্য আলেকজাণ্ডার অত্যন্ত রণনিপুণ সেনাপতিতে পরিণত হয়েছিলেন। ছোটকাল থেকেই তিনি পিতার সাথে সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন।

www.icsbook.info

আলেকজাণ্ডার উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকারী ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও পণ্ডিত এ্যারিস্টটল ছিলেন তাঁর শিক্ষক। তবে সব দিক দিয়ে প্রতিভাবান এবং সাহসী ও কর্মঠ হওয়া সত্ত্বেও আলেকজাণ্ডার ছিলেন রাগী স্বভাবের ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির।

ফিলিপের মৃত্যুর সংবাদ প্রচারিত হওয়ামাত্র বিভিন্ন গ্রীক নগররাষ্ট্রে বিদ্রোহের মনোভাব প্রকাশ পায়। এথেন্সেও বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং থিব্‌স্ বিদ্রোহ করে বসে। তরুণ আলেকজাণ্ডার কঠোর হাতে এসব বিদ্রোহ দমন করেন। থিব্‌স্ নগরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে তিনি তার অধিবাসীদের দাসরূপে বিক্রি করে দেন।

৩৩৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার এশিয়ায় তাঁর অভিযান শুরু করেন। আলেকজাণ্ডারের সেনাবাহিনী খুব বিশাল ছিল না, এতে ছিল প্রায় ৩০ হাজার পদাতিক সৈন্য, ৫ হাজার অশ্বারোহী এবং প্রয় ১৫০টি যুদ্ধজাহাজ। আলেকজাণ্ডারের সেনাবহিনী হেলেস্‌পন্ট অতিক্রম করে এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করলে পারসিক বাহিনীর সাথে প্রথম সংঘর্ষ ঘটে। এ যুদ্ধে পারসিক বাহিনীকে পরাস্ত করে আলেকজাণ্ডার উপকূল ধরে দক্ষিণে অগ্রসর হন এবং গ্রীক নগরসমূহকে পারসিক আধিপত্য থেকে মুক্ত করেন। অতঃপর ৩৩৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ইসাস্ নগরের কাছে আলেকজাণ্ডার পারস্য সম্রাট ৩য় দারিয়ুসের মূল সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হন। পারসিক বাহিনী ছিল সংখ্যায় গ্রীক বাহিনীর চেয়ে বহগুণ বেশি। আলেকজাণ্ডার তাঁর পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর বাম অংশকে অনেক দূর এগিয়ে যেতে দেন। এ অংশটি পারসিক বাহিনীকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে তাকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে। এর ফলে পারসিক বহিনী ঘেরাও হয়ে পরে পর্যুদস্ত হয়। দারিয়ুস কোনোক্রমে পলায়ন করেন। এভাবে নতুন ও বলিষ্ঠ রণকৌশলের সাহায্যে আলেকজাণ্ডার জয়লাভ করেন। এরপর আলেকজাণ্ডার ফিনিশীয় উপকূল ধরে অগ্রসর হন এবং বিভিন্ন নগর ও রাষ্ট্রকে পদানত করেন। যেসব নগররাষ্ট্র প্রতিরোধের চেষ্টা করে আলেকজাণ্ডার তাদের নগরীকে ধ্বংস করে সমস্ত লোকদের দাসে পরিণত করেন। যেমন,টায়ার নগরীকে অধিকার করার পর আলেকজাণ্ডর ৮ হাজার লোককে হত্যা করেন এবং ৩০ হাজার লোককে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেন। অবশ্য অধিকাংশ নগরই পারসিক আধিপত্য থেকে মুক্তিলাভের জন্যে ব্যস্ত ছিল, এরা স্বেচ্ছায় আলেকজাণ্ডারের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। এরপর আলেকজাণ্ডার বিনাযুদ্ধে মিশর জয় করে নেন এবং নিজেকে পারসিক আধিপত্য থেকে মিশরের মুক্তিদাতা রূপে ঘোষণা করেন। মিশরের পুরোহিতরাও আলেকজাণ্ডারকে দেবতা আমন-এর পুত্র এবং ফারাওদের উত্তরাধিকারীরূপে ঘোষণা করেন।

মিসর থেকে আলেকজাণ্ডার ৩৩১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আবার এশিয়ায় ফিরে আসেন। এবার দারিয়ুসের সাথে তাঁর শেষ বড় যুদ্ধ হয়। নিনেভে নগরীর কাছে এক প্রান্তরে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধেও আলেকজাণ্ডার উন্নত রণকৌশলের দরুন জয়লাভ করেন। দারিয়ুস প্রথমে অশ্বরথ বাহিনীকে আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে চালনা করেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের তীরন্দাজ বাহিনী রথচালকদের অনেককেই তীর মেরে নিহত করে। এ ছাড়া আলেকজাণ্ডারের সেনারা দু'পাশে সরে গিয়ে রথসমূহকে পথ ছেড়ে দেয় এবং রথগুলো আলেকজাণ্ডারের বাহিনীর কোনো ক্ষতি না করতে পেরে সোজা বেরিয়ে চলে যায়। এর পর আলেকজাণ্ডার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে দারিয়ুসের মূল শিবির আক্রমণ

www.icsbook.info

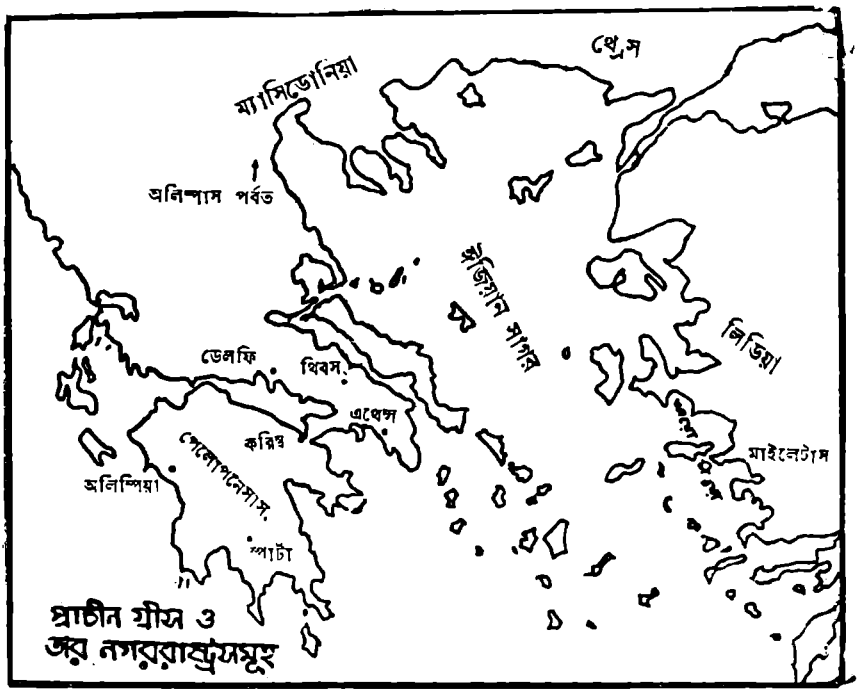

প্রাচীন গ্রীস ও তার নগররাষ্ট্রসমূহ

www.icsbook.info

করেন। দারিয়ুস আতঙ্কিত হয়ে পলায়ন করেন, তাঁর সেনাবাহিনী তাঁকে অনুসরণ করে।

দারিয়ুসের পশ্চাদ্ধাবন করে আলেকজাণ্ডার পারস্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং একে একে পারস্যের চারটি রাজধানীর মধ্যে তিনটিকেই অধিকার করেন। এ তিনটি রাজধানী হলঃ ব্যবিলন, সুসা ও পার্সিপোলিস। এ তিনটি নগরীতে আলেকজাণ্ডার প্রভূত ধনসম্পত্তি লাভ করেন। ব্যবিলনে আলেকজাণ্ডার নিজেকে পারস্যের সম্রাটরূপে ঘোষণা করেন। দারিয়ুস পলায়নরত অবস্থায় তাঁরই নিজের সেনাপতিদের হাতে নিহত হন। আলেকজাণ্ডার প্রথমে দারিয়ুস ও পরে তাঁর অধীনস্থ শাসকদের অনুসরণ করে মধ্য এশিয়ায় (বর্তমান উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তানে) প্রবেশ করেন। এখানকার স্থানীয় দুর্ধর্ষ অধিবাসীদের পরাস্ত করতে আলেকজাণ্ডারকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। তিন বছর প্রচণ্ড লড়াই করে শত সহস্র অধিবাসীদের হত্যা করে আলেকজাণ্ডার এখানে এক ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

এরপর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষের ধনসম্পদের কাহিনীতে আকৃষ্ট হয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। খাইবার গিরিপথ দিয়ে আলেকজাণ্ডার ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করেন। এখানে এক প্রাচীন ভারতীয় রাজা পুরুকে পরাজিত করে আলেকজাণ্ডার উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এ কাজ সহজে সাধিত হয়নি। সীমান্ত অঞ্চলের ভারতীয় অধিবাসীরা আলেকজাণ্ডারকে তীব্র বাধা প্রদান করেছিল। বিশেষত সীমান্তের উপজাতিদের প্রতিরোধের ফলে ভারতবর্ষে আলেকজাণ্ডারের প্রবেশ দীর্ঘকাল বিলম্বিত হয়েছিল। আলেকজাণ্ডারের স্বপ্ন ছিল বিশ্বজয়ের। কিন্তু তাঁর সৈন্যরা ভারতীয় উপসমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পৌঁছার পর আর অগ্রসর হতে অস্বীকার করে। উত্তর ভারতে তখন পরাক্রমশালী সম্রাট মহাপদ্ম নন্দ মগধের সিংহাসনে আসীন। এঁর পরাক্রমের কাহিনী আলেকজাণ্ডারের সৈন্যরা শুনেছিল, আর ভারতীয়দের বিক্রম তারা সীমান্ত অঞ্চলে স্বচক্ষেই দেখেছিল। অনেক চেষ্টা করেও আলেকজাণ্ডার তাঁর সৈন্যদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে ৩২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে গ্রীসের অভিমুখে ফিরে চললেন। কিন্তু গ্রীসে না ফিরে তিনি পথিমধ্যে ব্যবিলনেই তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করলেন। তাঁর সাম্রাজ্য এ সময় গ্রীসের মূল ভূখণ্ড থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্যবিলনে বসে আলেকজাণ্ডার ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম অংশ জয়ের পরিকল্পনা করতে শুরু করেন। কিন্তু ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মাত্র ৩২ বছর বয়সে অকস্মাৎ রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যাবার ফলে আলেকজাণ্ডারের বিশ্বজয়ের সাধ অপূর্ণই রয়ে যায়।

আলেকজাণ্ডারের বিজয়ের তাৎপর্য

পারস্য সাম্যজ্যের বিরুদ্ধে অলেকজাণ্ডারের সহজ বিজয়ের একটা প্রধান কারণ ছিল পারসিকদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য ছিল বহুসংখ্যক বিভিন্ন জাতির সমবায়ে গঠিত, আর তাদের মধ্যে কোনো ঐক্যবোধ ছিল না। পারসিক সেনাবাহিনীও ছিল বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির ও উপজাতির লোক এবং ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে গঠিত। আলেকজাণ্ডারের সুসংগঠিত গ্রীক বাহিনীর সর্বাধুনিক রণকৌশলের কাছে তাই পারসিক বাহিনী সহজেই পরাস্ত হয়েছিল।

কিন্তু বাহুবলে পারস্য সাম্রাজ্যকে পরাভূত করতে পারলেও আলেকজাণ্ডার কোন সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেননি। এর প্রধান কারণ হচ্ছে পারস্য

www.icsbook.info

সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কোনো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্যবোধ ছিল না। তাই ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হওয়ামাত্র তাঁর সাম্রাজ্য কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আলেকজাণ্ডারের তিনজন প্রধান সেনাপতিই তাঁর সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন। অবশ্য এ সকল ভাগাভাগির কাজ সমাধা করতে ত্রিশ-চল্লিশ বছরের যুদ্ধ বিবাদের প্রয়োজন হয়েছিল। যুদ্ধ বিগ্রহের শেষে দেখা যায় যে, আলেকজাণ্ডারের সুবিশাল সাম্রাজ্যের স্থলে উদিত হয়েছে তিনটি বড় বড় সাম্রাজ্য। আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকাস পারস্য, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনরের একাংশ নিয়ে তাঁর সাম্রাজ্য গঠন করেন। অর্থাৎ সেলুকাসের সাম্রাজ্য হেলেসপন্ট থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পার্থীয়গণ ইরান এবং আরো কিছু ভূখণ্ড সেলুকাস রাজবংশের কবল থেকে মুক্ত করে। অবশ্য তার পরেও পশ্চিম এশিয়ায় সেলুকাসদের সাম্রাজ্য আরো একশো বছর টিকে ছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত সে অংশও রোমের কবলিত হয়। সিরিয়ার এন্টিঅক নগরী ছিল সেলুকাসদের এ সাম্রাজ্যের রাজধানী। এ নগরী ক্রমশ প্রাচীনকালের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। আলেকজাণ্ডারের অপর এক সেনাপতি প্রথম টলেমী মিশর অধিকার করে সেখানে টলেমী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে ফিনিশিয়া এবং প্যালেস্টাইনও টলেমীর সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত হয়েছিল। এ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল আলেকজান্দ্রিয়া নগরী। আলেকজান্দ্রিয়া প্রাচীনকালের একটি বিখ্যাত সামুদ্রিক বন্দর এবং গ্রীক সভ্যতা সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

আলেকজাণ্ডারের অপর এক সেনাপতি এ্যান্টিগোনাস ম্যাসিডোনিয়া এবং গ্রীক নগররাষ্ট্র সমূহ করায়ত্ত করে এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। অবশ্য অধিকাংশ গ্রীকরাষ্ট্রই জোট গঠন করে এবং বিদ্রোহ করে কার্যত স্বাধীন হয়ে যায়।

কালক্রমে ১৪৬ থেকে ৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে উপরোক্ত তিনটি সাম্রাজ্যের প্রায় সমস্ত ভূ-ভাগই রোমক সাম্রাজের করতলগত হয়।

আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী না হলেও তাঁর দিগ্বিজয়ের ফলাফল সুদূর-প্রসারী হয়েছিল। আলেকজাণ্ডারের বিজয়ের আগে গ্রীক সংস্কৃতি কেবলমাত্র গ্রীসের সীমান্তবর্তী জাতিসমূহকে প্রভাবিত করেছিল। আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের পর গ্রীসীয় সংস্কৃতি ব্যাপক অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। টলেমী রাজ বংশ এবং সেলুকাস রাজবংশের অধীনে রাজ সরকারে এবং সেনাবাহিনীতে চাকরি নেয়ার জন্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বা কৃষিকাজের মাধ্যমে সম্পদশালী হওয়ার জন্যে দলে দলে গ্রীক নাগরিকরা মিশরে ও মধ্যপ্রাচ্যে আসতে শুরু করে। এর ফলে ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরের বিস্তৃত অঞ্চলের শুধু রাজসভাতেই নয় বরং সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে গ্রীক ভাষা এবং গ্রীক সংস্কৃতির প্রচলন ঘটে। বস্তুত মিশরে গ্রীক ভাষার এত ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল যে, ইহুদীরা তাদের ধর্মগ্রন্থ পুরাতন টেস্টামেন্টকে জনসাধারণের বোধগম্য করার জন্যে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করতে বাধ্য হয়েছিল।

আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের ফলে গ্রীক ও প্রাচ্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এক নতুন সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, এ সংস্কৃতির নাম দেয়া হয়েছে 'হেলেনিস্টিক' বা 'আলেকজান্দ্রীয়' সভ্যতা। হেলেনিস্টিক সভ্যতার অনেক প্রগতিশীল দিক ছিল। এ যুগে বহুসংখ্যক নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্রের উদ্ভব হয়েছিল। এ

www.icsbook.info

যুগে আলেকজান্দ্রিয়া প্রাচীন পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। আলেকজান্দ্রীয় যুগেই ইউক্লিড, এরাটোস্থেনিস, আর্কিমিডিস, হিপার্কাস, হিরো প্রমুখ বিজ্ঞানী ও গণিতবিদদের আবির্ভাব ঘটেছিল। এ যুগে যদিও গ্রীক ভাষা এবং গ্রীক ব্যক্তিরাই সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তথাপি এ যুগের প্রধান প্রবণতা ও মনোভঙ্গি নিরূপিত হয়েছিল প্রাচ্য মানস দ্বারা। মিশরীয়, পারসিক প্রভৃতি প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রভাবেই হেলেনিস্টিক যুগের গ্রীক চিন্তাধারায় কিছু কিছু অধোগতি লক্ষ্য করা যায়। এ যুগের সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ছিল গ্রীক স্বর্ণযুগের তুলনায় নিকৃষ্ট। সাবেক গ্রীক গণতন্ত্রের আদর্শের স্থলে এ যুগে উদিত হয় স্বৈরতন্ত্রের, এবং এ স্বৈরতন্ত্র ছিল মিশরীয় বা পারসিক স্বৈরতন্ত্রের মতোই কঠোর। হেলেনিস্টিক যুগের সম্রাটরা নিজেদের স্বর্গীয় বা আধাস্বর্গীয় বলে দাবি করতেন। সম্রাট আলেকজাণ্ডারকে মিশরে ঐশ্বরিক বলে ঘোষণা করা হয়েছিল— একথা আগেই বলা হয়েছে। আর পশ্চিম এশিয়ায় সেলুকাস রাজবংশ এং মিশরে টলেমী রাজবংশ নিজেদের ওপর নিজেরাই দেবত্ব আরোপ করেছিলেন আরও সুচারুরূপে। এঁরা রাজকীয় সনদে স্বাক্ষর করতেন "ঈশ্বর" নামে। ইতিহাসের ধারার পরিপন্থী এ সকল চিন্তাধারার উদয় যে এশীয় এবং প্রাচ্য প্রভাবেই ঘটেছিল, তা বলাই বাহুল্য। তবে মনে রাখা দরকার যে, হেলেনিস্টিক যুগ সর্বাংশে প্রগতিবিরোধী ছিল না। এ যুগে প্রাচীন মিশরীয় ও ব্যবিলনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মিলন ঘটায় হেলেনিস্টিক বিজ্ঞানের বিশেষ প্রসার ঘটেছিল। হেলেনিস্টিক যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য,কারিগরি, শিল্প, কৃষি এবং অর্থনীতিরও বিশেষ বিকাশ ঘটেছিল। পরের অনুচ্ছেদে গ্রীক সংস্কৃতির সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

গ্রীসীয় সংস্কৃতির পরিচয়

গ্রীসীয় সভ্যতার উৎপত্তি, বিবর্তন এবং অবসানের ইতিহাস আমরা ওপরে বর্ণনা করেছি। কিন্তু হোমারীয় যুগ (১২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) থেকে শুরু করে আলেকজান্দ্রীয় যুগের অবসান (৩০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ কালে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি অপরিবর্তিত থাকেনি। হোমারীয় যুগের ভিত্তিভূমির ওপর যে গ্রীসীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার নাম দেয়া হয়েছে হেলেনিক সভ্যতা। এ সভ্যতার ব্যাপ্তিকাল ধরা হয় হোমারীয় যুগ থেকে আলেকজাণ্ডারের উদয়ের কাল পর্যন্ত। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর প্রাচ্য সভ্যতার সংযোগে যে নতুন চরিত্রের গ্রীসীয় সংস্কৃতির উদ্ভব হয়, তার নাম দেয়া হয়েছে হেলেনিস্টিক বা আলেকজান্দ্রীয় সংস্কৃতি। তবে হেলেনিক সংস্কৃতিকেও সামগ্রিকভাবে সুসম, একধর্মী বা সমধর্মী বলে অভিহিত করা চলেনা। কারণ আয়োনীয় যুগের দর্শন এবং এথেনীয় যুগের দর্শন ছিল দুই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী চরিত্রের। আয়োনীয় যুগের দর্শন ছিল বস্তুবাদী আর এথেনীয় যুগের দর্শন ছিল ভাববাদী। খৃষ্ট পূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত আয়োনিয়ার সমৃদ্ধির কালকে বলা চলে আয়োনীয় যুগ। পারসিক আক্রমণে আয়োনীয় যুগের অবসান ঘটেছিল। ৪৭৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভের মধ্যে দিয়ে এথেন্সের অভ্যুদয় ঘটে। এথেন্সের সমৃদ্ধির এ যুগকেই বলা হয় এথেনীয় যুগ। আমরা তাই হেলেনিক সংস্কৃতিকে আয়োনীয় যুগ ও এথেনীয় যুগ— এ দুই স্তরে বিভক্ত করে আলোচনা করব। আর হেলেনিস্টিক বা আলেকজান্দ্রীয় যুগকে তৃতীয় পর্যায়-রূপে বিবেচনা করে

www.icsbook.info

পৃথকভাবে আলোচনা করব। তবে ধর্মীয় আচরণ, ক্রীড়া-অনুষ্ঠান, শিল্পকলা প্রভৃতি কতকগুলি মৌল বিষয়ে উপরোক্ত বিভিন্ন যুগের সংস্কৃতিতে এক নিরবচ্ছিন্ন অভ্যন্তরীণ যোগসূত্র বজায় ছিল।

ধর্ম

হোমারীয় যুগের গ্রীকদের ধর্ম ছিল বহু-ঈশ্বরবাদী। কোনো একজন দেবতা অন্য দেবতার চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী ছিলেন না। তাদের ধারণায় ঈশ্বররা ছিলেন মানুষেরই মতো, তবে তাঁরা ছিলেন অমর এবং অসীম শক্তিশালী। গ্রীকদের চিন্তায় দেবরাজ ছিলেন 'জিউস', তিনি বৃষ্টিরও দেবতা। আর রাগ হলে তিনি মানুষকে সোনালি তীর অর্থাৎ বজ্র দিয়ে আঘাত করতেন। গ্রীক নাবিকরা ছোট ছোট কাঠের তৈরি জাহাজে করে সমুদ্র পাড়ি দিত, তাই তারা সমুদ্রের দেবতা পসিডনকেও রীতিমতো ভয় করত। এই দেবতা ইচ্ছে করলে তাঁর ত্রিশূল দিয়ে ঝড় তুলতে পারতেন এবং জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারতেন।

গ্রীকদের কল্পনায় সমস্ত জগৎই দেবদেবীতে পূর্ণ ছিল। বনে যেসব দেবতা বাস করতেন তাঁদের নাম ছিল স্যাটার। দেখতে এঁরা মানুষের মতোই, কেবল সমস্ত শরীর লোমে ঢাকা আর পা দুটো ছাগলের মতো। ঝরনা ইত্যাদির দেবীর নাম ছিল নিম্‌ফ্‌, এঁরা ছিলেন সুন্দরী কুমারী। আবার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার রক্ষক দেবতা ছিল। যেমন, কৃষিকাজ, পশুপালন, শিকার, কাপড় বোনা প্রভৃতি প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রেই রক্ষাকারী দেবতা ছিল। ডায়োনিসিয়াস ছিলেন মদের দেবতা, বছরে দু'বার গ্রীকরা তাঁর সম্মানে ভোজ উৎসবের আয়োজন করত— একবার বসন্তকালে আঙুর বাগানে কাজ শুরু করার আগে, আরেকবার ডিসেম্বর মাসে, যখন নতুন মদ তৈরি হত। গ্রীকরা যখন ধাতুর কাজ শিখল তখন তারা কামারদের রক্ষা করার জন্যে এক নতুন দেবতার সৃষ্টি করল, তার নাম হেফিস্টাস। সুদর্শন দেবতা এ্যাপোলো ছিলেন চারুকলার দেবতা, তাঁর সাথী অন্যান্য দেবীদের নাম হল মিউজ, এঁরা হলেন সঙ্গীত, কাব্য, নৃত্য, ইতিহাস প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এ সকল মিউজেস অর্থাৎ মিউজদের নামে আলেকজান্দ্রিয়াতে যে মন্দির স্থাপিত হয়েছিল সেটাই পরবর্তীকালে মিউজিয়াম নামে বিখ্যাত হয়েছে। এ্যাফ্রোডিটি ছিলেন প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, এথেনা ছিলেন যুদ্ধের দেবী এবং নেমেসিস ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

গ্রীকরা বিশ্বাস করত যে, জিউস, এ্যাপোলো এবং অন্যান্য প্রধান দেব-দেবীরা গ্রীসের উচ্চতম পর্বত অলিম্পাসে বাস করতেন। পর্বতের চূড়ায় মেঘেরও ওপরে হেফিস্টাসের তৈরি সুন্দর সুন্দর প্রাসাদে বাস করতেন দেবতারা। গ্রীকদের দৃষ্টিতে দেবতাদের জীবনযাত্রা অভিজাত শ্রেণীর জীবনযাত্রার সাথে তুলনীয় ছিল। গ্রীক দেবতারা ছিলেন অভিজাত শাসকদের মতোই নিষ্ঠুর, উচ্চাভিলাষী ও প্রতিশোধপরায়ণ। প্রমিথিউসের উপকথায় দেবতাদের এ নিষ্ঠুর চরিত্রই ফুটে উঠেছিল। গ্রীক লোককাহিনী অনুসারে, দেবতারা মানুষের কাছ থেকে আগুনকে লুকিয়ে রেখেছিল, তাই মানুষ আগুনের অভাবে কষ্ট পেত। প্রমিথিউস নামে এক বীর হেফিস্টাস-এর কাছ থেকে আগুন চুরি করে এনে মানুষকে উপহার দেয়। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে জিউস হেফিস্টাসকে নির্দেশ দেন প্রমিথিউসকে এক পাহাড়ের চূড়ায় শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে। প্রত্যেক দিন

www.icsbook.info

জিউস একটা ঈগল পাঠিয়ে দেন প্রমিথিউসের পেট ঠুকরে খাবার জন্য। প্রমিথিউস প্রত্যহ এ নির্যাতন সহ্য করেন, কিন্তু নতি স্বীকার করেন না। গ্রীকরা প্রমিথিউসকে পূজো করত ন্যায়বান বীর হিসেবে।

শিক্ষা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান

হোমারীয় যুগের অবসানে নগররাষ্ট্রের বিকাশের সাথে সাথে গ্রীসে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানের ও অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়, লোকের জীবনযাত্রার ধরনে পরিবর্তন আসে, শিক্ষা সংস্কৃতিরও প্রসার ঘটে। গ্রীসের স্বাধীন মানুষদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষিত ছিল। অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলেরা ৭ থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলে লেখাপড়া শিখত। স্কুলে লিখতে॥ পড়তে এবং হিসাব করতে শেখান হত এবং মনের ভাব স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে প্রকাশের কৌশলও শেখান হত। গ্রীসে বাগ্মিতার কদর ছিল। গ্রীকরা হোমার এবং অন্যান্য কবির কবিতা ভাল করে শিখত। গ্রীসের অনেক মানুষই হোমারের ইলিয়াড এবং ওডিসি মহাকাব্য থেকে হাজার হাজার লাইন মুখস্থ বলতে পারত। স্কুলে ছবি আঁকা, নাচ এবং সঙ্গীত বাধ্যতামূলকভাবে শেখান হত। ছেলেমেয়েরা বাঁশি এবং বীণা বাজাতে শিখত। গ্রীসের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়সমূহ ছিল এথেন্সে। গ্রীসে স্কুল-শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ছেলেদের সক্রিয়, শক্তিশালী ও সাহসীরূপে গড়ে তোলা। ছাত্ররা দৌড়, ঝাঁপ, কুস্তি ইত্যাদি শিখত। কারিগর ও কৃষকের ছেলেরা সচরাচর স্কুলের পুরো শিক্ষা পেত না, দরিদ্র পিতার কাজে সাহায্য করার জন্যে তারা আগেই স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হত। গ্রীসে মেয়েদের জন্যে কোন স্কুল ছিল না। মায়ের কাছে তারা গৃহকর্ম, সেলাই, সূচীকর্ম ইত্যাদি শিখত।

প্রাচীন গ্রীসে মেয়েরা সংসারের কাজ করত, বাইরে বিশেষ বের হত না। আর পুরুষরা সারাদিনই প্রায় বাইরে কাটাত। সকালে উঠেই পুরুষেরা এ্যাগোরা বা সার্বজনীন চত্বরে জড়ো হত। সকালে এখানে বাজার বসত, বিকেলে সকলে একসাথে বসে কথাবার্তা বলত, তর্ক করত, খবর আদান-প্রদান করত। এ্যাগোরার একপাশে পাথরের ফলকে নগরের আইনসমূহ লেখা থাকত। এ্যাগোরা ছাড়াও গ্রীসের নগরগুলোতে সর্বসাধারণের জন্যে থিয়েটার, স্টেডিয়াম প্রভৃতি ছিল। স্টেডিয়ামে ব্যায়াম, খেলাধুলার প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হত। কনসার্ট হলে বিখ্যাত বাদক ও গায়করা সঙ্গীত পরিবেশন করতেন।

অলিম্পিক ক্রীড়া ছিল প্রাচীর গ্রীসের একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। পেলোপনেসাস-এর অন্তর্গত অলিম্পিয়া নগরে প্রতি চার বছর অন্তর অলিম্পিক খেলা অনুষ্ঠিত হত। এখানে সারা গ্রীসের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদরা একত্রিত হয়ে দৌড়, ঝাঁপ, মল্লযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, রথচালনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতেন। অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হলে যে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হত তা খুব ব্যয়সাপেক্ষ ছিল বলে কার্যত কেবল ধনী ব্যক্তিরাই এতে অংশ নিতে পারতেন। অলিম্পিক ক্রীড়া দেখার জন্যে গ্রীক উপনিবেশ থেকে হাজার হাজার দর্শক অলিম্পিয়া নগরীতে এসে জড়ো হত। অলিম্পিক ক্রীড়ার জন্যে যুদ্ধ স্থগিত রাখার রেওয়াজ ছিল। অলিম্পিক খেলোয়াড়রা দেশে ফিরে গেলে স্বদেশের সব নাগরিকরা তাঁদের সংবর্ধনা জানাতেন। অলিম্পিক ক্রীড়া বিভিন্ন গ্রীক নগরসমূহের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি করেছিল।

www.icsbook.info

খেলাধুলা ছাড়া থিয়েটারও গ্রীকদের খুব প্রিয় ছিল গ্রীক থিয়েটারের উদ্ভব হয়েছিল ডায়োনিসিয়াসের সম্মানে অনুষ্ঠিত বার্ষিক আনন্দ উৎসব থেকে। উৎসব-প্রাঙ্গণে স্যাটার বা ছাগ-মানুষের পোশাক পরা একদল গায়ক নেচে গেয়ে ডায়োনিসিয়াসের জীবনের নানা কাহিনীর রূপদান করত। দর্শকরা চারপাশে দাঁড়িয়ে দেখত আর শুনত। ক্রমশ স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটারের সৃষ্টি হয়। এ সকল থিয়েটার উন্মুক্ত স্থানে নির্মিত হত। গায়ক-অভিনেতারা মাঝখানে অভিনয় করতেন, চারপাশে গ্যালারির মত ধাপে ধাপে দর্শকদের বসার আসন নির্মিত হত। যতদূর জানা যায়, এথেন্সের এক্রোপলিসে প্রথম থিয়েটার নির্মিত হয়েছিল। এতে ১৭ হাজার দর্শকের স্থান সংকুলান হত। অন্যান্য নগরে ৪০-৫০ হাজার আসনবিশিষ্ট থিয়েটারও ছিল। ডায়োনিসিয়াসের মৃত্যুকাহিনীকে নিয়ে গ্রীক থিয়েটারে যেসব বিয়োগান্ত কাহিনীর অভিনয় হত তাকে বলা হত ট্র্যাজেডি। এ শব্দটার মূল অর্থ হচ্ছে ছাগসঙ্গীত অর্থাৎ ছাগ-মানুষদের গান। পরবর্তীকালে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে এস্কাইলাস, সোফোক্লিস প্রমুখ নাট্যকার যেসব বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেন সেগুলোও ট্র্যাজেডি নামে পরিচিত হয়।

গ্রীক দর্শনের পরিচয়

গ্রীক দর্শনের উৎপত্তি ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে, মাইলেসীয় দার্শনিকদের প্রচেষ্টার ফল হিসেবে। এই দার্শনিকরা ছিলেন মাইলেটাস্-এর অধিবাসী। মাইলেটাস্ ছিল এশিয়া-মাইনরের উপকূলে অবস্থিত এবং আয়োনিয়ার অন্তর্গত একটি নগররাষ্ট্র। এ দর্শনকে তাই মাইলেশীয় বা আয়োনীয় দর্শন নামে অভিহিত করা হয়। আয়োনীয় দর্শন ছিল বৈজ্ঞানিক ও বস্তুবাদী দর্শন। আয়োনীয় বিজ্ঞানও ছিল আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আদি জননী। আয়োনিয়াতে অতি প্রাচীনকালে বৈজ্ঞানিক চিন্তার উদয়ের বিশেষ কারণ আছে। মাইলেটাস ভৌগোলিকভাবে মিশর ও ব্যাবিলন এ দুই প্রাচীন সভ্যতার নিকটবর্তী হবার ফলে প্রাচীন কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করা আয়োনীয় পণ্ডিতদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। অপরপক্ষে আয়োনিয়াতেই তিনশো বছর আগে হোমার যে সংস্কারহীন মানবতাবাদী মুক্ত চিন্তাধারার সৃষ্টি করেছিলেন সেটাই আয়োনীয় বিজ্ঞানের মানসভূমি সৃষ্টি করেছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে মাইলেটাস ছিল আয়োনিয়ার সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ নগরী। ঐ সময়ে মাইলেটাস ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পোৎপাদন ও উপনিবেশ বিস্তারে সবচেয়ে অগ্রণী। আয়োনিয়ার সমৃদ্ধির যুগে ব্যবসায়ী-কারিগর-বণিকরাই ছিল রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। তাই এ যুগে শ্রমের মর্যাদা ছিল, ব্যবহারিক কাজ ও আবিষ্কারের কদর ছিল। এ রকম অনুকূল সামাজিক পরিবেশে স্বভাবতই বৈজ্ঞানিক ও বস্তুবাদী বিজ্ঞান ও দর্শনের উদয় হয়েছিল। যেমন, দার্শনিক ও গণিতবিদ থালেস জলপথে জাহাজ চলাচল বিঘ্নশূন্য করার জন্যে জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতের চর্চায় রত হন। এ্যানাক্সিম্যাণ্ডার নামে অপর এক দার্শনিক নাবিকদের সুবিধার জন্যে পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেন।

আয়োনীয় দার্শনিকদের মূল অনুসন্ধানের বিষয় ছিল প্রাকৃতিক জগতের চরিত্র নিরূপণ। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, জগতের সবকিছুর মূলে আছে একটি আদি বস্তুঃ বিশ্বজগৎ, গ্রহনক্ষত্র, পশু-প্রাণী, মানুষ সবকিছু একটিমাত্র বস্তু থেকে গঠিত হয়েছে। আয়োনীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা থালেস বললেন, সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে পানি থেকে, সম্ভবত এ কারণে যে তিনি দেখেছিলেন, সব কিছুই সমুদ্রের পানিতে বিলীন হয় এবং

www.icsbook.info

পানি-মিশ্রিত কাদা ঘন হয়ে মাটিতে পরিণত হয়, ইত্যাদি। অপর এক আয়োনীয় দার্শনিক এ্যানাক্সিমেনিস বললেন, বাতাস দিয়েই সব কিছু তৈরি হয়েছে। আয়োনীয় দার্শনিকদের এ সকল সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হলেও গুরুত্বহীন নয়। এই প্রথম মানুষ জগৎসৃষ্টির কল্পকাহিনী বাদ দিয়ে বাস্তব পরিবেশের ভিত্তিতে বস্তুভিত্তিক চিন্তার সাহায্যে জগৎকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা নিল। থালেসকে তাই প্রথম বিজ্ঞানীরূপে গণ্য করা হয়।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী শেষ হবার আগেই গ্রীক দর্শনে অধিবিদ্যক প্রবণতা দেখা দেয়। অর্থাৎ গ্রীক দর্শন এখন প্রাকৃতিক জগতের পরিচয় গ্রহণ বাদ রেখে সত্তার প্রকৃতি, সত্যের অর্থ ইত্যাদি সমস্যার সমাধানে নিমগ্ন হয়। নতুন দর্শনের স্থাপয়িতা হলেন পিথাগোরাস ও তাঁর অনুসারীগণ। আয়োনিয়া অঞ্চল যখন পারসিক রাজশক্তি দখল করে নেয় তখন পিথাগোরাস ও অন্যান্য গ্রীক দার্শনিকরা ইটালি ও সিসিলিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আয়োনীয় দর্শনেরও এখানেই সমাপ্তি ঘটে। অবশ্য আয়োনীয় দর্শনের রেশ আরো কিছুকাল টিকে ছিল। লিউসিপাস এবং ডিমোক্রিটাস নামে দুই দার্শনিক পরমাণু তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। তাঁরা বলেন যে, সমগ্র জগৎ শেষ বিচারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু নিয়ে গঠিত; এ পরমাণুসমূহ অক্ষয় ও অবিভাজ্য। অপর এক দার্শনিক হিরাক্লিটাস বলেন, জগতে চিরস্থায়ী বলে কিছু নেই, পরিবর্তনই একমাত্র চিরন্তন সত্য। সমস্ত জগৎ অবিরাম পরিবর্তিত হচ্ছে। ডেমোক্রিটাস আত্মার অমরতা অস্বীকার করেন।

সফিস্টদের তত্ত্ব

খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি গ্রীসে মানসচর্চার ক্ষেত্রে এক বিপ্লব উপস্থিত হয়। সাধারণ মানুষের অভ্যুদয় এবং ব্যক্তিসত্তার বিকাশের ফলে বাস্তব মানবিক সমস্যার সমাধানের প্রশ্নটা জরুরি হয়ে দেখা দেয়। মানবচর্চার এ নতুন ধারার প্রথম প্রবক্তাদের বলা হয় 'সফিস্ট'। সফিস্ট কথাটার অর্থ জ্ঞানী। প্লেটোর কঠোর সমালোচনার দরুন সফিস্টদের সম্পর্কে সাধারণভাবে খারাপ ধারণা প্রচলিত আছে এবং একথাও ঠিক যে, অনেক সফিস্টই বাগাড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। তবে অনেক সফিস্ট আবার অতি উচ্চ চিন্তাশীল ছিলেন। যেমন প্রোটাগোরাস, গর্গিয়াস প্রভৃতি। সফিস্টরা সংশয়বাদী চিন্তাধারারও প্রচার করেন।

'সফিস্ট' নামটি গ্রীকদেরই দেয়া। খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচের শতকের মাঝামাঝি সময়ে গ্রীসে এক নতুন শ্রেণীর জ্ঞানী ব্যক্তির উদয় ঘটে, যাঁরা একদিকে দার্শনিক এবং অপরদিকে শিল্পী ও কারিগর শ্রেণী থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন। আসলে এঁরা ছিলেন উচ্চমানের শিক্ষক। এঁরা বলতেন যে, তাঁরা ছাত্রদের বিশেষ কোনো একটি বিদ্যা বা বৃত্তি শেখান না, বরং তাদেরকে সভ্য নাগরিক জীবন-যাপনের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করেন। গ্রীকরা এঁদেরকেই সফিস্ট (Sophist) নামে অভিহিত করে। সফিস্ট কথাটার শব্দগত অর্থ হল 'জ্ঞানী ব্যক্তি'। সফিস্টরা প্রাচীন গ্রীসে প্রায় একশো বছর ধরে সাধারণ শিক্ষা বা উদারনৈতিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার বজায় রেখেছিলেন।

সফিস্টরা ছিলো পেশাদার শিক্ষক শ্রেণী। তবে এরা সকলেই সফিস্ট— এই একটি নামে পরিচিত হলেও, এ পেশার অন্তর্ভুক্ত পণ্ডিতরা বাস্তবে এবং তত্ত্বগতভাবে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। সফিস্টদের চারটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। যথা,

www.icsbook.info

সংস্কৃতি বিষয়ক সফিস্ট, বাগ্মিতা বা বক্তৃতাদান বিদ্যা (rhetoric) বিষয়ক সফিস্ট, রাজনীতি বিষয়ক সফিস্ট এবং তর্কবিতর্ক ('eristic' বা Disputation) বিষয়ক সফিস্ট। সফিস্টবিদ্যার এ চারটি বিভাগের এক একটি এক এক সময়ে প্রাচীন গ্রীসে পর্যায়ক্রমে গুরুত্ব অর্জন করেছিল, তবে প্রতিটি ধারাই কমবেশি প্রচলিত ছিল। যেমন, সংস্কৃতি বিষয়ক সফিস্টবিদ্যা খ্রিস্টপূর্ব ৪৪৭ অব্দে প্রবর্তিত হয়ে কালক্রমে বিতর্ক বিষয়ক সফিস্টবিদ্যায় পরিণতি লাভ করে। বক্তৃতা দান বিষয় সফিস্ট বিদ্যা মধ্য গ্রীসে খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭ অব্দে প্রবর্তিত হয় এবং কালক্রমে তা রাজনীতিবিষয়ক সফিস্ট বিদ্যার সাথে মিশে যায়।

আবার, সফিস্টদের মতো সক্রেটিস (খ্রিঃ পূঃ ৪৬৯-৩৯৯) এবং তাঁর শিষ্যরাও ছিলেন শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষক। তাই তাঁদেরও কখনও কখনও সফিস্ট হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে সফিস্টদের শিক্ষাদানের লক্ষ্য ছিল— তাঁদের ছাত্ররা যেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে, আদালতে, মামলা-মোকদ্দমায়, গণপরিষদে, জাতীয় সংসদে বা তর্কবিতর্কে সাফল্য লাভ করতে পারেন, সেভাবে তাঁদের গড়ে তোলা। অপর পক্ষে, সক্রেটিস ও তাঁর শিষ্যদের অভিমত ছিল ব্যবহারিক জীবনে সাফল্য অর্জনই জ্ঞানলাভের মূল লক্ষ্য নয়, জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যের অনুসন্ধান। এক্ষেত্রে সফিস্টদের সাথে সক্রেটিসের সম্প্রদায়ের পার্থক্য রয়েছে। এ কারণে ঐতিহাসিকরা সক্রেটিস ও তাঁর শিষ্যদের সফিস্টরূপে গণ্য না করে দার্শনিকরূপে গণ্য করেন। এর কারণ হচ্ছে সফিস্টরা নিজেরাই বলত যে, জ্ঞানলাভ সম্পর্কে তারা আশাবাদী নয়; অপরপক্ষে দার্শনিকরা সত্যজ্ঞান লাভে সমর্থ না হলেও সত্যের অনুসন্ধানে নিমগ্ন থাকতেন। কালক্রমে যখন সক্রেটিসের শিষ্য দার্শনিক প্লেটো (খ্রিঃপূঃ ৪২৭-৩৪৭) একাডেমি নামক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন এবং প্লেটোর শিষ্য দার্শনিক এ্যারিস্টটল (খৃ.ঃপূঃ ৩৮৪-৩২২) লাইসিয়াম নামক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন তখন ক্রমশ গ্রীসে সফিস্টদের পরিবর্তে দার্শনিকরা শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষাদাতারূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলেন।

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন গ্রীসে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পূর্ণতা সাধনের প্রয়োজনেই সফিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল। প্রথম যুগে গ্রীসের নাগারিকদের শুধুমাত্র লিখতে ও পড়তে শেখানো হত এবং শরীরচর্চা ও সঙ্গীতবিদ্যায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হত। এ অসম্পূর্ণ বিদ্যাশিক্ষার পরিপূরক হিসেবে গ্রীক নাগরিকদের সাধারণ শিক্ষা বা উদারনৈতিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্য নিয়েই সফিস্ট শ্রেণীর শিক্ষকরা উদিত হয়েছিলেন। কিন্তু, প্রথম যুগের সফিস্টরা তাঁদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি হিসেবে ব্যাকরণ, রচনাশৈলী, সাহিত্য এবং বাগ্মিতাকে (বক্তৃতাদানবিদ্যা) গ্রহণ করেছিলেন; আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের সফিস্টরা ছিলেন বক্তৃতাদানবিদ্যায় পারদর্শী। সফিস্টবিদ্যা (Sophistry) তাই সমকালীন গ্রীক সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আবার, আয়োনীয় যুগের দর্শনের বিরুদ্ধে যে সংশয়বাদী চিন্তাধারার উদয় গ্রীক চিন্তাজগতে ঘটেছিল, ঐ পটভূমিতেই সফিস্টদের উৎপত্তি ঘটেছিল। এথেনীয় যুগে সক্রেটিস-প্লেটো-এ্যারিস্টটলকে অবলম্বন করে নতুন আকারে গ্রীক দর্শনের পুনরুত্থান ঘটেছিল। এ কারণে সফিস্টবিদ্যাকে গ্রীক দর্শনের ইতিহাসে একটা স্বল্পকাল স্থায়ী অন্তর্বর্তীকালীন চিন্তাপদ্ধতিরূপে গণ্য করা চলে। শেষত বলা প্রয়োজন যে, সফিস্টদের শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় ক্রমশ বাগ্মিতা এবং তার্কিকতা প্রধান স্থান অধিকার করার ফলে মানুষের চিন্তা ও আচরণের ওপর এর

www.icsbook.info

একটা অসাধু প্রভাব পড়তে শুরু করে। তখন অনেকেই এ অভিযোগ উত্থাপন করেন যে সফিস্টদের আলোচনা বা তর্কের লক্ষ্য সত্যকে জানা নয়, বরং যে কোনো যুক্তি প্রদর্শন করে জয়লাভ করাই তাদের উদ্দেশ্য। দার্শনিক প্লেটো বিশেষ জোর দিয়ে সফিস্টদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। ক্রমশ এমন ধারণারও সৃষ্টি হয় যে সফিস্টরা অনৈতিক ও সমাজবিরোধী তত্ত্ব প্রচারে লিপ্ত রয়েছেন।

সফিস্ট তত্ত্বের উৎপত্তি ও বিকাশ

প্রাচীন গ্রীসের দর্শনের ইতিহাসে এক সংকটের উদয় ঘটার ফলেই সফিস্ট তত্ত্বের উৎপত্তি ঘটেছিল। প্রথম যুগের অর্থাৎ আয়োনীয় যুগের প্রকৃতি বিজ্ঞানী, যথা, থালেস, এ্যানাক্সিম্যাণ্ডার এ্যানাক্সিমেনিস্ প্রভৃতি দার্শনিকদের ধারণা ছিল, কোন একটিমাত্র মূল পদার্থ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন বিচিত্র পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। এবং ঐ আদি বা মূল পদার্থের সন্ধানেই তাঁরা নিমগ্ন ছিলেন। এ পর্যায়ের দার্শনিকরা সত্যজ্ঞান লাভের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কখনও সন্দিহান ছিলেন না। থালেস বলেছিলেন, পৃথিবীর সবকিছু পানি থেকে তৈরি হয়েছে। অপর এক দার্শনিক হেরাক্লিটাস (Heraclitus) বললেন যে, বিশ্বের মূল উপাদান হচ্ছে আগুন। এ পর্যন্ত কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু হেরাক্লিটাস যখন বললেন যে, সব জিনিসই অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছে তখন তিনি নিজেই নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, কোনো জিনিস সম্পর্কে পুরোপুরি বা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব না। এক অর্থে হেরাক্লিটাস ছিলেন গোঁড়াপন্থী, কারণ তিনি নিঃশর্তভাবে এবং নিঃসন্দিগ্ধভাবে নিজের তত্ত্বের ওপর আস্থাবান ছিলেন। কিন্তু আর সব বিচারে তিনি ছিলেন সন্দেহবাদী। আবার দার্শনিক ইলিয়া-নিবাসী পারমেনাইডিস (Parmenides) বললেন যে, একটি মূল পদার্থই প্রকৃত অস্তিত্বশীল এবং এটাকে জানাই জ্ঞানের লক্ষ্য; অপরপক্ষে, তাঁর মতে, বিশ্বের সকল বস্তুর বহুমুখী রূপ ক্রমশ গড়ে ওঠে এবং সেটা মানুষের অভিমতের ওপর নির্ভরশীল। এরপর দার্শনিক জেনো (zeno) এ তত্ত্বের সপক্ষে একটি যুক্তিও প্রদান করেন। কিন্তু এ সকল তত্ত্ব ছিল স্ববিরোধিতায় পূর্ণ এবং এ দার্শনিকরা ছিলেন সন্দেহবাদী। এরপর দ্বিতীয় এক ধারার প্রকৃতিবিজ্ঞানীর উদয় ঘটে। যথা, এমপেডোক্লিস, এনাক্সাগোরাস, লিউসিপ্পাস। এঁরা রহস্যময় এক ও বহুর তত্ত্বকে সরাসরি আক্রমণ করেননি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রবণতা দ্বারা পরিচালিত হয়ে বহির্জগৎ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন যে, আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ এঁরাও কার্যত সন্দেহবাদেরই প্রচার করেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, উপরোক্ত তিন পর্যায়ের দার্শনিকরা ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের প্রবর্তন করলেও, প্রতিটি তত্ত্বই ছিল সন্দেহবাদী তত্ত্ব, যদিও তাঁরা নিজেরা একথা বুঝতে পারেননি।

খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচের শতকের মধ্যভাগে আবডেরা-বাসী প্রোটাগোরাস প্রথম ও দ্বিতীয় ধারার প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের মত বিশ্লেষণ করে এক সন্দেহবাদী দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান। অপরপক্ষে লিওনটিনিবাসী দার্শনিক গর্গিয়াস (Gorgias) ইলিয়াপন্থী তথা পারমেনাইডিসপন্থীদের অধিবিদ্যামূলক (metaphysical) দর্শন অধ্যয়ন করে একই সন্দেহবাদী সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। এ সন্দেহবাদী সিদ্ধান্ত থেকে এতকাল গ্রীক দার্শনিকরা দূরে ছিলেন, কিন্তু আর তা এড়ানো গেল না। 'সত্য' (truth) নামক একটা বইয়ে প্রোটাগোরাস নিম্নোক্ত যুক্তি প্রদান করলেন ঃ 'যদি সব কিছুই অনবরত পরিবর্তনশীল

www.icsbook.info

হয়, তার অর্থ হবে, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যে জ্ঞানলাভ করি তা মানসিক চিন্তামাত্র (subjective); এবং সে ক্ষেত্রে বলতে হয়, মানুষই সব কিছুর পরিমাপ স্থির করে—যেটা অস্তিত্বশীল সেটার যে অস্তিত্ব আছে এবং যেটা অস্তিত্বহীন সেটার যে, অস্তিত্ব নেই, সে কথা মানুষই স্থির করে।' এ কথা দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে বস্তুনিষ্ঠ (objective) সত্য বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। অনুরূপভাবে, গর্গিয়াস 'প্রকৃতি সম্পর্কে' (On Nature) নামক রচনায় বলেন যে (১) কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই (nothing is); (২) যদি কোনো কিছু অস্তিত্বশীল হয় তা' হলেও সেটা জানা সম্ভব না (if anything is, it cannot be known); (৩) যদি কোনো কিছু অস্তিত্ববান হয় এবং তাকে জানা সম্ভব হয়, তাহলে তাকে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না (if anything is and can be known, i. cannot be expressed in speech)। গর্গিয়াসের রচনার যেসব সারাংশ পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় যে তিনি উপরোক্ত তত্ত্বের সমর্থনে জেনোর যুক্তিসমূহকে ব্যবহার করেছিলেন। পৃথিবীতে 'বহু' তথা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণাকে খণ্ডন করার জন্যে জেনো যে-যুক্তি ব্যবহার করেছিলেন, গর্গিয়াস ঐ যুক্তিকেই নিজের তত্ত্ব প্রমাণ করার কাজে ব্যবহার করেন। এর অর্থ হল, গর্গিয়াস জেনোর ধ্বংসাত্মক যুক্তিপ্রণালীকে পারমেনাইডিসের গণনামূলক দর্শনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন। এর দ্বারা গর্গিয়াস শুধু যে ইলিয়াপন্থীদের (তথা পারমেনাইডিসের) তত্ত্বকে অর্থহীন বলে প্রতিপন্ন করলেন তাই নয়, বরং জেনোর যুক্তির চেয়ে ভাল যুক্তিপ্রণালী আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত দার্শনিক অনুসন্ধান যে নিতান্তই অর্থহীন, কার্যত সে কথাও ঘোষণা করলেন। এর ফল হল এই যে, পূর্বে উল্লিখিত তিন পর্যায়ের দার্শনিকরা যে ক্ষেত্রে নিজেদেরকে দার্শনিক অর্থাৎ সত্যের সন্ধানকারী বলে গণ্য করতেন, প্রোটাগোরাস এবং গর্গিয়াস সে ক্ষেত্রে স্পষ্টতই পরাজয় স্বীকার করে দর্শনের মঞ্চ থেকে সরে দাঁড়ালেন।

যদিও আয়োনীয় যুগের প্রাথমিক কালের দার্শনিকরা জ্ঞানের রাজ্যে যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রসর হতে পারেননি, তথাপি প্রোটেগোরাসের কার্যকলাপের ফলে এমন একটা সময়ে গ্রীকজগৎ থেকে দর্শনচর্চার অবলুপ্তি ঘটল, যখন উদারনৈতিক বিষয়সমূহের অনুশীলন বিশেষজ্ঞদের বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এবং অবসর বিনোদনের পন্থা হিসাবে শিল্প-সাহিত্য-দর্শনচর্চা সাধারণ গ্রীক নাগরিকদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার উপক্রম হয়েছে। এ রকম সংকটকালে দর্শনের অবলুপ্তির ফলে গ্রীকদের মানসজীবনে একটা শূন্যতাসৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিল। এ পরিস্থিতিতে প্রোটাগোরাস একদিকে যেমন দর্শনকে দূরে ঠেলে দিলেন, অপরদিকে তেমনি দর্শনের একটি বিকল্পকে উপস্থিত করলেন। দার্শনিকদের আধিপত্যের কালে শিক্ষকদের গুরুত্ব কমে গিয়েছিল; প্রোটাগোরাস শিক্ষকদের গুরুত্বকে তুলে ধরলেন এবং বললেন মননচর্চা এবং জ্ঞানচর্চার সঠিক লক্ষ্য 'সত্য' বা 'প্রজ্ঞালাভ' নয়, কারণ সেটা অর্জন করা আদৌ সম্ভব নয়; বরং জ্ঞানচর্চার লক্ষ্য হল সদগুণ বা দক্ষতা অর্জন। তিনি প্রাচীন দার্শনিকদের মতো বিশ্ব সম্পর্কে তত্ত্ব উপস্থিত করলেন না, বরং সামাজিক জীবনযাপন সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তার কথাই প্রচার করলেন। প্লেটোর উদ্ধৃতি থেকে আমরা জানতে পারি যে প্রোটাগোরাস বলেছেন: 'যে শিক্ষা আমি আপনাদের দিতে চাই তা' হল সাংসারিক ও রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা ও সৎ পরামর্শ প্রদান, যেন সব মানুষ তাদের সাংসারিক

www.icsbook.info

জীবনে ও রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পাদনে যথোপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এক কথায় আমি মানুষকে যোগ্য নাগরিকে (good citizen) পরিণত করতে চাই।' শিক্ষাদানের পদ্ধতি হিসেবে তিনি ব্যাকরণ, রচনাশৈলী, কবিতা ও বাগ্মিতাকে বেছে নিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে গ্রীক তরুণরা প্রচলিত প্রাথমিক ধরনের বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষালাভের পর কর্মজীবনে প্রবেশ করত, কেউ দর্শনচর্চায় মনোনিবেশ করত, কেউ ভাস্কর্য বা অন্যান্য শিল্পচর্চায় আত্মনিয়োগ করতে বা ভিন্নতর কোনো পেশা গ্রহণ করত। এখন থেকে উচ্চাভিলাষী তরুণরা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর প্রোটাগোরাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর নিকট থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে শুরু করলেন। এ নতুন শিক্ষার পাঠক্রম পুরোপুরি সাহিত্যবিষয়কই ছিল, কিন্তু ঐ সময়ে প্রোটাগোরাস গ্রীকজগতে এমন এক চাহিদা পূরণ করলেন যা তিনি অংশত আবিষ্কার করেছিলেন এবং যার অভাববোধ তিনি অংশত তরুণদের মনে জাগ্রত করেছিলেন। তিনি গ্রীক জগতের যেখানেই যেতেন সেখানেই আগ্রহী শ্রোতারা তাঁর বক্তৃতাকক্ষে জড়ো হত এবং তাঁর অর্থ ও খ্যাতি দুয়েরই বৃদ্ধি ঘটত।

প্রোটাগোরাসের পরে যিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক সফিস্ট হিসেবে সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁর নাম হল প্রডিকাস। তিনি নিজেকে এথেন্স নগরে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁর ছাত্রদের সদগুণ ও দক্ষতা শিক্ষা দেন। তিনি প্রাধানত সাহিত্যসংক্রান্ত বিষয়াদি এবং বাস্তবমুখী নীতিশাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা দ্বারা শিক্ষাদান করতেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে প্রডিকাস পাণ্ডিত্যের ভান করলেও, তাঁর সফল ও সর্বজনগ্রাহ্য নীতিজ্ঞান তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। সফিস্টদের জনপ্রিয়তা বর্ণনা প্রসঙ্গে প্লেটো প্রডিকাস এবং প্রোটাগোরাসের নাম একসাথে উচ্চারণ করেছেন।

খ্রিস্টপূর্ব পাঁচের শতকের মাঝামাঝি সময়ে এথেন্সই গ্রীকজগতের সাংস্কৃতিক ও মননশীল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এখানে ক্রমশ প্রচুরসংখ্যক সফিস্ট-এর সমাবেশ ঘটে। এঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন স্থানীয় নাগরিক, আবার অনেকে ছিলেন অন্য অঞ্চল থেকে আগত। এঁদের মধ্যে কিছু- সংখ্যক সফিস্ট সরাসরি প্রোটাগোরাস বা প্রডিকাস-এর নিকট শিক্ষালাভ করেছিলেন, অনেকে আবার নিজের চেষ্টায় সফিস্টবিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। পরবর্তী যুগের সফিস্টরা ক্রমশ তাঁদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পরিধি বাড়াতে থাকেন এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিষয়েও শিক্ষা দিতে শুরু করেন। কিন্তু এঁরা বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যাকেও জনবোধ্য পদ্ধতিতে শেখাতেন। এ পর্যায়ের সফিস্টরা তাই বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হয়েও বিশেষজ্ঞের জগতে পদার্পণ করতে শুরু করেন। যেমন, এলিসনিবাসী সফিস্ট হিপ্পিয়াস শুধুমাত্র পূর্বোক্ত চারটি বিষয়ে (ব্যাকরণ, রচনাশৈলী, কবিতা, বাগ্মিতা) তাঁর শিক্ষাদানকে সীমিত না রেখে পৌরাণিক কাহিনী, পারিবারিক ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, (archaeology), হোমারবিদ্যা, তরুণদের শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও বক্তৃতা দান করতেন। এতে বোঝা যায় যে, এ সময়ে সংস্কৃতি বিষয়ক সফিস্টবিদ্যার অবনতি ঘটেছিল। পরবর্তীকালের সফিস্টরা হিপ্পিয়াসের মতো জ্ঞানের সকল বিষয়ে শিক্ষা দান করতেন না। তাঁরা কেবল সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিতর্কবিদ্যা বিষয়ে শিক্ষা দান করতেন। এভাবে সফিস্টবিদ্যা প্রোটাগোরাস এবং প্রডিকাস-এর সংস্কৃতিবিষয়ক সফিস্টবিদ্যা থেকে

www.icsbook.info

যাত্রা শুরু করে, হিপ্পিয়াস-এর সর্ববিদ্যা বিষয় শিক্ষাদানের পর্যায় পার হয়ে, পরবর্তীকালের বিতর্কবিদ্যামূলক সফিস্ট বিদ্যায় শেষ পরিণতি লাভ করে।

ইতিমধ্যে লিওনটিনি-নিবাসী গার্গিয়াস পশ্চিম গ্রীসের দর্শনকে প্রথমে অধ্যয়ন করেন এবং পরে বাতিল করেন। পরে তিনি বক্তৃতাবিদ্যা এবং আদালতের বক্তৃতাবিদ্যাকে সফিস্টবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করে সাফিস্টবিদ্যায় এক নতুন দিক সংযোজন করেন। অবশ্য, তাঁর চল্লিশ বছর আগেই সিসিলির কোরাক্স এবং টিসিয়াস এ বিষয়ে চর্চার শুরু করেছিলেন। লক্ষণীয় যে গর্গিয়াস নিজেকে কখনও সফিস্ট বলে দাবি করেননি। তিনি নিজেকে শিক্ষক বলেই গণ্য করতেন। খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭ অব্দে তিনি এথেন্সে যান এবং অবশিষ্ট জীবন সেখানেই যাপন করেন। এখানে তিনি বাগ্মিতা প্রদর্শন করে যথেষ্ট সম্মান ও অর্থলাভ করেন।

গর্গিয়াস যে বক্তৃতাবিদ্যামূলক, বিশেষত আইন-আদালতে ব্যবহারযোগ্য বক্তৃতাবিদ্যামূলক সফিস্টতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষাদান করেন, তা থেকে অচিরেই রাজনৈতিক সফিস্টতত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। অপরপক্ষে সংস্কৃতিবিষয়ক সফিস্টবিদ্যা ক্রমে বিতর্কবিষয়ক সফিস্টবিদ্যায় পরিণতি লাভ করে। আগেই বলা হয়েছে, প্রোটাগোরাস এবং প্রডিকাস যে কয়টি বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন, ক্রমে তার বিস্তৃতি ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত হিপ্পিয়াস নিজেকে সর্ব বিষয়ের এবং জ্ঞানের সকল শাখার শিক্ষক বলে দাবি করেন। দক্ষ পেশাদার শিল্পী এবং পেশাদার কারিগররা যে বিদ্যা শিক্ষা দিতেন হিপ্পিয়াসের শিক্ষাক্রমের মধ্যে সেগুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে হিপ্পিয়াস ঐ সকল বিষয় শেখাতেন জনবোধ্য এবং অপেশাদার পদ্ধতিতে। অর্থাৎ, হিপ্পিয়াস ঐ সব জটিল পেশাদার বিষয়ে জ্ঞানদানের দাবি করলেও, তার ছাত্ররা ঐ সকল বিষয়ে পেশাদারী দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হত না, কারণ তার পাঠক্রমটাই পেশাদারী দক্ষতা অর্জনের উপযুক্ত ছিল না। সর্ববিদ্যাবিশারদ হিপ্পিয়াসের পরবর্তীকারের সফিস্টরা অবশ্য সর্ববিষয়ে জ্ঞানদানের দাবি করতেন না, তাঁরা এমন এক সর্বব্যাপী শিক্ষাদানের দাবি করতেন, যার দ্বারা, তাঁদের মতে, সর্ববিষয়ে সামগ্রিক একটা দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয়। এ সামগ্রিক দক্ষতা অর্জনের দরুন এ নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত সফিস্টদের পক্ষে যে কোনো বিষয়েই বিশেষ জ্ঞানলাভ অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। সহজ কথায়, নতুন যুগের সফিস্টরা বিতর্কবিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করে। অবশ্য, বিতর্কবিদ্যায় উৎকর্ষলাভ একটি বিশিষ্ট গুণার্জন। বিশেষত, পরবর্তীকালের প্রখ্যাত দার্শনিক এ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা এ সকল বিতর্কবিদ সফিস্ট ও তাঁদের ছাত্রদের নিয়মানুগ বিতর্কের ভিত্তির ওপরেই গড়ে উঠেছিল। তাই খ্রিস্টপূর্ব চারের শতকের বিতর্কমূলক সফিস্টবিদ্যা আমাদের নিকট থেকে আরো বেশি মনোযোগ ও শ্রদ্ধা দাবি করতে পারে, যদিও গ্রীক দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে এ সফিস্টরা এখন পর্যন্ত বিশেষ কোনো সম্মানজনক স্থান অধিকার করতে সক্ষম হননি।

অবশ্য এ বিতর্কমূলক সফিস্টবিদ্যার ত্রুটির দিকও ছিল। বিতর্কবিদ্যার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করলেও আলোচ্য বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয়ের প্রশ্নটি অবান্তর হয়ে দাঁড়ায় এবং বিতর্কে জয়লাভই একমাত্র কাম্য বিষয়ে পরিণত হয়। বস্তুত, বিতর্কবিদ সফিস্টরা বিতর্কে জয়লাভের জন্যে সঠিক যুক্তির পরিবর্তে স্ববিরোধী এবং কুযুক্তির আশ্রয় নিতে দ্বিধাবোধ করতেন না; তাঁরা জেনেশুনেই অযৌক্তিক কথাকে ছদ্ম যুক্তির আচ্ছাদনে আবৃত করে সুকৌশলে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখতেন। প্রকৃতপক্ষে সব

www.icsbook.info

সফিস্টদের পক্ষেই এ ধরনের ভুলের আশ্রয় গ্রহণ করার প্রবণতা ছিল, কারণ, একে তো প্রথমাবধিই সফিস্টরা সত্যের অনুসন্ধানের প্রচেষ্টাকে বাতিল করেই সফিস্টবিদ্যার চর্চা শুরু করেছিলেন; তা ছাড়াও সফল সফিস্ট শিক্ষকরা এক নগর থেকে অন্য নগরে ঘুরে বেড়াতেন বা ভিন্ন নগরে গিয়ে বাস স্থাপন করতেন বলে স্থানীয় জনজীবন সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুন স্থানীয় কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হতেন না এবং তার ফলে আলোচ্য বা বিতর্কিত বিষয়ের বাস্তবতার গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁরা সচেতন হতেন না। সফিস্টদের স্ববিরোধী এবং অবাস্তব যুক্তি ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কুযুক্তির ব্যবহার ক্রমশ জনসাধারণের নিকট অপ্রিয় হয়ে উঠল। কালক্রমে তাই চিন্তাশীল ছাত্রেরা ঐ ধরনের বিতর্কে আগ্রহী হতে শুরু করলেন, যা সত্যের অনুসন্ধানকে বিতর্কের এবং সব ধরনের মননচর্চার লক্ষ্য বলে স্বীকার করে নিত। চিন্তাশীল ছাত্ররা এভাবে সফিস্ট তত্ত্বকে ত্যাগ করে কোনো না কোনো সত্যসন্ধানী দর্শনের শরাণাপন্ন হল। এভাবে দর্শনশাস্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন ঘটল।

সফিস্টবিদ্যার সাথে শিক্ষা, সাহিত্য ও দর্শনের সম্পর্ক

প্রোটাগোরাস থেকে আইসোক্রেটিস পর্যন্ত সকল সফিস্টকে যদি তাদের অন্য সব পরিচয় বাদ দিয়ে মূলত শিক্ষকরূপে গণ্য করা হয়, তাহলে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে, সফিস্টদের ক্রিয়াকলাপ ও কর্মপ্রচেষ্টা শিক্ষাদানের তত্ত্ব ও পদ্ধতিকে উন্নত করার ক্ষেত্রে কোনো অবদান রেখেছে কি না। খ্রিস্টপূর্ব পাঁচের শতকের শুরুতে প্রতিটি অবস্থাপন্ন ও বুদ্ধিমান গ্রীক তরুণ পড়ালেখা, সঙ্গীত এবং শরীরচর্চার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করত। তদুপরি গ্রীক উপনিবেশসমূহে, বিশেষত ইটালি প্রভৃতি পশ্চিম অঞ্চলের উপনিবেশগুলোতে, দর্শন এবং শিল্পচর্চা উচ্চশিক্ষার অভাব পূরণ করত। যেমন, ইটালিতে পিথাগোরাসের সম্প্রদায়ের শিক্ষাকেন্দ্রটি প্রকৃত পক্ষে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ছিল। আর সিসিলিতে কোরাক্স এবং টিসিয়াসের যে বক্তৃতাদানবিদ্যা শিক্ষা দিতেন সেটাও শিক্ষামূলকই ছিল। কিন্তু মধ্যগ্রীসে (এবং এথেন্সে) গ্রীক-পারসিক যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত স্থানীয় এবং বৈদেশিক রাজনীতি নিয়েই নাগরিকরা সর্বদা ব্যস্ত থাকত। আত্মশিক্ষার কোনো সময়ও তাদের হাতে থাকত না, আর উচ্চশিক্ষার কোনো প্রয়োজনীয়তাও তারা অনুভব করত না। কিন্তু গ্রীক-পারসিক যুদ্ধে গ্রীকরা পারসিকদের পরাজিত করার পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। এরপর থেকে গ্রীসের সেরা শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনের আগমন ঘটল এথেন্সে এবং এ সকল বিদ্যার একত্রীকরণ ও বিকাশ ঘটার সাথে সাথে এথেন্সে এ বিষয়ে শিক্ষালাভের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আমরা আগেই দেখেছি, ঠিক এ সময়েই আবার গ্রীসে শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে দর্শন ও শিল্পচর্চার বিলোপ ঘটেছিল। ফলে সাহিত্যবিষয়ক সফিস্টরা এ সময়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। কারণ, তাঁরা এমন ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রদান করতেন, যা দর্শন বা শিল্পবিষয়ক ছিলনা। সফিস্টরা যে ঐ মুহূর্তে গ্রীসের জনগণের শিক্ষার ঐ চাহিদা আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন এবং তা পূরণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এটা তাঁদের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। প্রোটাগোরাসের আবির্ভাবের আগে গ্রীসের উপনিবেশসমূহে বা মধ্যগ্রীসে উচ্চশিক্ষা বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু প্রোটাগোরাসের পরবর্তীকালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ছাত্ররা স্বাভাবিকভাবেই সফিস্টদের বক্তৃতাকক্ষে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। এ থেকে বোঝা যাবে যে সফিস্টদের আন্দোলন সফল হয়েছিল।

www.icsbook.info

এ ছাড়াও সফিস্টদের পক্ষে আরো কিছু বলার আছে। সংস্কৃতিবিষয়ক সফিস্টরা যে, শিক্ষা প্রদান করতেন তার অনেক ইতিবাচক গুণ ছিল। প্রোটাগোরাস তাঁর পাঠক্রমের মধ্যে ব্যাকরণ, রচনাশৈলী, কবিতার ব্যাখ্যা এবং বক্তৃতাদানবিদ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং বিরামহীনভাবে ব্যাখ্যা এবং আলোচনা দ্বারা এবং ছাত্রদের সাথে তর্কবিতর্কের মাধ্যমে ঐ পাঠক্রমকে প্রসারিত করেছিলেন। তাঁর ঐ ব্যাপক পাঠক্রমকে প্রোডিকাস এবং অন্যান্যরা আরো সম্প্রসারিত করেছিলেন। অনুমান করা যেতে পারে যে, এঁদের প্রবর্তিত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীর গুণেই এথেনীয় নাগরিকরা ক্রমে বহুমুখী গুণের অধিকারী হয়েছিলেন, যে বহুমুখী কর্মক্ষমতাকে এথেনীয়দের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা হয়।

অবশ্য বক্তৃতাদানবিদ্যা, রাজনীতি এবং বিতর্কবিষয়ক সফিস্টদের সম্পর্কে এত উচ্চ প্রশংসামূলক কথা বলা চলে না। এঁরা এক একজন এক একটি সীমিত শাখায় নিবদ্ধ হবার ফলে শিক্ষক না হয়ে প্রশিক্ষকে পরিণত হন। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে বক্তৃতাদানবিদ্যা এবং বিতর্কবিদ্যা শিক্ষাদানের একটা প্রধান হাতিয়ার। অবশ্য, এ ধরনের সফিস্টরা সীমিত শাখায় নিবদ্ধ হয়ে পড়লেও, ছাত্ররা এক শাখার সফিস্টের নিকট শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার পর অন্য শাখার সফিস্টের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এতে মনে হয়, সফিস্টবিদ্যার পতনের যুগেও শিক্ষাক্ষেত্রে এর উপযোগিতা ছিল। তবে এ কথা সম্ভবত মেনে নেয়া যায় যে, এক শতাব্দীকালের মধ্যে সফিস্টরা সাহিত্যভিত্তিক শিক্ষাদানের সবগুলো পদ্ধতি আবিষ্কার ও ব্যবহার করেছিলেন।

এ সকল গুণ সত্ত্বেও সাধারণ সফিস্টবিদ্যার একটা প্রধান ত্রুটি ছিল সত্যের প্রতি উদাসীনতা। আয়োনীয় যুগের দর্শন তথা প্রকৃতি বিজ্ঞানের উপর আস্থা হারিয়ে সফিস্টরা সন্দেহবাদীতে পরিণত হন। ফলে সব ধরনের সফিস্টরাই বিষয়বস্তুর পরিবর্তে রচনাশৈলী, সঠিক বস্তুর পরিবর্তে বাস্তব ফললাভ, প্রমাণ দানের বদলে বিশ্বাস উৎপাদন ইত্যাদি পদ্ধতির প্রতি মনোনিবেশ করেন। সংক্ষেপে বললে, বিজ্ঞানের বিরোধিতা করতে গিয়ে সফিস্টরা সাহিত্যক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের বিরোধিতা করেন। সফিস্ট বিদ্যার এ ত্রুটি যে একটি গুরুতর ত্রুটি, তা যে-সকল নাগরিকরা সফিস্টদের সম্মান করতেন তাঁরাও অস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। সফিস্টদের এ ত্রুটি যে মারাত্মক রকম ক্ষতিকর, তা সক্রেটিস বুঝতে পেরেছিলেন। সফিস্টবিদ্যার প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি পর্যায়ে সত্যকে এবং সত্যানুসন্ধানকে অবজ্ঞা করা হত— এবং এটাই ছিল সক্রেটিসের আপত্তির মূল কারণ। সফিস্টদের সম্পর্কে এ সমালোচনাকে বর্তমানকালের পণ্ডিতরা সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন।

সাহিত্য এবং বাগ্মিতার (বক্তৃতাদান বিদ্যা) ক্ষেত্রে সফিস্টদের অবদান নিতান্ত অল্প নয়। পেশাগত সাফল্য অর্জনের জন্যে তাদেরকে বাধ্য হয়েই উচ্চমানের রচনাশৈলী আয়ত্ত করতে হত। এ যুগের প্রধান সফিস্টরা তাঁদের কালের উপযোগী রচনাশৈলীর প্রবর্তনও করেন। সফিস্টবিদ্যার সূত্রপাত ঘটার আগে মধ্যগ্রীসে বা এথেন্সে গদ্যরচনার রেওয়াজ বিশেষ ছিল না। সাহিত্যবিষয়ক সফিস্টরাই উত্তম গদ্যরচনা এবং উত্তম বক্তৃতাদানের গুরুত্ব শিক্ষা দেন। পণ্ডিতদের মতে, সফিস্টরা উচ্চমানের রচনাশৈলীসম্পন্ন গদ্যরচনা এবং উৎকৃষ্ট মানের বক্তৃতাদানের কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলেন বলেই প্লেটোর পক্ষে 'রিপাবলিক' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মানের গ্রন্থরচনা সম্ভব হয়েছিল এবং ডেমোস্থেনিস-এর মতো বাগ্মীর উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল।

www.icsbook.info

সফিস্ট তত্ত্বের সাথে দর্শনের সম্পর্ক বরাবরই ছির সুস্পষ্ট বিরোধিতার সম্পর্ক। প্রোটাগোরাস থেকে আইসোক্রেটিস পর্যন্ত সব সফিস্টই ছিলেন সন্দেহবাদী। প্রোটাগোরাস, গর্গিয়াস প্রভৃতি প্রথম যুগের সফিস্টরা তাঁদের পূর্ববর্তী দার্শনিকদের রচনা পাঠ করেছিলেন ঐ দর্শনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য নিয়ে। দর্শনশাস্ত্রকে উৎখাত করে সফিস্টরা যখন বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে সর্বশক্তির অধিকারী হলেন, 'জ্ঞান কি?' এ প্রশ্নটি তখন অনেক দিনের জন্যে সকলের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। আসলে 'সফিস্ট জ্ঞানতত্ত্ব' বলে কিছু নেই কারণ সফিস্টরা জ্ঞানতত্ত্বের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। অনুরূপভাবে, 'সফিস্ট নীতিশাস্ত্র' বলেও কিছু নেই। বস্তুত, সফিস্টরা নীতিশাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা করতেন না বা এ বিষয়ে আলোচনায় আগ্রহী ছিলেন না। এমন ঘটে থাকতে পারে যে বাস্তবতার চেয়ে কৃত্রিমতা এবং সত্যের চেয়ে সাফল্যের প্রতি সফিস্টদের পক্ষপাতিত্ব থাকার ফলে ঐ যুগের নৈতিকতার ওপর সফিস্টরা একটা কুপ্রভাব ফেলতে পেরেছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক যে সফিস্টদের কোনো সাধারণভাবে স্বীকৃত নীতিশাস্ত্র ছিল না এবং কোনো সফিস্ট নীতিশাস্ত্র বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতেন এমন ধারণা করার মতো কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই।

সফিস্টদের সম্পর্কে আলোচনা শেষ করার আগে, সফিস্টদের সাথে সক্রেটিসের মিল এবং পার্থক্যের বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে। সফিস্টদের মতো সক্রেটিসও ছিলেন দর্শনশাস্ত্র এবং শিল্পকলার বিরোধী এবং এ বিষয়ে প্রোটাগোরাসের সাথে তাঁর মিল ছিল। সক্রেটিস সৎগুণ ও উৎকর্ষ অর্জনকে বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুসন্ধানের বিকল্পরূপে গণ্য করেছিলেন এবং বিতর্কের মাধ্যমে সৎগুণ ও উৎকর্ষ লাভ করা যায়, একথা বিশ্বাস করতেন। এ হিসেবে সংস্কৃতিবিষয়ক ও বিতর্কবিষয়ক সফিস্টদের সাথে তাঁর মিল ছিল। সক্রেটিসের সমকালীন লোকেরা তাঁকে সফিস্ট বলে মনেও করত। কিন্তু, সফিস্টরা যেক্ষেত্রে বিতর্কে জয়লাভের উদ্দেশ্যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতো, সক্রেটিস সেক্ষেত্রে সত্য উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে বিতর্কে প্রবৃত্ত হতেন। তাই যখন গ্রীসে দর্শনচর্চার হ্রাস ঘটেছিল, তখন সক্রেটিসকে অদ্ভুত ধরনের সফিস্ট হিসাবেই গণ্য করা হত। কালক্রমে যখন আবার দর্শনচর্চার পুনরুত্থান ঘটল, তখন সক্রেটিস দার্শনিকরূপেই গণ্য হতে শুরু করলেন।

সক্রেটিস, প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের দর্শন

গ্রীসীয়-পারসিক যুদ্ধে সফল বিজয়ের মধ্যে দিয়ে এথেন্সের অভ্যুদয় ঘটে। গ্রীসীয়-পারসিক যুদ্ধ শেষ হয় ৪৭৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। কিন্তু ঐ শতাব্দী শেষ হবার আগেই এথেন্সের সমৃদ্ধির যুগ অস্তমিত হয়। পেলোপনেশীয় যুদ্ধের ফলে সমগ্র গ্রীসের অর্থনীতিই ধ্বংস হয়ে যায়। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষে ও চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে গ্রীসের নগররাষ্ট্রগুলোর মধ্যে হানাহানি ও যুদ্ধ এক রকম নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সমাজে দাসের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময়ে বেকার, কর্মহীন, জীবিকাহীন ভবঘুরে যুবকে সব গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলো ছেয়ে যায় এবং সমাজের পক্ষে এরা বিপদস্বরূপ হয়ে দেখা দেয়। অর্থনৈতিক অবক্ষয় শুরু হবার সাথে সাথে গ্রীসে দার্শনিকচিন্তার প্রকৃতিও বস্তুবাদী স্তর থেকে মানস বা ভাববাদী স্তরে পর্যবসিত হয়। এ যুগে অংশত মাইলেশীয় বস্তুবাদের বিরুদ্ধে এবং অংশত সফিস্টদের সংশয়বাদের

www.icsbook.info

বিরুদ্ধে নতুন দার্শনিক চিন্তার উদয় হয়। এ নতুন দর্শনের প্রবক্তা হলেন দর্শন চিন্তার ইতিহাসের তিনজন বিখ্যাততম ব্যক্তি— যথা, সক্রেটিস, প্লেটো এবং এ্যারিস্টটল। সক্রেটিসের জন্ম হয়েছিল এথেন্সে, ৪৬৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। ৩৯৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তরুণদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগে তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। অবশ্য, অভিজাতদের সঙ্গে এবং বিশেষত দেশদ্রোহী আলসিবিয়াডিস-এর সাথে ঘনিষ্ঠতাই সক্রেটিসের মৃত্যুর আসল কারণ। সক্রেটিস কিভাবে লেখপড়া শিখেছিলেন তা জানা যায় না, কিন্তু পূর্ববর্তী গ্রীক দার্শনিকদের প্রচারিত শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর প্রভূত জ্ঞান ছিল এবং তাঁর চারপাশে একদল অনুসারীকে আকৃষ্ট করতেও তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। সক্রেটিস সাধারণভাবে একজন নৈতিক দার্শনিক হিসেবেই পরিচিত, তবে এরূপ মনে করার কারণ আছে যে ভাবচেতন সম্পর্কে প্লেটোর তত্ত্ব মূলত সক্রেটিসের উদ্ভাবিত। সে কথা সত্য হোক আর না-ই হোক, এটা ঠিক যে, সক্রেটিস সত্য জ্ঞানলাভের একটি পন্থায় বিশ্বাস করতেন, যে পন্থা তাঁর নিজেরই উদ্ভাবিত। সক্রেটিস মনে করতেন যে, বিভিন্ন মত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে খাঁটি সত্যকে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব।

সক্রেটিস ঃ সক্রেটিসের তত্ত্ব ও পদ্ধতি

সক্রেটিস খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬৯ অব্দে এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেন; খ্রিষ্টপূর্ব ৩৯৯ অব্দে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। সক্রেটিস ছিলেন পেরিক্লিসের যুগের দার্শনিক-পণ্ডিত। পেরিক্লিসের যুগে বিজ্ঞানের অবক্ষয় ঘটেছিল, যে রকম অবক্ষয় গ্রীকসভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে আরো কয়েকবার ঘটেছে। প্রকৃতিবিজ্ঞান ও মহাজাগতিক সমস্যা সম্পর্কে আয়োনীয় এবং অন্যান্য গ্রীক দার্শনিকরা খ্রিষ্টপূর্ব ছয়ের শতকের শুরু থেকে যে চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন, তার ফলস্বরূপ খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচের শতকের মাঝামাঝি অনেকগুলো মতবাদের সৃষ্টি হল। কিন্তু এ সকল মতবাদের প্রত্যেকটি কেবল একটা কথাই প্রমাণ করতে পারত যে, অন্য সব মত ছিল ভ্রান্ত। ইলিয়া (ঋফণট) নগরীর দার্শনিক পারমেনাইডিস (টেরবণভধঢগ্র মত ঋফণট) তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি প্রয়োগ করে আপাতদৃষ্টিতে প্রমাণ করেন যে, বিজ্ঞানের কোনো ভিত্তিই নেই। তিনি বলেন যে, 'ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা জগৎ সম্পর্কে যে ধারণা করি, বাস্তব জগৎ তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন; ফলে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জগৎ সম্পর্কে যে সকল ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তা স্ববিরোধী। পারমেনাইডিসের ছাত্র জেনো (Zeno) আপাতদৃষ্টিতে প্রমাণ করেন যে গণিতের স্বীকার্য বিষয়গুলোও স্ববিরোধী।

এ সকল মতের প্রভাবে তখন বিজ্ঞানকে অসম্ভব বা অবাস্তব সাধনা বলে মনে হল। এ কারণে সক্রেটিসের আগের প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা॥ যথা, প্রোটাগোরাস এবং গর্গিয়াস, বিজ্ঞানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং এমন এক পেশায় নিজেদের মনন ও মেধাকে নিয়োজিত করেন যার লক্ষ্য সত্যের অনুসন্ধান নয়, বরং মানবজীবনকে সফল ও সার্থক করে তোলা। তাঁদের কথা ছিল, 'সম্ভাবনা দ্বারাই জীবন চালিত হয়' এবং বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তা আয়ত্ত করা আমাদের সাধ্যের বাইরে হলেও, বাস্তবক্ষেত্রে উপযোগী এবং ফলদায়ক দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করা সম্ভবপর। প্লেটোর লেখা ফিডো (Phaedo) নামক গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী, তরুণ বয়সে সক্রেটিস তাঁর যুগের রীতি অনুযায়ী তৎকালে প্রচলিত পদ্ধতিতে জ্ঞানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি উৎসাহের সাথে ঐ যুগের 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন এবং ঐ সময়ে

www.icsbook.info

প্রচলিত সমস্ত দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন। তিনি বিশেষভাবে সমতলীয় পৃথিবী সম্পর্কিত মাইলেশীয় দার্শনিকদের তত্ত্ব এবং গোলাকার পৃথিবী সম্পর্কিত ইটালির গ্রীক দার্শনিকদের তত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। একক দৈর্ঘ্য বা সরলরেখার নিরবচ্ছিন্নতা সম্পর্কে জেনো যে গাণিতিক ধাঁধার উদ্ভাবন করেছিলেন, সক্রেটিস আগ্রহের সাথে সে বিষয়েও পড়াশোনা করেন। কিন্তু সক্রেটিস দুঃখের সাথে লক্ষ্য করলেন যে, প্রত্যেক দার্শনিক অন্যান্যদের মতকে খণ্ডন করতে পারলেও কেউই নিজের মতের সত্যতা সম্পর্কে কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি।

প্রকৃতপক্ষে, ঐ সময়ে সমালোচনামূলক বা বিশ্লেষণমূলক কোনো পদ্ধতির অস্তিত্ব ছিল না। প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্পর্কে হতাশ হয়ে সক্রেটিস সিদ্ধান্ত করলেন যে, ঘটনা বা তথ্যকে প্রাথমিক সত্যরূপে গণ্য না করে, ঘটনা বা তথ্য সম্পর্কে যে বিবৃতি বা প্রস্তাব প্রদান করা হয় তাকেই প্রাথমিক গুরুত্বসম্পন্ন বলে গণ্য করা প্রয়োজন। তাঁর পদ্ধতি ছিল এরকম কোনো বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে ঐ সম্পর্কে যে কল্পনা বা স্বীকার্যকে (hypothesis, postulate) সবচেয়ে সন্তোষজনক বলে বোধ হয় সেটাকে মেনে নিয়েই আলোচনায় অগ্রসর হওয়া এবং তার থেকে কি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় তা নির্ণয় করা। যদি দেখা যায় যে, এভাবে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত বা ফলাফলকে সত্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে বোধ হচ্ছে, তাহলে ঐ কল্পনাকে আপাতত সঠিক বলে গণ্য করা চলবে। অপরপক্ষে, যদি প্রাথমিক কল্পনা থেকে অগ্রসর হয়ে আমরা ভ্রান্ত বা অসঙ্গতিপূর্ণ বা স্ববিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হই তাহলে ঐ প্রাথমিক কল্পনাকে পরিত্যাগ করতে হবে। কিন্তু এ পদ্ধতির একটা অকাট্য নিয়ম হচ্ছে প্রাথমিক কল্পনা বা হাইপোথিসিসের বিশ্লেষণের পরিণতিতে যে ফল পাওয়া যায় তাকে ঐ সকল কল্পনার সত্যতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা চলবে না। যদি কোনো বিষয়ের সত্যতা নির্ণয়ের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তাহলে তার মীমাংসা হতে পারে শুধুমাত্র তখনই, যদি অন্য একটা সর্বজনগ্রাহ্য কল্পনা থেকে আরম্ভ করে তাকে বিশ্লেষণ করে বর্তমান প্রাথমিক কল্পনায় পৌঁছানো যায়। অর্থাৎ ধরা যাক 'ক' নামক কল্পনা থেকে যাত্রা শুরু করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল যাকে আপাতদৃষ্টিতে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সঠিক বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এর দ্বারাই 'ক' কল্পনার সত্যতা প্রমাণিত হবে না। যদি দুই বিরোধী পক্ষ 'ক' কল্পনার যৌক্তিকতা সম্পর্কে একমত না হন, তাহলে 'ক'-এর বিশ্লেষণের পরিণতিতে সঙ্গতিপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেও 'ক' সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে বলে দাবি করা চলবে না। এরকম ক্ষেত্রে আরো প্রাথমিক একটা সরল 'অ' প্রকল্পকে নিয়ে আরম্ভ করতে হবে যে প্রকল্পের সত্যতা সম্পর্কে দুই বিরোধী পক্ষই একমত। এরপর যদি 'অ' থেকে যাত্রা শুরু করে সিদ্ধান্ত- স্বরূপ 'ক' প্রকল্পে পৌঁছানো যায়, তখনই শুধু 'ক' প্রকল্প থেকে যে সিদ্ধান্ত টানা যায় তাকে সত্য বলে মানা চলবে। এ পদ্ধতিটি আধুনিক কালেও খাঁটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরূপে গৃহীত হয়েছে। পণ্ডিতদের মতে দার্শনিক জেনোর আলোচনায় এ পদ্ধতির প্রাথমিক আভাস পাওয়া যায়। (উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্লেটো তাঁর 'পারমেনাইডিস' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, সক্রেটিসের যৌবনকালে জেনোর সাথে সক্রেটিসের সাক্ষাৎ হয়েছিল। আবার, এ্যারিস্টটলও জেনোকে 'ডায়ালেকটিক' বিচার পদ্ধতির স্রষ্টা বলে উল্লেখ করেছেন)।

সক্রেটিসের দার্শনিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক মতের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা

www.icsbook.info

দিয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে তরুণদের বিপথগামী করার অভিযোগ আনেন। বিচারে সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৩৯৯ অব্দে তাঁকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়।

প্লেটোর দর্শন

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ছিলেন সক্রেটিসের শিষ্য। প্লেটো খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭ অব্দে এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেন এবং খ্রিস্টপূর্ব ৩৪৭ অব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মানুষের চিন্তার ওপর প্লেটোর প্রভাব গত ২৪০০ বছর ধরে বিরামহীনভাবে কাজ করেছে।

প্লেটোর নিজস্ব দর্শন সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা কঠিন, কারণ এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। প্লেটো খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৭ অব্দে বা তার অল্পকাল পরে এথেন্সে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য 'একাডেমি' নামক একটি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। প্লেটো এখানে কোনো রকম পাণ্ডুলিপির সাহায্য না নিয়ে মুখে মুখে শিক্ষাদান করতেন। প্লেটোর লেখা ৩৬টি বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে, তবে পণ্ডিতরা মনে করেন এর মধ্যে কয়েকটি হয়তো প্লেটোর লেখা নয়।

প্লেটোর রচনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি কথোপকথনের ভঙ্গিতে বইগুলো লিখেছিলেন। তাঁর লেখা গ্রন্থসমূহের মধ্যে এপোলজি, রিপাবলিক, ফিডো (Phaedo), থিয়াটিটাস (Theaetetus), পারমেনাইডিস, সফিস্ট, পলিটিকাস, ফাইলিবাস (Philebus), ল'জ (Laws) প্রভৃতি গ্রন্থের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রথম ও শেষ গ্রন্থের রচনাকালের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বছরের পার্থক্য রয়েছে। পণ্ডিতরা লক্ষ্য করেছেন যে, প্লেটোর প্রথম দিকের রচনা এবং শেষ দিকের রচনার বক্তব্যের মধ্যে অনেক বিষয়ে গভীর ও মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে থিয়াটিটাস গ্রন্থের আগের ও পরের রচনার মধ্যে প্রকাশিত চিন্তাধারায় মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, প্লেটোর প্রথম দিককার রচনায় সক্রেটিসের দর্শনের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে এবং শেষ দিকের রচনায় প্লেটোর নিজস্ব দর্শনের প্রকাশ ঘটেছে। তবে এ বিষয়ে সকল প্লেটো বিশারদগণ একমত নন। এ প্রসঙ্গে লক্ষনীয় যে এ্যারিস্টটল প্লেটোর দর্শনের যে বিবরণ দিয়েছেন, তার সাথে প্লেটোর প্রথম দিককার রচনায় বিবৃত দর্শনের কোনো মিল নেই। এ্যারিস্টটল সম্ভবত একাডেমিতে শিক্ষালাভ কালে সরাসরি প্লেটোর মুখ থেকেই প্লেটোর নিজস্ব দর্শন সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। তবে, প্লেটোর শেষ দিককার রচনা 'ফাইলিবাস' গ্রন্থে এ্যারিস্টটলের বর্ণিত প্লেটোর দর্শনের কিছুটা ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

প্লেটো রাষ্ট্র পরিচালনা, শিক্ষাপদ্ধতি, নীতিশাস্ত্র, জ্ঞানতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নিজস্ব মত ও তত্ত্ব প্রদান করেছেন। প্লেটোর মতে, যেটাকে আমরা পরিবর্তনশীল বাস্তব জগৎ বলে জানি সেটা সত্য জগৎ নয়। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের যেসব বস্তু পরিবর্তিত হয় বা বিলুপ্ত হয় সেগুলো প্রকৃত সত্য নয়, সত্য হচ্ছে বস্তুহীন একটা আকার বা মূল আদল (এমরব, অঢণট), যার পরিবর্তন ঘটে না, যা চিরস্থায়ী। এ্যারিস্টটল প্লেটোর এ অভিমতের সমালোচনা করেছেন।

www.icsbook.info

এ্যারিস্টটলের দর্শন

এ্যারিস্টটল প্লেটোর ছাত্র এবং শিষ্য হলেও, মৌলিক চিন্তার অধিকারী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হিসেবে তিনি খ্যাতিলাভ করেছেন। এ্যারিস্টটল খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দে ঈজিয়ান উপসাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত গ্রীক ঔপনিবেশিক নগরী স্ট্যাগিরা-তে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭ বছর থেকে ৩৭ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি এথেন্সে অবস্থিত প্লেটোর বিদ্যালয় 'একাডেমি'-তে অধ্যয়ন করেন। ৩৭ বছর থেকে ৪৯ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন এবং কিছুকাল ম্যাসিডোনিয়ার যুবরাজ আলেকজান্ডারকে শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত থাকেন। জীবনের শেষ বার বছর তিনি এথেন্সে লাইসিয়াম (Lyceum) নামক বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং সেখানে বিদ্যাচর্চা ও গবেষণাকার্যে নিমগ্ন থাকেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩২২ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

এ্যারিস্টটলের দার্শনিক চিন্তাধারার শুরু হয়েছিল প্লেটোর দর্শনচিন্তাকে অবলম্বন করে। প্লেটোর মৃত্যু পর্যন্ত এবং এ্যারিস্টটলের মধ্যবয়স পর্যন্ত এরিস্টটলের ওপর প্লেটোর দর্শনের প্রভাব স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু জীবনের শেষ ২৫ বছর তিনি নিজের উদ্ভাবিত একটি দর্শন ও জ্ঞানচর্চার পদ্ধতি অনুসরণ করেন। প্লেটো বাস্তব জগৎকে সামগ্রিকভাবে বিচার করতেন এবং তিনি যে জগৎ সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিলেন সেটি ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর বাইরের 'ভাব' (idea) দ্বারা গঠিত কোনো এক জগৎ। অপরপক্ষে এ্যারিস্টটল বাস্তব জগৎকে পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, রাজনীতি এবং মনস্তত্ত্ব-এ কয়টি ক্ষেত্রে বিভক্ত করে বাস্তব জগৎকে বিচার-বিশ্লেষণের কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। বাস্তব জগতের গবেষণার প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতির মূল কথা ছিল ঃ উপাত্ত (data) বা ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণ। জীবতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি নিখুঁতভাবে উপাত্ত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রাণিদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে প্রাণিদেহের ভেতরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন; এক্ষেত্রে আধুনিককালের পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাথে এ্যারিস্টটলের পদ্ধতির মিল আছে। এ্যারিস্টটলের গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর অনুসন্ধানের অধীন উপাত্তসমূহের কোনো বিকৃতি না ঘটিয়ে তাদের সম্পর্কে একটা সাধারণ তত্ত্বের উদ্ভাবন করা। প্রাণিবিদ্যাসংক্রান্ত গ্রন্থে তিনি লেখেন যে, কোনো বিষয়ে সত্য উদ্‌ঘাটনের প্রক্রিয়া হবেঃ 'ঐ দলভুক্ত সমস্ত প্রাণীর সাধারণ গুণসমূহের বর্ণনা প্রদান এবং তারপর ঐ গুণসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করা।'

এ্যারিস্টটল অতি উচ্চ পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক মানসিকতা অর্জন করেছিলেন। প্রথমত, তিনি ভিন্ন ভিন্ন 'বিজ্ঞানের' বা 'গবেষণার বিষয়সমূহের' মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা নিরূপণ করেছিলেন এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদান করেছিলেন। বিজ্ঞানের ঐ সব শাখা এখনো ঐ সব নামেই পরিচিত রয়েছে— যথা, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি। দ্বিতীয়ত তিনি তাঁর আলোচিত প্রতিটি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার নিয়মাবলী সততার সাথে মেনে চলতেন। অবশ্য অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেই তাঁকে কাজ করতে হয়েছে— তাঁর কালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযোগী যন্ত্রপাতি বিশেষ কিছু ছিল না, এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রক্রিয়াকেও তাঁকেই উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করতে হয়েছে।

এ্যারিস্টটলের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সারসত্তা এবং তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার ধারা অব্যাহত থাকলে তার ফলে গ্রীসে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রভূত বিকাশ ঘটতে পারত। প্রকৃতি বিষয়ে গবেষণার যৌক্তিকতা এবং একটি পরিকল্পনাও তিনি

www.icsbook.info

প্রদান করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর শিক্ষার সারবস্তু এবং তাঁর প্রদর্শিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তাঁর শিষ্যরা অনুসরণ করেননি। এর একটা কারণ এ হতে পারে যে, খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে আলেকজান্ডারের মৃত্যুর সংবাদ পেয়েই এ্যারিস্টটল যখন দ্রুত এথেন্স ত্যাগ করেন তখন তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহও সাথে করে নিয়ে যান। খ্রিস্টপূর্ব ৩২২ অব্দে এথেন্স থেকে অনেক দূরে, এ্যারিস্টটলের মায়ের দেশে, ইওরিয়া দ্বীপে, যখন তাঁর মৃত্যু ঘটে তারপর থেকে দুশো বছর পর্যন্ত এ্যারিস্টটলের রচনাসমূহ লোকচক্ষুর অগোচরে বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে ছিল। এ্যারিস্টটলের শিষ্যরা এ সময়ে গুরুর গ্রন্থাবলীর সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়ে দ্রুত তাঁর বৈজ্ঞানিক কৌতূহল-সমৃদ্ধ প্রেরণার প্রভাবকে রক্ষা করতে অসমর্থ হয়ে পড়েন। এ্যারিস্টটলের অনুগামী পেরিপ্যাটেটিক গোষ্ঠী (এ্যারিস্টটল বাগানে হাঁটতে হাঁটতে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন বলে তাঁর অনুগামীদের পেরিপ্যাটেটিক নামে অভিহিত করা হয়; গ্রীক ভাষায় পেরিপেটোস শব্দের অর্থ হল পায়চারি করা) ক্রমশ একটি গোঁড়া মতবাদের অনুগামী হয়ে ওঠে। দুশো বছর পরে যখন এ্যারিস্টটলের রচনাবলীকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হল তখন, আর তার মূল্য উপলব্ধি করা পণ্ডিতদের পক্ষে বা এ্যারিস্টলের অনুগামীদের পক্ষে সম্ভব হল না। এ্যারিস্টটলের শিক্ষাকে নতুন গবেষণার কাজে প্রয়োগ করার পরিবর্তে, তাঁর গ্রন্থাবলীকে জ্ঞানের চরম বিকাশ রূপে গণ্য করা হল। এ্যারিস্টটল তাঁর সাময়িক বা আপাত সিদ্ধান্তকে কখনো চূড়ান্ত সত্য বলে দাবি করতেন এমন মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু তাঁর অনুগামী এবং উত্তরসূরীরা এ্যারিস্টটলকে 'সকল পণ্ডিতদের গুরু' নামে অভিহিত করলেন এবং এ্যারিস্টটলের গ্রন্থাবলীতে বিধৃত সকল কথাকে পরিপূর্ণ জ্ঞানের চূড়ান্ত প্রকাশ বলে গণ্য করলেন। জ্ঞান অনুসন্ধানে প্রেরণাদানকারী হিসেবে এ্যারিস্টটলের মৃত্যু ঘটল; এরপর থেকে এ্যারিস্টটলকে চূড়ান্ত জ্ঞানের উৎস হিসেবেই গণ্য করা হল। এভাবে একজন মহান গবেষককে গবেষণা প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধক শক্তিতে পরিণত করা হল। বহু শতাব্দী ধরে এ্যারিস্টটলকে এই দুর্ভাগ্যের বোঝা বহন করতে হল। বহু যুগ ধরে পেরিপ্যাটেটিক গোষ্ঠী এ্যারিস্টটলকে 'জ্ঞানের আধার' রূপে প্রচার করল। মধ্যযুগের ইউরোপে এ্যারিস্টটলকে খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকরাও 'জ্ঞানীদের গুরু' হিসেবে গ্রহণ করে নিলেন। অবশেষে ষোল শতকে এ্যারিস্টটলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তবেই মাত্র আধুনিক বিজ্ঞান নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারল— অথচ প্রকৃতপক্ষে এ্যারিস্টটল ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে একজন।

এ্যারিস্টটলের বাস্তব তথ্যের প্রতি গভীর আস্থা ছিল এবং ঐ সব তথ্যকে তাদের গুণ অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করতে তিনি গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন। এ্যারিস্টটল যখন শেষ বয়সে বৈজ্ঞানিক মানসের অধিকারী হন, তখন তিনি প্লেটোর প্রচারিত 'আইডিয়া'-র ধারণা পরিত্যাগ করেন। এ্যারিস্টটলের কথা ছিল অনেকটা এ রকম— একটি বিশেষ জিনিস আর তার সার্বজনীন রূপের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে এই যে, একই জাতীয় পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়ে বারবার যে অনুভূতির সৃষ্টি করে সেটা প্রথমে স্মৃতির পর্যায়ে এবং পরে অভিজ্ঞতার পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং এভাবেই ঐ সকল একজাতীয় পদার্থের সার্বজনীন রূপের ধারণা আমাদের মনে গড়ে ওঠে। এ সকল ধারণা নির্মাণ করে আমরা আমাদের পক্ষে বোধগম্য একটা জগৎ গড়ে তুলি— এবং এটিই আমাদের

www.icsbook.info

জ্ঞানময় জগৎ, আর এ জগতের মধ্যেই আমরা যুক্তিতর্কে লিপ্ত হতে পারি এবং যথাযথ যুক্তি প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পারি।

জ্ঞানের জগতে এ্যারিস্টটলের এটি একটি শ্রেষ্ঠ অবদান যে, তিনি এ সকল পদ্ধতি রচনা করেন এবং তিনিই প্রথম এ সকল বিধিনিয়ম প্রবর্তন করেন; এবং তিনিই যুক্তিবিজ্ঞানের আবিষ্কার করেন। তাঁর আগেও যুক্তিতর্কের ব্যবহার প্রচলিত ছিল এবং প্লেটোর 'কথোপকথন'মূলক পুস্তকসমূহে যুক্তিবিদ্যার পদ্ধতি এবং নিয়মাবলীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু এ্যারিস্টটলই সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে এ সকল নিয়ম বিবৃত করেন এবং সিলোজিজ্‌ম (ওহফফমথধ্রব) নামক ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিধারার আবিষ্কর্তা হিসেবে দর্শনচিন্তার ইতিহাসে তিনি একটি স্থায়ী আসনের দাবিদার (সিলোজিজ্‌ম যুক্তি প্রক্রিয়ায় দুটি তথ্য বা প্রতিজ্ঞা থেকে স্থিরীকৃত একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছার প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে)।

এ্যারিস্টটলের চিন্তাধারার মধ্যে যে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদা বিদ্যমান ছিল তা হল বিবর্তন বা পরিবর্তনের ধারণা। তিনি ধারণাকে 'জেনেসিস' (Genesis) নামে বর্ণনা করেছেন, বর্তমান কালে ইংরেজিতে যে শব্দের অর্থ হল উৎপত্তি। সব জিনিসেরই পরিবর্তন এবং বৃদ্ধি আছে— এ কথাটাই এ্যারিস্টটল বলতে চেয়েছেন। এ্যারিস্টটলের এ ধারণাটা পদার্থবিদ্যা (Physics) নামক গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। জীববিদ্যা বিষয়ে অনুসন্ধানের ফলে তাঁর মনে পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল, অথবা সাধারণভাবে দার্শনিক অনুসন্ধানের ফলে তিনি পরিবর্তনের তত্ত্বে বিশ্বাসী হন এবং ঐ তত্ত্বের প্রয়োগ ক্ষেত্র খুঁজতে গিয়ে তিনি জীববিদ্যা অধ্যয়ন করেন— এ প্রশ্নের মীমাংসা করা কঠিন। তবে, জগতের পরিবর্তনশীলতা ও বিকাশ বা বৃদ্ধি সম্পর্কে এ্যারিস্টটলের যে সুনিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, প্লেটোর চিন্তার সাথে এ্যারিস্টটলের চিন্তার পার্থক্যের মূল বিষয় ছিল সেটিই। একটি জিনিস যে রূপ নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত সেই স্থির রূপটিতেই (being, সত্তা) প্লেটোর আগ্রহ ছিল; একটি জিনিস ক্রমিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটা কিছুতে পরিণত হচ্ছে (becoming) -এ পরিবর্তনের প্রতি প্লেটোর আগ্রহ ছিল না। প্লেটোর মতে পরিবর্তনশীলতা হচ্ছে ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি দিয়ে গড়া মিথ্যা ও অস্থায়ী জগতের অংশ। প্লেটো এক স্থায়ী ও সত্য জগতের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন গণিতের সত্যের ভিত্তিতে, আর তাঁর জগতের ভিত্তি ছিল গণিতের সংখ্যা। তাই প্লেটোর জগৎ ছিল এক স্থির, অচল ও অপরিবর্তনশীল জগৎ।

এ্যারিস্টটলের জগৎ কিন্তু সচল, অস্থির ও পরিবর্তনশীল। তাঁর জগতে সব বস্তুই বিকাশমান অবস্থায় আছে। তিনি বলতেন, প্রত্যেক জিনিসের ধর্মই হচ্ছে তার অন্তর্নিহিত সুপ্ত ক্ষমতা অনুযায়ী বিকাশ লাভ করা। এ্যারিস্টটল বলতেন, প্রত্যেক জিনিস তার সুপ্ত প্রকৃতি অনুযায়ী বিকাশ লাভ করে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়; এবং এভাবে প্রত্যেক বস্তু যখন তার পূর্ণ বিকশিত রূপ প্রাপ্ত হয়, তখন সেটাকেই তার আসল প্রকৃতি বলে গণ্য করা চলে। এ্যারিস্টটলের এই মতের পেছনে অবশ্য টেলিওলজি (teleology) বা উদ্দেশ্যবাদমূলক মতবাদ-এর অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ, এ্যারিস্টটল বলতে চাইছেন, পরিবর্তনটা ঘটে এ কারণে নয় যে, পরিবর্তনই জগতের নিয়ম; বরং তাঁর মতে জগতের প্রত্যেকটি জিনিস যাতে পূর্ব নির্ধারিত কোনো চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে সে প্রয়োজনেই জগতে পরিবর্তন ঘটে। এ্যারিস্টটল-এর এই উদ্দেশ্যবাদ বা

www.icsbook.info

টেলিওলজিকে অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞান বর্জন করেছে।

এ্যারিস্টটল নীতিশাস্ত্র এবং রাজনীতি সম্পর্কে যে সকল অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, পরবর্তীকালের চিন্তাধারাকে তা দীর্ঘকাল ধরে বিরামহীনভাবে প্রভাবিত করেছিল।

সাহিত্য ও শিল্পকলা

গ্রীক সাহিত্যের আদিতম প্রকাশ ঘটেছে হোমারের মহাকাব্যে। এ যুগের মহাকাব্যে গ্রীকদের বীরত্বের কহিনী বর্ণিত হয়েছে। হোমারের সবচেয়ে বিখ্যাত মহাকাব্য 'ইলিয়াড' এবং 'ওডিসি' সম্পর্কে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

আমরা আগেই দেখেছি, হোমারীয় যুগের অবসানে কয়েক শতাব্দীব্যাপী ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। এ পরিবর্তনের ফলে গ্রীকসমাজে ব্যক্তিসত্তার উদয় ঘটে এবং সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটে। এ যুগে গাথা এবং শোকগাথার উদয় হয়। এ সকল গাথায় ব্যক্তিগত প্রণয়কাহিনী বা কোনো করুণ অভিজ্ঞতার বর্ণনা থাকত। উল্লেখ্য যে, সোলোন একজন প্রতিভাবান গাথা রচয়িতা ছিলেন।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গাথার স্থানে লিরিক বা গীতিকবিতার উদয় হয়। লায়ার বা বীণাসহযোগে এ সকল গীতিকবিতা গীত হত। আলসিউস, স্যাফো, পিন্ডার প্রমুখ ছিলেন বিখ্যাত গীতিকবিতা রচয়িতা।

গ্রীকদের সাহিত্যরচনার সার্থক প্রকাশ ঘটেছিল বিয়োগান্ত নাটক রচনায় ডায়োনিসাস-এর উৎসবে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে, গ্রীক নাটকের জন্ম হয়েছিল ঃ এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এস্কাইলাস (৫২৫-৪৫৬ খ্রিঃ পূঃ)। অপর একজন বিখ্যাত নাট্যকার হলেন সোফোক্লিস (৪৯৬-৪০৬ খ্রিঃ পূঃ)। গ্রীসের শেষ বিখ্যাত বিয়োগান্ত নাট্যকারের নাম ইউরিপাইডিস (৪৮০-৪৪৬ খ্রিঃ পূঃ)। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রীক মিলনান্ত নাটক উৎকর্ষের বিচারে বিয়োগান্তক নাটকের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল। এ শ্রেণীর নাট্যকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন এরিস্টোফেনিস (আনুমানিক ৪৪৮-৩৮০ খ্রিঃ পূঃ)। তিনি ছিলেন একজন উগ্র অভিজাতপন্থী এবং তাঁর সমকালীন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আদর্শকে ব্যাঙ্গ করে তিনি নাটক রচনা করতেন।

গ্রীসের ইতিহাসের স্বর্ণ যুগের দুজন ঐতিহাসিকের উল্লেখ না করলে গ্রীক সাহিত্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ইতিহাস শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'হিষ্ট্রি' শব্দটি এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে। এটা খুবই সঙ্গত, কারণ ইতিহাস বিদ্যার প্রকৃত উৎপত্তি ঘটেছিল গ্রীক দেশেই। এবং ইতিহাসের জনকরূপে গণ্য করা হয় আদি গ্রীস ইতিহাসবিদ হেরোডোটাসকে। হেরোডোটাস (৪৮৪-৪২৫ খ্রিঃ পূঃ) ছিলেন এশিয়া-মাইনরের উপকূলের এক গ্রীক নগরীর অধিবাসী। তিনি পারস্য সাম্রাজ্য, গ্রীস ও ইটালিতে ব্যবস্থাপক ভাবে ভ্রমণ করেন এবং প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁর রচিত নয় খণ্ডে সম্পূর্ণ 'ইতিহাস' নামক গ্রন্থখানি মূলত গ্রীসীয়-পারসিক যুদ্ধের ইতিহাস, কিন্তু এর পরিসর এত ব্যাপক এবং এত বিভিন্ন জাতির ইতিহাস এতে বর্ণিত হয়েছে যে, এটিকে প্রায় একটি বিশ্বইতিহাস রূপে গণ্য করা চলে।

www.icsbook.info

হেরোডোটাসকে যদি ইতিহাসের জনক বলা চলে, তবে তাঁর সমকালীন অপর গ্রীক ইতিহাসবিদ থুকিডাইডিস-কে অবহিত করা চলে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের জনকরূপে। সফিস্টদের সংশয়বাদ ও বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে থুকিডাইডিস (৪৬০-৩৯৫ খ্রিঃ পূঃ) সতর্কতার সাথে সাক্ষ্য প্রমাণাদি বাছাই করতেন এবং ব্যক্তিগত অভিমত, জনশ্রুতি, কল্পকাহিনী প্রভৃতিকে বর্জন করতেন। তাঁর রচিত ইতিহাসের বিষয়বস্তু ছিল স্পার্টা ও এথেন্সের যুদ্ধ— অর্থাৎ পেলোপনেসীয় যুদ্ধ। তিনি বিজ্ঞান সম্মতভাবে ও নিরপেক্ষভাবে এ যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন ও তাঁর জটিল কারণ সমূহ ও যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা করেছেন। থুকিডাইডিস তাঁর রচনায় একস্থানে বলেছেন, 'আদিমকালের গ্রীকদের জীবনযাত্রা যে এখনকার বর্বরদের মতো ছিল এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ দেয়া যেতে পারে।' এ উক্তির মধ্যে যে গভীর ইতিহাস-বোধের পরিচয় আছে, সে যুগের কোনো প্রাচ্য দেশে তার তুলনা পাওয়া যায় না। বর্বর দশা থেকে ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমেই যে সভ্য জাতির উদয় ঘটে, এ রকম উক্তি বা উপলব্ধি সে যুগের যে-কোনো প্রাচ্য সাম্রাজ্যে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। এ থেকেই থুকিডাইডিসের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাহাত্ম্য বোঝা সম্ভব হবে।

অপর একজন সুবিখ্যাত এথেনীয় ঐতিহাসিক হলেন জেনোফোন (৪৩০-৩৫৫ খ্রিঃ পূঃ)। এ্যারিস্টটলও ইতিহাস বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

প্রাচীন গ্রীসের কয়েকটি মাটির পাত্র। পাত্রের গায়ে নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা আছে।

গ্রীক-চরিত্রের প্রকৃত প্রকাশ সাহিত্যের চেয়েও বেশি করে ঘটেছে শিল্পকর্মে। গ্রীকরা ছিল মূলত বস্তুবাদী, যারা জগৎকে প্রাকৃতিক ও বাস্তব হিসেবেই গণ্য করত। প্লেটো ও অধ্যাত্মবাদী ধর্মের অনুসারীরা অবশ্য ব্যতিক্রম ছিল। কিন্তু গ্রীকরা সচরাচর আধ্যাত্মিক জগৎ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। প্রাচীন গ্রীসের স্থাপত্যশিল্প ও ভাস্কর্যে তাই গ্রীকদের জাগতিক আদর্শেরই প্রতিফলন ঘটেছিল।

গ্রীসের শিল্পকর্মে গ্রীকদের মানবতাবাদের প্রতিফলন ঘটেছিল। গ্রীকদের দৃষ্টিতে জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি ছিল মানুষ, এ মানুষের মহত্তব ও জয়গানের প্রতিফলন ঘটেছিল গ্রীক শিল্পকর্মে। গ্রীক শিল্পকর্মে জাতীয় জীবনের এবং গ্রীক নাগরিকদের ঐক্যবোধেরও প্রতিফলন ঘটেছিল।

গ্রীক স্থাপত্য শিল্পের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন হচ্ছে এথেন্সের পার্থেনন বা দেবী এথেনার মন্দির। শ্বেত মার্বেলপাথরে তৈরি এ মন্দিরটির ভেতরে ও বাইরে অপূর্ব সুন্দর দেবদেবীর মূর্তি স্থান পেয়েছিল। মন্দিরের ভিতরে ছিল গজদন্ত ও সোনা দিয়ে তৈরি

www.icsbook.info

দেবী এথেনার এক সুবিশাল ও অপরূপ মূর্তি। এ মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন বিখ্যাত ভাস্কর ফিডিয়াস। ভাস্কর্যে গ্রীকরা অভূতপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ভাস্কররা তাঁদের নির্মিত মূর্তিতে গ্রীক নাগরিকদের শ্রেষ্ঠ গুণাবলী, যথা— সাহস, বিক্রম, দেশপ্রেম ইত্যাদির প্রকাশ ঘটাতেন। গ্রীক ভাস্কররা গতিশীল ও ক্রীড়ারত মানুষের প্রতিমূর্তি নির্মাণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গ্রীক নগরগুলোতে সুন্দর সুন্দর মন্দির ও অট্ট্যালিকা নগরীর শোভাবর্ধন করত। আর দেবদেবী, খ্যাতনামা ব্যক্তি ও বিভিন্ন কাজে রত মানুষের সুন্দর সুন্দর মূর্তি এ সকল মন্দির, অট্টালিকা,নগর চত্বর ও রাস্তাঘাটের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করত।

বিজ্ঞান

সাধারণভাবে গ্রীক বিজ্ঞানের যে সুনাম আছে, বিজ্ঞানের সে অগ্রগতি অবশ্য হেলেনিক যুগে ঘটেনি। যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার গ্রীক যুগে ঘটেছিল বলে সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, সেগুলোর অধিকাংশই হেলেনিস্টিক বা আলেকজান্দ্রীয় যুগে ঘটেছিল। যেমন, আর্কিমিডিস ছিলেন আলেকজান্দ্রীয় যুগের বিজ্ঞানী, তবে হেলেনিক যুগেও গণিত, জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে কিছু কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল।

গ্রীক গণিতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সম্ভবত থালেস। তাঁর আবিষ্কৃত কয়েকটি উপপাদ্য পরে ইউক্লিডের জ্যামিতি গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল। পিথাগোরাস ও তাঁর সম্প্রদায় অনেকগুলো জ্যামিতিক আবিষ্কার এবং সংখ্যাতত্ত্বের আবিষ্কার করেন। পিথাগোরাসের উপপাদ্য নামে পরিচিত গুরুত্বপূর্ণ জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞাটি সম্ভবত পিথাগোরাস স্বয়ং আবিষ্কার করেন, তবে জ্যামিতিকে একটি বিজ্ঞানরূপে প্রথম গড়ে তোলেন কিওসের হিপোক্রেটিস (ইনি চিকিৎসক হিপোক্রেটিস নন)। এ যুগের আরেকজন বিখ্যাত গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ হলেন ইউডক্সাস্ (৪০৮-৩৫৫ খ্রিঃ পূ)। জীববিজ্ঞান সম্পর্কে প্রথম আগ্রহী হন দার্শনিক এ্যনাক্সিম্যান্ডার। তিনি প্রাণিজগতের এক প্রাথমিক ধরনের বিবর্তনের তত্ত্বের অবতারণা করেন। তাঁর মতে আদিমতম প্রাণী পানিতে বাস করত। পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে প্রাণীদের দেহে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আসে। এভাবে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যায়ে মানুষের উদয় হয়। অবশ্য জীববিজ্ঞানে প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতারূপে গণ্য করা হয় এ্যারিস্টটলকে। নিজস্ব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তিনি অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। তবে তিনি অনেক ভ্রান্ত মতও পোষণ করতেন। যেমন, বিবর্তনের তত্ত্বে সাধারণভাবে আস্থা থাকলেও তিনি মনে করতেন, কোনো কোনো কীট-পতঙ্গ আপনা থেকেই জন্মলাভ করে।

গ্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রণী ছিলেন এম্পেডোক্লিস ও আল্‌ক্‌মাওন। এম্পোডোক্লিস আবিষ্কার করেছিলেন যে, প্রাণিদেহে রক্ত দেহ থেকে হৃৎপিণ্ডের দিকে এবং হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের দিকে প্রবাহিত হয়। আল্‌ক্‌মাওন প্রাণিদেহ ব্যবচ্ছেদ করে চোখের নার্ভ আবিষ্কার করেন এবং জানতে পারেন যে মস্তিষ্কই স্নায়ুতন্ত্রের মূল কেন্দ্র। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল কস নগরীর হিপোক্রেটিস-এর। হিপোক্রেটিসের প্রধান অবদান হল তিনি রোগের অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যাকে দূর করে ঘোষণা করেন যে, প্রত্যেক রোগের একটি প্রাকৃতিক কারণ আছে।

www.icsbook.info

শুধু এ কারণেই হিপোক্রেটিস চিকিৎসা- বিজ্ঞানের জনক রূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য। হিপোক্রেটিস তাঁর ছাত্রদের সব সময় বলতেন, 'প্রত্যেক রোগের একটি প্রাকৃতিক কারণ আছে, প্রাকৃতিক কারণ ছাড়া কখনও কিছু ঘটে না।' রোগে যে একটি সংকটের পর্যায় আছে হিপোক্রেটিস তা আবিষ্কার করেন এবং অস্ত্রোপচার ও শল্য চিকিৎসার উন্নতি সাধন করেন। তাঁর প্রধান ত্রুটি হল, রক্তে পিত্ত, শ্লেষ্মা প্রভৃতির আধিক্যের কারণে রোগের উৎপত্তি হয়— এ ভ্রান্ত তত্ত্বে আস্থা স্থাপন। এ তত্ত্ব থেকেই পরবর্তীকালে রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে রোগ নিরাময়ের ভয়াবহ পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল।

হেলেনিস্টিক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন

হেলেনিস্টিক বা আলেকজান্দ্রীয় যুগে অতি দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেছিল। আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের বাণিজ্য ও শিল্পবিপ্লবের আগে এত দ্রুত অর্থনৈতিক রূপান্তর আর ঘটেনি। এ অর্থনৈতিক উন্নয়নের কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, আলেকজান্ডারের বিজয়ের পরে গ্রীকদের বাণিজ্য আর শুধুমাত্র ভূমধ্যসাগরের পূর্ব অঞ্চলে সীমিত না থেকে, উত্তরে ডানিয়ুব থেকে দক্ষিণে ইথিওপিয়া এবং পূর্ব দিকে ভারত বা এমনকি চীন থেকে পশ্চিমে আটলান্টিক উপকূল পর্যন্ত বিশাল অঞ্চল জুড়ে গ্রীক বাণিজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য অল্প দিনের মধ্যে পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাণিজ্য জাহাজের গতি এবং আকার বৃদ্ধি পেয়েছিল। জাহাজগুলো সচরাচর ছিল ৮০ কিংবা ১০০ টন মালবাহী জাহাজ, তবে আরো বড় মালবাহী জাহাজও ছিল। বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে বড় বড় বন্দর, পোতাশ্রয় ও আলোকস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছিল, জলপথের সংস্কার করা হয়েছিল, ভূমধ্যসাগর থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত খাল খনন করা হয়েছিল জাহাজ চলাচলের জন্য। দ্বিতীয়ত পারস্য সাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডারগুলোতে জমা করা সোনারূপা বাজারে ছাড়া পাওয়ায় মুদ্রাস্ফীতি ঘটে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। এর ফলে অর্থবানরা শিল্প-বাণিজ্যে এবং ফটকাবাজিতে অর্থ বিনিয়োগ করতে শুরু করল। তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্যে এবং ধনভাণ্ডার পূর্ণ করার জন্যে নতুন শাসকরা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ সাধনে তৎপর হলেন। এ সকল কারণের ফলে এ যুগে বৃহদায়তন উৎপাদনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্যবসা ও অর্থব্যবস্থার প্রসার ঘটে। আলেকজান্দ্রীয় যুগে রাষ্ট্রই ছিল প্রধান শিল্পপতি ও পুঁজিপতি।

নতুন অর্থনীতিতে কৃষির ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। নতুন শাসকরা আগেকার আমলে বড় বড় ভূস্বামীর জমি বাজেয়াপ্ত করে রাজকীয় সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করে নেন। পরে এ জমিগুলোকে অনুগত অভিজাত এবং কৃষকদের কাছে পত্তন দেন এবং সর্বাধিক মুনাফালাভের ব্যবস্থা করেন। জমির ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের ফলে কৃষকদের দুর্দশা বাড়লেও কৃষির ফলন বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কোষাগারের ধনবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মিশর এবং সেলুকাসের সাম্রাজ্যের শাসকরা শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিবিধান ও তাদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। মিশরের টলেমী রাজবংশের শাসকরা প্রায় প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে কারখানা স্থপন করেছিলেন। এদের মালিক ও পরিচালক ছিল রাষ্ট্র স্বয়ং। সেলুকাসের সাম্রাজ্যেও প্রায় অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যকে অবশ্য এ দুই রাষ্ট্রই ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে

www.icsbook.info

রেখেছিল। তবে নতুন নতুন ক্ষেত্রে ব্যবসার প্রসারের জন্যে সরকার থেকে উৎসাহ দেয়া হত। পোতাশ্রয়সমূহকে নির্মাণ ও উন্নত করা হয়, জলপথে পাহারা দেবার জন্য যুদ্ধজাহাজ পাঠান হয়, পথঘাট এবং খাল নির্মাণ করা হয়। তদুপরি টলেমী শাসকরা বিখ্যাত ভৌগোলিকদের নিয়োগ করতেন দূরাঞ্চলে যাবার নতুন পথ আবিষ্কারের জন্যে, যাতে নতুন নতুন বাজারে প্রবেশ লাভ করা যায়। এসব ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে মিশর এক সুবিশাল বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং এখানে সারা বিশ্বের বিভিন্ন পণ্যের সমাবেশ ঘটে। আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে আরবদের কাছ থেকে মশলা, সাইপ্রাস থেকে তামা, আবিসিনিয়া ও ভারতবর্ষ থেকে সোনা, ব্রিটেন থেকে টিন, নুবিয়া থেকে হাতি ও হাতির দাঁত, স্পেন থেকে রূপা, এশিয়া মাইনর থেকে সুদৃশ্য কার্পেট, এমনকি চীন থেকে রেশমী বস্ত্র পর্যন্ত এসে জড়ো হত। এ সকল পণ্যের ব্যবসা থেকে সরকার এবং বণিকরা ২০ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত মুনাফা অর্জন করত।

হেলেনিস্টিক যুগে অর্থনৈতিক বিকাশের প্রতিফলন ঘটেছিল অর্থব্যবস্থার বিকাশে। এযুগে সোনা ও রূপার মুদ্রার ভিত্তিতে এক আন্তর্জাতিক মুদ্রা অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল এবং সমগ্র মধ্য ও পশ্চিম এশিয়াতে মুদ্রা ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। প্রধানত রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ব্যাঙ্কও গড়ে উঠেছিল। ব্যাংকগুলো সব রকম ব্যাবসা বাণিজ্যে টাকা ধার দিত।

যেসব সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় যে হেলেনিস্টিক যুগ, অন্তত তার প্রথম দুই শতাব্দী ছিল সমৃদ্ধির যুগ। তবে সে সমৃদ্ধি সম্ভবত শাসকদল, অভিজাত শ্রেণী ও ব্যবসায়ী বণিকদের ক্ষেত্রেই সীমিত ছিল। অন্তত কৃষক ও শ্রমিকদের জীবনে যে কোনো সমৃদ্ধিই আসেনি তা নিশ্চিত। খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকে এথেন্সের দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকরা যে মজুরি পেত তা ছিল পেরিক্লিসের যুগের তুলনায় মাত্র অর্ধেক। অপর পক্ষে জীবনযাত্রার ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। হেলেনিস্টিক যুগে ক্রীতদাসের সংখ্যা সাময়িকভাবে কিছুটা কমেছিল। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, এ সময় মজুরি এত কম ছিল যে একজন ক্রীতদাসকে প্রতিপালন করার চেয়ে একজন শ্রমিক ভাড়া করা অনেক সস্তা ছিল। আলেকজান্দ্রীয় যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে অনেক মহানগরীর সৃষ্টি হয়েছিল, যদিও এ যুগে অধিকাংশ লোকই স্বভাবতই গ্রামে বাস করত। তবে মানুষের মধ্যে শহরে যাওয়ার একটা প্রবণতা এ যুগে দেখা যায়। কারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারই অবশ্য এ যুগের শহরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। হেলেনিস্টিক যুগে নগরের সংখ্যা ও আয়তন এত দ্রুত বাড়তে থাকে যে, তাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকার অবস্থার সাথে তুলনা করা চলে। সিরিয়ার এ্যান্টিঅক নগরীর লোকসংখ্যা এক শতাব্দীর মধ্যে চারগুণ হয়ে যায়। হেলেনিস্টিক যুগের বৃহত্তম ও সবচেয়ে বিখ্যাত নগর ছিল আলেকজান্দ্রিয়া, তার লোকসংখ্যা ছিল ৫ থেকে ১০ লাখের মধ্যে। আকারে বা বৈভবে প্রাচীনকালের কোনো নগর, এমনকি রোম পর্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়াকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। এ নগরীতে অপূর্ব সব সার্বজনীন ভবন এবং উদ্যান ছিল, একটি মিউজিয়াম তথা বিদ্যাপীঠ ছিল এবং একটি গ্রন্থাগার ছিল, যাতে সাড়ে সাত লাখ পুস্তক সংরক্ষিত ছিল। এ নগরী ছিল হেলেনিস্টিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিচর্চার প্রধানতম কেন্দ্র।

www.icsbook.info

হেলেনিস্টিক যুগে দর্শনের দুটো সুস্পষ্ট ধারার প্রকাশ ঘটেছিল। মূল ধারায় ছিল স্টোয়িকবাদ ও এপিকিউরাসবাদ। এ দুটোই ছিল গ্রীক দর্শন। আর অপ্রধান ধারায় সমাবেশ ঘটেছিল বিভিন্ন প্রাচ্য ধর্মবিশ্বাসের। এপিকিউরাসবাদের প্রবর্তক ছিরেন গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস (৩২৪-২৭০ খৃঃ পূঃ) আর স্টোয়িকবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গ্রীক দার্শনিক জেনো (আনুমানিক ৩০০ খ্রিঃ পুঃ)। উভয় দর্শনেরই উদ্ভব ঘটেছিল ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকেঃ এ দুই দর্শনের মধ্যে কিছু কিছু মিল ছিল। উভয় দর্শনেরই লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির কল্যাণসাধন। উভয় দর্শনই ছিল বস্তুবাদী এবং আত্মিক পদার্থে অবিশ্বাসী। দুই দর্শনেই কিছু কিছু বিশ্বজনীনতার উপাদান ছিল। যেমন উভয় দর্শনই জগতের সব মানুষকে অভিন্ন বলে মনে করত এবং বলত যে গ্রীক ও বর্বর মানুষদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে এ দুই দর্শনের মধ্যে অনেক বিষয়ে অমিলও আছে। জেনোর মত ছিল এই যে, এ বিশ্বজগৎ মূলত সামঞ্জস্যপূর্ণ, তবে এতে মাঝে মাঝে যে অসঙ্গতি দেখা দেয় তার সমাধানের মধ্য দিয়েই পরম মঙ্গল লাভ করা যায়। স্টোয়িকবাদ অনুসারে, শান্ত মনের মধ্যেই পরম মঙ্গল নিহিত আছে। তাই তারা আত্মশাসন ও কর্তব্যপালনকে পরম সদগুণ বলে বিবেচনা করত। এপিকিউরাসবাদীরা মনে করত যে, আনন্দলাভের মধ্যেই পরম মঙ্গল নিহিত আছে। তবে লাম্পট্য বা ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে তারা আনন্দ বলে মনে করত না। ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তিকে তারা প্রয়োজনীয় ও মঙ্গলজনক মনে করত বটে; তবে মানসিক আনন্দ ও সদ্বিবেচনার আনন্দকেই তারা প্রকৃত আনন্দ বলে মনে করত। এপিকিউরাস ডেমোক্রিটাস-এর পরমাণু তত্ত্ব অংশত গ্রহণ করেছিলেন।

হেলেনিস্টিক দর্শনের অপর ধারা তথা যুক্তিবিরোধী ধারাটি চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করেছিল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যে— ফিলো জুডিয়াস এবং নব পিথাগোরীয়দের দর্শনে। এ দুই দর্শনের মধ্যে মূল বিষয়ে যথেষ্ট মিল ছিল। উভয় দর্শনই এক অজ্ঞেয় ও অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করত। উভয় মতের অনুসারীরাই মনে করত যে, এ জগৎ আত্মা এবং বস্তু এ দুই সুস্পষ্ট অংশে বিভক্ত। তারা মনে করত যে, বস্তু দ্বারা গঠিত সবকিছুই অমঙ্গলজনক এবং মানুষের আত্মা তার দেহে বন্দী হয়ে আছে। এদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অতীন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিবাদবিরোধী। তারা মনে করত বিজ্ঞান বা যুক্তি থেকে সত্যকে জানা যায় না, ঈশ্বরের কাছ থেকে অতিপ্রাকৃত উপায়ে সত্যকে লাভ করা যায়। ফিলো মনে করতেন যে, পুরাতন টেস্টামেন্টকে ঐশ্বরিকসূত্রে পাওয়া গেছে এবং তার মধ্যে সমস্ত সত্য নিহিত রয়েছে। ফিলো এবং নব পিথাগোরীয়গণ উভয় সম্প্রদায়ই খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের বিকাশে অবদান রেখেছিল।

বিশুদ্ধ গ্রীক সংস্কৃতি এবং হেলেনিস্টিক সংস্কৃতির পার্থক্য বিশেষ প্রকট হয়ে ওঠে ধর্মের ক্ষেত্রে। হেলেনিস্টিক যুগে বুদ্ধিজীবীরা গ্রীক নাগরিকদের সাধারণ ধর্মের পরিবর্তে স্টয়িকবাদ, এপিকিউরাসবাদ প্রভৃতিকে গ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাচ্যের অতীন্দ্রিয়বাদী ধর্মকে গ্রহণ করে। এক পর্যায়ে প্রাচীন মিশরীয় দেবী আইসিসের পূজা প্রসার লাভ করে। তারপর আবার ক্যালডীয়দের জ্যোতিষীয় ধর্মও প্রসার লাভ করে। এর ফলে স্বভাবতই জ্যোতিষচর্চা অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পায়। তবে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাব পড়েছিল জরথস্ত্রবাদের বিভিন্ন শাখার, বিশেষত

www.icsbook.info

মিথ্রাস্‌বাদের। এ যুগের মানুষ ইহজীবনের অসারতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে পরকালে সুখ-সম্পদ লাভের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে। এ যুগে মানুষ হতাশাবাদী, অতীন্দ্রিয়বাদী এবং অদৃষ্টবাদী হয়ে উঠেছিল। হেলেনিস্টিক যুগের ধর্মবিশ্বাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইহুদীদেরও কিছু অবদান ছিল। প্রথমে আলেকজান্ডার ও পরে রোমকরা প্যালেস্টাইন জয় করে নেয়ায় ইহুদীরা সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এরা অবশ্য স্বভাবতই গ্রীক ভাষা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু এ ইহুদীদের মাধ্যমেই আবার প্রাচ্য ধর্মবিশ্বাস গ্রীক জগতে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল।

আলেকজান্দ্রীয় বা হেলেনিস্টিক সাহিত্যের গুরুত্ব শুধু এ কারণে যে, তার মাধ্যমে ঐ সভ্যতার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকাংশ রচনাতেই কোনো মৌলিকতা বা চিন্তার গভীরতার ছাপ ছিল না। কিন্তু নকলনবিসদের হাত থেকে এত ব্যাপক সংখ্যায় এ সব বই বের হত যে তা অবিশ্বাস্য মনে হয়। এগার শতাধিক লেখকের নাম এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রতিবছর আরও হচ্ছে। এ সব পুস্তকের অধিকাংশই ছিল নিকৃষ্ট রচনা, তবে কয়েকটি রচনা সত্যই উৎকৃষ্ট ছিল।

হেলেনিস্টিক কাব্যের প্রধান রূপ ছিল নাটক ও দৃশ্যকাব্য। আর হেলেনিস্টিক নাটক ছিল প্রধানত মিলনান্তক। এ যুগের প্রধান নাট্যকার ছিলেন মিনাণ্ডার। গদ্যসাহিত্যে ঐতিহাসিক, জীবনীকার এবং কল্প-কাহিনীকারদেরই প্রাধান্য ছিল। এ যুগে শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন পলিবিয়াস। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের লোক। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ ও সত্যানুসন্ধানের দিক থেকে বিচার করলে প্রাচীনকালের ঐতিহাসিকদের মধ্যে একমাত্র পলিবিয়াসকেই থুকিডাইডিসের সাথে তুলনা করা চলে।

হেলেনিস্টিক শিল্প আগের যুগের গ্রীক শিল্পের সব মহৎ গুণকে বজায় রাখতে পারেনি। গ্রীক স্বর্ণযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে যে মানবতাবাদ, সামঞ্জস্য ও সংযমের প্রকাশ ঘটেছিল, হেলেনিস্টিক যুগে তার স্থলে মাত্রাতিরিক্ত বাস্তবতা, রোমাঞ্চ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার প্রকাশ ঘটে। হেলেনিক যুগের সরল গাম্ভীর্যপূর্ণ মন্দিরের পরিবর্তে হেলেনিস্টিক যুগে উদিত হয়েছিল বিলাসময় প্রাসাদ, ব্যয়বহুল অট্টালিকা, সুবিশাল সার্বজনীন ভবন এবং শক্তি ও বৈভবের প্রতীকস্বরূপ বিশাল স্মৃতিস্তম্ভ। হেলেনিস্টিক যুগের স্থাপত্যকর্মের একটা সুন্দর নিদর্শন হচ্ছে আলেকজান্দ্রিয়ার আলোকস্তম্ভ। সমুদ্র দিয়ে যাতায়াতকারী জাহাজসমূহের পথনির্দেশের জন্য এ আলোকস্তম্ভটি নির্মিত হয়েছিল। ত্রিতলবিশিষ্ট এ বিশাল ভবনটির উচ্চতা ছিল ৪০০ ফুট। হেলেনিস্টিক যুগের ভাস্কর্যে যদিও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও রোমাঞ্চের প্রকাশ ঘটেছিল, তার ব্যতিক্রমও আছে। ভেনাস ডি মিলো নামে পরিচিত আফ্রোডিটির মূর্তিটি এ যুগের একটি সার্থক সৃষ্টি।

হেলেনিস্টিক বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের ইতিহাসে আধুনিককালের সপ্তদশ শতাব্দীর আগে যে যুগটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রাচুর্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ ছিল, সেটি হল হেলেনিস্টিক সভ্যতার যুগ তথা আলেকজান্দ্রীয় যুগ। হেলেনিস্টিক যুগের তিনশ বছরের পরিসরে যতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সাধিত হয়েছে, নতুন পাথরের যুগের অবসান ও ব্রোঞ্জ যুগের আবির্ভাবের পর থেকে মধ্যযুগের অবসান ও ধনতন্ত্রের উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত আর কোনো

www.icsbook.info

যুগে তা হয়নি। বস্তুত হেলেনিস্টক যুগের প্রধান না হলে নগরীসমূহ, যথা, আলেকজান্দ্রিয়া, সায়রাকিউস, পার্গামাম প্রভৃতি স্থানে যেসব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সাধিত হয়েছিল সেগুলি ছাড়া আধুনিককালের অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সাধন সম্ভব হত না। হেলেনিস্টক তথা আলেকজান্দ্রীয় যুগে বিজ্ঞানের এহেন অভূতপূর্ব অগ্রগতির বিশেষ কারণ আছে। আলেকজান্দ্রীয় যুগে সমগ্র গ্রীক সাম্রাজে কৃষি ও বাণিজ্যের বিশেষ অগ্রগতি ঘটেছিল, আমরা আগেই দেখেছি। এর ফলে শিল্প উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছিল। শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির মানসে শ্রমবিভাগও এ যুগে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যেমন, যারা পাথর কাটত তারা হাতিয়ারে শান দিত না। এ যুগে শিল্পে দাসশ্রম নিয়োগের প্রথাও সাময়িকভাবে কমে গিয়েছিল, শ্রমিকরা ছিল স্বাধীন মানুষ। এ রকম সামাজিক পরিবেশ কারিগরি আবিষ্কারের অনুকূল। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, গ্রীক জ্ঞানবিজ্ঞানের সাথে ক্যালডীয় ও মিশরীয় বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটায় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এ যুগে বিশেষ উদ্দীপনা লাভ করে।

আলেকজান্দ্রীয় যুগে যে সকল বিজ্ঞানের বিশেষ চর্চা হয়েছিল, সেগুলি হল জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, ভূগোল, চিকিৎসাবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা। ধাতুবিদ্যার কথা বাদ দিলে, রসায়নবিদ্যা প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। জীববিদ্যারও বিশেষ চর্চা হয়নি। তবে এ যুগের একজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন যে, উদ্ভিদেরও যৌন বিভাগ অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষে ভেদ আছে। এটি নিঃসন্দেহে জীববিদ্যার একটি বড় আবিষ্কার। উল্লেখ করা যেতে পারে, এ্যারিস্টটল মনে করতেন যে, উদ্ভিদের মধ্যে যৌন বিভাগ নেই। সে যুগের শিল্প ও বাণিজ্যের সাথে রসায়ন ও জীববিদ্যার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না বলে এ দুই শাস্ত্রের কোনো বাস্তব উপযোগিতা আছে বলে মনে করা হত না। সম্ভবত এ কারণেই এ দুই বিজ্ঞানের বিশেষ কোনো চর্চা আলেকজান্দ্রীয় যুগে হয়নি।

আলেকজান্দ্রীয় যুগের প্রথম দিকের একজন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ হলেন সামোসের এ্যারিস্টার্কাস (৩১০-২৩০ খ্রিঃপূঃ)। তাঁকে প্রায়শ হেলেনিস্টিক যুগের কোপার্নিকাস নামে অভিহিত করা হয়। এর কারণ হচ্ছে, তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারদিকে আবর্তন করে। দুঃখের বিষয় যে, তাঁর পরবর্তী জ্যোতির্বিদরা এ সঠিক মতকে গ্রহণ করেননি। কারণ এ মত ছিল এ্যারিস্টটলের শিক্ষার বিরোধী এবং গ্রীকদের মানবকেন্দ্রিক চিন্তারও বিরোধী। তা ছাড়া ইহুদী ও প্রাচ্যবাসীদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গেও সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। এ কারণে এ্যারিস্টার্কাসের সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ প্রচলিত হতে পারেনি। হেলেনিস্টিক যুগের অপর গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতির্বিদ হলেন হিপার্কাস (১৯০-১২০ খ্রিঃপূঃ)। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ায় তাঁর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করেন। তিনি জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত এ্যাস্ট্রোল্যাব যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, চন্দ্রের ব্যাসের প্রায় সঠিক মান নির্ণয় করেন, পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব নির্ণয় করেন এবং আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। অবশ্য পরবর্তীকালে আলেকজান্দ্রিয়ায় শেষ বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ টলেমীর খ্যাতির কাছে হিপার্কাসের খ্যাতি ম্লান হয়ে গিয়েছিল। ক্লডিয়াস টলেমী দ্বিতীয় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ায় জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন। টলেমীর নিজের মৌলিক আবিষ্কারের সংখ্যা বেশি নয়, কিন্তু তিনি অন্যান্য বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ফলাফলকে সূত্রবদ্ধভাবে উপস্থাপিত করেন। টলেমীর সর্বশ্রেষ্ঠ

www.icsbook.info

জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের নাম 'আল মাজেস্ট'। এ গ্রন্থটি ভূকেন্দ্রিক তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত। টলেমীর এ গ্রন্থখানি মধ্যযুগের ইউরোপে প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যার সারসঙ্কলন হিসাবে সমাদৃত হয়েছিল।

হেলেনিস্টিক যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত গণিতবিদ ছিলেন ইউক্লিড (আনুমানিক ৩২৩-২৮৫ খ্রিঃপূঃ) তাঁর রচিত 'এলিমেন্টস' নামক জ্যামিতি গ্রন্থখানি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত জ্যামিতিবিষয়ক মূল গ্রন্থরূপে সমাদৃত হয়েছে। ইউক্লিডকে ভুলক্রমে গ্রীক জ্যামিতির প্রতিষ্ঠাতারূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আসলে তাঁর গ্রন্থে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্যের আবিষ্কৃত উপপাদ্য প্রণালীবদ্ধভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে মাত্র। ইউক্লিডের জ্যামিতির অধিকাংশ উপপাদ্যই থালেস, পিথাগোরাস প্রমুখ গণিতবিদদের আবিষ্কৃত, কিন্তু সে সমস্ত উপাপাদ্যকে সূত্রবদ্ধভাবে উপস্থাপন করার বিশেষ প্রণালীটি ইউক্লিডের নিজস্ব অবদান।

হেলেনিস্টিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক গণিতবিদ ছিলেন হিপার্কাস। তিনি সমতলীয় ও বৃত্তীয় ত্রিকোণমিতির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। আলেকজান্দ্রীয় যুগের একজন শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ ছিলেন আর্কিমিডিস (২৮৭-২১২ খ্রিঃ পূঃ)। তিনি জ্যামিতি ও ঘন জ্যামিতির অনেক প্রতিজ্ঞার প্রমাণ আবিষ্কার করেছিলেন। সংখ্যাতত্ত্বের গবেষণার সূত্রে তিনি সূচক॥ নিয়মের আবিষ্কার করেছিলেন। আর্কিমিডিস হলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অন্যতম। তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা পরে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এ যুগের অপর একজন বিখ্যাত গণিতবিদ হলেন এপোলোনিয়াস (আনুমানিক ২৬২-২০০ খ্রিঃ পূঃ)। জ্যামিতিতে তাঁর অনেক মৌলিক অবদান আছে।

হেলেনিস্টিক যুগে ভূগোলবিদ্যায় বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল ইরাটোস্থেনিস-এর দরুণ। ইরাটোস্থেনিস (আনুমানিক ২৭৬-১৯৫ খ্রিঃ পূঃ) ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও একাধারে জ্যোতির্বিদ, কবি ও ভাষাতাত্ত্বিক। কয়েকশ' মাইল তফাতে দুটো সূর্যঘড়ি স্থাপন করে তার থেকে হিসাব করে তিনি পৃথিবীর পরিধির দৈর্ঘ্য নিরূপণ করেছিলেন। ভূপৃষ্ঠকে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে বিভক্ত করে তিনি ভূপৃষ্ঠের নিখুঁত মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। তিনি এ তত্ত্বের উদ্‌গাতা ছিলেন যে, পশ্চিম দিকে যাত্রা করে ভারতবর্ষে পৌঁছান সম্ভব।

আলেকজান্দ্রীয় যুগে চিকিৎসাবিদ্যায় বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে হিরোফিলাস-এর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শুরুতে আলেকজান্দ্রিয়ায় গবেষণায় রত ছিলেন। শারীরস্থান বা এ্যানাটমি বিষয়ে তিনি ছিলেন প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তিনি মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের নিখুঁত বিবরণ প্রদান করেছিলেন। তিনি আবিষ্কার করেন যে, ধমনীর মধ্যে দিয়ে হৃৎপিণ্ড থেকে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়। হিরোফিলাসের সুযোগ্য সহকর্মী ছিলেন ইরাসিস্ট্রেটাস। তিনিও খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকেরই মধ্যভাগে আলেকজান্দ্রিয়াতে গবেষণা পরিচালনা করেন। ইরাসিস্ট্রেটাসকে শারীরবৃত্ত বা ফিজিওলজির প্রতিষ্ঠাতারূপে গণ্য করা হয়। তিনি শুধু মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদই করেননি, জীবন্ত প্রাণীদেহ ব্যবচ্ছেদ করে তিনি দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন । তিনি হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা আবিষ্কার করেছিলেন, চালক স্নায়ু এবং অনুভূতিবাহী স্নায়ুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছিলেন এবং ধমনী ও শিরার শাখা-প্রশাখাগুলি যে শেষ পর্যন্ত পরস্পরের সাথে যুক্ত হয় এ

www.icsbook.info

সত্য আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি রক্তমোক্ষণ দ্বারা চিকিৎসা করার অসারতা প্রতিপন্ন করেছিলেন।

বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস (আনুমানিক ২৮৭-২১২ খ্রিঃ পূঃ) পদার্থবিদ্যাকে দর্শন থেকে পৃথক একটি বিদ্যা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর্কিমিডিস ভাসমান পদার্থের নিয়ম এবং স্থিতিবিদ্যার অনেকগুলি নিয়ম আবিষ্কার করেন। তিনি অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারিগরি আবিষ্কারও সাধন করেন।

আলেকজান্দ্রিয়ার হিরো নামক বিজ্ঞানী অনেকগুলি যান্ত্রিক আবিষ্কার সাধন করেছিলেন। হিরো ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর লোক। তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলির মধ্যে রয়েছে উন্নত ধরনের সাইফন, পানিচালিত অর্গান বাদ্যযন্ত্র, জেট ইঞ্জিন ইত্যাদি বহু কিছু। প্রতিকূল সামাজিক আবহাওয়ার জন্য হিরোর যান্ত্রিক আবিষ্কারসমূহ ঐ সময়ে কোনো কাজে লাগেনি। তথাপি সে যুগে এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারসাধন সত্যই বিস্ময়কর।

www.icsbook.info

রোমক সভ্যতা

গ্রীসীয় সভ্যতা যখন বিকাশের উচ্চস্তরে প্রবেশ করেছে, তখন ভূমধ্যসাগরের মধ্য অঞ্চলে এ্যাপেনাইন উপদ্বীপ তথা ইটালীয় উপদ্বীপকে আশ্রয় করে আরেকটি সভ্যতার উদয় ঘটেছিল। এটাই সুবিখ্যাত রোমক সভ্যতা।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

গ্রীসীয় উপদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত এ্যাপেনাইন উপদ্বীপ ইটালি এবং সিসিলি দ্বীপ ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে সেতুরূপে বিরাজ করছে। ইটালীয় উপদ্বীপের মধ্যভাগ দিয়ে তার দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত রয়েছে এ্যাপেনাইন পর্বতশ্রেণী। এ উপদ্বীপ পার্বত্য হলেও গ্রীসের মত দুর্গম নয়। পর্বতের উভয় পাশে, পর্বত ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী অংশে, চাষাবাদ ও পশুপালনের উপযোগী বিস্তৃত উপত্যকা ছিল। ইটালীয় প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল কাঠ ও ধাতু (বিশেষত তামা ও টিন)।

উপদ্বীপের মধ্যভাগে রয়েছে টাইবার নদী। পাহাড়ে এর উৎপত্তি এবং পশ্চিমাংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এটা সমুদ্রে পড়েছে। উত্তরে অবস্থিত আল্পস্ পর্বতশ্রেণী এ উপদ্বীপকে উত্তরের শীতল বায়ুর হাত থেকে রক্ষা করেছে, এর আবহাওয়া তাই উষ্ণ। গ্রীসের চেয়ে এখানে বৃষ্টিপাত বেশি এবং জমিও বেশি উর্বর। দক্ষিণের সিসিলি দ্বীপের আবহাওয়া উষ্ণতর এবং ফসলও সমৃদ্ধতর।

আদি অধিবাসী

পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, অন্ততপক্ষে উচ্চতর পুরোপলীয় যুগে ইটালিতে লোকবসতি ছিল। এ সময় দক্ষিণ ফ্রান্সের ক্রোমানিয়ন জাতির সমগোত্রীয় মানুষ এখানে বাস করত। নবোপলীয় যুগে আফ্রিকা, স্পেন ও গল থেকে নতুন জাতির মানুষ এখানে আগমন করে। অতপর ব্রোঞ্জযুগের শুরুতে একাধিক নতুন অভিযান ঘটে। আল্পস্-এর উত্তরাঞ্চল থেকে ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা এখানে এসে বাস স্থাপন করে। এ সকল নবাগত কৃষিজীবী পশুপালক গোষ্ঠী ইটালিতে প্রথম ঘোড়া ও চাকাওয়ালা গাড়ির প্রচলন করে। এদের সংস্কৃতি ছিল ব্রোঞ্জভিত্তিক, যদিও ১০০০

www.icsbook.info

খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর এরা লোহার ব্যবহার আয়ত্ত করে। এ সকল ইণ্ডো-ইউরোপীয় আক্রমণকারীরাই ছিল রোমকসহ সকল ইটালির জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ। জাতিগতভাবে এরা ছিল সম্ভবত গ্রীস আক্রমণকারীদের সাথে সম্পর্কিত। এ ইণ্ডো-ইউরোপীয়দের একটা প্রধান শাখার নাম ছিল ল্যাটিন; এরা টাইবার নদীর দক্ষিণে বিস্তৃত সমভূমিতে বাস স্থাপন করেছিল এবং এ সমগ্র অঞ্চলটা ল্যাটিয়াম নামে পরিচিত হয়েছিল। উক্ত জাতির অন্যান্য শাখা ইটালীয় উপদ্বীপের মধ্যে ও পূর্বাঞ্চলে বাস স্থাপন করে।

সর্বশেষ আরও দুটো নবাগত জাতি ইটালীয় উপদ্বীপের বিভিন্ন অংশ অধিকার করে। ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যেই এট্রুস্কান জাতি উত্তরাঞ্চলের পো নদীর অববাহিকায় বাস স্থাপন করে এবং তার দক্ষিণাংশে অধিকার বিস্তার করে। তাদের অধিকৃত অঞ্চল এট্রুরিয়া নামে পরিচিত হয়। গ্রীকরা খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর পর থেকে দক্ষিণ ইটলির উপকূলবর্তী অঞ্চলে এং সিসিলির পূর্বাঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করতে থাকে। ব্যাপকসংখ্যক গ্রীক উপনিবেশের উপস্থিতির জন্য এ অঞ্চল একদা ম্যাগনা গ্রীসিয়া বা বৃহত্তর গ্রীস নামে পরিচিত হয়েছিল। গ্রীকরাই প্রথম এ্যাপেনাইন উপদ্বীপের দক্ষিণাংশের নামকরণ করে ইটালীয়া। কালক্রমে সমগ্র উপদ্বীপটিই এ নামে পরিচিত হয়।

এট্রুস্কানদের সভ্যতা

রোমের প্রাচীন ইতিহাসে এট্রুস্কানদের এক বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। বস্তুত খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে এট্রুস্কানরা প্রায় সমগ্র ইটালি উপদ্বীপে অধিকার বিস্তার করেছিল। এখন পর্যন্ত ইটালীতে এট্রুস্কানদের শহর, দুর্গ, প্রাসাদ ও সমাধির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এট্রুস্কানরা মূলত ছিল কৃষিজীবী। তবে এট্রুস্কান কারিগররা ধাতু, হাতীর দাঁত ও সোনা দিয়ে সুন্দর সুন্দর সামগ্রী তৈরির কাজে বিশেষ দক্ষ ছিল। এট্রুস্কানরা গ্রীক, মিশরীয় ও অন্যান্য জাতির সাথে জলপথে বাণিজ্য করত। সে যুগে বণিক নাবিকরা সচরাচর জলদস্যুতার কাজেও লিপ্ত হত এবং এট্রুস্কান জলদস্যুদের সকলে ভয় করে চলত।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এট্রুস্কানদের শাসনব্যবস্থা ছিল রাজতন্ত্র ভিত্তিক। অভিজাত শ্রেণীর সহযোগিতায় রাজা শাসন পরিচালনা করতেন। জনসাধারণের ব্যাপক অংশই ছিল দাস ও ভূমিদাস। এ সময় ইটালিতে বারটি এট্রুস্কান নগর এক জোট গঠন করেছিল। এ সময়ের আগেই রোম নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু তা ছিল এট্রুস্কানদের অধীন। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে রোমে এক এট্রুস্কান রাজবংশ রাজত্ব করত। এ সময় রোমের নাগরিকদের মধ্যে বহুসংখ্যক এট্রুস্কান কারিগর প্রভৃতি ছিল এবং রোমের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বহু পরিমাণে এট্রুস্কান আচার ও রীতিনীতি প্রচলিত ছিল।

কালক্রমে এট্রুস্কানদের ক্ষমতা কমে আগে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এট্রুস্কান শহরগুলির মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। দক্ষিণ ইটালিতে গ্রীকদের সাথে বিবাদেও এট্রুস্কানরা পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত রোমের নেতৃত্বে ইটালীয় জাতিসমূহের এক

www.icsbook.info

অভ্যুত্থানের ফলে ইটালীতে এট্রুস্কানদের ক্ষমতার অবসান ঘটে।

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে বহুসংখ্যক এট্রুস্কান প্রস্তরলিপি পাওয়া গেছে, কিন্তু তাদের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। তাই এট্রুস্কানদের সম্পর্কে অনেক তথ্য এখনও অজানা রয়ে গেছে।

রোমের আদি ইতিহাসঃ রাজতন্ত্র

টাইবার নদীর বাম তীরে মোহনা থেকে ১৫ মাইল অভ্যন্তরে, প্রাচীন রোমক ঐতিহাসিকগণের মতে ৭৫৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, রোম নগরী স্থাপিত হয়েছিল। তবে এ তারিখ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা কঠিন । লোকশ্রুতি অনুসারে নির্বাসিত দুই রাজপুত্র রোমুলাস এবং রেমাস সিংহাসন পুনরাধিকার করে রোম নগরী নির্মাণ করেন; রোমুলাস-এর নাম অনুসারেই রোম নগরীর নামকরণ হয়। প্রথম পর্যায়ে রোমে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। রোমুলাস-এর পর ছয়জন রাজা রাজত্ব করেন, এঁদের মধ্যে শেষ তিনজন এট্রুস্কান বংশীয়। এঁদের শাসনকালে রোম এক বৃহৎ ও সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হয় এবং ল্যাটিয়ামের অন্যান্য নগররাষ্ট্র রোমের কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে।

রোমের রাজতন্ত্র অবশ্য একেবারে নিরঙ্কুশ ছিল না। রোমের রাজতন্ত্রের শাসনব্যবস্থায় গণসভা ও সিনেট-এর স্থান ছিল। রাজ্যের সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের নিয়ে গণসভা গঠিত হত এবং এর মূল দায়িত্ব ছিল কার্যত আইন ও ফর্মান অনুমোদন করা। সিনেট বা প্রধানদের পরিষদ গঠিত হত ক্ল্যান বা গোত্রসমূহের প্রধানদের নিয়ে। রাজা কর্তৃক প্রস্তাবিত আইন বা ফর্মান পরীক্ষা করে দেখার, এমনকি নাকচ করার অধিকার ছিল এ পরিষদের।

রোমের সবশেষের আগের রাজা সার্ভিয়াস টুলিয়াস এক সামাজিক সংস্কার সাধনের জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। তিনি রোমের জনগণকে চারটি জেলা বা গোষ্ঠীতে ভাগ করেন। এ ছাড়া জনসাধারণকে সম্পত্তি ও আয় অনুযায়ী পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। দরিদ্রতম নাগরিক এ শ্রেণী বিভাগের বাইরে ছিল এবং তাদের বলা হত প্রলেটারিয়েট বা সর্বহারা। ইতিপূর্বে রোমের জনগণ তিনটি গোষ্ঠী বা ট্রাইবে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি ট্রাইব দশটি করে কিউরিয়ায় এবং প্রতিটি কিউরিয়া একাধিক ক্ল্যান বা গোত্রে বিভক্ত ছিল।, আর প্রতিটি ক্ল্যান গঠিত হত একাধিক পরিবার নিয়ে। এ পরিবার ও পরিবারকর্তা রোমের সমাজজীবনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে রোমে রাজতন্ত্র উৎখাত করে এক অভিজাত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিদেশী এট্রুস্কান শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ অসন্তোষ এ রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে অনুমান করা হয়ে থাকে।

প্রজাতান্ত্রিক রোমঃ প্রথম পর্যায়

রোমে ৫০৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অবশ্য অভিজাত সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত ছিল এবং প্রজাতান্ত্রিক যুগে দাসভিত্তিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক রোমে দ্রুত বিকাশ লাভ করে এবং ক্রমে দাসশ্রম

www.icsbook.info

www.icsbook.info

রোমের অর্থনৈতিক উৎপাদনের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। রোমক রাষ্ট্রশক্তির বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়েই সেখানে উন্নত দাস-অর্থনীতির প্রসারের কারণ হল বাহিরিক প্রভাব। সিসিলিতে ফিনিশীয় তথা কার্থেজীয়দের এবং দক্ষিণ ইটালীতে গ্রীকদের উপনিবেশ ছিল এবং এদের মধ্যে দাসভিত্তিক ব্যবস্থা যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছিল। ইটালীয় উপদ্বীপের উত্তরাংশে এট্রুস্কানদের দাসভিত্তিক ব্যবস্থাও পরিণত রূপ লাভ করেছিল। এ সকলের প্রভাবেই রোমে অতি দ্রুত উচ্চতর দাসব্যবস্থা প্রসার লাভ করেছিল। তবে রোমের ইতিহাসের একেবারে শুরুতে সেখানে দাসের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম ছিল।

রাজতন্ত্র উৎখাতের পর রোমের মানুষরা শাসনব্যবস্থার সংস্কার করে। রাজার পরিবর্তে দুজন সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত হতেন, এঁদের বলা হত কন্সাল। উভয় কন্সালই সমান ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন এবং জরুরি অবস্থায় এঁদের একজন সর্বময় ক্ষমতা লাভ করতেন, তাঁকে তখন বলা হত ডিক্টেটর।

রোম প্রজাতন্ত্রে মূল ক্ষমতার আধার ছিল সিনেট, তিনশত গোত্রপ্রধান ছাড়াও সাবেক কন্সালগণ ও অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীরা সিনেটের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সিনেটের প্রধান কাজ ছিল প্রতিবছর দুজন করে কন্সাল নির্বাচিত করা; গণসভা কর্তৃক গৃহীত সকল প্রস্তাব ও আইন পরীক্ষা করে তা অনুমোদন অথবা নাকচ করা এবং ভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুমোদন করা; রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ করা।

রোমে গণসভার প্রাথমিক রূপ ছিল কিউরিয়াসমূহের সভা (comitia Curiata)। রোমের সকল নাগরিকদের নিয়ে এটা গঠিত হত। এ গণসভার কাজ ছিল রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন করা, কন্সালদের নির্বাচন অনুমোদন করা, যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয়া। সার্ভিয়াস টুলিয়াসের পূর্ববর্ণিত সংস্কারের ফলে যে নতুন সেন্টুরিয়া-সভা(Comita Centuriata) গঠিত হয় কালক্রমে সেটাই কিউরিয়াগুলির সভার সকল ক্ষমতার অধিকারী হয়। এছাড়া সেন্টুরিয়া সভায় সকল উচ্চ কর্মচারীদেরও নির্বাচিত করা হত।

আপাতদৃষ্টিতে গণসভা হলেও সেন্টুরিয়া সভাকে উচ্চশ্রেণীগুলি কৌশলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। সেন্টুরিয়াগুলির নতুন সভায় নাগরিকরা সৈন্যদের কায়দায় সংঘবদ্ধ হত একশ লোকের এক একটি বাহিনীতে (সেন্টুরিয়া বা শত জন); এবং প্রত্যেক সেন্টুরিয়ার একটি করে ভোট থাকত। কিন্তু ইতিপূর্বে বর্ণিত প্রথম শ্রেণীর ছিল ৮০টি সেন্টুরিয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর ২২টি, তৃতীয় শ্রেণীর ২০টি, চতুর্থ শ্রেণীর ২২টি, পঞ্চম শ্রেণীর ৩০টি, ষষ্ঠ বা প্রলেটারিয়েট শ্রেণীর ছিল শুধু শোভনতার জন্য একটিমাত্র সেন্টুরিয়া। এ ছাড়া সর্বাপেক্ষা ধনীদের নিয়ে ১৮টি সেন্টুরিয়া গঠন করা হত। সব মিলিয়ে ছিল ১৯৩ টি সেন্টুরিয়া। সংখ্যাধিক্যের জন্য প্রয়োজন ছিল ৯৭টি ভোটের এবং কেবল প্রথম শ্রেণী ও ধনী অশ্বারোহীদের মিলিয়েই হত ৯৮ ভোট, ফলে এরা একমত হলেই অন্য শ্রেণীর মত ছাড়াই এরা বৈধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারত। ফলত, শুধু অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাই সিনেট সদস্য, কন্সাল ইত্যাদি হতে পারতেন।

প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের সংগ্রাম

রাজতন্ত্রের অবসানের আগেই রোমের জনগণ প্যাট্রিসিয়ান এবং প্লিবিয়ান এ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। প্রাচীনকাল থেকে যেসব পরিবার রোমে বাস করে এসেছিল তারাই নিজেদের প্যাট্রিসিয়ান বলত। এরাই সিনেট সদস্যদের পদ এবং কন্সাল

www.icsbook.info

ও সকল গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদ একচেটিয়াভাবে অধিকার করে থাকত।

এ সুবিধাভোগী শ্রেণীর বাইরে যারা ছিল, তাদের বলা হত প্লিবিয়ান। ইটালির বিভিন্ন স্থান থেকে স্বাভাবিকভাবেই অনেক লোক এসে রোমে বসবাস করত। এ ছাড়া রোমকরা অন্যান্য নগররাষ্ট্রসমূহ জয় করে সেখানকার কৃষক কারিগরদের ভূসম্পত্তি দখল করে তাদের রোমে এসে বসবাস করতে বাধ্য করত। এ নবাগতরা এবং তাদের বংশধররাই ক্রমে প্লিবিয়ান বা সাধারণ লোক নামে পরিচিত হয়েছিল। অধিকাংশ প্লিবিয়ান যদিও দরিদ্র কৃষক ও কারিগরই ছিল, তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ধনী ব্যবসায়ী, জাহাজ-মালিক ইত্যাদিও ছিল।

রোমান সমাজে প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের অবস্থান ছিল দুটি বিপরীত মেরুতে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্যাট্রিসিয়ানগণ সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। তাদের মধ্য থেকে কন্সাল নিযুক্ত করা হত এবং কাউন্সিল অব এন্ডার্স ও সিনেটের সদস্য নিযুক্ত হত তারাই। ম্যাজিস্ট্রেট, পুরোহিত ও অন্যান্য রাজকীয় বড় বড় পদগুলি তাদের জন্য নির্দিষ্ট করা হত। প্লিবিয়ানগণ শুধুমাত্র সেন্টুরিয়া সভাতে কিছুসংখ্যক আসন গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু যেহেতু সেন্টুরিয়া সভার কাজ ছিল ম্যাজিস্ট্রেট-এর প্রস্তাবগুলিকে সমর্থন করা, কাজেই এক অর্থে এটা প্যাট্রিসিয়ানদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। অর্থনৈতিকভাবেও প্লিবিয়ানগণ ছিল সব দিক দিয়ে বঞ্চিত। অত্যাচারী প্যাট্রিসিয়ান ম্যাজিস্ট্রেটদের শাসনে তাদের জীবন ও সম্পত্তির কোনো নিরাপত্তা ছিল না। রাষ্ট্রীয় করভার বিপুলভাবে তাদের উপর চাপান হত, অন্যদিকে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করা ছিল তাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

বিচারবিভাগেও প্যাট্রিসিয়ানদের প্রতি ব্যবহার ছিল পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। অন্যদিকে রোমান আইন লিপিবদ্ধ না থাকার দরুন প্লিবিয়ানগণ তাদের অধিকার কতখানি, সে সম্বন্ধেও অবহিত ছিল না; রোমান কন্সালগণ যেভাবে খুশি সে সকল আইনের ব্যাখ্যা করতেন। অনেক ক্ষেত্রে প্লিবিয়ানদের ঋণের দায়ে ক্রীতদাস বানানোর প্রথাও রোমান সমাজে প্রচলিত ছিল।

এ সকল অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে প্লিবিয়ানগণ শেষ পর্যন্ত প্যাট্রিসিয়ানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়। প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের মধ্যে এ সংঘর্ষ প্রায় দু'শ বছর ধরে চলে।

৪৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্লিবিয়ানগণ তাদের নিজস্ব ট্রিবিউন নির্বাচিত করার অধিকার অর্জন করে। প্লিবিয়ানদের নিজস্ব প্রতিনিধিদের বলা হত ট্রিবিউন। প্যাট্রিসিয়ান ম্যাজিস্ট্রেটদের অবৈধ কার্যকলাপের উপর ভেটো প্রয়োগ করার ক্ষমতা ট্রিবিউনদের দেয়া হয়। অধিকন্তু প্রত্যেক ট্রিবিউনের বাড়ির দরজা সর্বক্ষণ প্লিবিয়ানদের আশ্রয় গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।

ট্রিবিউনদের নেতৃত্বে প্লিবিয়ানগণ তাদের অন্যান্য অধিকার অর্জনে অগ্রসর হয়। এবার তাদের সংগ্রাম হল জমির জন্য সংগ্রাম। রোমানগণ যখনই কোনো নতুন দেশ জয় করত, তখন সে দেশের কৃষিযোগ্য জমির বিপুল অংশ সরকারি সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করে নিত। এ সকল দেশ জয়ের পুরো কৃতিত্বই ছিল প্লিবিয়ানদের। কিন্তু প্যাট্রিসিয়ানগণ এ-সকল কৃষিজমির প্রায় সম্পূর্ণটাই দাবি করতে শুরু করে। স্বভাবতই প্লিবিয়ানগণও

www.icsbook.info

তাদের অংশ দাবি করে। কিন্তু জমিসংক্রান্ত বিষয়ে কোনো নিষ্পত্তি শেষ পর্যন্ত হয়নি। এ সমস্যার সমাধান না হওয়ার ফলেই শেষ পর্যন্ত রোম প্রজাতন্ত্র তার চরম বিপর্যয় ডেকে ধ্বংসের কবলে পতিত হয়।

খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দে প্লিবিয়ানদের আরেক দফা বিজয় সূচীত হয় লিখিত রোমান আইন আদায়ের মাধ্যমে। বারটি ব্রোঞ্জের পাতের উপর সমগ্র রোমান আইন সঙ্কলিত করা হয়। এ কারণে এর নাম দেয়া হয় বার দফা আইন সঙ্কলন। এতে প্যাট্রিসিয়ান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কোনো প্লিবিয়ানের উপর অবৈধভাবে জারিকৃত প্রাণদণ্ডাদেশ-এর বিরুদ্ধে আপীল করার অধিকার দেয়া হয়। কিন্তু ঋণের দায়ে ক্রীতদাস বানানোর প্রথাকে এ আইনের দ্বারা বাতিল করা হয়নি।

পরবর্তী ধাপে প্লিবিয়ানদের প্রায় ম্যাজিস্ট্রেটদের সমমর্যাদাসম্পন্ন অধিকার দেয়া হয় এবং ৩৩৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে প্রথম প্লিবিয়ান কন্সাল নিযুক্ত হন। যেহেতু প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী রোমের কন্সালগণ তাঁদের কার্যকালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর সিনেটের সদস্য হতে পারতেন, এখন থেকে তাই সিনেটে প্যাট্রিসিয়ানদের একচেটিয়া আধিপত্য বিলুপ্ত হল।

প্লিবিয়ানদের সর্বশেষ বিজয় লাভ ঘটে ২৪৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যখন হর্তেনসীয় আইনে (রোমের শাসক কুইন্টাস হর্তেনসীয়াস-এর নামানুসারে) ঘোষণা করা হয় যে, গণসভা কর্তৃক জারিকৃত যে কোনো আইন— তা সিনেট অনুমোদন করুক— বা না করুক॥ রাষ্ট্রের উপর বলবৎ হবে।

প্যাট্রিসিয়ানদের বিরুদ্ধে প্লিবিয়ানদের এই সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে অহিংস পদ্ধতিতে, সশস্ত্র পদ্ধতিকে পরিহার করে। প্লিবিয়ানগণ তাদের দাবি মানতে বাধ্য করার জন্য দু'বার একত্রে দল বেঁধে শহর পরিত্যাগ করে চলে যায় এবং পাহাড়ের উপর নতুন নগর তৈরী করার ভয় দেখায়। এ পদ্ধতিকে বলা হত সিসেশান। এতে আশানুরূপ ফল পাওয়া গিয়েছিল।

প্যাট্রিসিয়ানদের বিরুদ্ধে প্লিবিয়ানদের বিজয়ের ফলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কতকগুলি সুবিধালাভ ঘটে। রোমান ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা খর্ব করে প্লিবিয়ানদের শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু এটা কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচীত করেনি। রাষ্ট্রযন্ত্র পূর্বের মতোই স্বৈরাচারী থেকে যায়। শাসনযন্ত্রে প্লিবিয়ানদের অংশগ্রহণের অধিকার জনগণের উপর রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী শাসনের এতটুকু অবসান ঘটায়নি। সিনেটের প্রবল প্রতাপ পূর্বের মতই বহাল থাকে। এতে প্লিবিয়ানদের সদস্য হওয়ার সুযোগ দিলেও, সিনেটের প্রতি রোমের জনগণের অচলাভক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এর ক্ষমতাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রূপে টিকিয়ে রাখে।

রোমের সামরিক অভিযান

খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে রোমের রাজ্যবিস্তার শুরু হয়। পঞ্চম শতাব্দীতে রোম তার প্রতিবেশী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ভলসি ও একুই নামক দুটি জাতিকে পরাজিত করার পর টাইবার নদীর দক্ষিণ তীরস্থ ভূভাগ রোমের করতলগত হয়। এগুলি রোমের প্রথম সফল অভিযান। কিন্তু খ্রিঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে রোম এক

www.icsbook.info

মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়। উত্তর ইটালির পথে অগ্রসর হয়ে গল জাতি ৩৯০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রোমের উপর আক্রমণ চালায়। আলিয়া নদীর তীরে রোমক বাহিনী গলদের হাতে নিদারুণভাবে পরাজিত হয় এবং গলবাহিনী রোম দখল করে নেয়। ব্যাপকভাবে রোম শহরে লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পরে গলবাহিনী আবার উত্তর দিকে ফিরে যায়। রোমক সৈন্যরা শুধুমাত্র রোম নগরীর ক্যাপিটল হিল নামক অংশটুকু গলদের হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়। গলদের প্রত্যাবর্তনের পরে নতুন করে রোম শহরটিকে পুনর্নির্মাণ করা হয়।

রোমের এই আপাতদুর্যোগের সুযোগ নিয়ে তার পূর্বতন শত্রুরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে খ্রিঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে রোমকে ভলসি, এট্রুস্কান, স্যামনাইটদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হয়। স্যামনাইটদের বিরুদ্ধে রোমকে তিনতিনবার যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয় এবং সম্মিলিত ইটালীয় শক্তিগুলিকে তার মোকাবেলা করতে হয়। দীর্ঘদিনব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রোম এ সকল শত্রুদের পরাজিত করে মধ্য ইটালির সমগ্র অঞ্চল অধিকার করে নেয়। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে রোম ইটালির বাকি অংশটুকু অধিকার করতে অগ্রসর হয়। কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহর রোমের আধিপত্য মেনে নিলেও দক্ষিণের একটি বড় নগর ট্যারেন্টাম রোমের আধিপত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ট্যারেন্টামের অধিবাসীরা উত্তর-পশ্চিম গ্রীসের অন্তর্গত এপিরাস-রাজ্যের রাজা পিরাস-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।

গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের বংশধর পিরাস-এর ইচ্ছা ছিল আলেকজাণ্ডারের মতোই একটি বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হওয়া। ট্যারেন্টাম-এর অধিবাসীদের সাহয্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে পিরাস রোমের দিকে তাঁর সামরিক বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। ২৮০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পিরাস-এর বাহিনী ইটালিতে উপস্থিত হয় এবং রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে। আরও উত্তরে অগ্রসর হয়ে আসকুলাম-নামক স্থানে তারা রোমানদের দ্বিতীয়বার পরাজিত করে। কিন্তু পিয়াস-এর বহিনী এ যুদ্ধে এত বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় যে পিরাস নাকি বলেছিলেন, 'আরেকটি যুদ্ধে যদি আমি এভাবে জয়লাভ করি তাহলে আমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।'

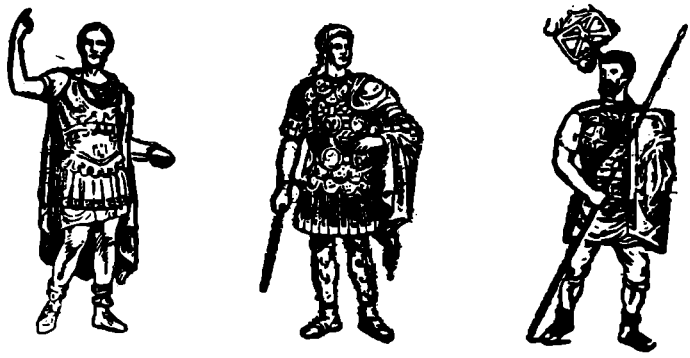

রোমান যোদ্ধা। (বাঁয়ে) প্রধান সেনাপতি, (মধ্যে) সেনাপতি, (ডানে) সাধারণ যোদ্ধা।

www.icsbook.info

এ যুদ্ধের পর পিরাস তাঁর অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে সিসিলিতে উপস্থিত হন; কিন্তু বিপুল চেষ্টার পরেও তিনি সিসিলি অধিকার করে নিতে ব্যর্থ হন। ২৭৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তিনি আবার ইটালিতে ফিরে আসেন এবং বেনভেন্টাম নামক স্থানে শেষবারের মতো রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধে পিরাস পরাজিত হন এবং ইটালি পরিত্যাগ করে চলে যান। দুই বছর পরে ট্যারেন্টাম রোমের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ক্রমে ক্রমে রোম দক্ষিণ ইটালির বাকি শহরগুলি দখল করে নেয়। এর ফলে রোম পো নদীর উপত্যকা ব্যতীত সমগ্র ইতালীয় উপদ্বীপের অধীশ্বর হয় এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সর্ববৃহৎ শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়।

কার্থেজের বিরুদ্ধে অভিযান

মগ্র ইতালির অধীশ্বর হওযার পর রোমের স্বভাবতই দৃষ্টি পড়ে ভূমধ্যসাগরের অপর পারে অবস্থিত উত্তর আফ্রিকার বিশাল সমৃদ্ধিশালী নগরী কার্থেজের উপর।

কার্থেজ নগরীকে শুধু নগরী বললে ভুল বলা হবে, প্রকৃতপক্ষে কার্থেজ ছিল একটি বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী। উত্তর আফ্রিকার টিউনিস্ থেকে জিব্রাল্টার প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের মালিকানা ছিল কার্থেজের অধীনে।

৮০০ অব্দে ফিনিসীয় উপনিবেশরূপে কার্থেজ নগরীর পত্তন হয়। খ্রিঃ পূঃ ৬০০ অব্দে কার্থেজীয়গণ তাদের মাতৃভূমির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে একটি স্বাধীন শক্তিশালী ও সম্পদশালী জাতিরূপে গড়ে উঠে। কার্থেজের এই সমৃদ্ধির মূলে ছিল ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলস্থ বাণিজ্যবন্দরগুলির সাথে পরিচালিত ব্যবসা-বাণিজ্য। স্পেন ও ব্রিটেনের রূপা ও তামার খনিগুলির সম্পদ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে ও উত্তর আফ্রিকার অধীনস্থ এলাকাগুলির সম্পদ আত্মসাৎ করে কার্থেজ তার নিজস্ব পণ্যের সম্ভার গড়ে তোলে এবং এই পণ্য দেশ-বিদেশে চালান দিয়ে সে তৎকালীন পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। স্বাভাবিক কারণেই কার্থেজের বিপুল ঐশ্বর্য রোমের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই কার্থেজের সাথে রোমের তিনটি বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হয। ইতিহাসে এই যুদ্ধগুলিকে পিউনিক যুদ্ধ বলা হয়। কার্থেজের অধিবাসীদের রোমানগণ পিনি (অর্থাৎ ফিনিশীয়) নামে সম্বোধন করত। এই নাম থেকেই পিউনিক নামের উৎপত্তি।

খ্রিঃ পূঃ ২৬৪ অব্দে কার্থেজের সাথে রোমের প্রথম যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের প্রাথমিক কারণ ছিল সিসিলির উপর উভয়ের দখল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। কার্থেজ অবশ্য সিসিলির পশ্চিমাংশ আগেই অধিকার করে নিয়েছিল। এখন সে পূর্ব দিকের গ্রীক অধিকৃত সায়রাকিউজ ও মেসানার উপর তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

কার্থেজের হাত থেকে সিসিলিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রোম কার্থেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তেইশ বছর স্থায়ী যুদ্ধে কার্থেজ শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয় এবং সিসিলির অধিকার রোমের হাতে প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রচুর ধনরত্নও রোমকে প্রদান করতে হয়।

সিসিলি দখলের পর রোমের লালসা আরও বেড়ে যায়। কার্থেজ কর্তৃক স্পেনে রাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টাকে রোম তার উপর কার্থেজের আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা বলে মনে করে এবং কার্থেজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ ঘোষণা করে (২১৮ খ্রিঃ পূঃ)। এ যুদ্ধ

www.icsbook.info

সতেরো বছর ধরে চলে। কার্থেজীয়গণ তাদের বিখ্যাত সামরিক অধিনায়ক হ্যানিবল-এর অধীনে আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করে রোমের দিকে অগ্রসর হয়। হ্যানিবল-এর বাহিনী ক্যানির যুদ্ধে (২১৬ খ্রিঃ পূঃ) রোমানদের পরাজিত করে সমগ্র ইতলীয় উপদ্বীপব্যাপী এক প্রচণ্ড বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। রোম তার মিত্রদের সহায়তায় বহু কষ্টে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু হ্যানিবল তাঁর নিজ দেশ থেকে পর্যাপ্ত সাহায্য ও সহযোগিতা না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত ইতালী ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হন। শেষ যুদ্ধে হ্যানিবল রোমের হাতে পরাজিত হন এবং এ পরাজয় কার্থেজের জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনে। যুদ্ধে বিধ্বস্ত ও প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত কার্থেজ শুধু মাত্র তার রাজধানী ও তৎসংলগ্ন আফ্রিকার কিছু অংশ ব্যতীত সমগ্র অধিকৃত সাম্রাজ্য রোমের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমের আগ্রাসী নীতি সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়। ইতিমধ্যে কার্থেজ তার পূর্ব সমৃদ্ধির কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এটা রোমের পক্ষে সহ্য করা কঠিন ছিল। ১৪৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমের সিনেট কার্থেজের প্রতি এই মর্মে নির্দেশ পাঠায় যে কার্থেজীয়গণ যেন তাদের রাজধানী পরিত্যাগ করে চলে যায় এবং সমুদ্রোপকূলের অন্তত দশ মাইলের মধ্যে তাদের কোনো চিহ্ন যেন না থাকে।

একটি স্বাধীন জাতির পক্ষে এর চেয়ে অবমাননাকর আর কি হতে পারে? এ নির্দেশনামা ছিল কার্থেজীয়গণের প্রতি মৃত্যু-সংকেতস্বরূপ। স্বাভাবিকভাবেই কার্থেজীয়গণ এ নির্দেশ অমান্য করে এবং রোম তৃতীয় ও শেষবারের মতো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তিন বছর ধরে (খ্রিঃ পূঃ ১৪৯-১৪৬) কার্থেজীয়গণ প্রাণপণে প্রতিরোধ করেও শেষ পর্যন্ত রোমানদের হাতে পরাজিত হল। পৃথিবীতে যতগুলি নৃশংস ও মর্মান্তিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, এ যুদ্ধ তাদের অন্যতম। পরাজিত ও বিধ্বস্ত কার্থেজ নগরীর উপর রোমক বাহিনীর বিপুল জয়যাত্রা যে বিভীষিকার সৃষ্টি করে, তা ইতিহাসের পাতায় চিরদিন লেখা থাকবে।

পাইকারি গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পর যারা অবশিষ্ট ছিল, তাদের ক্রীতদাসরূপে রোমে চালান দেওয়া হল। এককালের সমৃদ্ধিশালী কার্থেজ নগরীর কোনো চিহ্নমাত্র রইল না। রোমান সিনেট-সদস্য ও দাসমালিকগণ অধিকৃত অঞ্চলের সমৃদ্ধ এলাকাগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল।

কার্থেজের বিরুদ্ধে অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল

কার্থেজের বিরুদ্ধে জয়লাভ রোমের জন্য অন্যদিকে অভিযানের পথ খুলে দেয়। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অন্যান্য দেশগুলি এখন রোমের আগ্রাসী নীতির স্বরূপ প্রকাশ পাওয়ায় নিজেদের নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের সময় ম্যাসিডনের রাজা পঞ্চম ফিলিপ কার্থেজের সাথে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি সিরিয়ার সাথে একত্রে মিলে মিশরকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করেন। ফিলিপের এই পরিকল্পনায় বাধাদানের উদ্দেশ্যে রোম পূর্ব দিকে তার সামরিক অভিযান প্রেরণ করে। ফলে গ্রীস ও এশিয়া মাইনর তার সরাসরি দখলে আসে এবং মিশরের উপর তার কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। গ্রীস জয়ের ফলে রোম হেলেনীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসে এবং বিপুল প্রতিরোধ সত্ত্বেও হেলেনীয় সংস্কৃতি ও ভাবধারা বহুলাংশে

www.icsbook.info

রোমানদের প্রভাবিত করে। যুদ্ধজয়ের সম্পদ হিসাবে রোম ১,২৮০টি হাতির দাঁত, ২৩৪টি স্বর্ণহার, ১৮৭ হাজার পাউন্ড রূপা, ২ লক্ষ ২৪ হাজার গ্রীক রৌপ্যমুদ্রা, ১ লক্ষ ৪০ হাজার ম্যাসিডনীয় স্বর্ণমুদ্রা এবং প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার লাভ করে। এ ছাড়া কার্থেজবিজয়ের ফলে স্পেনের রূপার খনিগুলির অধিকারী হওয়ায় রোম প্রচুর পরিমাণে রৌপ্যমুদ্রা তৈরির সুযোগের অধিকারী হয়।

কিন্তু রোমের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পিউনিক যুদ্ধের যে প্রভাব পড়ে, সেটাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

যুদ্ধের পরে বিপুলসংখ্যক যুদ্ধবন্দীদের ধরে আনা হয় এবং ক্রীতদাসরূপে তাদের উৎপাদনের সর্বস্তরে নিয়োগ করা হয়। ফলে ক্রীতদাসের সংখ্যা রোমে এত বেড়ে যায় যে, খনিতে, খামারে, কারখানায় স্বাধীন নাগরিকদের উচ্ছেদ করে এদেরই কাজে লাগানো হয়। গ্রামের স্বাধীন কৃষকদের উচ্ছেদ করে ছোটখাট কৃষিজমিগুলিকে একত্রিত করে বড় বড় ল্যাটিফান্ডিয়া বা কৃষি-খামার স্থাপন করা হল এবং সেখানে ব্যাপক হারে ক্রীতদাসদের নিয়োগ করা হলো। খনি ও কারখানায় বেতনভোগী মজুরদের পরিবর্তে ক্রীতদাসদের নিয়োগ করা হল। ফলে দেশের বিপুলসংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। এসব বেকার, অসহায়, ভবঘুরেরা রোমে এসে জড়ো হয় এবং সামাজিক জীবনে এক প্রচণ্ড সমস্যার সৃষ্টি করে।

বিজিত রাজ্যগুলি থেকে সস্তা দরে খাদ্যদ্রব্য আমদানির ফলে দেশে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যের দাম ভীষণভাবে কমে যায় এবং কৃষকরা দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশে ব্যবসায়ী, মহাজন, ঠিকাদার ইত্যাদি এক শ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগীর আবির্ভাব হয় এবং দেশের সম্পদের একটি অংশ এদের কুক্ষিগত হয়। সবচেয়ে বড় কথা হল যে, যুদ্ধজয়ের সম্পদলাভের মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন ইত্যাদি রোমে এসে জমা হলো তাতে এক শ্রেণীর লোক প্রচণ্ড ভোগবিলাসে নিমগ্ন হয়ে পড়লো।

এসবের ফলে রোমে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের দারুণ পরিবর্তন ঘটল। একটি স্বাধীন নাগরিকদের রাষ্ট্রের পরিবর্তে রোম পরিণত হল সাম্রাজ্যবাদী দাসনির্ভর রাষ্ট্রে। ক্রীতদাসদের পশুর মতো শ্রমে নিযুক্ত করে রোমে যেমন একদিকে স্বাধীন নাগরিকদের জীবিকার পথ বন্ধ করে দেয়া হল, অন্যদিকে তেমনি এক শ্রেণীর লোক সর্বপ্রকার দৈহিক শ্রম থেকে বিরত হয়ে প্রচণ্ড বিলাসিতা ও অর্থনৈতিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল।

ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সৃষ্ট বৈষম্য এতদিনের সমস্ত মূল্যবোধ ও ধ্যান ধারণাকে পাল্টে দিল, শৃঙ্খলাবোধ ও দেশপ্রেম এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য॥ যা এতদিন পর্যন্ত রোমের জনগণের মধ্যে টিকে ছিল, তা এখন বিশৃঙ্খলা, ঈর্ষা, পরস্পরের প্রতি রেষারেষি ও শত্রুতায় পরিণত হল। ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে এ বিশৃঙ্খলা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উপনীত হল এবং সিনেটর ক্যাটোর মতো দু-একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির সতর্কবাণী ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তা ব্যাপক ভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

রোমের সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরিণামস্বরূপ প্রাথমিকভাবে রোমে যে অশান্তি ও অরাজকতার সৃষ্টি হয়, তা শেষ পর্যন্ত রোম প্রজাতন্ত্রের জন্য মর্মান্তিক পরিণতি ডেকে আনে।

গুপ্তহত্যা, শাসকশ্রেণীর নিজেদের মধ্যে রেষারেষি, যুদ্ধ, গৃহবিবাদ ইত্যাদির সাথে যুক্ত হয় দাসবিদ্রোহ— যা ব্যাপকভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ক্রীতদাসপ্রথা শুধু রোমের

www.icsbook.info

স্বাধীন অর্থনীতিকেই ব্যাহত করেনি, ক্রীতদাসদের মানবেতর জীবনযাপন, তাদের প্রতি সীমাহীন অত্যাচার ইত্যাদির কারণে প্রায়শই ব্যাপক দাসবিদ্রোহ সংঘটিত হয়— যা রোম প্রজাতন্ত্রের তথাকথিত শান্তিকে প্রায়ই বিঘ্নিত করত।

খ্রিঃ পূঃ ১০৪ অব্দে প্রথম ব্যাপক দাসবিদ্রোহ শুরু হয় সিসিলিতে। রোমান সৈন্যের সাহায্যে এ বিদ্রোহ দমন করা হয়। ত্রিশ বছর পরে সিসিলিতে দ্বিতীয় বারের মতো ক্রীতদাসগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এবারও রোমান সৈন্য পাঠিয়ে এ বিদ্রোহ দমন করা হল।

ক্রীতদাসপ্রথার কুফল রোমের কিছুসংখ্যক নাগরিককে এর ভয়াবহতা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিল। এদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন প্লিবিয়ান শ্রেণী থেকে উদ্ভূত গ্রাকাস্ ভ্রাতৃদ্বয়।

বড় ভাই টাইবেরিয়াস গ্রাকাস খ্রিঃ পূঃ ১৩৩ অব্দে রোমের ট্রিবিউন নিযুক্ত হন। তিনি জমিসংক্রান্ত একটি সংশোধনী বিল সিনেটে উপস্থিত করেন। এতে প্রস্তাব করা হয় যে, কোনো ব্যক্তি ৩১০ একরের বেশি জমির মালিক হতে পারবে না। অবশিষ্ট জমি দেশের ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। টাইবেরিয়াসের উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপকভাবে ক্রীতদাসদের কৃষিকার্যে নিযুক্তির ফলে যে বিপুলসংখ্যক স্বাধীন কৃষক ভূমিহীন হয়ে পড়েছিল তাদের অন্তত কিছুটা পুনর্বাসিত করা। কিন্তু সিনেটের বহু সদস্য এ বিলের বিরোধিতা করে। তারা প্রত্যেকেই ছিল বিরাট বিরাট কৃষি-খামারের মালিক এবং ক্রীতদাসদের অধিকর্তা। স্বভাবতই তাদের স্বার্থবিরোধী এ বিলকে তারা প্রাণপণে বাধা দেয়; তাদের নেতা অক্টেভিয়াস এ বিলের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করেন। টাইবেরিয়াস অক্টেভিয়াসকে ট্রিবিউন পদ থেকে অপসারিত করেন এবং সিনেটে নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করে এ বিল পাস করেন।

এ বিল কার্যকর করতে গিয়ে টাইবেরিয়াস প্রচণ্ডভাবে সর্বত্র বাধাপ্রাপ্ত হন। অক্টেভিয়াসকে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরিয়ে দেয়ার ফলে তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে। পরবর্তী ট্রিবিউন নির্বাচনে টাইবেরিয়াস অংশগ্রহণ করলে তাঁর বিরোধী পক্ষ নির্বাচনের দিন হিংসাত্মক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে টাইবেরিয়াস ও তাঁর ৩০০ অনুচরকে হত্যা করে।

টাইবেরিয়াস-এর মৃত্যুর নয় বছর পরে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গেইয়াস গ্রাকাস বড় ভাই-এর আরব্ধ সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করেন। ১২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গেইয়াস ট্রিবিউন নিযুক্ত হন। তিনি তাঁর ভাইয়ের চেয়ে বেশি স্পষ্ট বক্তা ছিলেন এবং সিনেটের বিভিন্ন কার্যকলাপের মারাত্মক সমালোচনা শুরু করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, টাইবার নদীর পার্শ্বে সরকারি শস্যাগার গড়ে তুলতে হবে এবং সেখান থেকে স্বল্প মূল্যে খাদ্যদ্রব্য দেশের দরিদ্র জনসাধারণের নিকট বিক্রি করতে হবে।

নির্যাতিত জনগণের মধ্যে ভীষণভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করার ফলে গেইয়াস পরের বছর পুনরায় ট্রিবিউন নির্বাচিত হন।

এবার তিনি নাগরিক অধিকার, যা এতদিন পর্যন্ত শুধু রোমের জনগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা ইতালির অন্যান্য জনগণ, বিশেষ করে ল্যাটিনদের মধ্যে বিস্তৃত করার প্রস্তাব দেন। গেইয়াস-এর শত্রুরা এবার প্রচার করতে শুরু করল যে, রোমানদের সম্পদের অধিকার এবার অন্য জাতিরাও কেড়ে নেবে। এ প্রচারণা

www.icsbook.info

গেইয়াস-এর বিরুদ্ধে বিপুল জনমত গড়ে তুলল। গেইয়াসকে দেশের শত্রু ঘোষণা করা হল। গেইয়াস অবশ্য আত্মরক্ষার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত করেছিলেন কিন্তু পরাক্রমশালী রোমান সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। রোমান সৈন্যের হাতে মৃত্যুবরণের পরিবর্তে তিনি তাঁর একজন অনুচরকেই নির্দেশ দেন তাঁকে মেরে ফেলার জন্য। কিন্তু রোমান সৈন্যরা তাঁর তিন হাজার অনুচরকে হত্যা করে।

গ্রাকাস্ ভ্রাতৃদ্বয়ের হত্যা একটি কথাই পরিস্ফুট করে তোলে যে, রোমের তথাকথিত গণতন্ত্রের মৃত্যুঘন্টা বাজছে, রোমের দাস-মালিকগণ এতটুকু স্বার্থত্যাগ করতে রাজি নয়, এবং বৃহত্তর জনগণের কল্যাণ কামনা তাদের মোটেই কাম্য নয়— বরং দরকার হলে বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই তারা জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম দমন করবে।

রোমের গ্রহযুদ্ধ

প্রথম পর্ব : মারিয়াস ও সুলা

এতদসত্ত্বেও রোমের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হত, যদি রোম তার সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিত্যাগ করত। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃত পরিধি তাকে অনবরত প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বাধ্য করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১১১ অব্দে উত্তর আফ্রিকার নুমিডিয়া রাজ্যের রাজা জুগার্থার বিরুদ্ধে রোম যুদ্ধে লিপ্ত হল। এর পরপরই আক্রমণকারী গলদের বিরুদ্ধে এবং এশিয়া মাইনরে রোমের কুশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগের সুযোগ নিয়ে অগ্রসররত পন্টাস রাজ্যের মিথ্রিডেটিস-এর বিরুদ্ধে রোম অভিযান প্রেরণ করে। এ সব যুদ্ধে জয়লাভকারী সামরিক নেতৃবর্গ একা একটি রাজনৈতিক দলের অধিকর্তারূপে রোমে আবির্ভূত হন।

সামরিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন মারিয়াস যিনি শুধু জুগার্থার বিরুদ্ধে জয়ী হননি, উত্তরের বর্বর জাতি কিম্ব্রি ও টিউটনদের সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকেও রোমকে রক্ষা করেন। এ কারণেই তিনি বিপুল জনপ্রিয় হন এবং পরপর ছয় বার রোমের কন্সালপদে নিযুক্ত হন। কন্সাল নিযুক্ত হওয়ার পরে মারিয়াস রোমের সৈন্যবাহিনীতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন। এতদিন পর্যন্ত সম্পদশালী লোকজনই শুধুমাত্র সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত হতে পারত। মারিয়াস এখন থেকে ভূমিহীন নাগরিকদেরও সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করার সুযোগ দান করেন। এর ফলে সৈন্যদের মধ্যেও তাঁর জনপ্রিয়তা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং প্রধানত এর সাহায্যেই তিনি ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন।

মারিয়াস যে দলের নেতৃত্ব দান করেন তারা ছিল প্রধানত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দরিদ্র ও মধ্য কৃষক এবং শ্রমিক ও কারিগর। কিন্তু রাষ্ট্রনায়করূপে মারিয়াস ব্যর্থতার পরিচয় দেন এবং নিজের দলের প্রতি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেন। মারিয়াস-এর ব্যর্থতা রোমের চরম প্রতিক্রিয়াশীল দলকে শক্তিশালী করে তোলে; তারা ছিল প্রধানত দাসমালিক, বড় বড় ল্যাটিফন্ডিয়ার অধিকর্তা এবং অভিজাত বংশোদ্ভূত। রোমের সিনেটের অধিকাংশই ছিলেন এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এ দলের নেতৃত্ব দান করেন সামরিক অধিনায়ক সুলা। খ্রিস্টপূর্ব ৮৮ অব্দে সুলা রোমের কন্সাল নিযুক্ত হন এবং রোম এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়। মারিয়াস-এর বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে সুলা প্রাথমিকভাবে জয়লাভ করেন।

www.icsbook.info

রোমের এই গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে পন্টাস-এর রাজা মিথ্রিডেটিস নিজেকে এশিয়া মাইনর, ম্যাসিডোনিয়া ও গ্রীসের অধিকর্তারূপে ঘোষণা করেন। পূর্ব দিকে রোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে। মিথ্রিডেটিস-এর বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্বের ভার মারিয়াস অথবা সুলা॥ কাকে দেয়া হবে, এ নিয়ে রোমে তীব্র সংঘাতের সূচনা হয়। উভয় পক্ষই সশস্ত্র সংঘর্ষের প্রস্তুতি নিতে থাকে। মারিয়াস তখন সত্তর বছরের বৃদ্ধ, তাঁর পক্ষে জয়লাভ করা একপ্রকার অসম্ভব বলেই বিবেচিত হয়। অন্যদিকে সুলা তখন ইতালিতে অবস্থান করছিলেন। সংবাদ পেয়ে সসৈন্য তিনি রোমের দিকে অগ্রসর হলেন এবং বিরাট বাহিনী নিয়ে রোমে প্রবেশ করলেন। তাঁকে বাধা দিতে ব্যর্থ হয়ে মারিয়াস পলায়ন করেন।

রোমে নিজের শক্তিকে সংগঠিত করে সুলা মিথ্রিডেটিস-এর বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হন এবং তিন বছর ধরে বিভিন্ন যুদ্ধে মিথ্রিডেটিসকে পরাজিত করে তিনি গ্রীস অধিকার করে নেন। মিথ্রিডেটিস সন্ধি প্রার্থনা করেন এবং সুলাও অনতিবিলম্বে মিথ্রিডেটিস-এর সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। কারণ ইতিমধ্যে রোমে তাঁর অনুপস্থিতিতে মারিয়াস-এর দল পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে।

মিথ্রিডেটিসের বিরুদ্ধে অভিযান সমাপ্ত করেই সুলা তাঁর সামরিক বাহিনী নিয়ে রোমের দিকে অগ্রসর হলেন। ইতালিতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সৈন্যবাহিনী বাধাপ্রাপ্ত হল মারিয়াসের সৈন্যদল কর্তৃক। মারিয়াস অবশ্য এর আগেই মারা যান। শুরু হল পুনরায় গৃহযুদ্ধ। কিন্তু অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সৈন্যদলের সাথে পেরে উঠতে না পারার ফলে মারিয়াসের দল পরাজয় বরণ করে। সুলার অধীনস্থ সৈন্যদল বিপুল বিক্রমে রোমে প্রবেশ করল এবং ইতিহাসে অতুলনীয় নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সূচনা করল। সুলা তাঁর বিরুদ্ধাচারীদের একটি তালিকা তৈরি করে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করার নির্দেশ দেন এবং হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করার সংকল্প ঘোষণা করেন। ইতালি, সিসিলি, স্পেন ও আফ্রিকাতে এভাবে লক্ষ লক্ষ নাগরিককে সুলার শত্রুরূপে চিহ্নিত করে হত্যা করা হল।

রোমের সিনেট সুলার সমস্ত কার্যকলাপকেই অনুমোদন দান করে তাঁকে রোমের একনায়করূপে বহাল করল। প্রতিদানে সুলা দেশের সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নিশ্চিহ্ন করে একমাত্র সিনেটকেই সকল ক্ষমতা প্রদান করলেন। সুলার প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্র তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যক্ত হয়; কিন্তু সিনেটের পক্ষে সম্ভব হল না দেশের উপযোগী আরেকটি শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা। ফলে দেশে সৃষ্টি হল চরম অরাজকতা। অন্যদিকে, বিপুলসংখ্যক সৈন্যদলের উপস্থিতি এবং তাদের শৃঙ্খলা বিবর্জিত কার্যকলাপ প্রতি মুহূর্তে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশকে বিনষ্ট করছিল। উপরন্তু সুলার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য সামরিক অধিনায়কবৃন্দের প্রত্যেকেই চেষ্টা করছিলেন যে কোনো উপায়ে ক্ষমতা দখল করে দেশে নিজস্ব সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে। ফলে রোম আরেকবার গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে পড়ল।

ঐতিহাসিক দাসবিদ্রোহ

রোমের গৃহযুদ্ধের অবকাশে আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রস্তুতি চলছিল। তা হল, স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে পরিচালিত ইতিহাসের সর্ববৃহৎ দাসবিদ্রোহ।

এ বিদ্রোহের প্রথম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ক্যাপুয়া শহরে কয়েকজন মল্লযোদ্ধা ক্রীতদাস কর্তৃক। এ ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়। কিন্তু প্রায় আশিজন ক্রীতদাস পালিয়ে যেতে

www.icsbook.info

সক্ষম হয়। ভিসুভিয়াস পর্বতে তারা শিবির স্থাপন করে এবং স্পার্টাকাসকে তাদের নেতা নির্বাচিত করে। তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে একজন অবিসংবাদী নেতা, উপযুক্ত সংগঠক ও সুদক্ষ সামরিক অধিনায়ক। তাঁর জন্মস্থান ছিল থ্রেস্-এ। সেখান থেকে তিনি ক্রীতদাসরূপে রোমে আনীত হন। বন্দীদশা থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার অপরাধে শাস্তিস্বরূপ তাঁকে গ্লাডিয়েটর বা মল্লযোদ্ধা ক্রীতদাসরূপে নিযুক্ত করা হয়।

প্রথম দিকে দাসবিদ্রোহের গুরুত্ব বুঝতে না পারায় রোম এদিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়নি। কিন্তু স্পার্টাকাসের অধীনস্থ দাসবাহিনী দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। তখন বিরাট রোমান সৈন্যদল প্রেরিত হল এ বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে। রোমানবাহিনী ভিসুভিয়াসে ওঠার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াল এবং স্পার্টাকাসের বাহিনীর সরবরাহের পথ বন্ধ করে দিল। এ বিপদে স্পার্টাকাস পরম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। ভিসুভিয়াসের উপরে ছিল আঙুরের বিস্তৃত ক্ষেত। স্পার্টাকাসের নির্দেশে তাঁর বাহিনী আঙুরের লতা দিয়ে শক্ত দড়ি তৈরি করল এবং তার সাহায্যে গভীর রাত্রির অন্ধকারে পাহাড় থেকে নেমে পড়ল। দলে দলে এভাবে দাসসৈন্যরা ভিসুভিয়াস থেকে অবতরণ করে রোমান সৈন্যদের শিবির অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদের সমূলে ধ্বংস করে দিল।

স্পার্টাকাস বাহিনীর এ বিজয়ের খবরে উল্লসিত হয়ে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে ক্রীতদাসরা পালিয়ে এসে তাঁর দলে যোগদান করল। অচিরেই স্পার্টাকাসের বাহিনী কয়েক হাজারে উন্নীত হল এবং দাসবিদ্রোহ সমগ্র ইতালিতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল।

স্পার্টাকাসের উদ্দেশ্য ছিল ক্রীতদাসদের ইতালি থেকে সরিয়ে নিয়ে প্রত্যেককে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া। কিন্তু তাঁর বাহিনীতে বিভিন্ন জাতির সমাবেশ ঘটেছিল ঃ থ্রেসিয়ান, গ্রীক, গল ও জার্মান। এদের সবাইকে একই নীতিতে বিশ্বাস করানো বাস্তবিকপক্ষেই ভীষণ কঠিন কাজ ছিল। এদের মধ্যে কোনো কোনো দল ইতালি পরিত্যাগ না করে সরাসরি রোম আক্রমণের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু স্পার্টাকাস বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর বাহিনী রোম আক্রমণ করার মতো অতখানি শক্তিশালী ছিল না। কাজেই এ ব্যাপারে তিনি স্বতন্ত্র মত পোষণ করতেন। তাঁর সাথে ভিন্নমত হওয়ার দরুন দুটি দল তাঁর বাহিনী পরিত্যাগ করে যায়॥ এটা পরবর্তীকালে তাঁর বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

স্পার্টাকাসের সেনাবাহিনী উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হল। তাঁর আগমনের সংবাদে ভীত হয়ে রোমান সিনেট ক্রেসাস-এর অধীনে বিরাট সৈন্যদল সমবেত করল। তারা স্পার্টাকাসের বাহিনীকে বাধা দিতে প্রস্তুত হল।

স্পার্টাকাস কিন্তু রোম আক্রমণ না করেই দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চললেন। পথিমেধ্যে রোমান বাহিনীর দু'-একটি দলের সাথে খণ্ডযুদ্ধ হয়। তদের পরাজিত করে স্পার্টাকাসবাহিনী শেষ পর্যন্ত ইতালির সর্ব দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এসে উপস্থিত হয়। তাদের উদ্দেশ্যে ছিল সিসিলিতে গমন করা। কিন্তু জাহাজ যোগাড় করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কাঠের ভেলায় সমুদ্র পার হওয়ার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায় প্রচণ্ড ঝড়ের আক্রমণে। ইতিমধ্যে ক্রেসাস-এর বাহিনী উপস্থিত হয়ে তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। নিরুপায় হয়ে স্পার্টাকাস যুদ্ধে লিপ্ত হলেন রোমান বাহিনীর সাথে। খ্রিষ্টপূর্ব ৭১ অব্দে রোমানদের সাথে যুদ্ধে স্পার্টাকাসের ক্রীতদাসবাহিনী শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়।

www.icsbook.info

স্পার্টাকাস শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সাহসিকতার সথে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেন। রোমানরা শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও এ যুদ্ধে তাদের প্রচুর ক্ষতি হয় ইতিমধ্যে পম্পির নেতৃত্বে রোমানদের আরেকটি বাহিনী বলকান উপদ্বীপ থেকে এসে পৌঁছায়। তারা মৃতপ্রায়, আহত ক্রীতদাসদের ধরে ধরে ক্রুশে বিদ্ধ করে ঝুলিয়ে রাখে। বিদ্রোহের অগ্নি যেখানে প্রথম প্রজ্জ্বলিত হয়, সেই কাপুয়া শহর থেকে রোম পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তার দু ধারে খুঁটি পুঁতে এভাবে প্রায় ছয় হাজার ক্রীতদাসকে ঝুলিয়ে দেয়া হল বিভীষিকা সৃষ্টির জন্য॥ যাতে ভবিষ্যতে আর কখনও দাসবিদ্রোহ না ঘটে।

কিন্তু এত করেও রোম তার সংকটকে এড়াতে পারল না। যে সংকটের বীজ রোম নিজে বপন করেছিল ক্রীতদাসপ্রথাকে টিকিয়ে রেখে, তা শেষ পর্যন্ত তার নিজেরই পতন ডেকে এনেছিল।

রোমের গৃহযুদ্ধ

দ্বিতীয় পর্ব : পম্পি ও সীজার

স্পার্টাকাসের দাসবিদ্রোহ যখন নির্মম হাতে দমন করা হচ্ছিল, ঠিক সে সময়েই প্রস্তুতি চলছিল রোমের গৃহযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বের। এ গৃহযুদ্ধের নায়ক ছিলেন পম্পি ও সীজার— রোমের দু'জন দিগ্বিজয়ী সামরিক অধিনায়ক।

পম্পি ছিলেন সুলার বন্ধু এবং মারিয়াস ও সুলার মধ্যে অনুষ্ঠিত গৃহযুদ্ধে সুলার পক্ষ নিয়ে লড়াই করেন। স্পার্টাকস-এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত দাসবিদ্রোহ দমনের কাজেও পম্পিকে পাঠানো হয় ক্রেসাস-এর বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য। বিলম্বে পৌঁছালেও পম্পি নিহত স্পার্টাকাসের অবশিষ্ট সৈন্যদলকে নির্মমভাবে ধ্বংস করেন। ভূমধ্যসাগরে জলদস্যুদের দমন করার কাজেও তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। পম্পির উপর-এর পর দেয়া হয় পূর্ব দিকে মিথ্রিডেটিসকে পুনরায় দমন করার ভার।

অল্প সময়ের মধ্যে পম্পি মিথ্রিডেটিস-এর বাহিনীকে পরাজিত করেন। মিথ্রিডেটিস ক্রিমিয়ায় পালিয়ে যান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। পম্পি এবার এশিয়া মাইনর ও সিরিয়া জয় করেন এবং ইউফ্রেটিস নদীর তীর পর্যন্ত রোমান সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করেন।

পম্পি যখন পূর্ব দিকে তাঁর সামরিক অভিযানে ব্যাপৃত ছিলেন, ঠিক তখনই আরেকজন সামরিক অধিনায়ক জুলিয়াস সীজার পশ্চিমে একের পর এক রাজ্য রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে যাচ্ছিলেন। রোমের এই ব্যাপক সামরিক অভিযানের কালেই আরেকটি নাটকের মহড়া চলছিল রোম শহরের অভ্যন্তরে। এ নাটকের নায়ক ক্যাটিলাইন একজন অভিজাত বংশোদ্ভূত, যিনি তিন তিনবার কন্সাল পদে মনোনয়নলাভে ব্যর্থ হয়ে এক গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেন। রোমের ম্যাজিস্ট্রেট ও ধনী ব্যক্তিদের হত্যা করে তিনি সমগ্র রোম প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেন। তাঁর এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে বিখ্যাত রোমান বক্তা সিসেরো তা সিনেটের অধিবেশন চলাকালে ফাঁস করে দেন। ক্যাটিলাইন ইতোমধ্যেই পলায়ন করে ইত্রুরিয়া নামক স্থানে তাঁর ক্ষুদ্র সৈন্যদল সমবেত করেন। এর বিরুদ্ধে সিনেট এন্টোনিনাস-এর অধীনে এক বিরাট দল প্রেরণ করে। যুদ্ধে ক্যাটিলাইন ও তাঁর তিন হাজার সহচর পরাজিত ও নিহত হন।

www.icsbook.info

ক্যাটিলাইনের ষড়যন্ত্র নির্মূল করার পরে রোমের রাজনৈতিক ক্ষমতা তিনজন সামরিক অধিনায়কের হাতে তুলে দেয়া হয়। এঁরা হলেন পম্পি, ক্রেসাস ও জুলিয়াস সীজার। খ্রিষ্টপূর্ব ৬০ শতাব্দীতে এঁরা প্রথম ট্রায়ামভায়রেট (First Triumvirate) বা 'ত্রয়ী শাসক' গঠন করেন। সমগ্র রোমান সাম্রাজ্য তিনজন অধিনায়ক নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন। রোমের দাস-মালিকগণ নিজেদের নিরাপত্তার জন্য কোনো সিনেট বা গণতান্ত্রিক সংস্থা অপেক্ষা সামরিক নেতাদের শাসনব্যবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট বলে মনে করে।

পম্পিকে দেয়া হয় রোমের শাসনভার এবং সিনেটের উপর খবরদারীর নেতৃত্ব। ক্রেসাসকে দেয়া হল পূর্বাঞ্চলের ক্ষমতা এবং গেইয়াস জুলিয়াস সীজার পাঁচ বছরের জন্য রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। পশ্চিমের গল (বর্তমান ফ্রান্স) রাজ্য দখল করার উদ্দেশ্যে সীজার তাঁর বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন। একাদিক্রমে সাত বছর সামরিক অভিযান চালানোর পর গল রাজ্য দখল করা হল। তাঁর শাসনকাল আরও পাঁচ বছর বাড়ানো হল। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫ অব্দে সীজার রাইন নদী অতিক্রম করে বর্বর জার্মান জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং এর পর বছরই ব্রিটেনে পদার্পণ করেন। ব্রিটেনে কয়েকটি জাতিকে পরাজিত করতে সক্ষম হলেও রোমান শাসন ব্রিটেনে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি।

ইতিমধ্যে গলে আবার বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু সীজার অসামান্য সামরিক কুশলতার সাথে এ বিদ্রোহ দমন করেন। গল বিজয়ের ফলে প্রচুর ধনরত্ন ও প্রায় দশ লক্ষ ক্রীতদাস সীজার লাভ করেন। এ সকল কাজ তাঁর জনপ্রিয়তা বহুলাংশে বৃদ্ধি করে।

সীজারের গল বিজয়ের সমাপ্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ট্রায়ামভায়রেট-এরও সমাপ্তি ঘটে। ক্রেসাস পার্থিয়াতে মারা যান। বাকি রইলেন পম্পি ও সীজার। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিতে কেউ কারও কম নন, কাজেই দু'জনের প্রত্যেকেই চাইলেন অপরজনকে ক্ষমতাচ্যুত করে রোমে সর্বময় ক্ষমতা নিজ করায়ত্ত করতে। দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের শেষ চিহ্নটুকুও অবলুপ্ত হ'ল যখন সীজারের কন্যা ও পম্পির স্ত্রী জুলিয়া সন্তানের জন্মদানকালে মারা যান। পম্পি ও সীজার পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হলেন এবং রোম আরেকবার গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হল।

জুলিয়াস সীজার তাঁর বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে রোমের দিকে অগ্রসর হন এবং সিনেটের নিষেধ সত্ত্বেও রুবিকন (সীজার ও পম্পির রাজ্যের সীমারেখা) অতিক্রম করে রোমের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন।

সীজারের আগমনের সংবাদ পেয়ে পম্পি কয়েকজন সিনেটরকে সাথে নিয়ে গ্রীসে পালিয়ে যান। সীজার তক্ষুণি পম্পিকে অনুসরণ না করে রোমে তাঁর ক্ষমতা সংগঠিত করার চেষ্টায় লিপ্ত হন। পম্পির অনুগত সৈন্যদল সীজারকে বাধাদানের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। রোমবাসীরা আরেকবার গৃহযুদ্ধের ভয়ে ভীত-হয়ে পড়ে! কিন্তু সীজার প্রতিহিংসাপরায়ণ না হয়ে সকলকে তাঁর পক্ষে যোগদানের আহ্বান জানান। এর ফলে রোমের বিপুল জনতা তাঁর পক্ষাবলম্বন করে।

সীজার এবার স্পেনে সামরিক অভিয়ান শুরু করেন পম্পির অনুগতদের বিরুদ্ধে। তাদের পরাজিত করে তিনি বল্কান অঞ্চলের দিকে ধাবিত হন। সেখানে পারসালুস-এর

www.icsbook.info

যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি পম্পির দেখা পান। যুদ্ধে পম্পি পরাজিত হয়ে মিশর অভিমুখে পলায়ন করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি এক গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন।

সীজার এরপর মিশরে গমন করেন এবং মিশর-সম্রাজ্ঞী বিশ্ববিখ্যাত ক্লিওপেট্রার সাথে সাক্ষাৎ করেন। মিশরের রাজপ্রাসাদে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি পুনরায় সামরিক অভিযানে বহির্গত হন। প্রথমে সিরিয়াতে ও পরে আফ্রিকায় পম্পির সমর্থকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সীজারের শেষ অভিযান পরিচালিত হয় স্পেনের মুণ্ডা নামক স্থানে, যেখানে পম্পির বাহিনী শেষবারের মতো সীজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং পরাজিত হয়।

সীজারের একনায়কত্ব

পম্পির বিরুদ্ধে যুদ্ধের অবসানের পর সীজার রোমান সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হলেন। পূর্বেই তাঁকে দশ বছরের জন্য রোমের একনায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল। এখন থেকে তিনি রোমের আজীবন একনায়ক নিযুক্ত হলেন। অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী হলেন সীজার। গণপরিষদের আর কোনও ক্ষমতা রইল না এবং সিনেটও সীজারের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল।

সীজারের একনায়কত্বের কালে রোমে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধিত হয়েছিল। প্রথমত, স্পেন ও গলবাসীদেরকে রোমান নাগরিকের অধিকার দান করে তিনি বহুদিনের একটি মৌলিক সমস্যার সমাধান করেন। দ্বিতীয়ত, দরিদ্র বেকার শহরবাসীদের তিনি ইতালি ও রোমের অন্যান্য প্রদেশে অব্যবহৃত সরকারি জমিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। তৃতীয়ত, গ্রীক জ্যোতির্বিদদের সাহায্যে তিনি প্রচলিত ক্যালেণ্ডারের সংস্কার সাধন করেন। ৩৬৫ দিনে এক বছর এবং প্রতি চার বছরের সাথে একদিন অতিরিক্ত যোগ করে তিনি যে ক্যালেণ্ডার প্রবর্তন করেন, তা ঈষৎ পরিবর্তনসহ (১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী কর্তৃক যে পরিবর্তন সাধিত হয়) অদ্যাবধি প্রচলিত রয়েছে। তা ছাড়া রোমান আইনের সংস্কার সাধনেও তিনি সচেষ্ট হন।

কিন্তু সীজারের রাজনৈতিক কার্যকলাপ তাঁর শত্রুদের মধ্যে এমন ধারণার সৃষ্টি করেছিল যে, তিনি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হয়েছেন। তাঁরা সীজারের এ কার্যে বাধাদানের উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। খ্রিস্টপূর্ব ৪৪ অব্দের ১৫ই মার্চ সিনেটের অধিবেশন চলাকালে সীজার এ ষড়যন্ত্রের দুজন মূল কর্ণধার ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস কর্তৃক ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

রোমের গৃহযুদ্ধ

তৃতীয় পর্ব : এন্টনী ও অক্টেভিয়ান

সীজারের হত্যাকাণ্ড রোমকে আরেকবার গৃহযুদ্ধে নিক্ষেপ করে। সীজারকে হত্যা করে ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস রোমের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু রোমের জনসাধারণ সীজারের মৃত্যুতে এতখানি শোকাভিভূত হয়ে পড়ে যে ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস ভীত হয়ে রোম ছেড়ে পালিয়ে যান। মার্ক এন্টনী বিপুলসংখ্যক জনসমর্থনের মাধ্যমে সীজারের স্থলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু অচিরেই তিনি আরেকজন প্রতিদ্বন্দ্বীর সাক্ষাৎ পান। এ নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন অক্টেভিয়ান— ইনি ছিলেন সীজারের নিকটতম আত্মীয় ও

www.icsbook.info

পালিত পুত্র, এঁকেই সীজার তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। অষ্টাদশ বছরের অক্টেভিয়ান অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। এন্টনীর বিরুদ্ধে তিনি প্রথমেই যুদ্ধ ঘোষণা না করে বরং রোমের আরেকজন নেতা লেপিডাস-এর সাথে একত্রিত হয়ে এন্টনীর কাছে জোট গঠনের প্রস্তাব দিলেন। খ্রিষ্ট পূর্ব ৪৭ অব্দে এন্টনী, অক্টেভিয়ান ও লেপিডাস দ্বিতীয় ট্রায়ামভায়রেট গঠন করলেন।

বিশাল রোমান সাম্রাজ্য এ তিনজন নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিলেন। এন্টনীকে দেয়া হল পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলির ভার, অক্টেভিয়া পেলেন পশ্চিমাঞ্চলের কর্তৃত্ব এবং আফ্রিকার অংশ দেয়া হল লেপিডাসকে।

ট্রয়ামভায়রেট-এর প্রথম কাজ হল জুলিয়াস সীজারের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেয়া।

হত্যাকাণ্ডের প্রধান নায়ক ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে এন্টনী ও অক্টেভিয়ান একত্রে পূর্বদিকে অভিযানে বহির্গত হলেন। তাঁরা আড্রিয়াটিক সাগর অতিক্রম করে থ্রেস-এ পৌঁছালেন। সেখানে তাঁরা ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস-এর দেখা পেলেন। ফিলিপির যুদ্ধে ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসকে তাঁরা পরাজিত করলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস উভয়েই আত্মহত্যা করেন।

ফিলিপির যুদ্ধে সাফল্য লাভের পর অক্টেভিয়ান রোমে ফিরে এলেন। এন্টনী গ্রীস ও এশিয়া মাইনরের দিকে অগ্রসর হলেন সেখানকার অবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে আনার উদ্দেশ্যে। মিশরে উপস্থিত হয়ে তিনি ক্লিওপেট্রার সাক্ষাৎ পেলেন। প্রাচ্যের সুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হয়ে এন্টনী নিজ কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হলেন। দিনের পর দিন মিশরের রাজপ্রাসাদের বিলাস ব্যসনের মধ্যে এন্টনীর দিন কাটতে লাগল।

এদিকে এন্টনীর শত্রুরা রোমে প্রচার করতে লাগল, এন্টনী আলেকজান্দ্রিয়াকেই রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করতে চান।

অক্টেভিয়ান এ সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। তিনি সিনেটকে নির্দেশ দিলেন এন্টনীকে প্রাচ্যের শাসনকর্তার পদ থেকে বিচ্যুত করতে। অক্টেভিয়ান অতঃপর এন্টনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এন্টনীও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। মিশরের সৈন্যবাহিনী এন্টনীকে সম্পূর্ণভাবে সহায়তা করল। গ্রীসের পশ্চিম তীরে এক্টিয়াম নামক স্থানে উভয়ের মধ্যে বিরাট নৌ-যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখে ক্লিওপেট্রা তাঁর যুদ্ধজাহাজ নিয়ে পলায়ন করলেন। এন্টনী যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে ক্লিওপেট্রার সাথে পালিয়ে গেলেন। পরাজিত ও বিধ্বস্ত মিশরীয় নৌবাহিনীর অবশিষ্টাংশ অক্টেভিয়ান-এর নিকট আত্মসমর্পণ করল। পরাজয়ের সংবাদে এন্টনী ও ক্লিওপেট্রা উভয়েই আত্মহত্যা করলেন। মিশর এখন থেকে রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত হল।

অক্টেভিয়ান-এর শেষ প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যুর সাথে সাথে রোমের গৃহযুদ্ধেরও সমাপ্তি ঘটে।

সাম্রাজ্যিক রোমের ইতিহাস

অগাস্টাস সীজার

মার্ক এন্টনীকে পরাজিত করার পর অক্টেভিয়ান রোমের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক রূপে আবির্ভূত হলেন। অত্যন্ত সুচতুর অক্টেভিয়ান উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে সীজারের

www.icsbook.info

রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা তাঁর পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, কারণ তাতে তিনি জনসমর্থন হারাবেন। কাজেই কৌশলে তিনি এ ব্যাপারে অগ্রসর হলেন। তিনি প্রথমে ঘোষণা করলেন যে, রোম প্রজাতন্ত্রকে তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন। সিনেট তাঁকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রদান করল এবং তাঁকে 'অগাস্টাস' উপাধিতে ভূষিত করল। এখন থেকে অক্টেভিয়ান 'অগাস্টাস সীজার' নামে পরিচিত হলেন। পরবর্তী কালে প্রতিটি রোমান সম্রাট 'অগাস্টাস সীজার' উপাধি ধারণ করতেন। এমনকি রোম সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় তিনশত বছর পরে বর্বর ফ্রাঙ্ক রাজা শার্লামেনও এই উপাধি ধারণ করে নিজেকে রোমান সম্রাট ঘোষণা করেন।

অগাস্টাস নিজেকে সিনেটরদের মধ্যে 'প্রথম' (Princep) বলে ঘোষণা করলেন। অগাস্টাস-এর শাসনকালকে বলা হয় প্রিন্সিপেট (Principate) বাস্তবিকপক্ষে অগাস্টাস রোম প্রজাতন্ত্র সৃষ্টির অন্তরালে রাজতন্ত্রকেই সৃষ্টি করেছিলেন। সিনেটকে মুখে সম্মান দেখালেও আসলে তিনি সিনেট ও গণপরিষদ উভয়কেই তাঁর আজ্ঞাবহ যন্ত্রে পরিণত করেন। তিনি সিনেট কর্তৃক তের বার কন্সাল পদে নিযুক্ত হন। সিনেট তাঁকে রোমের সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে নিযুক্ত করে। অন্যদিকে ম্যাজিস্ট্রেট ও সিনেটের উপর কর্তৃত্ব করার সর্বময় ক্ষমতা এবং যে কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভেটো (নাকচ করা) প্রয়োগের সর্বোচ্চ ক্ষমতা তাঁকে দেয়া হয়। রোমের ধর্ম-মন্দিরের প্রধান পুরোহিতরূপেও তিনি অধিষ্ঠিত হন। অগাস্টাসের পূর্বে রোমের আর কোনও শাসক এতখানি ক্ষমতা ভোগ করেননি।

রোমের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী অগাস্টাস 'সম্রাট' উপাধি গ্রহণ না করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন রোমের প্রথম সম্রাট ও রোম সাম্রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা।

রোম প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য জুলিয়াস সীজারের শত্রুরা তাঁকে হত্যা করলেও গণতন্ত্রকে বাঁচানো গেল না। অগাস্টাস সীজার রোমের গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে ফেলে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। রোমের জনসাধারণের জন্য অগাষ্টাস কিছু কিছু অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করেন। তাঁর সময়ে করের বোঝা কমানো হয় এবং প্রাদেশিক গভর্নরদের নিয়মিত বেতন দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়, যাতে তাঁরা প্রজাদের নিকট থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায় না করেন। সরকারি প্রশাসনযন্ত্রকে যতদূর সম্ভব দুর্নীতিমুক্ত করা হয়। দরিদ্র জনগণকে বিনামূল্যে অনেক সময় খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হত এবং সাধারণ নাগরিকদের মনোরঞ্জনের জন্য খেলাধুলা ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু সবচেয়ে অধিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় ক্রীতদাস-মালিকদের জন্য। অগাস্টাস আইন জারি করেন যে, কোনো দাস-মালিককে হত্যা করা হলে তার সব কয়টি ক্রীতদাসকে হত্যা করা হবে। তিনি আরও নির্দেশ জারি করেন যে মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস কখনই সমাজের উঁচু শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার পাবে না।

অগাস্টাস রোমের সামরিক বাহিনীর সংখ্যা হ্রাস করেন, কারণ রাজ্যজয় অপেক্ষা কূটনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমে রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিসাধন তাঁর অধিক কাম্য ছিল। তিনি প্রিটোরিয়ান গার্ড নামে সম্রাটের দেহরক্ষী বাহিনীর একটি নতুন দল তৈরি করেন এবং এদের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়।

www.icsbook.info

অগাস্টাসের শাসনকালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রিস্টের জন্মগ্রহণ (১ খ্রিস্টাব্দ)। যীশুখ্রিস্ট ও তাঁর অনুসারীগণ কর্তৃক রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিস্টধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং এর পর থেকেই রোমের সম্রাটের শক্তি ও ক্ষমতার বিরুদ্ধে খ্রিস্টধর্ম একটি চ্যালেঞ্জরূপে আবির্ভূত হয়। ইতিমধ্যে রোমে বিভিন্ন প্রাচ্য ধর্মবিশ্বাস, যথা, মিথ্রাসবাদ, সিবিল দেবীর পূজা প্রভৃতি ধর্মমতকেও খ্রিস্টধর্ম স্থানচ্যুত করে। মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনাকালে আমরা খ্রিস্টধর্মের উৎপত্তি ও বিস্তারের ইতিহাস বিবৃত করব।

অগাস্টাস সীজার ৪৫ বছর পর্যন্ত রোমের একচ্ছত্র সম্রাটরূপে রাজত্ব করে ১৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ক্লডিয়ান রাজবংশ

অগাস্টাস সীজার কোনো উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সৎ ছেলে টাইবেরিয়াস ক্লডিয়াস রোমের পরবর্তী শাসক নিযুক্ত হন। টাইবেরিয়াসের পর আরও তিনজন শাসক এই ক্লডিয়ান বংশ থেকে নিযুক্ত হন। ক্লডিয়ান বংশের সর্বশেষ সম্রাট হলেন নীরো।

দুর্নীতি, অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা ও চরম বিলাসিতার সাথে নীরোর নামটি ইতিহাসে যুক্ত রয়েছে। তিনি নিজ হাতে তাঁর মাতা, ভ্রাতা ও স্ত্রীকে হত্যা করেন। তাঁর সময়ে রোমে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটে। অনেকের মতে নীরো নিজেই এই অগ্নিসংযোগের জন্য দায়ী। সমগ্র রোম শহরের প্রায় অর্ধাংশ এই অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়। নীরো এই অগ্নিকাণ্ড নেভাবার কোনো চেষ্টা তো করেনইনি, উপরন্তু রোম শহর যখন পুড়ছিল, নীরো মনের সুখে তখন বাঁশি বাজাচ্ছিলেন। এই অগ্নিসংযোগের জন্য তিনি খ্রিস্টানদের দায়ী করেন এবং বহু খ্রিস্টানকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। চরম বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতার জন্য নীরো সব সময় অর্থের প্রয়োজন অনুভব করতেন। এজন্য তিনি অনেক ধনী ব্যক্তিকে হত্যা করে তাঁদের অর্থ আত্মসাৎ করেন। তাঁর নিষ্ঠুরতার জন্য তিনি অল্পদিনের মধ্যে সকলের শত্রুরূপে চিহ্নিত হন এবং যখন তিনি গ্রীসে অবস্থান করছিলেন তখন গল ও স্পেনে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। তিনি রোমে ফিরে এলেন কিন্তু সিনেট ইতিমধ্যেই তাকে গণশত্রুরূপে ঘোষণা করে এবং সমগ্র রোমেই তাঁর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু হয়। উপায়ান্তর না দেখে তিনি প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেন।

ফ্লেভিয়ান রাজবংশ

নীরোর পর ফ্লেভিয়াস ভেসপাসিয়ান (৬৯-৭৯ খ্রিঃ) সেনাবাহিনীর সহায়তায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র টিটাস (৭৯-৮১ খ্রিঃ) ও ডোমিটিয়ান (৮১-৯৬ খ্রিঃ) পরপর সম্রাট হন। টিটাস-এর শাসনকালে ভিসুভিয়াস পর্বতের আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে পম্পি ও হার্কুলেনিয়াম নামক শহর দুটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। ডোমিটিয়ান নিষ্ঠুরতার দিক দিয়ে মোটামুটি নীরোর সমকক্ষ ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন।

www.icsbook.info

এন্টোনিন রাজবংশ

দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোম এন্টোনিন রাজবংশ দ্বারা শাসিত হয়। ডোমিটিয়ানের মৃত্যুর পর সিনেট নার্ভা নামক একজন সাধারণ নাগরিককে রোমের সিংহাসনে বসায়। সম্রাট নার্ভা (৯৬ খ্রিঃ-৯৮ খ্রিঃ) ডোমিটিয়ান কর্তৃক নির্বাসিতদের দেশে ফিরে আসার অনুমতি দেন এবং জনগণের উপর আরোপিত অনেক কর মওকুফ করে দেন। নার্ভার মৃত্যুর পর তাঁর পালিত পুত্র ট্রেজান রোমের সম্রাট হন (৯৮ খ্রিঃ-১১৭ খ্রিঃ) ট্রেজানের সময় রাজ্যের সীমা ডেসিয়া, আর্মেনিয়া, আরব ও মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। রোম সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ বিস্তার ট্রেজানের সময়েই ঘটেছিল। ট্রেজান-এর পরবর্তী শাসক ছিলেন হেড্রিয়ান (শাসনকাল ১১৭ খ্রিঃ-১৩৮ খ্রিঃ)। হেড্রিয়ানের পরে সম্রাট হয়েছিলেন যথাক্রমে এন্টোনিনাস পায়াস্ (১৩৮ খ্রিঃ-১৬১ খ্রিঃ পর্যন্ত) এবং মার্কাস্ অরেলিয়াস (১৬১ খ্রিঃ-১৮০ খ্রিঃ পর্যন্ত)। মার্কাস অরেলিয়াস-এর শাসনকালেই বর্বর জার্মান জাতি সর্বপ্রথম রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তে আক্রমণ চালায়। দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ বিস্তার ঘটে। উত্তরে স্কটল্যাণ্ড থেকে দক্ষিণে নীলনদ পর্যন্ত এবং পাশ্চিমে আটলান্টিকের উপকূল থেকে পূর্বে পারস্য উপসাগরের সীমা পর্যন্ত এ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

দাসভিত্তিক সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখতে পাই এ শতাব্দীতে। দেশের প্রায় সমগ্র ভূসম্পদ ও কারিগরি শিল্পকে কেন্দ্র করে এ অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল ব্যাপক দাশশ্রমের ভিত্তিতে। বহির্বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। ফলে দাস-মালিকগণ তাদের ক্রীতদাসদের অমানুষিক শ্রমে নিয়োজিত করে সর্বোচ্চ মুনাফা আদায় করতে থাকে। শোষণ ও নির্যাতনের পরিমাণ এত অধিক মাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল যে, ক্রীতদাসদের পক্ষে তা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। ক্রীতদাসরাও এখন হিংস্র জীবে পরিণত হয়ে পড়ে। সামান্য কারণে তাদের জেলে অটকে রাখা, চাবুক মারা ও একেবারে মেরে ফেলা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ক্রীতদাসদের সর্বক্ষণ ভয় ও ভীতি দেখিয়ে কাজ আদায় করতে হত এবং এভাবে তাদের শ্রমকে নিয়োজিত করে রোমের দাসমালিকগণ মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে। রোমান সাম্রাজ্যের এই সমৃদ্ধি শুধুমাত্র রোম বা তার আশেপাশেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সমগ্র ইতালি উপদ্বীপ,গল,স্পেন ও প্রাচ্যের দূর-দূরান্তে এ সমৃদ্ধি ছড়িয়ে পড়েছিল। এশিয়া মাইনর ও সিরিয়ার উপকূল ধরে অনেকগুলি বাণিজ্য বন্দর গড়ে ওঠে এবং এগুলির মাধ্যমে ভারত, চীন ও পূর্বের দেশগুলির সাথে রোমের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

এ সমৃদ্ধি রোমে উচ্চশ্রেণীর নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানকে বহুগুণ উন্নীত করে। রোমের সম্রাট, অমাত্য, পাত্রমিত্র, সেনাধ্যক্ষগণ , প্রাদেশিক শাসকগণ, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, পুরোহিতবৃন্দ, ধনী ব্যবসায়ী ও দাস-মালিকগণ চরম বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে এক পরম সুখের জীবন যাপন করছিলেন।

এদের সুখের উপকরণ যোগাতে গিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের অধিকাংশ কৃষককে ভূমিহীন সর্বহারায় এবং ক্রমে ক্রমে ঋণদাস ও পরে ক্রীতদাসে পরিণত হতে হয়। লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাসকে অমানুষিক শ্রমে জীবনীশক্তি ক্ষয় করে ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে যেতে হয়। আর রোমান সাম্রাজ্যের অগণিত সাধারণ নাগরিককে বিপুল করভারে নিষ্পেষিত হয়ে সর্বস্ব হারাতে হয়।

www.icsbook.info

এর পরিণামস্বরূপ দেখা দেয় প্রচণ্ড অরাজকতা— সামরিক বাহিনীর স্বেচ্ছাচারিতা, ঘন ঘন দাসবিদ্রোহ ও সর্বশেষে বহিঃশত্রুর আক্রমণ। রোমের সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও ক্রীতদাসপ্রথার পরিণাম এমন ভয়াবহভাবে দেখা দিল, যা সমগ্র রোমান সাম্রাজ্য তার সর্বশক্তি দিয়েও প্রতিরোধ করতে সক্ষম হল না।

রোমক সাম্রাজ্যের পতন

তৃতীয় শতাব্দী থেকেই রোমের স্বর্ণযুগের অবসান ঘটতে থাকে। রোমান সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস-এর মৃত্যুর পর থেকেই রোম সংকটের গহ্বরে পতিত হয়। অগাষ্টাস কর্তৃক সৃষ্ট প্রিটোরিয়ান গার্ডবাহিনী এখন রোমের শাসনক্ষমতায় সর্বেসর্বা। তারা তাদের ইচ্ছামতো রোমান সম্রাট নিযুক্ত করত, ইচ্ছামতো তাঁদের সিংহাসনচ্যুত করত। সম্রাটদের মধ্যে অনেকে হয়তো রোমের রাজপ্রাসাদেও প্রবেশ করেননি, তার পূর্বেই তাঁরা আততায়ীর হাতে নিহত হন। এরূপ চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে শুরু হল অভ্যন্তরীণ অন্যান্য সংকট। প্রথমত গৃহযুদ্ধ, যার ফল ছিল হত্যা, গুপ্তহত্যা ও অজস্র লোকের প্রাণনাশ। দ্বিতীয়ত শিল্প ও বাণিজ্যের সংকট। উৎপাদন কমতে শুরু করল, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে ক্ষেত্রেও সংকট সৃষ্টি করল।

ঠিক এ সময়েই বর্বর জার্মান জাতির আক্রমণ মারাত্মক রূপ ধারণ করে। পশ্চিম দিকে ফ্রাঙ্ক ও এ্যালেমানিগণ গল আক্রমণ করে ও স্যাক্সনগণ ব্রিটেন দখল করে নেয়। ইতিমধ্যে আফ্রিকান মুরগণ স্পেনের বিরাট অংশের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। অন্যদিকে কৃষ্ণসাগরের উপকূলস্থ অঞ্চলগুলিতে শুরু হয় বিভিন্ন গথজাতির আক্রমণ। রোমান বহিনীর পক্ষে এ সকল আক্রমণ প্রতিহত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তার কারণ ঠিক একই সময়ে তাদের রোমের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমনে ব্যাপৃত থাকতে হয়।

এরই সুযোগ নিয়ে পূর্বদিকে পারসিক বাহিনী রোমের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে।

রোমের বৈদেশিক অক্রমণের কালেই এর অভ্যন্তরীণ সংকট চরমে পৌঁছে। রোমের শ্রেণীসংগ্রাম চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। এ শ্রেণীসংগ্রাম শুধু ক্রীতদাস ও দাস-মালিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, শোষিত নিপীড়িত অন্যান্য শ্রেণীদের বিক্ষোভ এ সংগ্রামকে আরও তীব্র করে তোলে। এ বিদ্রোহ প্রথমত শুরু হয় আফ্রিকা ও এশিয়া মাইনরে, পরে তা ছড়িয়ে পড়ল স্পেনে। এসব প্রদেশের দাসবিদ্রোহের সাথে কৃষকবিদ্রোহ একই সাথে সংঘটিত হয় এবং সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের শান্তি ও স্থিতি বিনষ্ট করে তোলে। রোমের এই চরম অরাজকতার দিনে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ অক্ষমতার পরিচয় দেয়। অভ্যন্তরীণ সংকট ও বহিঃশত্রুর আক্রমণরোধে এর চরম ব্যর্থতা রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

এরূপ সংকটজনক পরিস্থিতিতে ২৩৮ খ্রিস্টাব্দে ডায়োক্লেশিয়ান রোমের সম্রাট নিযুক্ত হন। তিনি এসে রোমের নামেমাত্র পরিচিত গণতন্ত্রের চিহ্নকে লুপ্ত করে দেন। সিনেটকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হল। ডায়োক্লেশিয়ান নিজেকে ডোমিনেট বা লর্ড বলে ঘোষণা করেন। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ডায়োক্লেশিয়ান এখন থেকে রোমান

www.icsbook.info

সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন (তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত রোম প্রজাতান্ত্রিক রোম নামেই পরিচিত ছিল।)

শাসনকার্যের সুবিধার্থে রোমকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। রোমান সম্রাট নিজের হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ধারণ করে বাকি তিনটি ভাগে তাঁর অধীনস্থ তিনজন শাসক নিযুক্ত করেন। এ তিন বিভাগকে আবার বারোটি ডায়োসেস (Diocese) এবং সেগুলিকে সর্বমোট ১০১টি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়।

এছাড়া ডায়োক্লেশিয়ান করপ্রথার সংস্কার সাধনকল্পে জমির উপর খাজনা নির্দিষ্ট হারে বেঁধে দেন। তিনি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম বেঁধে দিয়ে মুদ্রা সরবরাহ ব্যবস্থায় একটি স্থিতিশীলতা আনয়নেরও প্রচেষ্টা করেন।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও ডায়োক্লেশিয়ান সাম্যাজ্যের সংকট এড়াতে পারেননি। কারণ প্রাচ্যদেশীয় রাজন্যবর্গের অনুকরণে রোমের রাজপ্রাসাদে যে বিলাসব্যসনের প্রবর্তন তিনি করে গিয়েছিলেন— তা তাঁর সমস্ত অর্থনৈতিক সংস্কারকেই বানচাল করে দিয়েছিল।

ডায়োক্লেশিয়ানের মৃত্যুর পর কনস্টানটাইন রোমের সম্রাট হলেন। তিনি প্রায় ত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। ৩৩০ খ্রিষ্টাব্দে কনস্টানটাইন বসফরাস- এর তীরে রোমের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করলেন। সাম্রাজ্যকে এখন থেকে দুটি ভাগে ভাগ করা হল ঃ পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য। সম্রাটের নামানুসারে নতুন রাজধানীর নামকরণ করা হল কনস্টান্টিনোপল। প্রাচীন গ্রীক উপনিবেশ বাইজেন্টিয়াম ও তার আশেপাশের অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্র করে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের উপর ক্রমাগত বর্বর আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। কনস্টানটাইন খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে উদার নীতি গ্রহণ করেন এবং খ্রিষ্টধর্মকে রোম সাম্রাজ্যে প্রচলিত ধর্মের সমান মর্যাদা দান করেন।

উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতি বিলাসিতার কেন্দ্রভূমিরূপে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যই এখন থেকে প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হল এবং পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ক্রমশ একে একে বর্বরদের হাতে অধিকৃত হতে লাগল।

কনস্টানটাইনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কনস্টানটাইনাস ও পরে পৌত্র জুলিয়ান পূর্ব রোমান সম্রাট নিযুক্ত হন। জুলিয়ান খ্রিষ্টধর্মকে অগ্রাহ্য করে রোমের প্রাচীন ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। তাঁর এ চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং রোমান সাম্রাজ্য তার পতনের পথে আর এক ধাপ অগ্রসর হয়।

পরবর্তীকালের দেড়শত বছরের রোমান সাম্রাজ্যের ইতহাস এক চরম অবক্ষয়ের ইতিহাস। একের পর এক প্রায় চল্লিশজন সম্রাট রোমের সিংহাসনে বসেন। কিন্তু সকলেই ব্যর্থ হন। এদিকে বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন বর্বর জাতি কর্তৃক অধিকৃত হয়। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে প্রায় সমগ্র রোমান সাম্রাজ্য বর্বরদের হাতে চলে যায়।

অবশেষে ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বর্বর নেতা অডোএকার সর্বশেষ রোমান সম্রাট রোমিউলাস অগাস্টাসকে সরিয়ে দিয়ে রোমের সিংহাসন দখল করেন। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যে তখনও একজন সম্রাট অধিষ্ঠিত থাকলেও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য চিরতরে

www.icsbook.info

অস্তমিত হয়। অডোএকার কর্তৃক রোমের সিংহাসন দখলের সাথে সাথে সাত শত বছরের রোম সাম্রাজ্যের চির অবসান ঘটে।

রোমান সভ্যতার বিভিন্ন দিক

ধর্ম

প্রজাতন্ত্রের যুগেই রোমের ধর্ম পুরোপুরি রূপ পরিগ্রহ করে। রোমের ধর্ম বহুলাংশে গ্রীকদের মতো। গ্রীকধর্মের মতো রোমান ধর্মের পশ্চাতে কোনো ভাবাদর্শ নেই। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে তারা দেবদেবীরূপে পূজা করত। তবে তাদের আরাধ্য দেবদেবীগণের আকৃতি ও প্রকৃতি সাধারণ মানুষেরই অনুরূপ। মানুষের মতোই তাদের কার্যকলাপ আবেগ ও অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। আকাশের দেবতা জুপিটার, জ্ঞানের দেবী মিনার্ভা, প্রেমের দেবী ভেনাস, সমুদ্রের দেবতা নেপচুন— এঁরা হলেন রোমের দেবদেবীদের প্রধান। এঁদের সকলের উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেবমন্দির নির্মাণ করা হত।

এ সকল দেবতার কাজ ছিল রাষ্ট্রকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে শক্তি বৃদ্ধি করা। রোমের ধর্মমন্দিরগুলিতে পুরোহিতগণ দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজা-অর্চনা করতেন এবং যজ্ঞ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানপর্ব সম্পন্ন করতেন।

দর্শন

রোমানযুগের দর্শনের উপর গ্রীক প্রভাব সুপরিস্ফুট। গ্রীকদের এপিকিউরিয়ান ও ষ্টয়িক মতবাদ রোমানদের উচ্চশ্রেণীর নাগরিকদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

লুক্রেটিয়াস (৯৮-৫৫ খ্রিঃ পূঃ) ছিলেন এপিকিউরিয়ান মতবাদের প্রধান প্রবক্তা। On The Nature of Things বা 'পদার্থের প্রকৃতি সম্পর্কে' নামক বিখ্যাত কাব্যের রচয়িতা লুক্রেটিয়াসের মতে বিশ্বপ্রকৃতির প্রধান উদ্দেশ্য হল মানুষকে অতি প্রাকৃতিক শক্তির ভয় থেকে মুক্ত করা, কেননা এটাই আত্মার মঙ্গলের পথে প্রধান বাধা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কতকগুলি আকস্মিকভাবে মিলিত অণুর সমষ্টি। লুক্রেটিয়াস দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেও, তাঁর মতে এঁরা নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে নিমগ্ন, মানুষের ভাল-মন্দ বা পৃথিবীর নিয়ম-কানুনের উপর এঁদের কোনো হাত নেই। বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু বস্তুতান্ত্রিক নিয়মে চলছে, এমনকি মানুষ ও তার কার্যকলাপ, তার অভ্যাস, রুচি, বিশ্বাস সবকিছুই এই নিয়মের অধীনে। যেহেতু মানুষের মনও এই বস্তুতে তৈরি কাজেই মৃত্যুর সাথে সাথেই তার সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে। আত্মা বলে কিছুই নেই, কাজেই মৃত্যুর পরে স্বর্গে বা নরকে মানুষকে পুরস্কার বা পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে না। লুক্রেটিয়াসের কাব্যে এপিকিউরাস ও ডেমোক্রিটাস-এর পরমাণুতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছিল।

গ্রীকদের ষ্টয়িক মতবাদ রোমানদের উপরও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিখ্যাত রোমান সিনেটর ও বক্তা সিসেরো এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা। তাঁর বিখ্যাত রচনা On Duty এবং Tusculan Disputations জেনোর মতবাদের প্রধান প্রতিফলন। তাঁর মতে, সদগুণই মানুষের সুখের মূল উৎস। একজন আদর্শ মানুষ সুখ ও দুঃখের উর্ধ্বে থেকে শুধুমাত্র যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হবে। পূর্ববর্তী ষ্টয়িক দার্শনিকদের থেকে এক ধাপ অগ্রসর হয়ে সিসেরো বলেছেন, রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা করা। তিনি রাষ্ট্রীয় বিধান ও আইনের উর্ধ্বে এমন একটি ন্যায়নীতির প্রয়োজন উল্লেখ করেছেন যা

www.icsbook.info

মানুষের দ্বারা তৈরি হবে না বরং প্রাকৃতিক নিয়ম ও যুক্তিই হবে যার উৎস। সিসেরোর এই মতবাদ পরবর্তীকালে রোমান আইন প্রণয়নের মূল ভিত্তি রচনা করেছিল।

পরবর্তীকালে স্টয়িক মতবাদ আরও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। রোমানদের প্রাচীন মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণার সাথে এর বিশেষ মিল এই জনপ্রিয়তার মূল কারণ। পরবর্তী যুগের রোমান স্টয়িক মতবাদ জেনো বা তাঁর অনুসারীদের মতবাদ থেকে অনেক দূরে সরে যায়। রোমের স্বৈরতন্ত্রের যুগে সেনেকা, এপিক্‌টেটাস ও সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস ছিলেন স্টয়িক মতবাদের প্রধান প্রবক্তা। তাঁদের সবার মতে, প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণ বশবর্তী হয়েই প্রকৃত সুখ অনুভব করা যায়। সেনেকা ও এপিক্‌টেটাস তাঁদের মতবাদকে একেবারে ধর্মের পর্যায়ে উপনীত করেছিলেন। তাঁদের মতে, বিশ্বজগৎ একজন সর্বশক্তিমানের নির্দেশে এর মূল লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত। মার্কাস অরেলিয়াসের মতবাদ ছিল নৈরাশ্যজনক। তাঁর মতে, মানুষ দুর্ভাগ্যকে সাথে নিয়ে জন্মেছে, কাজেই কিছুতেই সে শান্তির লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না। তাঁর মতে, তবুও মানুষকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে, কেননা পঙ্কিলতার স্রোতে গা ভাসিয়ে বা অধৈর্য হয়ে প্রতিবাদে ভেঙে পরা— কোনটাই সমাধান নয়।

সাহিত্য

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রোম গ্রীকদের নিকট ঋণী। প্রজাতান্ত্রিক রোমের শেষ দুই শতাব্দীতে রোমের উচ্চশ্রেণীর জনগণের নিকট গ্রীক ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন একটি ফ্যাশানে পরিণত হয়। এই ভাষা ও সাহিত্যের বিপুল প্রভাব পড়েছিল রোমান সাহিত্যের উপর। সে যুগের বিখ্যাত সাহিত্য-কর্মের মধ্যে প্লটাস ও টেরেন্স কর্তৃক রচিত মিলনান্তক রচনাবলী (মিনাণ্ডার-এর 'New Comedy'-র অনুকরণে রচিত) ও ক্যাটুলাস-এর গীতিকাব্যগুলি উল্লেখযোগ্য। এ যুগের মহাকাব্য, নাটক, গীতিকবিতা সবকিছুতেই অত্যন্ত সচেতনভাবে গ্রীকদের অনুকরণ করা হয়েছে।

রোমান যুগের সাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ এর নাটক। এ যুগের প্রখ্যাত নাট্যকার প্লটাস-এর (২২৪-১৮৪ খ্রিঃ পূঃ) অধিকাংশ রচনাই ব্যঙ্গাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক। উচ্চশ্রেণীর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে তিনি তীব্র ভাষায় কষাঘাত করেছেন। তাঁর অঙ্কিত কয়েকটি নষ্ট চরিত্র থেকে পরবর্তীকালে শেক্সপীয়র তাঁর Comedy of Errors ও The Merry Wives of Windsor-এর চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরও তাঁর রচনার জন্যে অনেকাংশে প্লটাস-এর কাছে ঋণী।

পরবর্তী নাট্যকার টেরেন্স (১৯০-১৫৯ খ্রিঃ পূঃ)-এর রচনা অনেকখানি শালীন ও মার্জিত। যদিও তাঁর নাটক প্লটাস-এর মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি, তথাপি ল্যাটিন ভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরিত করার অনেকখানি কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। সিসেরো ও ভার্জিলের রচনার পটভূমি তিনিই তৈরি করে গিয়েছিলেন।

প্রজাতান্ত্রিক রোমের অন্যতম গীতিকাব্য রচয়িতা ক্যাটুলাস-এর কাব্যের মূল বিষয়বস্তু হল মানব মানবীর প্রেম। নিজ জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত এ প্রেমকাহিনী পৃথিবীর সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ। পরবর্তী যুগে তাঁর রচনার বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হয়।

www.icsbook.info

পম্পি ও সীজারের আকাশচুম্বী আকাঙ্ক্ষাকে বিদ্রূপ করে তিনি তাঁর শেষ বয়সের কবিতাগুলি রচনা করেন।

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক সিসেরো ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, বক্তা, প্রবন্ধকার ও সাহিত্য সমালোচক। তাঁর বিশাল রচনা সংকলনে প্রজাতান্ত্রিক রোমের বিভিন্ন সমস্যার প্রতি বিস্তৃত আলোকপাত করা হয়েছে। ল্যাটিন ভাষার সৌন্দর্যবৃদ্ধি এবং তাকে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত করার গৌরবময় কৃতিত্বের তিনি অধিকারী।

অগাস্টাস-এর যুগ রোমান সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। এ স্বর্ণযুগের অন্যতম কবি ভার্জিল (৭০-১৯ খ্রিঃ পূঃ) শুধু রোমান কাব্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে 'পরিচিতি নন, পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ট কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ঈনিড (Aeneid) অগাস্টাস-এর পরিবারিক ইতিহাস ও তাঁর বিশ্বজয়ের আকাঙ্ক্ষার কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত। এ গ্রন্থে ল্যাটিন জনগণের পৌরাণিক নায়ক ইনিস ট্রয় থেকে ইতালিতে আবির্ভূত হয়েছেন। ঈনিড ভার্জিলের প্রগাঢ় দেশপ্রেমের স্বাক্ষর ও রোমের সাম্রাজ্যবাদী নীতির অন্যতম ধারক।

হোরেস (৬৫-৮ খ্রিঃ পূঃ)-এর খ্যাতি রয়েছে গীতিকবিতা ও ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা রচনার জন্য। হোরেসের কবিতায় সুখের এপিকিউরীয় ব্যাখ্যা ও দুঃখের দিনে সাহসী হওয়ার স্টয়িক উপদেশ উভয়ই বর্তমান। তাঁর মতে, যুক্তিবান বিবেকের দ্বারাই সর্বোচ্চ সুখ অনুভব করা সম্ভব।

সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ওভিড (খ্রিঃ পূঃ ৪৩-১৭ খ্রিঃ) কবি হিসেবে অনেকখানি ক্যাটুলাস-এর নিকটবর্তী। কবিতার মধ্য দিয়ে প্রেমের কাহিনী বর্ণনার নিপুণতায় তিনি অনন্য। প্রধানত তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'রূপান্তর' বা 'মেটামোরফোসিজ' Metamorphoses-এর মাধ্যমে প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীগুলি বর্তমান যুগে প্রচলিত হয়েছে।

অগাস্টাস-এর মৃত্যুর পরেও রোমের সাহিত্যচর্চা সমান গতিতে অব্যাহত থাকে এবং বহুসংখ্যক কবি ও সাহিত্যিক তাঁদের গ্রন্থগুলি রচনা করেন।

পরবর্তী যুগের অন্যতম কবি জুভেনাল (৫৮-১৩০ খ্রিঃ)-এর কবিতা মূলত ব্যঙ্গধর্মী। তাঁর রচনা বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক ড্রাইডেন, পোপ ও সুইফ্‌ট্‌-এর রচনাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

জুভেনাল-এর বন্ধু মার্শাল (৪০-১০২ খ্রিঃ) একই ধরনের কবিতা রচনা করেন; সম-কালীন সমাজের প্রখর সমালোচক মার্শালের প্রতিটি লেখা ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে পরিপূর্ণ।

ইতিহাস

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেই সম্ভবত রোমানদের অবদান সবচেয়ে বেশি। তিনজন বিখ্যাত রোমান ঐতিহাসিক ছিলেন লিভি, ট্যাসিটাস ও প্লুটার্ক্‌। এ তিনজনের মধ্যে লিভির (খ্রিঃ পূঃ ৫৯-১৭ খৃঃ)) নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। ভার্জিলের সমসাময়িক লিভি ভার্জিলের মহাকাব্যের মতোই বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ 'রোমের ইতিহাস' রচনা করেন। রোমের বিজয় ইতিহাস ও গৌরবময় কৃতিত্বের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এ

www.icsbook.info

ইতিহাসগ্রন্থে। কিন্তু গ্রীক ঐতিহাসিক থুকিডাইডিসের মতো বস্তুনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় লিভি দিতে পারেন নি তাঁর গ্রন্থে।

লিভির মতো বিশদ ইতিহাস রচনা না করলেও ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস (৫৫-১১৭ খ্রিঃ) তাঁর বিখ্যাত জার্মানিয়া (Germania) গ্রন্থে জার্মান জাতির সরল ও অনাড়ম্বর সমাজ ও জীবনের বিরবণ দেন। পাশাপাশি রোমান সমাজের, বিশেষ করে উঁচু শ্রেণীর জনগণের কলুষময় জীবনচিত্র তুলে ধরে তিনি উভয়ের তুলনামূলক সমালোচনা করেন।

তাঁর অপর এক গ্রন্থ 'ঐতিহাসিক বিবরণী' Annals-এ সম্রাট অগাস্টাস থেকে নীরো পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রোমান সম্রাটগণ ও তাঁদের অমাত্যবর্গের দোষ-ত্রুটির বিশদ বিবরণ দেন। তাঁর মতামত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যদিও পক্ষপাতদোষে দুষ্ট, তথাপি সমকালীন ইতিহাসের একটি সুস্পষ্ট চিত্র এতে প্রতিফলিত হয়েছে।

রোমের আরেকজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক হলেন প্লুটার্ক (৪৬?-১২০? খ্রিস্টাব্দ ১। সরকারি চাকরিতে কর্তব্য রত প্লুটার্ক তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় গ্রীক ও রোমান যুগের বিখ্যাত চরিত্রগুলির বিবরণ সংগ্রহের কাজে ব্যয় করেছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ (The Parallel Lives)-তে চল্লিশজন প্রসদ্ধি রোমান ও গ্রীক নায়কদের জীবনচরিত্র লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে শেক্সপীয়র তাঁর 'জুলিয়াস সীজার' এবং 'এন্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা' গ্রন্থের বহু তথ্য প্লুটার্ক-এর ইতিহাস থেকেই নেন।

শিল্পকলা

রোমের শিল্পকলা গড়ে উঠেছিল প্রধানত গ্রীকদের অনুকরণের মাধ্যমে। রোমানদের শিল্পকলার প্রকাশ ঘটেছিল স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পে। ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে, বিশেষত মানুষের মূর্তি ও চিত্রের ক্ষেত্রে, রোমানরা এট্রুস্কান রীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, যদিও গ্রীক প্রভাবও এ ক্ষেত্রে কার্যকর ছিল। গ্রীক ভাস্কর্যে প্রধানত আদর্শ মানবমূর্তির প্রকাশ ঘটত। আর রোমানরা এট্রুস্কানদের মতো বাস্তবসম্মত মূর্তি ও চিত্র নির্মাণ করত। রোমানরা স্মারক স্তম্ভে এবং দেওয়ালের গায়ে নির্মিত ভাস্কর্যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সুন্দর চিত্র নির্মাণ ও অঙ্কন করত।

শিল্পকলার ক্ষেত্রে রোমানদের বিশেষ কৃতিত্বের প্রকাশ অবশ্য স্থাপত্য শিল্পেই ঘটেছিল। বিরাটাকৃতির অট্টালিকা ও নানাবিধ সৌধনির্মাণে শিল্পীর স্বাধীনতা ও শিল্পবোধের পরিবর্তে তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির পরিচয়ই বেশি পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্থাপত্যশিল্পে খিলান ও গম্বুজের ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণত ইট, পাথর ও কংক্রিটের সাহায্যেই এগুলি নির্মাণ করা হয়েছিল। ইমারতগুলি বিশেষ প্রয়োজনে নির্মিত হয়। সরকারি ভবনসমূহ, থিয়েটার, সার্বজনীন স্নানাগার, ঘোড়দৌড়ের স্থান ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়েছিল অধিক পরিমাণে।

রোম নগরীর দুটি প্রধান ইমারতের মধ্যে একটি হল প্যানথিওন নামক মন্দির—১৪২ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট গম্বুজ যার প্রধান অলঙ্কার; এবং অন্যটি হল ৬৫ হাজার দর্শকের স্থানসম্বলিত 'কলোসিয়াম' নামক রঙ্গমঞ্চ বা এ্যাম্ফিথিয়েটার। এ রকম রঙ্গমঞ্চ অবশ্য রোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্রই আরও ছিল।

www.icsbook.info

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক হিসাবে রোমানগণ সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এর প্রধান কারণ আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। দাসভিত্তিক অর্থনীতি ও দাসতান্ত্রিক ভাবাদর্শ রোমানদের মনে বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনো সাড়াই জাগায়নি। এমনকি গ্রীকদের আবিষ্কৃত বিজ্ঞানকেও তারা কাজে লাগায়নি। দাস মালিকগণ দৈহিক পরিশ্রমকে ঘৃণার চক্ষে দেখত এবং উৎপাদনের সাথে সংযুক্ত সবকিছু, এমনকি ব্যবহারিক বিজ্ঞানও তাদের নিকট ছিল পরিত্যাজ্য। অন্যদিকে উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত ক্রীতদাসগণ সময় ও অনুপ্রেরণার অভাবে এ ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারেনি। কারণ এগুলি তাদের পরিশ্রমের ভার কমাতে পারেনি। কাজেই রোমান যুগে কারিগরি ক্ষেত্রে কোনো আবিষ্কার ঘটলেও সেগুলি খেলনার সামগ্রীরূপে ফেলে রাখা হয়েছে।

রোমান যুগে একমাত্র বিজ্ঞানচর্চা হয়েছে আলেকজান্দ্রিয়াতে, যেখানে আগের থেকেই বিজ্ঞান সাধনার ধারা অব্যাহত ছিল। এ যুগের বিখ্যাত গ্রীক বৈজ্ঞানিক ছিলেন গ্যালেন (খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক)। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর রচিত চিকিৎসা গ্রন্থ ষোল শতক পর্যন্ত মূল প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ছিল রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া পদ্ধতি সম্পর্কে। এ শতাব্দীর আরেকজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্লডিয়াস টলেমী। জ্যোতির্বিদ্যার উপর লিখিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "আলমাজেস্ট" প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যার বিশ্বকোষ নামে পরিচিত। সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহের গতি, পৃথিবীর আহ্নিক গতি, দিবারাত্রি ও তার দীর্ঘতা, নক্ষত্রের উদয়াস্ত ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর বিস্তারিত আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এ গ্রন্থটিতে। টলেমীর মতে, পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই সূর্য পরিক্রমণ করে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কোপার্নিকাস ও ষোড়শ শতাব্দীতে গ্যালিলিও'র সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত টলেমীর মতবাদই নির্ভুল বলে পরিগণিত ছিল।

খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ডায়োফ্যান্টাস ছিলেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ। ডায়োফ্যান্টাসের পর প্যাপাস, থিওন অব আলেকজান্দ্রিয়া ও হাইপেসিয়ার নাম গণিতের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। থিওনের বিদুষী কন্যা হাইপেসিয়াকে নির্মমভাবে হত্যা করে খ্রিস্টান ধর্মান্ধ পাদরীগণ। এ পাদরীদের অন্যতম আর্চবিশপ থিওফেলাসের নির্দেশে ৩৯০ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থাগারের একটি বিরাট অংশ ধ্বংস করা হয়েছিল।

রোমান আইন

বিশ্বসভ্যতার ক্ষেত্রে রোমানদের সবচেয়ে বড় অবদান তাদের আইন-ব্যবস্থা। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে রোমানরা তাদের প্রচলিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী (সিভিল ও ক্রিমিনাল) আইনগুলি একত্রে সংকলিত করে। এগুলি বারটি কাঠের ফলকে খোদিত করে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এগুলিকে বলা হত দ্বাদশ তালিকা (Twelve Tables)। কিন্তু এই আইনগুলি ছিল আদিম কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী এবং ক্রমপ্রসারমান আধুনিক রোমান রাষ্ট্রের চাহিদা পূরণে এ আইনগুলি ক্রমশ ব্যর্থ হচ্ছিল। তা ছাড়া শুধু রোমান নাগরিকদের ক্ষেত্রেই এগুলি প্রয়োগ করা যেত। কিন্তু

www.icsbook.info

পরবর্তীকালে পরিবর্তিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপযোগী ও ক্রমশ বিস্তৃত রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য নাগরিকদের জন্যও একটি নতুন আইনব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিল। দ্বাদশ তালিকাকে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করে একে উদার ও বিশ্বজনীন করে গড়ে তোলা হল।

নতুন প্রবর্তিত রোমান আইনের সূত্রগুলি হল ঃ পরিবর্তিত সামাজিক রীতিনীতি, স্টয়িক দার্শনিকদের আদর্শ, বিচারকদের সিদ্ধান্ত এবং মূলত প্রিটরদের আদেশ। রেমান প্রিটররা ছিলেন ম্যাজিস্টেট এবং আইনকে একটি বিশেষ দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করে তাঁরা জুরিদের যে কোনো মামলা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার নির্দেশ দিতেন।

জুরিরা অবশ্য শুধু তাঁদের মতামতই ব্যক্ত করতেন এবং মামলার চূড়ান্ত রায় দেয়ার ক্ষমতা প্রিটরেরই ছিল। প্রিটরদের আইনের ব্যাখ্যাগুলি পরবর্তীকালে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেকখানি সাহায্য করত। এভাবে রেমানরা এমন একটি আইনব্যবস্থা গড়ে তোলে, যা আধুনিক যুগেও আইনের ভিত্তি হিসাবে কার্যকর হয়।

প্রিন্সিপেট-এর শাসনকালে রোমান আইনের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে। সম্রাট অগাস্টাস সীজার ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ কয়েকজন বিশিষ্ট জুরিকে মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে চূড়ান্ত অভিমত ব্যক্ত করার অধিকার দান করেন। বিভিন্ন সময়ে গেইয়াস, আলপিয়ান,প্যাপিনিয়ান এবং পলাসকে এই অধিকার দেয়া হয়। এঁরা আইনবিদ ও আইন-এর বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যাদানকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এঁরা রোমান আইনের একটি সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভিত্তি তৈরি করেন। নব প্রণীত রোমান আইন তিন শাখায় বিভক্ত ছিল ঃ জাস সিভিলে, জাস জেন্টিয়াম ও জাস ন্যাচুর‍্যাল। শুধুমাত্র রোমান নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য জাস সিভিলে (Jus Civile) বা সিভিল আইন কখনও ছিল লিখিত বা অলিখিত। এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল সিনেটের বিধানসমূহ, প্রিন্সেপদের নির্দেশসমূহ, প্রিটরদের আদেশসমূহ এবং প্রচলিত রীতিনীতি, যা সাধারণত আইনরূপে স্বীকৃত ছিল।

জাস জেন্টিয়াম (Jus Gentium) বা জনগণের আইন জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল রোমান নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। এ আইনের মাধ্যমে দাস প্রথাকে স্বীকৃতদান, ব্যক্তিগত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, ক্রয়-বিক্রয়ের নীতি নির্ধারণ, অংশীদারিত্ব ও চুক্তির ব্যাখ্যা প্রভৃতি সম্পাদিত হত। এর অবস্থান নিঃসন্দেহে সিভিল আইনের নিচেই ছিল এবং বিদেশীদের বিচারকার্য সম্পন্ন করার সময়ে এগুলি সিভিল আইনকে মাঝে মাঝে সাহায্য করত।

জাস ন্যাচুর‍্যাল (Jus Naturale) বা প্রাকৃতিক আইন ছিল রোমান আইনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক। ন্যায় ও সত্যের ভিত্তিরূপে স্টয়িক দার্শনিকরা প্রকৃতির আইনের একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দান করে গেছেন। তাঁরা বলেছেন, মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকেই সমান অধিকারপ্রাপ্ত, অতএব, কোন সরকারের অধিকার নেই এর উপর হস্তক্ষেপ করার। এই আইনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা সিসেরোর মতে, প্রাকৃতিক আইনই সর্বোচ্চ আইন। যে শাসক এই আইনকে অস্বীকার করে সে অত্যাচারী।

পরবর্তীকালের প্রায় সকল রোমান আইন প্রবক্তা এর স্বপক্ষে মত দিয়েছেন এবং সকল নাগরিক আইন প্রণয়নের সময়ে প্রাকৃতিক আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে চলার পরামর্শ দিয়েছেন।

www.icsbook.info

রোমান সভ্যতার পতনের কারণ

রোমান প্রজাতন্ত্র তথা সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস এক দীর্ঘস্থায়ী মর্মবেদনার কাহিনী। রোমান সভ্যতার সম্পূর্ণ ইতিহাস পাঠ করলেই এর পতনের কারণসমূহ অতি সহজেই পাঠকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। আপাত- দৃষ্টিতে রোমের সভ্যতা যতই বর্ণাঢ্য মনে হোক না কেন এর মননশীলতার জগৎ ছিল নিঃস্ব ও রিক্ততায় পরিপূর্ণ। সমাজের অধিকাংশ মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে রেখে তাদের ক্রীতদাসের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে কোনো সভ্যতাই যে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, উপরন্তু তা নিজের সঙ্কটকে ডেকে আনে— রোমের ইতিহাস পাঠে আমরা সে সত্যই অবগত হই।

বিশাল রোমান সভ্যতা তার সাতশত বছরে মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে বিশেষ কোনো অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। শিল্প ও সাহিত্যে তার অগ্রগতি যতখানি হয়েছিল, সে তুলনায় বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে সে বিন্দুমাত্র অগ্রগতি সাধনে সক্ষম হয়নি। উপরন্তু গ্রীকদের আবিষ্কৃত কারিগরি জ্ঞান বা বিজ্ঞানকে সে কাজে লাগায়নি। এর কারণ আর কিছুই নয়, রোমান উৎপাদন ও সমাজব্যবস্থার অসঙ্গতি এর ব্যর্থতার মূল কারণ। অবক্ষয়িত, অপ্রচলিত, বাতিল হয়ে যাওয়া দাসপ্রথাকে জোর করে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে সে শুধু সভ্যতার সংকটই সৃষ্টি করল না, তার সমস্ত শক্তি আর অহমিকা নিয়ে ভেঙে পড়ল।

গ্রীক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল নতুন পাথরের যুগ, ব্রোঞ্জযুগ ও লৌহ যুগের কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু এই তিনটি যুগের মিলিত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আবিষ্কারের সুফলগুলি গ্রীকরা পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে পারেনি তাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও ভাবাদর্শের উপস্থিতির দরুন। ব্রোঞ্জযুগের শেষ পর্বে যে উৎপাদন সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করার একটি সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল লৌহযুগের আবির্ভাবে। কিন্তু লৌহযুগের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আবিষ্কার ও তার বিকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল ক্রীতদাসপ্রথা বাতিল করে একটি মুক্ত সমাজ তৈরি করা, যে সমাজের মুক্ত মানুষ তার স্বাধীনতা ও শ্রমকে কজে লাগিয়ে একটি স্বাধীন অর্থনীতি ও উৎপাদনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে। কিন্তু তা হতে পারেনি কারণ, যে ঘৃণিত ও অবক্ষয়িত দাসপ্রথা ব্রোঞ্জযুগের সাথে সাথেই বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, গ্রীকরা তা টিকিয়ে রেখেছিল। তার ফলে সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল দুটি বিপরীত শ্রেণী—দাসমালিক ও ক্রীতদাস। দাসমালিকগণ সর্বপ্রকার শারিরীক শ্রমকে ঘৃণার চোখে দেখত। অন্যদিকে ছিল নিপীড়িত বঞ্চিত অসহায় ক্রীতদাস— উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়েও উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো সুফলই তাদের কাজে লাগত না। কাজেই উৎপাদিকাশক্তির বিকাশেরও তারা কোনো অবদান রাখতে পারেনি। এ অসঙ্গতির দরুনই গ্রীকযুগে উৎপাদিকাশক্তির যতখানি বিকাশ ঘটা সম্ভব ছিল, তা হতে পারেনি।

রোমানরা তাদের সভ্যতা গড়ে তুলেছিল গ্রীক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপরে, সঙ্গে সঙ্গে তারা গ্রহণ করেছিল গ্রীকদের উৎপাদন ও সমাজব্যবস্থা।

প্রথম থেকেই রোম সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেছিল। একের পর এক দেশ জয় করে রোম তার রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করেছিল। শেষ পর্যন্ত এর ফল হয়েছিল ভয়াবহ। একটির পর একটি রাজ্য জয় করে সেখান থেকে রোম সংগ্রহ করেছিল বিপুলসংখ্যক

www.icsbook.info

ক্রীতদাস। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইতালিতে ক্রীতদাসের সংখ্যাই ছিল দু কোটিরও বেশি–যেটা সমগ্র স্বাধীন জনসংখ্যার প্রায় তিনগুণ। এ সকল ক্রীতদাসদের উৎপাদনের সর্বস্তরে নিয়োগ করার ফলে স্বাধীন কৃষক ও শ্রমিকরা হয়ে পড়ল বেকার ও অন্যদিকে সমাজে দাসদের, বিশেষত দাসনারীর উপস্থিতি নৈতিক অবক্ষয়ের সূচনা করল।

ক্রীতদাস প্রথার বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা ক্রমাগত এর মূল উৎপাদিকা শক্তি অর্থাৎ দাসদের ধ্বংস সাধন করত। অধিক মাত্রার পরিশ্রমের ফলে ক্রীতদাসগণ অতি অল্পদিনেই মারা যেত এবং সেখানে নতুন দাস যোগাড় করতে গিয়ে আবার নতুন রাজ্য জয় করতে হত। এভাবে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে গিয়ে রোমানরা তাদের সামরিক শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি করে চলল। এর ফল ফলল মারাত্মকভাবে, যা আমরা পূর্বেই বিস্তৃত আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি সামরিক অধিনায়কগণ কিভাবে ক্ষমতাশালী হয়ে রোমে দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ ডেকে এনেছিলেন এবং কিভাবে তাঁরা শেষ পর্যন্ত রোম প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

দাস-মালিকগণ নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সামরিক অধিনায়কের শাসনই উৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা করল।

যতদিন পর্যন্ত রোমের সাম্রাজ্যবিস্তার অক্ষুণ্ন ছিল ততদিন পর্যন্ত দাসপ্রথা টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল। কিন্তু যখনই সাম্রাজ্য বিস্তার বন্ধ হল তখনই বিজিত দেশ থেকে যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাসরূপে আমদানি করা বন্ধ হয়ে গেল। এর ফলে দেখা দিল আসল সংকট।

উৎপাদনে দাসপ্রথা কিভাবে সংকট সৃষ্টি করেছিল তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। দাস অর্থনীতি এমনই পশ্চাৎপদ যে এটা ফলিত বিজ্ঞানের বিন্দুমাত্র উন্নতি সাধন করতে পারে না। অথচ ক্রমাগত যান্ত্রিক ও কারিগরি আবিষ্কারের মাধ্যমে উৎপাদিকাশক্তির বিকাশ না ঘটালে কোনো সভ্যতাই শেষ পর্যন্ত টিকতে পারে না। দাসতন্ত্রের উচ্চতম পর্যায়ে, রোমান যুগে কোনো যান্ত্রিক আবিষ্কার তো ঘটেইনি, উপরন্তু আগে যে সকল কাজে গাধা বা ঘোড়ার ব্যবহার হত, সুসভ্য রোমান যুগে সে সকল কাজে দাসদের নিয়োগ করা হত। এভাবে দাসতন্ত্র উৎপাদন প্রথার বিকাশের পথ রুদ্ধ করে বসে থাকে।

ফলে উৎপদনের সকল স্তরে সংকট প্রকটভাবে দেখা দেয়। বাইরে থেকে দাসের যোগান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ ক্রীতদাস ধরে রাখার চেষ্টা করল। তাদের উপর শোষণের মাত্রা পূর্বের অপেক্ষা বেড়ে যাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই ক্রীতদাসগণ বিদ্রোহ শুরু করল। দাসবিদ্রোহ ব্যাপক হারে দেখা ছিল। অনেক দাসই পালিয়ে গেল এবং তাদের আর ধরে আনা সম্ভব হল না; বাকি যারা রইল তাদের দিয়ে আর আশানুরূপ কাজ না পাওয়ার ফলে দাসপ্রথা আর কোনোক্রমেই লাভজনক রইল না।

এ সংকট এড়ানোর একমাত্র উপায় ছিল দাসপ্রথাকে বিলুপ্ত করে, উৎপাদন সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে, উৎপাদিকাশক্তির অভ্যন্তরীণ বিকাশ ঘটানো। কিন্তু অধিকাংশ দাস-মালিকই দাসপ্রথার বিলুপ্তি সাধনে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় সংকট আরও ঘনীভূত হতে লাগল।

www.icsbook.info

সংকট দেখা দিল সর্বত্র— কৃষি ও শিল্পে দিন দিন উৎপাদন কমতে শুরু করল; ব্যবসা বাণিজ্য ক্রমে অচল হয়ে উঠল। অর্থনীতির অবক্ষয়ের ফলে সর্বত্র অচলাবস্থার সৃষ্টি হল। রোগ ও মহামারীতে প্রচুর লোকক্ষয় ঘটতে শুরু করল। গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর জনশূন্য হয়ে গেল মহামারীতে।

এর উপর শুরু হল বৈদেশিক আক্রমণ। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে এ আক্রমণ এত মারাত্মকভাবে দেখা দিল যে, বিশাল রোমান সামরিক বাহিনী দিয়েও তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হল না। রোমান সৈন্যবাহিনীতে বিদেশী সৈন্যদের ভর্তি করা হলে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় দিন দিন বেড়ে চলল। কিন্তু এত সংকটের মধ্যেও রোমান সম্রাটদের বিলাসিতা এতটুকু কমেনি। এক হিসাবে দেখা যায় যে, এ বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে সাম্রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ সোনা ও অর্ধেক পরিমাণ রূপা ভারতবর্ষে চালান হয়ে গেছে। এমনকি মুদ্রা তৈরির জন্য এখন উপযুক্ত পরিমাণ সোনা-রূপার ঘাটতি দেখা দিল। এ ঘাটতি মেটানো হল খাদ মেশানো মুদ্রা তৈরি করে। খাদের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মুদ্রার শতকরা সাড়ে আটানব্বই ভাগই খাদ। এ খাদ মেশানো মুদ্রায় আস্থা না থাকায় শেষ পর্যন্ত মুদ্রাপ্রথাই বাতিল হয়ে গেল। অর্থনীতি আবার ফিরে গেল বিনিময় প্রথায়।

এ সংকটময় পরিস্থিতিতে দাসপ্রথা অচল হয়ে উঠল। গ্রামাঞ্চলে বৃহদায়তন কৃষিখামারে বা শহরে কারখানায় বা খনিতে কোথাও দাসপ্রথা আর লাভজনক রইল না। ব্যাপকহারে উৎপাদিত পণ্যের বাজার প্রকৃতপক্ষে লোপ পেয়ে গেল।

শহরের কারখানা ও খনিগুলি ক্রমে অচল হয়ে উঠল। গ্রামে অবশ্য অনেক ভূস্বামী তাদের বড় বড় কৃষি খামারগুলি ভেঙে টুকরো টুকরো করে অনেক ক্ষেত্রে ক্রীতদাসদের মুক্ত করে তাদের মধ্যেই জমি বন্টন করে দেন। দাসশ্রমের দ্বারা কৃষিখামার পরিচালনার পরিবর্তে স্বাধীন কৃষকদের উৎপন্ন ফসলে ভাগ বসানোই তাদের কাছে অধিক লাভজনক বলে মনে হয়। গ্রামে ভিলা বা দুর্গ তৈরি করে অনেকে কৃষকদের নিরাপত্তার ভার স্বহস্তে তুলে নেন। ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক আক্রমণের মুখে নিষ্ক্রিয় রোমান সম্রাটের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা যখন ক্রমেই ভেঙে পড়তে থাকে, তখন স্থানীয় ভূস্বামীগণই কৃষকদের জান ও মাল অনেক ক্ষেত্রে রক্ষা করেন। রোমান সাম্রাজ্যের শেষের দিকে এভাবেই দাসপ্রথা আপনা আপনি ভেঙে পড়ে।

শহরগুলি পূর্বেই অচল হয়ে গিয়েছিল। কিছু সংখ্যক শ্রমিক ও কারিগর শহর থেকে গ্রামে চলে আসে এবং ভূস্বামীদের আশ্রয় গ্রহণ করে একটি স্বনির্ভর ম্যানর অর্থনীতি বা গ্রামীণ অর্থনীতি গড়ে তোলে। এদের মধ্যে কৃষিজীবীরাই প্রধান হলেও কামার, কুমার,নাপিত, রাজমিস্ত্রি, ছুতোর, মুচি ও দর্জি— এদের সকলের মিলিত প্রচেষ্টাতেই গড়ে ওঠে পরবর্তী সামন্ত অর্থনীতির ভিত্তি। রোমান সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশকারী বর্বর জাতিরা এ ব্যবস্থাকে পুরোপুরিভাবে মেনে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে দাসপ্রথার কোনো প্রচলন ছিল না বলেই স্বাধীন স্বনির্ভর সামন্ত অর্থনীতি গড়ে তুলতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

এভাবেই রোমান সাম্রাজ্য তার অবক্ষয়িত দাসপ্রথা নিয়ে চিরতরে ভেঙে পড়ল। মানবজাতির চরম অবমাননার ইতিহাস দাসপ্রথার ইতিহাস। এ অবমাননাকর প্রথাকে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে রোমানগণ নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে সবচেয়ে বেশি।

www.icsbook.info

ঘুণে ধরা রোমান সাম্রাজ্য বর্বর আক্রমণের অনেক আগেই অস্তমিত হয়েছিল। বর্বর আক্রমণ এ অবক্ষয়িত রোমান সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত অবসান ঘটিয়ে মানবজাতির অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে দেয়।

রোমক ঐতিহ্য

সমাজ ও অর্থনীতির বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতির জন্য রোমক সাম্রাজ্য অবলুপ্ত হলেও রোমাক সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান, নির্দশন, কলাকৌশল ও চিন্তাধারার প্রভাব কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়নি। অবশ্য রোমক ঐতিহ্যের মাধ্যমে গ্রীক সংস্কৃতির অনেক উপাদানও পরবর্তী মানব-সমাজকে প্রভাবিত করেছে। রোমক স্থাপত্যশিল্প মধ্যযুগের ইউরোপে নির্মিত গির্জা ও প্রাসাদ নির্মাণকে এমনকি আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য দেশের সরকারি ও সার্বজনীন ভবন নির্মাণকে প্রভাবিত করেছে। আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে যে নগর চত্বরে ঘোড়ায় চড়া মূর্তি, তোরণ, স্তম্ভ, মহৎ ব্যক্তিদের প্রতিমূর্তি প্রভৃতি স্থাপন করা হয়, তাতে রোমক সংস্কৃতির প্রভাব বিদ্যমান। রোমক আইন (বিশেষত ধনিকের সম্পত্তি রক্ষা সম্পর্কিত আইন) আধুনিক কালের ইউরোপ ও আমেরিকার এবং সে সূত্রে সারা ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার আইন ও জ্ঞানচর্চার পুনরুজ্জীবনে রোমক সাহিত্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রোমক রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় সংগঠন খ্রিষ্টীয় ক্যাথলিক চার্চের সংগঠনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

www.icsbook.info

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস

ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের ইতিহাস অতি প্রাচীনকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ২ থেকে ৪ লক্ষ বছর আগের মানুষের বসবাসের চিহ্ন এখানে পাওয়া গেছে। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই পুরাতন পাথর যুগের পাথরের হাতিয়ার ও অন্যান্য উপকরণ পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, অতি প্রাচীন কালেই ভারতীয় উপমহাদেশে শিকারি মানুষের আগমন ঘটেছিল। তবে সে মানুষরা আধুনিক মানুষ ছিল না। কালক্রমে আধুনিক মানুষও ভারতীয় উপমহাদেশে এসে পৌঁছেছিল। এদের শিকারি কার্যকলাপের সাক্ষ্য-প্রমাণও পাওয়া গেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মধ্য পাথরের যুগের অনুরূপ পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। অনুমান করা কঠিন নয় যে, ভারতবর্ষের বাইরে থেকেই প্রথম এ সকল আধুনিক মানুষ এ উপমহাদেশে এসে পৌঁছেছিল এবং সাথে করে উন্নত ধরনের শিকারের হাতিয়ার ও জ্ঞান নিয়ে এসেছিল। কারণ, আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, আধুনিক মানুষের উৎপত্তি প্রথমে একস্থানে ঘটেছিল, সেখান থেকেই তারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং এ কথা জানাই আছে যে, ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক মানুষের উৎপত্তি ঘটেনি।

প্রাচীন ভারতে শিকারি যুগের সমাজের অস্তিত্বের অনেক প্রমাণ পাওয়া গেলেও নতুন পাথরের যুগের কৃষিসমাজের অস্তিত্বের বিশেষ কোনো সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি। ৪,০০০ থেকে ৩,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে বেলুচিস্তানে এবং সিন্ধু অববাহিকায় (সিন্ধু ও পাঞ্জাবে) নতুন পাথর যুগের সংস্কৃতির উদয় ঘটেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। পশ্চিম এশিয়া থেকেই যে সিন্ধু-বেলুচিস্তানে নবোপলীয় সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল তাতে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। ভারতবর্ষের আরও কয়েক স্থানে নবোপলীয় কৃষি সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে; যথা, দক্ষিণ ভারতে, কাশ্মীরে এবং বাংলা ও আসামে। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, মধ্য এশিয়া থেকে কাশ্মীরে এবং দক্ষিণ চীন থেকে আসামে নবোপলীয় সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল। আর দক্ষিণ ভারতে নবোপলীয় সংস্কৃতি পৌঁছেছিল হয়তো উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষ থেকেই, তবে এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন।

আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি যে, নবোপলীয় সমাজের বিকাশের মধ্য দিয়ে মিশর বা মেসোপটেমিয়াতে প্রথম ব্রোঞ্জযুগের নগরসভ্যতার উদয় ঘটেছিল। ভারতীয় উপমহাদেশেও সিন্ধু অববাহিকায় ঐ রকম এক উন্নত নগরসভ্যতার উদয় ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে। কিন্তু এ উপমহাদেশেরই পরিসরে সিন্ধু-বেলুচিস্তানের নবোপলীয় সমাজের বিকাশের মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতার আবিষ্কার ঘটেছিল এমন কথা মনে করা ঠিক নয়। সম্ভবত, পশ্চিম এশিয়া অর্থাৎ ব্যাবিলন ইত্যাদি অঞ্চল অথবা মিশর থেকেই ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতা এসে ভারতীয় উপমহাদেশে পৌঁছেছিল। এ অভিমতের পক্ষে একটা যুক্তি হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষে

www.icsbook.info

নবোপলীয় কৃষি সংস্কৃতি এত বেশি বিস্তার বা বিকাশলাভ কখনই করেনি যে তার ভিত্তিতে স্বতন্ত্রভাবে ব্রোঞ্জযুগের উদয় ঘটা সম্ভব। দ্বিতীয় যুক্তি হচ্ছে এই যে, ব্রোঞ্জযুগের যে কতগুলি জরুরি আবিষ্কার প্রথম মিশর ও মেসোপটেমিয়াতেই ঘটেছিল, ভারতবর্ষের সিন্ধু সভ্যতাতেও তার প্রয়োগ দেখা যায়। আবিষ্কারগুলি হল, ব্রোঞ্জের কারিগরি, ইট, ওজন ও মাপনী, লেখন পদ্ধতি ইত্যাদি। এ সকল জটিল আবিষ্কার যে একবার মেসোপটেমিয়াতে একবার ভারতবর্ষে আলাদা করে ঘটবে, এ রকম মনে করা রীতিমত কষ্টকল্পনা। কারণ আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, লিখনপদ্ধতি বা ব্রোঞ্জের কারিগরি ইত্যাদি আবিষ্কারের জন্য বিশেষ ধরনের সামাজিক পটভূমি প্রয়োজন হয়। এ কথা তাই মনে করা বিশেষভাবে যুক্তিসঙ্গত যে, সিন্ধু উপত্যকাতে ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতার উদয় ঘটেছিল মিশর বা মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার প্রভাবে বা তার অনুকরণে। আমরা এখন এই সিন্ধু সভ্যতার পরিচয় প্রদান করব।

সিন্ধু সভ্যতা

প্রায় অর্ধশতাব্দীরও কিছু পূর্বে ব্রিটিশভারতের (বর্তমানে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার মহেঞ্জোদাড়োতে এবং পাঞ্জাবে মন্টগোমারি জেলার হরপ্পাতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে যে ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়, তাতে জানা যায় যে মিশর, ব্যবিলনিয়া প্রভৃতি সভ্যতার সমসাময়িক এক ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতা পাঁচ হাজার বছরেরও পূর্বে ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছিল। এ ধ্বংসস্তূপের আবিষ্কার ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ববর্তী ধারণা একেবারে পাল্টে দেয়। বৈদিক সভ্যতাকেই ভারতবর্ষের সর্বপ্রাচীন সভ্যতা বলে যে ধারণা এতদিন চলে এসেছিল, নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে তা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়।

সিন্ধু নদের তীরে গড়ে উঠেছিল বলে এ সভ্যতাকে সিন্ধু সভ্যতা বলা হয়। মাটির অভ্যন্তরে ধ্বংসস্তূপের স্তরবিন্যাস লক্ষ্য করে যে কালপর্ব নির্ণয় করা হয়েছে তাতে অনুমান করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের মধ্যে এ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এ সভ্যতা ছিল মূলত নগরসভ্যতা।

নগর জীবন

মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা— এ দুই স্থানে দুটি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। শহরগুলির রাস্তাঘাট, দালান-কোঠা প্রভৃতি সুপরিকল্পিত উপায়ে নির্মিত। ইমারতগুলি মজবুত পাকা ইটের তৈরি; নানা ধরনের বাড়ি দেখা যায়— ছোট, বড়, মাঝারি। স্তম্ভবিশিষ্ট হলঘরের একটি চিহ্ন পাওয়া গেছে। একে সভাগৃহ বলে অনুমান করা হয়। সাধারণের জন্য জলাশয়, স্নানাগার, কূপ ও শৌচাগার প্রভৃতি ছিল। পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা দেখলে অনুমান করা যায় পৌরজীবনের সুখ-সুবিধার সকল ব্যবস্থাই বিদ্যমান ছিল। বাঁধানো ও প্রশস্ত রাস্তার দু ধারে জনগণের আবাসবাটিগুলির অভ্যন্তরে উপরে ওঠার সিঁড়ি, আরো ভিতরে শয়নকক্ষ, রান্নাঘর, পাকা নর্দমা ইত্যাদি দেখে ধারণা হয় যে বর্তমান নাগরিক জীবনের সকল উপকরণই সেখানে বিদ্যমান ছিল। তবে বিরাট বিরাট দালানকোঠাগুলিতেও কোথাও রাজতন্ত্রের চিহ্ন বা দাসপ্রথার স্বাক্ষর পাওয়া যায় না।

www.icsbook.info

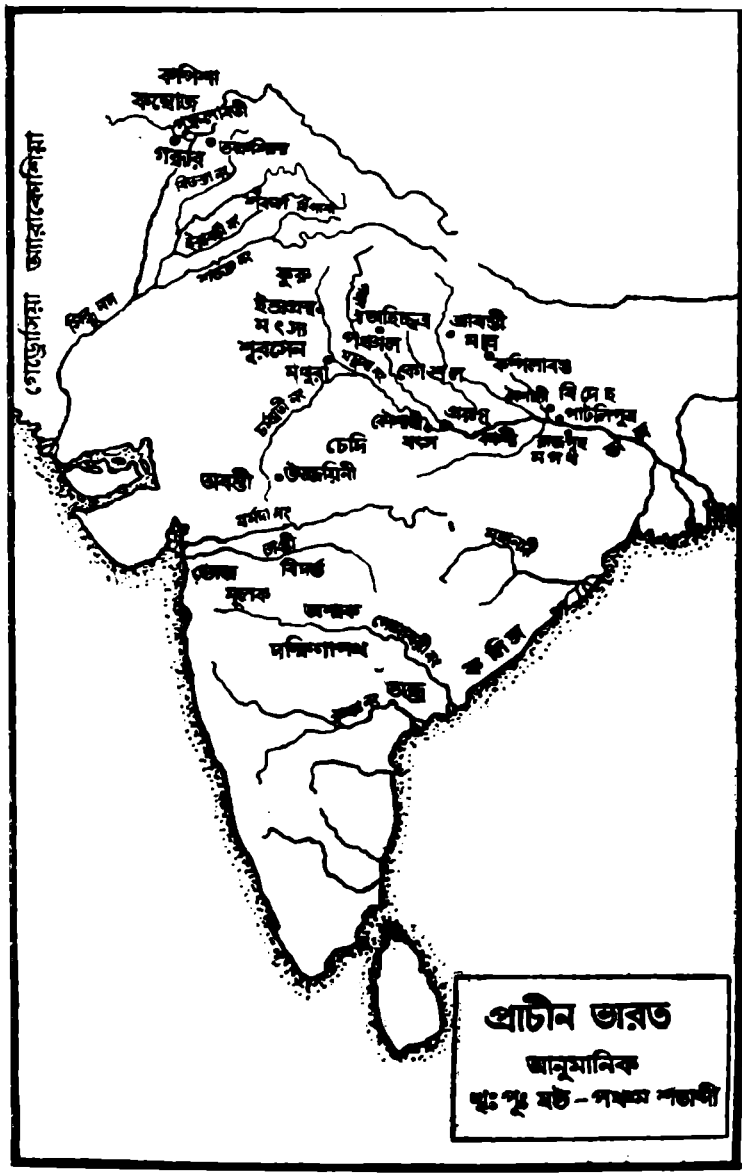

www.icsbook.info

পোশাক পরিচ্ছদ

এখানকার স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সুন্দর সুন্দর পোশাক ও অলঙ্কার পরিধান করত। হাতির দাঁত ও সোনা-রূপার অলঙ্কার সেখানে প্রচলিত ছিল— আংটি, হার, কানের দুল, বাজুবন্ধ, মল, নাকছাবি ইত্যাদি ধরনের অলঙ্কার সেখানে পাওয়া গেছে। সেখানে কার্পাস ও পশমবস্ত্রের প্রচলন ছিল।

জীবিকা ও শিল্পদ্রব্য

সিন্ধু সভ্যতার যুগের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। গমই ছিল প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এ ছাড়া যব ও কার্পাসের চাষ হত। প্রধান খাদ্য ছিল মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ। কৃষক ছাড়াও কুমার, কামার,স্বর্ণকার, ছুতোর, মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি প্রভৃতির শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ

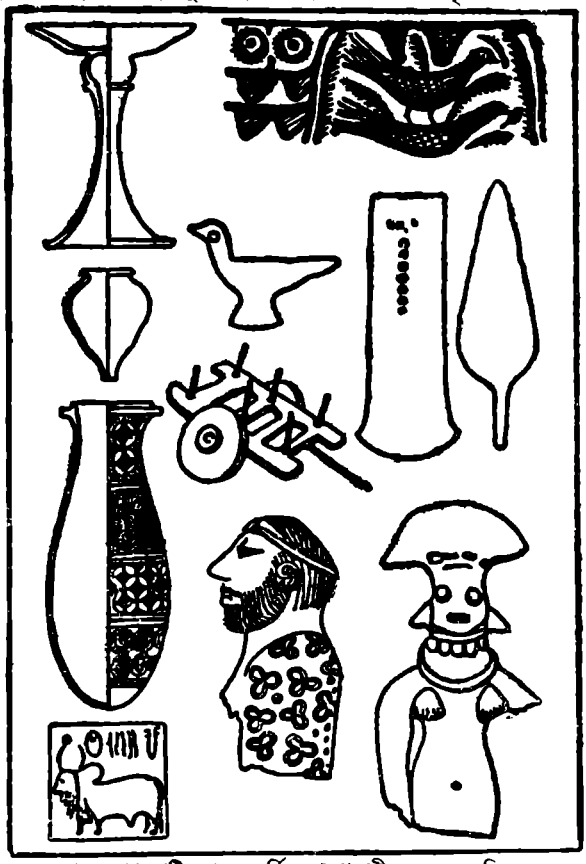

হরপ্পাতে প্রাপ্ত মাটির পাত্র, মূর্তি, খেলনা, সীলমোহর প্রভৃতি।

ভূমিকা ছিল। এদের শিল্পকর্মের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। হাড় ও হাতির দাঁতের তৈরি চিরুনি ও সুঁচ, তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরি কুঠার, কাস্তে, ছুরি, ক্ষুর, মাছ ধরার বঁড়শি প্রভৃতি পাওয়া গেছে। গৃহস্থালীর ব্যবহারের জন্য সাধারণত মাটির

www.icsbook.info

দ্রব্যেরই প্রচলন ছিল। অসংখ্য মাটির পাত্র, পোড়ামাটির খেলনা, কুমোরের চাক, চাকাওয়ালা খেলনার গাড়ি, ছোট ছোট চেয়ার–এমনকি পাশা খেলার ঘুঁটিও পাওয়া গেছে। পোড়ামাটির তৈরি গরু, মহিষ, কুকুর, শুয়োর, ভেড়া ও মানুষের মূর্তি পাওয়া গেছে। মাটির মনুষ্য মূর্তিগুলির মধ্যে নৃত্যরত পুরুষ ও রমণীর মূর্তি প্রধান এবং এদের শিল্পসৌন্দর্য অতুলনীয়। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পাতে যে সীলমোহরগুলি পাওয়া গেছে, তাতে কুঁজওয়ালা ষাঁড়ের মূর্তি দেখা যায়, তবে কোথাও ঘোড়ার মূর্তি পাওয়া যায়নি। একটি সীলে মাস্তুলহীন জাহাজের চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। তাতে অনুমান করা যায় যে, বিদেশের সাথে এদের সমুদ্রপথে বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল।

ধর্মবিশ্বাস

সিন্ধু সভ্যতার যুগের মানুষদের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু নিশ্চিত করে বলা কঠিন। কারণ, এখানে কোনো ধর্ম মন্দির বা উপাসনালয় পাওয়া যায়নি। তবে ষাঁড়,কুমির, সাপ ও গাছের পূজা হত বলে অনুমান করা হয়। পোড়ামাটি নির্মিত মাতৃকা মূর্তি ও পশুবেষ্টিত পুরুষমূর্তি দেখে অনুমান করা হয় যে, এখানকার মানুষ জগৎমাতা দেবীর ও জগৎপিতা পশুপতি- নাথের পূজা করত। মাটির নিচে প্রাপ্ত মানুষের কঙ্কালের সাথে কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। তাতে অনুমান করা হয়, বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণে এ সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ বৈদেশিক শত্রুরা ছিল ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশকারী আর্যগণ। অনেকের মতে, সিন্ধুনদের বন্যায় অথবা নদীর খাত বদলের ফলে এ সভ্যতা ধ্বংস হয়।

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের ফলে, প্রাচীন আর্য সভ্যতার পূর্বেও যে এ দেশে নগর সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। তবে এ সভ্যতা ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতা, এ কারণেই সভ্যতার খুব বেশি বিস্তৃতি ঘটেনি। এর পরবর্তীকালে আর্যগণ ভারতবর্ষে গ্রামীণ সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। কালক্রমে লোহার হাতিয়ারের প্রচলন ঘটেছিল এবং ভারতবর্ষের সুবিস্তির্ণ অঞ্চলে আর্যদের এ গ্রামীণ সভ্যতার দ্রুত বিকাশ ঘটেছিল।

আর্যজাতি ও বৈদিক সভ্যতা

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে একদল আক্রমণকারী উপমহাদেশে প্রবেশ করে। দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ ও উন্নত নাসার অধিকারী এ জাতির নাম আর্য জাতি। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী নরগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত এ জাতির আদি বাসস্থান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, তবে সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে মধ্য এশিয়া থেকে এদের আগমন ঘটে। সম্ভবত জমির সন্ধানে ও উন্নত জীবনযাত্রার তাগিদে এরা নিজেদের আবাসভূমি পরিত্যাগ করে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে অগ্রসর হয়। একদল ইরানে প্রবেশ করে প্রাচীন পারস্য সভ্যতার গোড়াপত্তন করে এবং অন্যদল ভারতের উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে প্রবেশ করে পাঞ্জাব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।

খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে ৮০০ অব্দ সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের আর্যরা ক্রমশ পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে কুরু,পাঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, কোশল অঞ্চলে ও পরে গণ্ডক নদী অতিক্রম করে কাশী ও বিদেহ অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। ভারতবর্ষের প্রাচীন

www.icsbook.info

অধিবাসীদের পরাস্ত করে আর্যদের এই অভিযানকার্য চলে। আর্যরা এদের অনার্য বা অসভ্য বলে অভিহিত করে তাদের 'দাস' বা 'দস্যু' নামে আখ্যায়িত করেছে। তবে কৃষ্ণবর্ণ অনার্যগণ আর্যদের থেকে সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থার দিক দিয়ে পৃথক হলেও তারা সত্যিকার অর্থে অসভ্য ছিল না। কৃষিকার্য, 'পুর' বা নগর তৈরি, দুর্গ নির্মাণ ও যুদ্ধবিগ্রহে এরা কম নিপুণ ছিল না। বস্তুত, আর্যরা এগুলি সম্পর্কে অনার্যদের কাছ থেকেই শিক্ষালাভ করে।

আর্যরা ক্রমশ সমগ্র উত্তর ভারত অধিকার করে। তাদের নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম হয় আর্যাবর্ত। মধ্যভারতে আর্যরা বিদর্ভ ও চেদি রাজ্য ও পশ্চিমে অবন্তী, সৌরাষ্ট্র, সৌবীর প্রভৃতি কয়েকটি আর্য জনপদ ও গোদাবরীর তীরেও দুটি রাজ্য স্থাপন করে। আর্যরা বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করে ধীরে ধীরে দক্ষিণাপথে প্রবেশ করে এবং অনার্যদের সাথে যুদ্ধ করে সেখানে কয়েকটি জনপদ প্রতিষ্ঠা করে। সুদূর দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত আর্যসভ্যতার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ার কাহিনী সে যুগের বিখ্যাত মহাকাব্য রামায়ণ থেকে জানা যায়।

বেদ ও বৈদিক সভ্যতা

প্রাচীন আর্য সভ্যতার ইতিহাসের মূল সূত্র আর্যদের প্রধান ধর্মগন্থ বেদ। এর রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ। হিন্দুধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যের মূল উৎস হল বেদ। বেদ চারপি ঃ ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব। মন্ত্র ও স্তব দ্বারা রচিত ঋগ্‌বেদ সবচেয়ে প্রাচীন। অনেকগুলি মন্ত্র নিয়ে গানের স্বরে রচিত হয়েছে স্যামবেদ। যজুঃর্বেদ পরিপূর্ণ যজ্ঞের ক্রিয়াকার্য ও তার উপযোগী বির্ধিমন্ত্রে, আর সর্বশেষ বৈদিক ধর্মগন্থ অথর্ববেদে রয়েছে সৃষ্টিরহস্য, চিকিৎসা, বিপদ নিবারণ, শত্রুদমন প্রভৃতি বিষয়ের মন্ত্র।

প্রতিটি বেদের দুটি অংশ-সংহিতা (পদ্যে রচিত) ও ব্রাহ্মণ (গদ্যে রচিত)— পরবর্তী বৈদিক যুগে আরণ্যক ও উপনিষদ নামে দুটি ধর্মতত্ত্ব বা দর্শন-শাখার সৃষ্টি হয়। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে আর্যদের যাগযজ্ঞের পদ্ধতি, গার্হস্থ্য জীবন ও সমাজজীবনের বিধি-ব্যবস্থার পরিচয় জানা যায়। ঋগবেদের কাল থেকে পরবর্তী যুগ পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বছরে আর্যরা সঙ্গীত, শিল্প, নাট্য, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্র রচনা করে।

ধর্ম

প্রাচীন আর্যগণ প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবদেবীরূপে কল্পনা করে তার আরাধনা করত, এভাবে বজ্রবৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র, আকাশের দেবতা দ্যোঃ, জলের দেবতা বরুণ, বায়ুর দেবতা মরুৎ, অগ্নি, পৃথিবী, বৃহস্পতি, নাসত্য (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) এবং সূর্য অথবা মিত্র প্রভৃতি দেবতাদের উপাসনা হত। এ সকল দেবতাদের উদ্দেশ্যে আর্যরা যাগযজ্ঞের আয়োজন করত এবং মন্ত্র ও স্তব সহকারে যজ্ঞে বিভিন্ন দ্রব্য আহুতি দিত।

বৈদিক যুগের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা

বৈদিক যুগের সমাজ ছিল পিতৃপ্রধান। সমাজের ভিত্তি ছিল পরিবার। পরিবারের কর্তা ছিলেন 'গৃহপতি'। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি 'বিশ' বা 'জন' গঠিত হত, এর কর্তাকে বলা হত 'বিশপতি' বা 'রাজন'। রাজন বা রাজাকে শাসন ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য

www.icsbook.info

কয়েকজন গ্রামণী পুরোহিত ও সেনানী উপস্থিত থাকতেন। এ ছাড়া বৈদিক সাহিত্যে সভা ও সমিতি নামে দু'টি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত রাজ্যের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ একত্রিত হয়ে এ সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতেন।

বৈদিক যুগের শেষ দিকে রাজাদের ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং কোনো কোনো শক্তিশালী রাজা পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি দখল করে একটি বৃহৎ রাজ্য গঠন করে রাজচক্রবর্তী উপাধি ধারণ করতেন।

জীবিকা ও আর্থিক ব্যবস্থা

আর্যরা প্রথমে পশুপালক ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে তারা প্রধানত কৃষিকার্যকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করে। তারা ধাতুশিল্প, মৃৎশিল্প ও বয়নশিল্পে দক্ষতা অর্জন করে।

আর্যদের প্রধান খাদ্য ছিল শস্য, পশুর মাংস ও সোমরস নামক উপাদেয় পানীয়।

তারা সুতি, পশমী বস্ত্র ও সুগন্ধীদ্রব্যের ব্যবহার জানত। ঘোড়াচালনা, রথচালনা ও পাশা খেলা ছিল তাদের প্রধান আমোদ-প্রমোদ।

আর্যসমাজে নারীর মর্যাদা ছিল। গৃহকর্ম ও ধর্মাচরণে নারীর সমান অধিকার ছিল পুরুষের সাথে।

বর্ণশ্রম

ঋগ্‌বেদে আর্য ও অনার্যদের মধ্যে শ্রেণীভেদ ছিল, পরে গুণ ও বৃত্তি অনুসারে আর্যদের মধ্যেই চারটি বর্ণ বা শ্রেণী গড়ে ওঠে। তখন শাস্ত্রজ্ঞরা ব্রাহ্মণ, অস্ত্রনিপুণ বীর শাসকগণ ক্ষত্রিয়, কৃষি বণিক ও ব্যবসায়ীরা বৈশ্য ও কৃষি শ্রমিকরা শূদ্র নামে পরিচিত ছিল।

একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তৎকালীন পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতার মতো ভারতবর্ষে ক্রীতদাসপ্রথা গড়ে ওঠেনি। আর্যসমাজের মধ্যে গৃহকর্মের জন্য কিছুসংখ্যক দাস নিয়োজিত থাকলেও উৎপাদনের সর্বস্তরে ক্রীতদাস নিয়োগের প্রথা কখনই প্রচলিত ছিল না। কোনো কোনো প্রাচীন সভ্যতাতে কি কারণে দাসপ্রথার উদয় না ঘটতে পারে চীনের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনাকালে সে বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপ কারণ প্রাচীন ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে।

মহাকাব্যের যুগ

বৈদিক যুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছে মহাকাব্যের যুগে। রামায়ণ ও মহাভারত— এ দু'টি বিখ্যাত মহাকাব্যে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি, ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার, রাজধর্ম ও প্রজাপালনের কর্তব্য, শিক্ষাদীক্ষা, শৌর্যবীর্য, জনকল্যাণ, পিতৃপুরুষের সম্মান, পারিবারিক সম্পর্কের আদর্শ সবকিছুই বর্ণিত হয়েছে। মহাভারতের ঈশ্বরের অবতার শ্রীকৃষ্ণের উপদেশগুলি নিয়ে 'গীতা' রচিত হয়েছে।

প্রাক্-ঐতিহাসিক, বৈদিক ও মহাকাব্যের যুগ একত্রে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি রচনা করেছে।

www.icsbook.info

জৈন ও বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব

মহাকাব্যের যুগের শেষ পর্যায়ে হিন্দুধর্ম ও সমাজে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের প্রাধান্য, আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের প্রবর্তনের ফলে এ সমাজ তার অন্তর্নিহিত মাহাত্ম্য বিসর্জন দিতে শুরু করল। জাতিভেদ প্রথা ও বলিদান মানুষের মনে ধর্মের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি করল।

প্রচলিত ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার উপর প্রবল বিতৃষ্ণায় কয়েকজন সংসার- জীবন ত্যাগ করে সত্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়লেন। এঁদের একজন জৈন ধর্ম প্রবর্তক মহাবীর ও অপরজন বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ।

মহাবীর ও জৈনধর্ম

বৈশালীর এক ক্ষত্রিয় বংশে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহাবীরের জন্ম হয়। দীর্ঘ বারো বছর কৃচ্ছ্র সাধনা ও তপস্যার পরে তিনি হলেন 'জিন' বা বিজয়ী। তাঁর প্রচারিত ধর্মকে বলা হয় জৈনধর্ম।

জৈনরা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, বেদের অভ্রান্ততা ও জাতিভেদ স্বীকার করে না। তাদের মতে পাপপুণ্য নিজ কর্ম অনুসারেই হয় আর মানুষ সেই পাপ-পুণ্যের ফলভোগ করে।

যিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করে নিজের বশে অনন্ত শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারেন, তিনিই জিন বা সিদ্ধপুরুষ। জৈনরা অহিংসাবাদী, পশু বধ করে না, এমনকি মাছমাংসও খায় না। অনেকে পোশাক-পরিচ্ছদও পরিধান করে না। এরা 'দিগম্বর' নামে পরিচিত। জৈনধর্ম ভারতবর্ষের বাইরে বিশেষ প্রসার লাভ করেনি।

বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম

হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের অন্তর্গত কপিলাবস্তু নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে ক্ষত্রিয় শাক্য বংশে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ। চিন্তাশীল সিদ্ধার্থ অল্প বয়সেই সংসারের দুঃখ-বেদনা, জরা ও মৃত্যুতে কাতর হতেন এবং যৌবনে স্ত্রী-পুত্রের বন্ধনও তাঁকে সংসারের মায়ায় আবদ্ধ করতে পারল না, সংসার ত্যাগ করে তিনি সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। দীর্ঘদিন ধরে বহুদেশে পরিভ্রমণ করে অবশেষে গয়ার নিকট উরুবিল্ব নামক স্থানে এক বোধিবৃক্ষের তলে তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। দীর্ঘ ছয় বছর গভীর সাধনার পর তিনি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন। তখন হতে তিনি হলেন বুদ্ধ বা জ্ঞানী। মহাজ্ঞান লাভের পর বুদ্ধ ধর্মপ্রচারে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর ধর্ম ভারতের ব্যাপক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ও মগধের রাজা বিম্বিসার তাঁর ধর্ম গ্রহণ করলেন। এভাবে শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, বৈশালী প্রভৃতি নগরে ধর্মপ্রচারের পর প্রায় আশি বছর বয়সে কুশী নগরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বৌদ্ধধর্মমতে জীবমাত্রই কর্মফল অনুসারে জন্ম-জন্মান্তরে দুঃখকষ্ট ভোগ করে। ভোগবিলাস ও কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারলেই চিরতরে মুক্তি বা 'নির্বাণ' লাভ করা যায়। সৎকর্ম, সৎচিন্তা, সৎবাক্য, সৎ সংকল্প, সৎচেষ্টা, সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সমাধি— এই আটটি নীতি বা অষ্টাঙ্গিক মার্গই মুক্তিলাভের উপায়। বৌদ্ধরা ঈশ্বর, বেদ বা জাতিভেদ মানে; তারা অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী, তবে জৈনদের মতো বৌদ্ধরা চরম মতাবলম্বী নয়, তারা মধ্যপন্থী।

www.icsbook.info

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক। এটা পালি ভাষায় রচিত। বুদ্ধ সন্ন্যাসীগণ সংঘের মাধ্যমে জীবন যাপন করে। কালক্রমে বৌদ্ধরা হীনযান ও মহাযান নামক দুটো ভাগে বিভক্ত হয়, যদিও শেষ পর্যন্ত মহাযান মতই স্বীকৃতি লাভ করে।

বৌদ্ধধর্ম শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, ক্রমে চীন, তিব্বত ও শ্যামদেশেও প্রসার লাভ করে।

মগধের অভ্যুদয়

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টের জন্মের পর পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বছর ধরে উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা চলে। এ চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ফলবতী হয় মগধকে কেন্দ্র করে। সমগ্র ভারতে পূর্ণ সাম্রাজ্য গঠনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজে মগধ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গান্ধার থেকে পূর্ব ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে ষোলটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। 'ষোড়শ মহাজনপদ' নামে পরিচিত এই রাজ্যগুলির কোনোটি ছিল রাজতন্ত্রের অধীনে, আবার কোনো কোনো রাজ্যে গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অনৈক্যের সুযোগেই সেকালে বৈদেশিক আক্রমণ সহজ হয়ে ওঠে।

পূর্ব ভারতের দুটো রাজ্য ছিল কোশল ও মগধ। গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক বিম্বিসার ছিলেন মগধের অধিপতি। তিনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগিনীকে বিবাহ করে সে রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কাশী রাজ্যটি যৌতুকস্বরূপ লাভ করেন। বিম্বিসারের পরে তাঁর পুত্র অজাতশত্রুর রাজত্বকালে মগধ রাজ্য সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্যে একটি বড় সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। অজাতশত্রু শোন ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে পাটলী নামে দুর্গ তৈরি করেন।

অজাতশত্রুর কয়েক পুরুষ পরে শিশুনাগ নামে এক রাজা অবন্তী রাজ্য জয় করে মালব পর্যন্ত মগধের পরিধি বিস্তৃত করেন। এর পরবর্তী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট মহাপদ্ম নন্দ 'একরাট' উপাধি ধারণ করেন। নন্দবংশের শেষ রাজা ধনানন্দের সময়ে মগধের ঐশ্বর্য, প্রতাপ ও সামরিক শক্তির কাহিনী ইতিহাসে বিখ্যাত।

বৈদেশিক আক্রমণ

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে সর্বপ্রথম বৈদেশিক আক্রমণ ঘটে। বিখ্যাত পারস্য সম্রাট দারায়ুস-এর সেনাপতি স্কাইলাক্স ভারত সীমান্ত আক্রমণ করে পাঞ্জাবের একাংশ দখল করে নেন। ক্রমে গান্ধার, তক্ষশীলা ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল পারসিক সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীন ভারতে প্রস্তরশিল্প, স্তম্ভনির্মাণ, শিলালিপি ও খরোষ্ঠীলিপির ব্যবহারে পারসিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীসের ম্যাসিডন রাজ্যের রাজা ফিলিপের পুত্র আলেকজাণ্ডার এশিয়া অভিযানে বহির্গত হন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি পশ্চিম এশিয়া ও বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য দখল করে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন।

www.icsbook.info

তৎকালীন উত্তর-পশ্চিম ভারতের ছোট ছোট রাজ্যগুলির অনৈক্য তাঁর অভিযান সহজতর করে তোলে। এর মধ্যে তক্ষশীলা রাজ্যের রাজা অম্ভি আলেকজাণ্ডার-এর সাথে রীতিমতো সহযোগিতা করেন। একমাত্র ঝিলাম ও চেনাব নদীর মধ্যবর্তী রাজ্যের রাজা পুরু তাঁর সাধ্যমতো আলেকজাণ্ডারকে বাধা দিতে চেষ্টা করেন। যুদ্ধে তিনি পরাজিত হলেও তাঁর সাহস ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে আলেকজাণ্ডার পুরুর রাজত্ব তাঁকে ফিরিয়ে দেন এবং তাঁর সাথে সন্ধি করেন।

পূর্বদিকে আরও অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা আলেকজাণ্ডারের থাকলেও সৈন্যদের অনিচ্ছা ও অসহযোগিতার দরুন তাঁকে ফিরে যেতে হয়। দেশে ফেরার পথে ব্যবিলনে তাঁর মৃত্যু ঘটে— মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে, ৩২৩ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের তেমন কোনো সুদূর প্রসারী ফলাফল প্রত্যক্ষ করা যায়নি। তাঁর সাম্রাজ্য তাঁর মৃত্যুর পর প্রধান সেনাপতিদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। ভারতের অংশটুকু সেনাপতি সেলুকাসের ভাগে পড়ল। অল্প কিছুদিন পরে সেটুকু তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের রাজনৈতিক প্রভাব এত কম ছিল যে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সাহিত্যের কোথাও এ বিষয়ের সামান্যতম উল্লেখও পাওয়া যায়নি।

তবে পরোক্ষভাবে এর প্রভাব যে কিছু ছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্রথমত, এর দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে যাতায়াত ও বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত হয়।

দ্বিতীয়ত, গ্রীক ও ভারতীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণে গান্ধারশিল্পের উৎপত্তি ও প্রসার ঘটে।

শেষত, গ্রীক আক্রমণের দরুন উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলি যে শক্তিহীন হয়ে পড়ে, তার ফলে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পক্ষে সমগ্র উত্তর ভারতে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

মৌর্য যুগ

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পর সমগ্র উত্তর ভারতে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। এর নাম মৌর্য সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মধ্যভারতের পিপ্‌লীবন নামক একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের 'মোরিয়' নামের ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিকদের মতে 'মোরিয়' থেকেই মৌর্য নামের উৎপত্তি।

প্রথম জীবনে চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের শিবিরে রণকৌশল শিক্ষা করেন, পরে নিজেই একটি সৈন্যদল গঠন করে মগধের দিকে অগ্রসর হন। কিংবদন্তী অনুসারে পথিমধ্যে চাণক্য নামে তক্ষশীলার এক পণ্ডিতের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। চাণক্যের পরামর্শে ও সহযোগিতায় তিনি নন্দবংশের উচ্ছেদ করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৪ অব্দে)। অসাধারণ ক্ষমতা ও বুদ্ধিসম্পন্ন চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের ভারতবর্ষ থেকে পুরোপুরি বিতাড়িত করে তাদের অধিকৃত অঞ্চলগুলি দখল করে নেন। বিশাল মগধ সাম্রাজ্য ছাড়াও কাবুল, কান্দাহার, হিরাত, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব ও

www.icsbook.info

সৌরাষ্ট্র তাঁর অধীনস্থ ছিল। দক্ষিণ ভারতের মহিশূর পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা। জৈন সূত্র অনুযায়ী, শেষ বয়সে তিনি জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। মহীশূরের নিকট শ্রাবণ বেলগোলা নামক স্থানে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিন্দুসার

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অনেকের মতে তিনি দাক্ষিণাত্য জয় করেন। গ্রীকদের সাথে তাঁর সবিশেষ যোগাযোগ ছিল। মৌর্য রাজসভায় বিদেশী রাজশক্তি কর্তৃক দূত প্রেরণ তাঁর সময়েই শুরু হয়। সিরিয়ার গ্রীক রাজা ও মিশরের গ্রীক রাজা তাঁর রাজসভায় দূত প্রেরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন।

অশোক

খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩ বা ২৭২ অব্দে অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তবে এ কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়নি। এক গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে অন্যান্য ভাইদের অপসারণ করে তিনি সিংহাসন দখল করেন। এ জন্য পিতার মৃত্যুর চার বছর পরে তাঁর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। শোনা যায়, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের নিকট তিনি বৌদ্ধ ধর্মগ্রহণ করেন।

এ সকল কাহিনী কতদূর সত্য তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন, তবে অশোকের এক শিলালিপিতে তাঁর মনোভাব ও স্বভাব পরিবর্তনের কারণ দেওয়া আছে।

রাজত্বের তের বছরে দেশ জয়ের উদ্দেশ্যে অশোক কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন। বর্তমান উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ প্রদেশ দু'টির কিছু অংশ নিয়ে এ রাজ্য গঠিত ছিল।

যুদ্ধের বিভীষিকা, ক্ষয়ক্ষতি ও রক্তপাত অশোকের মনে ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং রাজ্য বিজয় অপেক্ষা ধর্মবিজয়ের মাধ্যমে তিনি প্রজাদের হৃদয় জয় করতে মনস্থ করে। কলিঙ্গ যুদ্ধের পরে অশোক আর কখনও দেশজয়ের উদ্যোগ নেননি এবং এর পরের জীবন তিনি ধর্মপ্রচার ও প্রজাদের মঙ্গল সাধনায় নিয়োজিত করেন। অশোকের শিলালিপিগুলি থেকে তাঁর সকল ধর্মজীবনের ইতিহাস পাওয়া যায়। পাহাড়ের গায়ে ও স্তম্ভের গায়ে তিনি তাঁর ধর্মোপদেশ খোদিত করেন সর্বসাধারণের অবগতির জন্য। এগুলি থেকে জনগণের প্রতি তাঁর মনোভাব সম্পূর্ণভাবে অবগত হওয়া সম্ভব।

পবিত্র জীবনযাপন ও জীবের প্রতি কল্যাণসাধন, এটাই তাঁর ধর্মের মূলনীতি। সততা, দয়া, শুচি ও নম্রতা— প্রত্যেক মানুষের এ সদগুণগুলি অর্জন করা দরকার। ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতা বর্জন করে মানুষকে সংযম ও বিনয় শিক্ষা করতে হবে। পিতা-মাতা, গুরুজন, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণকে শ্রদ্ধা করতে হবে। দাসদাসীদের উপর অত্যাচার করা, হিংসা ও জীবহত্যা করা ও অকারণে পশুপক্ষীদের কষ্ট দেওয়া অন্যায়। তিনি সৎপাত্রে দান করতে এবং অন্য ধর্মের নিন্দা না করার উপদেশ দেন।

'ধর্ম মহামাত্র' নামক এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীদের উপর তিনি প্রজাদের মঙ্গলকর্মের ভার দিলেও প্রজাদের সুখ-দুঃখের প্রতি তাঁর সর্বত দৃষ্টি ছিল। প্রজাদের মঙ্গলার্থে তিনি রাজপথ, রাস্তার দু'ধারে অতিথিশালা ও পথিকদের বিশ্রামগৃহ নির্মাণ

www.icsbook.info

করেন। পানীয় জল সরবরাহের জন্য পুকুর ও খাল খনন করেন ও গরিব-দুঃখীদের কষ্ট নিবারণের জন্য দানশালা স্থাপন করেন। মানুষ ও পশুর রোগ নিবারণের জন্য হাসপাতালও প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নিযুক্ত ধর্মাধ্যক্ষগণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে সম্রাটের উপদেশগুলি বিশদভাবে বুঝিয়ে দিতেন।

অশোকের শেষজীবন ধর্ম প্রচারেই ব্যয় হয়। দেশে আমোদ-প্রমোদ ও পশুহত্যা বন্ধ করে দেয়া হয়। সমগ্র ভারতবর্ষ ছাড়াও ব্রহ্মদেশ ও চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। তাঁর এক পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা সিংহলে গিয়ে ধর্মপ্রচার করেন। বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী গ্রাম ও অন্যান্য তীর্থস্থানে তিনি স্তূপ, বিহার, চৈত্য ও স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন। বিনয়ী, ধার্মিক, প্রজাহিতৈষী, উদার হৃদয়ের অধিকারী এ মহামান্য সম্রাট খ্রিস্টপূর্ব ২৩২ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অশোকের মৃত্যুর পর দ্রুতগতিতে মৌর্য সাম্রাজ্যের ভাঙন শুরু হয়।

মৌর্যযুগের ভারতবর্ষের অবস্থা

মৌর্যযুগের ভারতবর্ষের সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিবরণ পাওয়া যায় মূলত গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র নামক গ্রন্থ হতে।

ছোটবড় ১১৮টি রাজ্যের মধ্যে মগধই ছিল সর্ববৃহৎ। বিশাল সেনাবাহিনী রাজ্যপ্রহরায় নিয়োজিত। শোন ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পাটলীপুত্র ছিল রাজধানী–বিশাল ও সুন্দর কারুকার্য দ্বারা শোভিত।

কঠোর দণ্ডাদেশ বিদ্যমান থাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যথেষ্ট উন্নত ছিল। সাধারণ নাগরিকবৃন্দ ছিল ভদ্র, শান্তিপ্রিয় ও সত্যবাদী। সমগ্র রাজ্যটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল; রাজপ্রতিনিধিগণ মন্ত্রীদের সাহায্যে দেশ শাসন করতেন।

সমাজে সাতটি জাতির পরিচয় পাওয়া যায়-দার্শনিক, কৃষক, শিকারি, পশুপালক, কারিগর ও ব্যবসায়ী যোদ্ধা, পরিদর্শক এবং অমাত্য।

পাটলীপুত্রের শাসনভার ছিল পৌরসভার হাতে। এটা ছয়টি বোর্ড বা সমিতিতে বিভক্ত ছিল। শ্রমশিল্পের রক্ষণাবেক্ষণ, বিদেশিদের তত্ত্বাবধান; জন্মমৃত্যুর হিসাব গণনা, কারুশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, শুল্ক আদায় প্রভৃতি কাজ ছিল এদের হাতে ন্যস্ত।

মৌর্যযুগের জলসেচের যথেষ্ট উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। বছরে দু'বার ফসল জন্মাত; কাজেই দুর্ভিক্ষের অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে।

রাজ্য শাসনে প্রকৃত কর্তা ছিলেন রাজা; তবে তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। অমাত্য ও অন্যান্য রাজপুরুষদের সাহায্য নিয়েই তিনি রাজ্য পরিচালনা করতেন। রাজা প্রজার সম্পর্ক ছিল পিতার সাথে সন্তানের সম্পর্কের তুল্য।

সাম্রাজ্য তখন চারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিলঃ তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, তোসালি ও সুবর্ণগিরি। গ্রামগুলি ছিল ক্ষুদ্রতম বিভাগ, এগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ যা কিছু প্রয়োজন গ্রামের মধ্যেই উৎপন্ন হত।

মৌর্যযুগের শিল্পকলায় পারসিকদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ, অশোকের স্তম্ভগুলি, স্তূপ ও বাসগুহাগুলি উৎকৃষ্ট শিল্পকলার পরিচয় বহন করে।

www.icsbook.info

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন

অশোক যে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, তা স্থায়ী হয়নি। অশোকের মৃত্যুর পর তার বংশধরদের মধ্যে রাজ্যের ভাগাভাগি নিয়ে কলহ শুরু হয়। তাঁর এক ছেলে কাশ্মীরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন, আরেক ছেলে মগধ অধিকার করে বসেন। মগধে পরপর সাতজন রাজা রাজত্ব করেন কিন্তু কেউই উপযুক্ত ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র সুঙ্গ শেষ মৌর্যরাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করে মগধের সিংহাসনে বসেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন যে, অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় খুব অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে এবং সে আক্রোশে বিপ্লব ঘটায়। আর পার্থিয়া ছিল পারস্যের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। পার্থিয়া হল পার্থিয়ান বা পারদদের আদি বাসস্থান। পার্থিয়ানদের বাংলায় পহ্লব বলা হয়ে থাকে। শক্‌রা থাকত মধ্য এশিয়ায়, সেখান থেকে তারা অবশ্য একবার বিতাড়িত হয়েছিল। গ্রীক ভাষায় শকদের নাম দেওয়া হয়েছে সিদিয়ান। এ সব বিদেশি জাতি সকলেই ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে এবং বিভিন্নস্থানে রাজ্য স্থাপন করে।

প্রথমে ব্যাকট্রিয়ান গ্রীকরাই ভারতের সীমান্ত আক্রমণ করে এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধু অধিকার করে। দুজন গ্রীক রাজা ভারতের মধ্যে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। একজনের নাম ডিমিট্রিয়স। ইনি পাটলীপুত্র পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। আরেকজনের নাম মিনান্দার। তাঁর রাজধানী ছিল সাকল (বর্তমান সিয়ালকোট)। মিনান্দার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত, গ্রীকরা ক্রমশ ভারতীয় সমাজের সংস্পর্শে এসে ভারতীয় ধর্ম ও আচার গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। গ্রীকদের অধিকার বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। নিজেদের মধ্যে বিবাদের ফলে গ্রীক রাজ্য নষ্ট হয়ে যায়।

শকরা দুই দলে ভারতে প্রবেশ করে এবং এক দল উত্তর ভারতে ও অপর দল দক্ষিণে রাজ্য স্থাপন করে। উত্তরে শকরা মথুরা, তক্ষশীলা প্রভৃতি জায়গায় বসবাস করে এবং সেখানকার শকরা ক্ষত্রপ ও মহাক্ষত্রপ উপাধি নিয়ে রাজত্ব করেন। কালক্রমে শকরা ভারতীয় আচার গ্রহণ করে একেবারে এদেশী হয়ে যায় এবং বৌদ্ধ বা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে। শকদের একটি শাখা পশ্চিম ভারতে প্রবল হয়। আরেকটি শাখা গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে রাজত্ব স্থাপন করে। কিছুকাল পরে আরেক দল শক উজ্জয়িনীতে একটি রাজবংশ স্থাপন করে। উজ্জয়িনীর শকরা প্রায় তিনশ' বছর রাজত্ব করেন। মহাক্ষত্রপ স্বামী রুদ্রদামন ছিলেন এ বংশের প্রধান রাজা।

উত্তর ভারতের শকদের সঙ্গে পহ্লব বা পারদ জাতিও ভারত সীমান্তে অধিকার স্থাপন করে। এ বংশের রাজাদের মধ্যে খ্রিস্ট্রীয় প্রথম শতকের গণ্ডোফারনিস্‌-এর নাম বিখ্যাত। কাবুল, কান্দাহার ও তক্ষশীলা তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল।

দক্ষিণ ভারতে আন্ধ্র বা সাতবাহন সাম্রাজ্য

শক, পহ্লব প্রভৃতি যত বিদেশি শত্রু ভারতে প্রবেশ করে তাদের অনেকের সাথেই আন্ধ্র বা সাতবাহনদের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ হয়। এ আন্ধ্ররা মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় বা প্রথম শতাব্দীতে আন্ধ্র যা হোক, অশোকের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই আনুমানিক ১৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

www.icsbook.info

মৌর্যদের পতনের সাথে সাথে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য লুপ্ত হয়। অশোক যে কলিঙ্গ রাজ্য জয় করেছিলেন সেই কলিঙ্গে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয় এবং খারবেল নামে কলিঙ্গের এক রাজা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশ জয় করে নেন। দক্ষিণ ভারতে আন্ধ্র বা সাতবাহন বংশের রাজারা এ সময়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন, এবং পশ্চিম ও মধ্য ভারতের বহু স্থান তাঁদের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। সম্ভবত সাতবাহনদের হাতেই খারবেলের সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধিত হয়েছিল। উত্তর ভারতে মৌর্য বংশের পতনের পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সুঙ্গ বংশ।

উত্তর ভারতে সুঙ্গ ও কাণ্ব বংশ

পুষ্যমিত্র সুঙ্গ শেষ মৌর্যরাজাকে হত্যা করে মগধের সিংহাসনে বসেছিলেন এ কথা আগেই বলা হয়েছে। পুষ্যমিত্র প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। তিনি মগধের পূর্ব গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর রাজ্য পশ্চিমে বিপাশা এবং দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে অনুমান করা হয়। সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ পতঞ্জলি সম্ভবত পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক ছিলেন। পুষ্যমিত্র ও তাঁর কয়েকজন বংশধর গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে শত্রুদের আর পূর্বদিকে অগ্রসর হতে দেননি। সুঙ্গবংশীয় দশজন রাজা পাটলীপুত্রে রাজত্ব করেন। কালক্রমে তাঁরা দূর্বল হয়ে পড়লে মন্ত্রী বাসুদেব কাণ্ব শেষ সুঙ্গরাজাকে রাজ্যচ্যুত করেন (খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ৭৩)।

কান্ব বংশের চারজন মাত্র ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। আনুমানিক ২৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এ বংশের পতন হয়। সুঙ্গ ও কান্বদের পর পূর্ব ভারতের অবস্থা কি হয় তা এখন পর্যন্ত ঠিকমতো জানা যায়নি।

গ্রীক, শক ও পহ্লব

মৌর্যদের পতনের পর ভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে সে সুযোগে নানা জাতের বিদেশি শত্রু এসে এদেশে রাজ্য স্থাপন করে। এ সময় যেসব বিদেশি জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে তারা হল ব্যাকট্রিয়ান গ্রীক, পার্থিয়ান (পারদ বা পহলব) ও শক জাতি। ব্যাকট্রিয়ানদের বাংলায় বহলীক বলা হয়ে থাকে, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ব্যাকট্রিয়াতে ছিল এদের আদি বাসস্থান। উত্তর-পশ্চিম ভারত যখন বিদেশী শত্রুদের হস্তগত হয় তখন আন্ধ্ররাই ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির রক্ষাকর্তা হন এবং যুদ্ধ করে বহিরাগতদের বিতাড়িত করার চেষ্টা করেন। দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে বহুদিন ধরে আন্ধ্রদের আধিপত্য বজায় থাকে। এ বংশে গোতমী-পুত্র সাতকর্ণী, যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী ইত্যাদি অনেক বড় বড় রাজার জন্ম হয়। বিদেশীদের আক্রমণে কিছুকালের জন্য এঁদের প্রভাব ম্লান হয়। কিন্তু খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গোতমী-পুত্র সাতকর্ণী সমস্ত শত্রুকে পরাস্ত করে নিজ বংশের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করেন। কিন্তু পরবর্তী রাজারা তেমন শক্তিশালী ছিলেন না। শত্রুরা তাঁদের হারিয়ে দিয়ে আন্ধ্ররাজ্যের অনেক প্রদেশ জয় করেন। ক্রমশ আন্ধ্ররাজ্যের অধঃপতন শুরু হয় এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ স্বাধীন হয়ে পড়ে।

আন্ধ্র রাজারা বহু জনহিতকর কাজ করেছিলেন। এ যুগে শিল্প ও সাহিত্যের অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। সাতবাহন যুগের গুহা-স্থাপত্যের যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তা অতি অপরূপ।

www.icsbook.info

কুষাণ সাম্রাজ্য

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে ইউচি নামে এক যাযাবর জাতি মধ্য এশিয়া থেকে ভারতবর্ষের দিকে আসতে থাকে। ক্রমশ তারা যাযাবরবৃত্তি পরিত্যাগ করে কৃষিকর্ম গ্রহণ করে। ইউচিরা ক্রমে পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়েছিল। এদের মধ্যে কুষাণ শাখা বিশেষ প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই কুষাণরা পূর্ব দিকে বারাণসী থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। কুষাণরা ভারতবর্ষে এসে এদেশের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করেছিল।

কুজুল কদফিস নিজেকে সমগ্র ইউচি জাতির অধিনায়ক বলে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি কাবুল ও পাঞ্জাব জয় করে একটি বড় সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তাঁর পুত্র বিম কদফিস উত্তর-পশ্চিম ভারতে অনেক অঞ্চল অধিকার করেন। বিম কদফিস বা দ্বিতীয় কদফিসের মৃত্যুর পর কুষাণ রাজ্যের অধিপতি হন কণিষ্ক। বিম কদফিসের সাথে কণিষ্কের কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল কি না তা জানা যায়নি। কণিষ্ক কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত জয় করেন এবং পূর্বভারতের বহু স্থানও তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কাশ্মীর তাঁর অধীন ছিল। মধ্য এশিয়ার খোটান, ইয়ারকন্দ এবং কাশগড় প্রদেশও তিনি জয় করেন। তাঁর সময়ে কুষাণ সাম্রাজ্য মধ্য এশিয়া থেকে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর রাজধনী ছিল পুরুষপুর বা বর্তমান পেশোয়ার। প্রথম জীবনে কণিষ্ক হিন্দুধর্মের প্রতি আসক্ত ছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ জন্মায়। তিনি মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তিনি বিদ্যাচর্চারও বিশেষ সমাদর করতেন। তাঁর সভায় বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত, লেখক ও দার্শনিক উপস্থিত থাকতেন।

কণিষ্কের রাজ্যকাল নিয়ে মতভেদ আছে। অনেকের মতে তিনি ৭৮ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে শকাব্দের প্রচলন করেন। কণিষ্কের পর বাসিষ্ক, হুবিষ্ক, দ্বিতীয় কণিষ্ক, বাসুদেব প্রভৃতি রাজা রাজত্ব করেন। বাসুদেবের পর কুষাণদের অধোগতি শুরু হয়।

কুষাণযুগে বহির্বিশ্বের সাথে ভারতবর্ষের যোগাযোগ ও বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনীভূত হয়েছিল। এ যুগে রোমের সাথে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল— দক্ষিণ ভারতের সাথে জলপথে আর উত্তর ভারতের সাথে স্থলপথে। স্থলপথে একটি রাস্তা চীন থেকে ব্যাকট্রিয়া এবং সেখানে থেকে রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর নাম ছিল রেশমের রাস্তা, তক্ষশীলা থেকে একটি রাস্তা ব্যাকট্রিয়াতে গিয়ে ঐ রেশমের রাস্তার সাথে মিশেছিল।

ভারত থেকে সূক্ষ্ম মসলিন, সাধারণ সুতিবস্ত্র, হাতির দাঁতের জিনিস, মশলা, রেশম ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্য বিদেশে, বিশেষত রোমান সাম্রাজ্যে রপ্তানি হত। ভারতের আমদানিদ্রব্যের মধ্যে তামা, টিন, প্রবাল, কাঁচের জিনিস ও রৌপ্যদ্রব্যই উল্লেখযোগ্য।

কুষাণযুগের শিল্প ও সংস্কৃতিতে বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। তবে এ যুগের শ্রেষ্ঠ কীর্তি গান্ধারশিল্প। ভারতীয় এবং গ্রীক-রোমানদের শিল্পের আশ্চর্য সমন্বয় এই গান্ধারশিল্প। আফগানিস্তানে, মধ্য এশিয়ায় এবং পৃথিবীর বিখ্যাত

www.icsbook.info

যাদুঘরগুলিতে এ শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলি রক্ষিত আছে। এ যুগে গ্রীক দেবতাদের মূর্তির অনুকরণে বৌদ্ধমূর্তি এবং রোমান মুদ্রার অনুকরণে ভারতীয় মুদ্রার প্রচলন হয়।

কুষাণ যুগে সাহিত্যেরও যথেষ্ট বিকাশ ঘটে। প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার অশ্বঘোষ 'বুদ্ধচরিত' রচনা করেন। 'নাগার্জুন' এ যুগের অন্যতম প্রধান দার্শনিক। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রণেতা চরক ও সুশ্রুত এ যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। এ যুগে বৌদ্ধ সাহিত্যের চরম বিকাশ ঘটে।

কণিষ্কের নির্দেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের উপর বিরাট টীকাগ্রন্থ 'অভিধর্মকোষ' রচিত হয়। এছাড়া জ্যোতিষশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের বহু মূল্যবান গ্রন্থ এ যুগেই রচিত হয়।

কুষাণদের পতনের পর উত্তর ভারতে ছোটবড় অনেকগুলি রাজবংশের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাটরা এদেশ দখল করে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। অবশ্য মৌর্য যুগের মত সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁদের আধিপত্য স্থাপিত হয়নি।

গুপ্ত সাম্রাজ্য

কুষাণ রাজ্যের পতনের পরে উত্তর ভারতে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গড়ে ওঠে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শুরুতে মথুরায় নাগ বংশীয় রাজাদের আবির্ভাব ঘটে। মধ্য ভারতে গড়ে ওঠে বাকাটক রাজ্য। পশ্চিম ভারতে উজ্জয়িনীর শাক বংশীয়দের, পাঞ্জাব ও রাজস্থানে মদ্রক, যৌধেয় ও মালবদের শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে এ সকল রাজ্য গুপ্ত সম্রাটদের অধীনস্থ হয়।

গুপ্ত বংশের সূত্রপাতঃ গুপ্ত বংশের প্রথম রাজা মহারাজ গুপ্ত ও তাঁর পরে ঘটো ৎকচ মগধের একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। গুপ্ত রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তাঁর সময় থেকেই গুপ্ত রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে। বৈশালী রাজ্যের লিচ্ছবী বংশের কন্যা কুমার দেবীকে বিবাহ করার ফলে তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমে ক্রমে প্রয়াগ, অযোধ্যা, মগধ প্রভৃতি তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৩২০ খষ্টাব্দে তিনি'মহারাজাধিরাজ' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র।

সমুদ্রগুপ্ত (আঃ ৩৪০-৩৮০ খৃষ্টাব্দ)

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত আনুমানিক ৩৪০ খৃষ্টাব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন। এলাহাবাদে অবস্থিত একটি স্তম্ভের উপর খচিত সভাকবি হরিষেণ কর্তৃক রচিত 'প্রশস্তি' থেকে সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ও তাঁর রাজ্য জয়ের ইতিহাস জানা যায়। সমুদ্রগুপ্ত হিমালয় থেকে নর্মদা এবং ব্রহ্মপ্রত্র থেকে যমুনা চম্বল নদী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। সমতট (বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ), কামরূপ ও নেপাল, পাঞ্জাব-মালবের অর্জুনায়ন,মদ্রক, যৌধেয়, অভীর প্রভৃতি জনপদ এবং মধ্য ও পশ্চিম ভারতের অনেক রাজ্য তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। উত্তর ভারতের রুদ্রদেব, নাগদত্ত, গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুৎ নন্দী এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজা চন্দ্র বর্মাও সমুদ্রগুপ্তের আধিপত্য মেনে নেন। সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণে কোশল, কাঞ্চী মহাকান্তা, পিষ্টপর প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন।

www.icsbook.info

বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সমুদ্রগুপ্তকে ইতিহাসে ভারতের 'নেপোলিয়ন' বলে অভিহিত করা হয়।

উত্তর ভারতে সমুদ্রগুপ্তের স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও দক্ষিণের রাজ্যগুলিকে তিনি শুধুমাত্র করদ রাজ্যে পরিণত করেন।

দিগ্বিজয়ের পরে সমুদ্রগুপ্ত 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' সম্পন্ন করেন এবং নিজের নামে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেন। সমুদ্রগুপ্ত হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও বৌদ্ধধর্মের প্রতিও সহনশীল ছিলেন। অসামান্য যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন পণ্ডিত ও বিদ্বানদের গুণগ্রাহী। স্বর্ণমুদ্রায় খচিত বীণাবাদনরত সমুদ্রগুপ্তের মূর্তি সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অনুরাগের চিত্র প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (আঃ ৩৮০-৪১৩ খৃষ্টাব্দ)

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত আনুমানিক ৩৮০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনিও পিতার ন্যায় বীর যোদ্ধা ছিলেন। পশ্চিম ভারতের শক রাজাদের তিনি উচ্ছেদ করেন এবং মালব ও সৌরাষ্ট্র জয় করেন। অনেকের মতে তিনিই কিংবদন্তির প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিদ্বান ও গুণীদের সমাদর করতেন। মহাকবি কালিদাস তাঁর রাজসভার উজ্জ্বলতম রত্ন। কালিদাস এবং আরও আটজন পণ্ডিতকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল তাঁর নবরত্ন সভা। এঁরা ছিলেন-বরাহমিহির, বররুচি, ঘটকর্পর, বেতালভট্ট, অমর সিংহ, ক্ষপনক,শঙ্কু ও ধন্বন্তরি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে আগমন করেন। দীর্ঘকাল এদেশে বাস করে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি একটি মূল্যবান গ্রন্থ লিখে গেছেন।

পরবর্তী গুপ্তরাজগণ

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র কুমারগুপ্ত (৪১৪-৪৫৫ খৃঃ) মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পূর্ববর্তী গুপ্ত সম্রাটদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গৌরব ও সমৃদ্ধি তখন অক্ষুণ্ণ ছিল। মধ্য ভারতের দুর্ধর্ষ পুষ্যমিত্র নামক উপজাতি কুমার গুপ্তের রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করলে সমাট তাদের পরাজিত করে সাম্রাজ্যকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন। কুমার গুপ্তের সময় সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রসার ঘটে।

পরবর্তী গুপ্তরাজার স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে (৪৫৫-৪৬৭ খৃঃ) মধ্য এশিয়া থেকে আগত দুর্ধর্ষ হুন জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। স্কন্দগুপ্ত তাদের পরাজিত করেন। তাঁর রাজত্বকালে, অবশ্য হুনরা আর গুপ্তরাজ্য আক্রমণ করেনি। এই কুখ্যাত হুন জাতি রোমান সাম্রাজ্যর উপর তাদের ধ্বংসলীলা চালায়। তাদেরই এক শাখা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের উপর বার বার আক্রমণ চালায় এর ফলে ভারতবর্ষে গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। নরসিংহ, দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত ও বুধগুপ্ত (৪৭৬-৪৯৫ খৃঃ) প্রভৃতি শেষের দিকের গুপ্তরাজাদের রাজত্বকালে হুনদের আক্রমণ বার বার ঘটতে থাকে এবং এ সকল রাজারা তাদের প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হন। পরিণামে ৬ষ্ঠ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং তার স্থানে উদ্ভব ঘটে কনৌজ, মালব, সৌরাষ্ট্র,বঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের।

www.icsbook.info

গুপ্তযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি

গুপ্তযুগে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অতি উচ্চ পর্যায়ে আরোহণ করেছিল। গু. যুগকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ নামে আখ্যায়িত করা হয়।

গুপ্তযুগে দেশের অর্থনৈতিক জীবনে বহু সমৃদ্ধি ঘটেছিল। কৃষিকাজ ছিল দেশে অর্থনীতির মূল ভিত্তি। তবে গুপ্তযুগে বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একটা প্রধান কারণ। ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় উপকূল থেকে বড় বড় নৌকা ও জাহাজে করে বাণিজ্য সম্ভার বিদেশে যেত। পশ্চিমে রোম সাম্রাজ্যভূক্ত দেশগুলির সাথে এবং পূর্ব দিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে ভারতবর্ষের বাণির্জ সম্পর্ক ছিল।

গুপ্তযুগে শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই নতুন প্রয়াস ও সাফল্যের স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া যায়। গুপ্তযুগে কাব্য ও নাটকের ক্ষেত্রে অসাধারণ উ ৎকর্ষ দেখা গিয়েছিল। মহাকবি কালিদাস, কবি হরিষেণ, নাট্যকার শুদ্রক ও বিশাখদত্ত প্রমুখ ছিলেন গুপ্তযুগের কবি ও সাহিত্যিক। কালিদাসের রচিত মেঘদূত,শুদ্রক রচিত নাটক মৃচ্ছকটিক, বিশাখদত্ত প্রণীত নাটক মুদ্রারক্ষস প্রভৃতি সাহিত্যকর্ম যুগ যুগ ধরে নন্দিত হয়েছে।

শিল্প ও ভাস্কর্যের অপরূপ প্রকাশ গুপ্ত যুগে ঘটেছিল। উত্তর প্রদেশে অবস্থিত দেওগড়ের দশাবতার প্রস্তর মন্দির ও ভিতগাওয়ের ইষ্টক মন্দির এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গুহা স্থাপত্যেও গুপ্তযুগের বিশেষ অবদান রয়েছে। অজন্তার ২৯টি গুহায় পর্বতগাত্র থেকে বিশাল বুদ্ধমূর্তি, স্তম্ভ, অলিন্দ প্রভৃতি সৃষ্টি করা হয়েছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুপ্তযুগের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় ও গ্রীক পণ্ডিতদের মধ্যে যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের ফলে গুপ্ত যুগে ভারতবর্ষে ভূগোল, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আর্যভট্ট, বরাহ মিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। গুপ্তযুগে চিকিৎসাবিদ্যা, শল্যবিদ্যা (অস্ত্রোপচার), রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতিতে অগ্রগতি ঘটেছিল। এ প্রসঙ্গে রসায়নবিদ নাগার্জুন ও চিকিৎসাবিদ ধন্বন্তরি প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

গুপ্তযুগে বৌদ্ধধর্মের প্রভার কমেছিল এবং তার স্থানে হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, হিন্দুধর্ম এখন যে রূপ লাভ করেছে তার প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ গুপ্তযুগেই দেখা গিয়েছিল। নারদ,বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য ও মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি শাস্ত্র গ্রন্থ গুপ্তযুগেই সংকলিত হয়েছিল। বর্তমান কালে প্রচলিত হিন্দুধর্ম, আচার, নিত্যকর্ম, সমাজ বিধান ইত্যাদি বিষয়ে প্রামাণিক বিবৃতি গুপ্ত শাসনকালে প্রকাশিত হয়েছিল। রামায়ণ,মহাভারত এবং পুরাণের কাহিনীগুলি খৃষ্ট জন্মের অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল; কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণকে বর্তমানে যে আকারে দেখা যায় তা গুপ্তযুগেই নির্ধারিত হয়েছিল।

গুপ্তযুগে স্বভাবতই রাজতন্ত্র প্রাধান্য ও গুরুত্ব অর্জন করেছিল। গুপ্ত শাসনে সম্রাটই ছিলেন সমস্ত শক্তির কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু রাজাকে কেন্দ্র করে জমিদার প্রভৃতি সামন্তচক্রও

www.icsbook.info

গড়ে উঠেছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেলে ক্রমে গ্রামভিত্তিক ও জমিদার-সামন্তপ্রভু নির্ভর সামন্ত ব্যবস্থার উদয় ঘটে। সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সমাজ ব্যবস্থাকে ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষেত্রেও আমরা গুপ্তযুগের পরবর্তী কালের সামন্ততন্ত্রের যুগের ইতিহাসকে মধ্যযুগের ইতিহাস রূপে গণ্য করতে পারি। ইউরোপের ইতিহাসে রোম সাম্রাজ্যের পতনের কালকে প্রাচীন যুগের অবসান রূপে গণ্য করা হয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসেও তেমনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কালকে প্রাচীন যুগের অবসান রূপে গণ্য করা চলে।

ভারতীয় ইতিহাসের কাল বিভাজনের ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদরা সাধারণত সুদুর অতীত কাল থেকে শুরু করে ১২০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কালকে প্রাচীন যুগ বলে গণ্য করেন। আমরা এ কাল বিভাজনকে ভ্রান্ত মনে করি। বর্তমান গ্রন্থে গুপ্ত যুগের অবসান কালকে অর্থাৎ ৬ষ্ঠ শতকের মধ্য ভাগকে ভারতীয় ইতিহাসে প্রাচীন যুগের অবসান রূপে গণ্য করা হয়েছে।

www.icsbook.info

চীনের প্রাচীন ইতিহাস

চীনের ইতিহাস জানতে হলে তার ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক বিশাল অংশ জুড়ে চীন অবস্থিত। প্রাকৃতিক অবস্থা অনুসারে চীনকে তিনটি সুস্পষ্ট অংশে ভাগ করা চলে। উত্তরে পীত নদীর (হোয়াং হো নদীর) অববাহিকা তথা বিশাল সমভূমি, মধ্য চীনের পার্বত্য অঞ্চল ও ইয়াংসি নদীর অববাহিকা এবং দক্ষিণ চীনের পার্বত্য অঞ্চল। পীত নদীর বার্ষিক বন্যার ফলে চীনের সমভূমি চমৎকার উর্বরতা লাভ করে। মধ্য চীন তত উর্বর নয়, দক্ষিণ চীন আরও কম উর্বর; কিন্তু এ দুই অঞ্চল তামা, টিন, সীসা প্রভৃতি বহুসংখ্যক খনিজপদার্থ ও মূল্যবান খনিজপাথরে সমৃদ্ধ। চীনের পূর্ব উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। প্রাচীন চীনে নানা জাতি ও উপজাতির মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল।

পুরোপলীয় ও নবোপলীয় সংস্কৃতি

চীনে প্রাচীনতম মানুষের বা অর্ধমানবের ফসিল পাওয়া গেছে। পাঁচ লক্ষ বছর আগেকার খাড়া মানুষের ফসিল পাওয়া গেছে পিকিংয়ের কাছে। এ মানুষ প্রাচীনতম পুরোপলীয় (অর্থাৎ পুরানো পাথরের যুগের) সংস্কৃতির অধিকারী ছিল। চীনে ২০-২৫ হাজার বছর পুরানো আধুনিক মানুষের ফসিলও যৎসামান্য পরিমাণে পাওয়া গেছে। এতে প্রমাণ হয় যে, চীনে উচ্চতর-পুরোপলীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। বিশ্ব সংস্কৃতিতে অতি আদিমকালে যে বিকাশ ঘটেছিল তার ঢেউ চীনে এসে পৌঁছেছিল।

১৯৫০ সালের পর থেকে চীনে নবোপলীয় (অর্থাৎ নতুন পাথরের যুগের) সংস্কৃতির অনেক চিহ্ন পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইয়াং শাও এবং লুং শান নামক স্থানের নবোপলীয় গ্রামের সংস্কৃতি। ২২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইয়াং শাও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। ইয়াং শাও সংস্কৃতির মানুষরা ছিল কৃষক এবং তারা কুকুর ও শূকরকে পোষ মানিয়েছিল। এরা চমৎকার মৃৎপাত্র তৈরি করতে পারত এবং লাল, কালো ও সাদা রঙে তাদের চিত্রিত করতে পারত। তুর্কিস্তান ও পশ্চিম এশিয়াতে যেসব মাটির পাত্র পাওয়া গেছে, তার সাথে এ সকল ইয়াং শাও পাত্রের বিলক্ষণ মিল আছে। অথচ, পশ্চিম এশিয়াতে মৃৎশিল্পের ধারাবাহিক বিকাশের যেসব প্রমাণ পাওয়া যায় চীনে সে ধরনের প্রমাণের কোনো চিহ্নই পাওয়া যায় না। তাই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, চীনে ইয়াং শাও সংস্কৃতির প্রবর্তন ঘটেছিল পশ্চিম এশিয়ার অনুকরণে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পশ্চিম এশিয়াতে সাধারণভাবে নবোপলীয় বিকাশের একের পর এক ধাপগুলির চিহ্ন চোখে পড়ে, কিন্তু চীনে

www.icsbook.info

পুরোপলীয় সমাজ থেকে নবোপলীয় সমাজে উত্তরণের ধাপগুলির কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। চীনে নবোপলীয় সংস্কৃতি যেন হঠাৎ উদিত হয়েছিল। এ রকম যখন হয় তখন ধরে নেয়া যেতে পারে যে, নতুন সংস্কৃতি সেখানে বাইরে থেকে আনীত হয়েছে। তাই চীনের ক্ষেত্রে মনে করা যেতে পারে যে, পশ্চিম এশিয়া বা ঐ ধরনের কোনো স্থান থেকে পূর্ণ

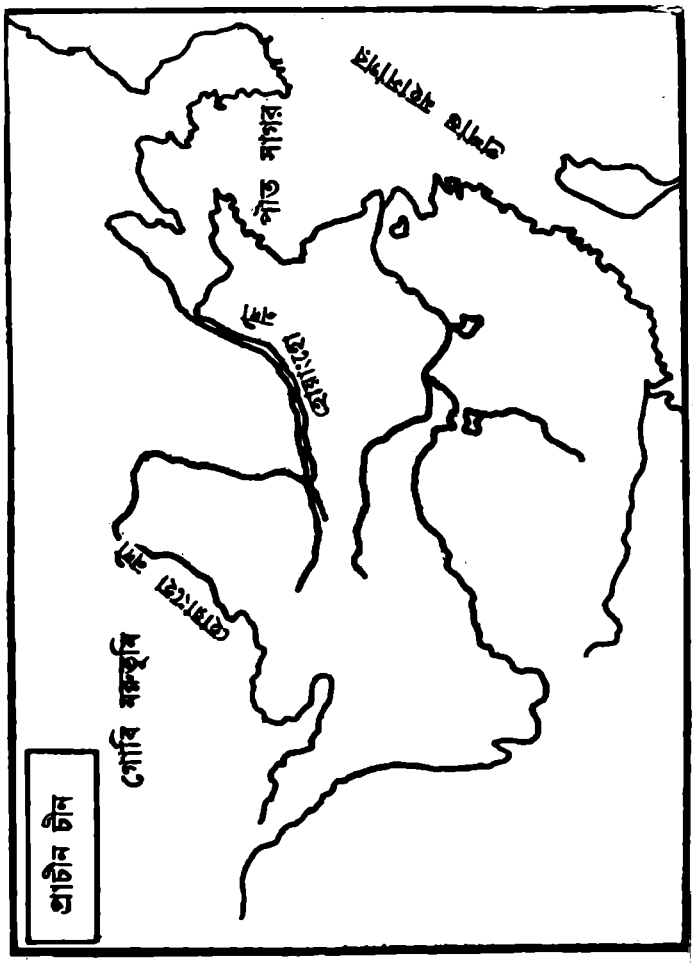

বিকশিত নবোপলীয় সংস্কৃতি চীনে তৈরি অবস্থায় এসেছিল, চীনের মাটিতে স্বতন্ত্রভাবে তার উদয় হয়নি।

লুং শানের নবোপলীয় কৃষিভিত্তিক গ্রাম-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। এরা কালো রঙের সুন্দর উজ্জ্বল ও পাতলা মাটির পাত্র তৈরি করতে পারত। পণ্ডিতদের মতে, পশ্চিম এশিয়া এ সংস্কৃতির উৎস। অবশ্য এ বিষয়ে

www.icsbook.info

পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, চীনে নবোপলীয় ও পরবর্তী অন্যান্য সংস্কৃতির উদয় স্বতন্ত্রভাবে ও নিজস্ব উদ্যোগে ঘটেছিল।

ব্রোঞ্জ সংস্কৃতি : শাং যুগ

প্রায় ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চীনে পীত নদীর পূর্ব অংশের মধ্যভাগে অকস্মাৎ ব্রোঞ্জযুগের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এ অঞ্চলের ব্রোঞ্জযুগের মানুষেরা সুরক্ষিত নগর তৈরি করতে পারত এবং ব্রোঞ্জযুগের সমস্ত মৌল অবদান, এমনকি লেখনপদ্ধতি পর্যন্ত আয়ত্ত করেছিল।

চীনে নবোপলীয় সংস্কৃতি যেমন হঠাৎ উদিত হয়েছিল, ব্রোঞ্জযুগের সংস্কৃতিও তেমনি হঠাৎ উদিত হয়েছিল বলে মনে হয়। চীনে ব্রোঞ্জযুগের সংস্কৃতির ধাপে ধাপে বিকাশ লাভের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। এর অর্থ হল ব্রোঞ্জযুগের উদয় চীনে ঘটেছিল বাইরের সভ্যতার প্রভাবে। মিশর ও ব্যবিলনে ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতার বিকাশের আলোচনা কালে আমরা দেখেছি, কেমন করে অনুকূল সামাজিক পরিবেশে বিভিন্ন কারিগরি আবিষ্কার সে যুগে সংঘটিত হয়েছিল। ব্রোঞ্জের কারিগরি, কুমোরের চাক, গাড়ির চাকা, লেখনপদ্ধতি ইত্যাদি আবিষ্কারের জন্য যেসব সূক্ষ্ম শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক তা মনে রাখলে বোঝা যাবে যে, বারবার ভিন্ন ভিন্ন স্থান নতুন করে তার আবিষ্কার ঘটা সম্ভব নয়। বিশেষত মিশর বা মেসোপটেমিয়ায় চিত্রলিপিভিত্তিক যে লেখনপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল তা এমনই একটি জটিল, বিস্ময়কর ও অভিনব আবিষ্কার ছিল যে বারবার নুতন করে তার আবিষ্কার ঘটার সম্ভবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। বিশেষত চীনের প্রাচীন লিপিও ছিল মূলত চিত্রলিপিভিত্তিক ও ভাবব্যঞ্জক। তাই একথা নিঃসংশয়ে মেনে নেওয়া যেতে পারে যে, চীনে ব্রোঞ্জযুগের আবির্ভাব ঘটেছিল পূর্ববর্তী কোনো সভ্যতার (ব্যবিলনীয় বা অন্য কোনো সভ্যতার) প্রভাবে।

চীনের ব্রোঞ্জযুগের সংস্কৃতির বিকাশ শাং যুগের ইতিহাসের সাথে জড়িত। শাং রাজবংশ চীনে ১৫০০ থেকে ১১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল। শাং রাজ্য মোটামুটি হোয়াং হো অববাহিকার পূর্ব অংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। শাং রাজা যদিও প্রভাবশালী ছিলেন এবং বিশাল সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন, তথাপি শাং যুগে সাম্রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলে অভিজাত শাসকদের প্রতিপত্তিই বজায় ছিল। শাং রাজারা রাজ্যের প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করতেন। শাং আমলে যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় লেগেই থাকত। এ আমলেই চীনে প্রথম দুই চাকাওয়ালা ঘোড়ায় টানা যুদ্ধরথের প্রচলন হয়েছিল। এ নতুন সামরিক সরঞ্জামের সাহায্যেই শাং রাজারা তাঁদের আধিপত্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলন।

শাং যুগে ধর্ম ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে। জমি ও পশুর উর্বরতাবৃদ্ধির পূজাই ছিল এ যুগে মূল ধর্মাচরণ। এ যুগে পরিবার ছিল মাতৃতান্ত্রিক, পরবর্তীকালে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রচলন হয়। শাং যুগের সংস্কৃতির অনেকগুলি উপাদান পরবর্তীকালের চীনের সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ হয়েছিল। যথা, রেশম উৎপাদনের জন্য রেশম গুটির চাষ, লেখনপদ্ধতির বিকাশ সাধন, যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে চীনের লিপি গড়ে উঠেছিল; ব্রোঞ্জের নির্মিত অপরূপ পাত্র ও অন্যান্য শিল্প নিদর্শন ইত্যাদি। বস্তুত শাং রাজত্বকালেই চীনের মানুষ উন্নত জীবনযাপনের উপযুক্ত সব রকম উপকরণ ও সমাজ সংগঠন আয়ত্ত করেছিল।

www.icsbook.info

শাং যুগের মানুষরা প্রধানত কৃষিকাজেই ব্যাপৃত ছিল। তাদের চাষের পদ্ধতি ছিল খুবই আদিম ধরনের। একজন একটা চোখা লাঠিকে মাটিতে ঢুকিয়ে শক্ত করে ধরে থাকত, আরেকজন কোমরে বাঁধা দড়ির একপ্রান্ত কাঠিতে বেঁধে তাকে টানত। এভাবেই তারা জমি চাষ করত, কারণ তাদের লাঙল ছিল না। তাদের প্রধান খাদ্যশস্য ছিল গম ও যব। ধানের চাষও তারা করত। এ যুগে কুকুর, শূকর, ছাগল, ভেড়া, গরু, ঘোড়া, মুরগি, বানর ও সম্ভবত হাতিকে পোষ মানানো হয়েছিল। কুকুর ও শূকরের মাংস ছিল লোকের প্রিয় খাদ্য। শাং যুগে কৃষির পাশাপাশি কারিগরি উৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন ছিল।

শাং যুগের কারিগররা ব্রোঞ্জ, পাথর, হাড়, ঝিনুকের খোল, শিং প্রভৃতি দিয়ে অতি সুন্দর সামগ্রী বানাতে পারত। সে যুগের কারিগরদের তৈরি সুন্দর সুন্দর ছুরি, কুঠার, থালা প্রভৃতির নমুনা প্রত্নতাত্ত্বিকরা উদ্ধার করেছেন। মণিখচিত হাড়ের সামগ্রী এবং সুন্দরভাবে খোদাই করা হাতির দাঁতের অনেক সামগ্রীও পাওয়া গেছে। নানারকম চিত্রিত মাটির পাত্র এবং চীনামাটির বাসন ও পাত্র এ যুগে তৈরি হত। এ যুগে মানুষ মাটির দেওয়াল দেয়া দোচালা ঘর বানাতে শিখেছিল। উত্তর চীনের বাতাসে ভেসে যে লোয়েস মাটি আসত তাকে পানি দিয়ে মেখে পিটিয়ে নিলে তা দিয়ে খুব শক্ত দেওয়াল বানানো চলত। ডাল, পাতা, খড় দিয়ে ঘরের চাল দেওয়া হত। আগেকার নবোপলীয় যুগে এ অঞ্চলের মানুষ মাটির নিচে গর্ত করে বাস করত। শাং যুগের প্রধান অস্ত্র ছিল তীরধনুক। শিকার ও যুদ্ধে তীরধনুক ব্যবহার করা হত। বাঁশের তীরে পালক লাগানো থাকত এবং সামনের দিকে হাড় বা ব্রোঞ্জের ফলা লাগান থাকত। মধ্যভাগে স্থাপিত শিংয়ের সাথে দুই পাশে দুই খণ্ড কাঠ জোড়া দিয়ে এদের ধনুক তৈরি হত। এ ধনুক মধ্যযুগের ইংরেজদের লম্বা ধনুকের দ্বিগুণ শক্তিশালী ছিল বলে কথিত আছে। দুই ঘোড়ায় টানা রথও যুদ্ধে ব্যবহৃত হত। এসব রথের চাকা অরযুক্ত ছিল। যোদ্ধারা চামড়া বা কাঠের পাতযুক্ত চামড়ার তৈরি বর্ম ব্যবহার করত। শাং যুগের মানুষের বাদ্যযন্ত্র ছিল— প্রধানত ঢোল ও ফাঁপা হাড়ের তৈরি বাঁশি। পাথরের তৈরি আরেক রকম বাদ্যযন্ত্র ছিল॥ তা থেকে ঘন্টার মতো ধ্বনি নির্গত হত। শাং যুগের নির্মিত ভাস্কর্য ও শিল্প সামগ্রীর মধ্যে শিল্পীর অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আগেই বলা হয়েছে, শাং যুগের মানুষ লেখন পদ্ধতি আয়ত্ত করেছিল। তাদের ব্যবহৃত লেখার তুলি এবং ভুসার কালি আবিষ্কৃত হয়েছে। সাধারণত সিল্কের কাপড়ে এবং বাঁশ বা কাঠের পাতে লেখা হত। শাং যুগের লেখার অনেক নমুনা পাওয়া গেছে পশুর হাড়, শিং এবং কাছিমের খোলার গায়ে খোদাই করা লেখা থেকে। এগুলিকে বলা হয় 'দৈববাণীর হাড়'। কারণ প্রাচীন পুরোহিতরা প্রেতলোকের উদ্দেশ্যে কোনো প্রশ্ন করে একটা হাড় বা খোলাকে আগুনে ফেলে দিতেন। গরমে এগুলো ফেটে গেলে যে দাগ পড়ত তা দেখে পুরোহিতরা প্রশ্নের জবাব বুঝতেন। কোনো কোনো হাড়ে সবশেষে পুরোহিতরা প্রশ্নগুলি লিখে রাখতেন। এই হল দৈববাণীর হাড়। এগুলি থেকে শাং যুগের লিপির পরিচয় পাওয়া গেছে। এ থেকে পণ্ডিতরা বুঝতে পেরেছেন যে, শাং যুগের লিপি একেবারে আদিম ধরনের নয়। বিবর্তনের অনেক ধাপ পার হয়ে তবে শাং যুগের লিপির

www.icsbook.info

উদ্ভব হয়েছিল। শাং যুগের লিপি ও লেখনপদ্ধতির সাথে আধুনিক চীনের লেখনপদ্ধতির কিছু মিলও রয়েছে।

চু–রাজবংশ

খ্রিস্টপূর্ব এগার শতকে উত্তর-পশ্চিমের এক যোদ্ধা জাতি শাং বংশকে উৎখাত করে চু-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে। চু-জাতির মানুষরা শাং যুগের সংস্কৃতির কদর বুঝত, তাকে শ্রদ্ধা করত। তাই চু-রাজবংশের আগমনের পরও চীনের সংস্কৃতির বিকাশে কোনো ছেদ পড়েনি। চু-রাজবংশের শাসনকাল চীনের ইতিহাসে দীর্ঘতম। আনুমানিক ১০২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২৪৯ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৮০০ বছর ধরে চু-বংশীয় সম্রাটরা চীনে রাজত্ব করেছেন। তবে এ সমগ্র শাসনামল নিরবচ্ছিন্নভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল না। চু-সম্রাটরা সামরিক শক্তির জন্য অভিজাত ভূস্বামীদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। ৭৭১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এ অভিজাতরা একজোট হয়ে রাজধানী আক্রমণ করে সম্রাটকে হত্যা করে। চু-বংশের একজন সদস্য পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং তিনি পূর্বদিকে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এখানে থেকে চু-বংশ আরও ৫০০ বছর রাজত্ব করে। চু-রাজত্বের শেষ কয়েক শতাব্দী 'যুদ্ধমান রাষ্ট্রের' যুগ নামে পরিচিত। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকেই চীনে পাঁচটি রাজ্যের উদ্ভব হয়। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে পশ্চিম সীমান্তবর্তী চিন রাজ্যই সমধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ২৪৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চু-রাজবংশকে উৎখাত করে চিন রাজ্যের রাজারাই চীন রাজবংশ স্থাপন করেন।

চু-রাজবংশের ৮০০ বছরের রাজত্বকালে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারা অব্যাহত ছিল। চু-যুগের সংস্কৃতি শাং যুগের অনুরূপ, কিন্তু সমৃদ্ধতর ছিল। চু-যুগের হস্তশিল্প আরও বিকাশ লাভ করে। চু-আমলে চীনের ইতিহাসে নতুন একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। এ যুগেই চীনে লোহার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। চীনে অবশ্য লোহা পুরোপুরিভাবে ব্রোঞ্জের স্থান অধিকার করতে পারেনি, লোহার পাশাপাশি ব্রোঞ্জের ব্যবহারও টিকে ছিল। আমরা জানি, পশ্চিম এশিয়ার হিট্টাইটরা সর্বপ্রথম ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে লোহা নিষ্কাশনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। পশ্চিম এশিয়া থেকেই লোহা নিষ্কাশনের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। চীনে লোহার প্রচলন ঘটেছিল চু-আমলে, সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, লৌহযুগের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, যথা, লোহা, বর্ণমালা, মুদ্রা প্রভৃতিকে অবলম্বন করে ফিনিশিয়া, গ্রীক ও রোমে উন্নত ধরনের লৌহযুগের সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ফিনিশিয়া, গ্রীস ইত্যাদি স্থানে অবশ্য জলপথে সহজে যাতায়াতের সুবিধাও ছিল, যা চীনে ছিল না। কিন্তু তা ছাড়াও চীন লৌহযুগের সবগুলি সুযোগের সদ্ব্যবহার করেনি। যেমন, চীনে বর্ণমালাভিত্তিক লেখনপদ্ধতি কখনও প্রচলিত হয়নি। চীনে অনেক আগেই ব্রোঞ্জযুগের আবিষ্কৃত চিত্রলিপি প্রচলিত হয়েছিল বলে পরবর্তীকালে আর বর্ণমালার প্রচলন হতে পারেনি। চিত্রলিপি আর বর্ণমালার পার্থক্য আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। চীন বর্ণমালাকে গ্রহণ না করার ফলে চিন্তা, জ্ঞানচর্চা ও সমাজের বিকাশের দিক থেকে গ্রীস প্রভৃতি দেশের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছিল। চীনে অবশ্য খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে তামার মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল, কিন্তু গ্রীসের মতো সামগ্রিকভাবে লৌহযুগের উন্নত সভ্যতার প্রচলন এখানে কখনও হয়নি। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, চীনে

www.icsbook.info

কখনও ব্যবিলনীয় বা গ্রীস বা রোমের মতো দাসপ্রথার উদয় হয়নি। চীনে অবশ্য ক্রীতদাসের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু উৎপাদনে কখনও ব্যাপকহারে দাসদের নিয়োগ করা হয়নি। এর কারণ হয়তো এই যে, চীনে বিলম্বে ব্রোঞ্জযুগের আবির্ভাব ঘটায় সেখানে একবারেই ব্রোঞ্জযুগের উন্নত হাতিয়ার ব্যবহারের দরুন শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল, অর্থাৎ অল্প শ্রমেই অধিক উৎপাদন করা চলত। এ কারণেই হয়তো চীনে দাসশ্রমের প্রচলন কখনই হয়নি। মনে রাখা যেতে পারে যে, চীনের অন্তত দুই হাজার বছর আগেই মিশর-ব্যবিলনে ব্রোঞ্জযুগের আবির্ভাব ঘটেছিল। মিশর-ব্যবিলনীয় ব্রোঞ্জযুগের শুরুতে হাতিয়ার এত অনুন্নত ছিল যে, দাসপ্রথার প্রচলন ছাড়া সভ্যতার প্রাথমিক বিকাশই সম্ভব হত না। অবশ্য চীনে দাসপ্রথার প্রচলন কেন ঘটেনি তার কারণ সম্পর্কে এ ব্যাখ্যা সঠিক কি না তা বলা কঠিন। কারণ চীনে দাসপ্রথা ছিল কি ছিল না এবং না থাকলে তার কারণ কি এ বিষয়ে পণ্ডিতরা এখনও একমত হতে পারেননি। জোসেফ নীডহাম প্রমুখ চীন-তাত্ত্বিকরা অবশ্য মনে করেন যে, চীনে গ্রীস বা রোমের মতো দাসপ্রথার প্রচলন কখনও হয়নি।

চু যুগে অধিকাংশ মানুষ অবশ্য ছিল গ্রামীণ কৃষক; কিন্তু এ যুগে অনেকগুলি বড় বড় শহর গড়ে উঠেছিল এবং সমাজে বণিক শ্রেণী এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। এ যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য কেবল চীনের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মাল পরিবহণের কাজে প্রথমে গাধা এবং পরে সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে উটের প্রচলন ঘটায় মধ্য এশিয়া অতিক্রম করে খাদ্যশস্য, লবণ, রেশম ও অন্যান্য পণ্য দূরদেশে চালান দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। এ প্রয়োজনে চীন থেকে পশ্চিম এশিয়া পর্যন্ত বাণিজ্যপথ (রেশম সড়ক) গড়ে উঠেছিল; এ পথে উটের ক্যারাভান যাতায়াত করত। চু যুগে রেশমের উৎপাদন বেড়েছিল এবং কয়েক রকম গাছের আঁশ থেকে কাপড় তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল।

আদিমকাল থেকেই চীনে চিন্তা ও দর্শনের বিকাশ ঘটেছিল। চু এবং তার পরবর্তী চিন রাজবংশের আমলে প্রাচীন চীনের তিনজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক চিন্তাবিদের উদয় হয়। এঁরা হলেন লাওৎসে, কনফুশিয়াস এবং মেনশিয়াস। এঁদের মধ্যে লাওৎসে ছিলেন প্রাচীনতম। লাওৎসে ছিলেন তাওবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তাওবাদ বস্তুজগৎকে অবজ্ঞা করত বলে বাস্তব কার্যকলাপের কোনো সুযোগ এ ধর্মে ছিল না। লাওৎসের অনুসারীরা ক্রমে তাঁর শিক্ষাকে বিস্মৃত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাওবাদ চীনের বৌদ্ধধর্মের সাথে মিশে যায়।

প্রাচীন চীনের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দার্শনিক ছিলেন কনফুশিয়াস (৫৫১-৪৭৯ খ্রিঃ পূঃ)। কনফুশিয়াস ছিলেন নৈতিক দার্শনিক। সৎ জীবন এবং সৎ সমাজ ছিল তাঁর কাম্য। তিনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে দেশাচার হিসাবে শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু ধর্মীয় বা অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতেন না; এ বিষয়ে তিনি বলতেন, 'আমরা জীবনকেই জানি না, মৃত্যুকে বুঝব কি করে?' কনফুশিয়াসের উদ্দেশ্য ছিল চীনের প্রাচীন প্রথায় ফিরে গিয়ে সমাজকে রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্যে তিনি নৈতিক শিক্ষা ও সদাচার পালনের শিক্ষা দিতেন।

মেনশিয়াস (৩৭২-২৮৯ খ্রিঃ পূঃ) ছিলেন কনফুশিয়াসের অনুসারী। তাঁর দর্শন ছিল মূলত রাজনৈতিক। তিনি বলতেন যে, রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে মানুষের মঙ্গলের জন্য,

www.icsbook.info

মানুষকে কর প্রভৃতি দ্বারা নির্যাতন করার জন্য নয়। তিনি উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে ন্যায়সঙ্গত মনে করতেন।

চিন রাজবংশ

২৪৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চু-রাজবংশের পতনের পর চীনে চিন বংশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। চিন বংশের সম্রাট শি হুয়াং তি তিরিশ বছর যুদ্ধ করে বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজ্যগুলিকে নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন এবং ঐক্যবদ্ধ চীনের সম্রাট হয়ে 'প্রথম সম্রাট' উপাধি ধারণ করেন। এ সম্রাটের আমলেই দুর্ধর্ষ বর্বর জাতিদের আক্রমণ রোধের জন্য সুবিখ্যাত চীনের প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। এ প্রাচীর প্রায় ২৫০০ মাইল লম্বা ছিল। এ প্রাচীরের উপর দিয়ে পাঁচ-ছয় জন ঘোড় সওয়ার পাশাপাশি ঘোড়া চালিয়ে যেতে পারত। প্রাচীরের মাঝে মাঝে সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। শি হুয়াং তি অভিজাত ভূস্বামীদের কর্তৃত্ব দূর করে সমস্ত দেশকে কতগুলি প্রদেশে ভাগ করেন এবং আমলাদের সাহায্যে এক কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এ আমলারা সরাসরি সম্রাটের কাছে দায়ী থাকতেন। এ শাসনব্যবস্থা চীনের রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর স্থায়ী ছাপ রেখেছিল। চিন রাজবংশের শাসনকাল বিশেষ স্থায়ী হয়নি। চিন সম্রাটের শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠলে সম্রাট দেশের ভিতরের সব অস্ত্রকে গলিয়ে ফেলেন এবং কনফুশিয়াসের সব বই ও অন্যান্য ইতিহাসের বইও পুড়িয়ে ফেলেন, কারণ কনফুশিয়াসপন্থীরাই সাবেক ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য আন্দোলন করছিল। কনফুশিয়াসপন্থীদের বিরুদ্ধে চিন সম্রাট নিষ্ঠুর উৎপীড়নমূলক নীতি গ্রহণ করেন। ৪৬০ জন কনফুশিয়াসপন্থী পণ্ডিতকে তিনি জীবন্ত কবর দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অতি দ্রুত এ রাজবংশের পতন ঘটে। ২০৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চিন বংশের শাসনের অবসান ঘটে।

হান রাজবংশ

চিন বংশের পতনের পর চীনে হান রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। হান সম্রাটরা ২০৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৪০০ বছর চীনে রাজত্ব করেন। কুষাণ সম্রাটরা হান সম্রাটদের কর দিতেন। কোনো কোনো হান সম্রাট চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে উৎসাহ দান করেন। এর ফলে প্রথমে মধ্য এশিয়া থেকে এবং পরে, যিশু খ্রিষ্টের সমকালে, ভারতবর্ষ থেকে চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে। হান আমলে শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছিল। পশ্চিমের বাণিজ্যপথগুলিকে নিরাপদ ও সংরক্ষিত করা হয়েছিল এবং চীনের সাথে মধ্য এশিয়া ও গ্রীক জগতের পণ্যের আদান প্রদান হত। এ যুগে শিল্প সাহিত্যেরও বিকাশ ঘটেছিল।

হান রাজবংশের আমলে কয়েকবার বড় বড় কৃষক অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এদের মধ্যে ১৮ খ্রিস্টাব্দের একটি এবং ১৮৪ খ্রিস্টাব্দের একটি অভ্যুত্থান বিশেষ গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। এ সকল কৃষক বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত দমিত হয়েছিল। অবশ্য, বিদ্রোহের ফলে কৃষক ও কারিগরদের অবস্থার উন্নতি ঘটেছিল।

তৃতীয় শতাব্দীর শুরুতে হান বংশের পতন ঘটার পর চীনে প্রায় চার শতাব্দীব্যাপী অরাজকতা দেখা দেয়। এ সময় চীনে তিনটি রাজ্যের উদয় ঘটে এবং এ তিনটি রাজ্য পরস্পরের সাথে বিরামহীন যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। তৃতীয় এবং চতুর্থ শতাব্দীতেই চীনে সামন্ততন্ত্রের উদয় ঘটতে শুরু করে। চীনে আবার ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রথমে সুই রাজবংশের আমলে (৪৮৯-৬১৮ খ্রিঃ) এবং তারপর তাং রাজবংশের আমলে (৬১৮-৯০৭ খ্রিঃ)। এ কালের ইতিহাস মধ্যযুগের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

www.icsbook.info

আমেরিকা মহাদেশের প্রাচীন ইতিহাস

১৪৯২ খৃষ্টব্দে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করার পর ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা যখন আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করে তখন তারা সেখানে বহুসংখ্যক আদিবাসীর সাক্ষাৎ পায়। আমেরিকার আদি বাসিন্দারা আমাদের দেশে রেড ইণ্ডিয়ান নামে পরিচিত। আমেরিকার আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের সভ্যতা-সংস্কৃতির স্তর সর্বত্র এক রকম ছিল না। অধিকাংশ অঞ্চলের আদিবাসীরা ছিল পশু শিকারি, কোনো কোনো অঞ্চলের আদিবাসীরা ছিল কৃষি সংস্কৃতির মানুষ। আবার উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো অঞ্চল এবং দক্ষিণ আমেরিকার পেরু অঞ্চলের লোকেরা প্রাচীন মিশরের ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতার সমতুল্য সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।

এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এ আমেরিকা মহাদেশে প্রথম মানুষের আবির্ভাব কি করে ঘটেছিল এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতিক ও সুউচ্চ সভ্যতার সৃষ্টি কিভাবে হয়েছিল তা পণ্ডিতদের সামনে এখনও এক সমস্যারূপে বিরাজ করছে।

আমেরিকাতে যে ধরনের বানর আছে তা বিবর্তনের দিক থেকে এশিয়া আফ্রিকার বানরের চেয়ে প্রাচীনতর পর্যায়ের। আমেরিকায় পিকিং মানুষের পর্যায়ের মানুষের কোনো ফসিল পাওয়া যায়নি। আমেরিকাতে যেসব মানুষের ফসিল বা কঙ্কাল পাওয়া গেছে তা সবই আধুনিক মানুষের। এর অর্থ হচ্ছে আমেরিকাতে বিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক মানুষের উদয় ঘটেনি। আর আমেরিকাতে যদি মানুষের উৎপত্তি স্বতন্ত্রভাবে না ঘটে থাকে তাহলে মানুষ নিশ্চয়ই পুরাতন বিশ্ব অর্থাৎ এশিয়া-আফ্রিকা বা ইউরোপ থেকে সেখানে গিয়েছে।

উত্তর গোলার্ধে এশিয়া ও আমেরিকা মহাদেশকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে বেরিং প্রণালী। এ জায়গায় উত্তর-পূর্ব এশিয়ার উপকূল থেকে উত্তর আমেরিকার আলাস্কার দূরত্ব পঞ্চাশ মাইলেরও কম। এ জায়গায় যে-কোনো মেঘমুক্ত ও কুয়াশামুক্ত দিনে এশিয়ার উপকূলে দাঁড়িয়ে আমেরিকার তীর ভূমিকে দেখতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া এর মধ্যে দ্বীপমালাও রয়েছে।

এশিয়া থেকে আমেরিকা জলপথে যেতে হলে এ জায়গায় একসাথে পঁচিশ মাইলের বেশি যেতে হয় না। কুড়ি-পঁচিশ হাজার বছর আগে অবশ্য জলপথে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তখন ছিল বরফ যুগ। উত্তর-পূর্ব এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকার মধ্যবর্তী এ জলপথ তখন সম্ভবত বরফে আচ্ছন্ন ছিল। বরফের পথ পার হয়ে এশিয়ার শিকারি যুগের মানুষদের পক্ষে বাইসনের পালের পিছন পিছন এশিয়া থেকে আমেরিকায় চলে যাওয়া সে সময় কোনো কঠিন কাজ ছিল না। বস্তুত, এখনকার অধিকাংশ পণ্ডিত

www.icsbook.info

মনে করেন যে, আমেরিকা মহাদেশে প্রথম মানুষ গিয়েছিল এশিয়া থেকে, বরফে ঢাকা বেরিং প্রণালী পার হয়ে এবং আলাস্কার মধ্য দিয়ে।

এশিয়া থেকে আমেরিকাতে যে একবারই মাত্র একদল মানুষ প্রবেশ করেছিল তা হয়তো নয়। পণ্ডিতরা মনে করেন, হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ দলে দলে এশিয়া থেকে আমেরিকায় প্রবেশ করেছে। আমেরিকাতে যে বিভিন্ন ধরনের ফসিল পাওয়া গেছে

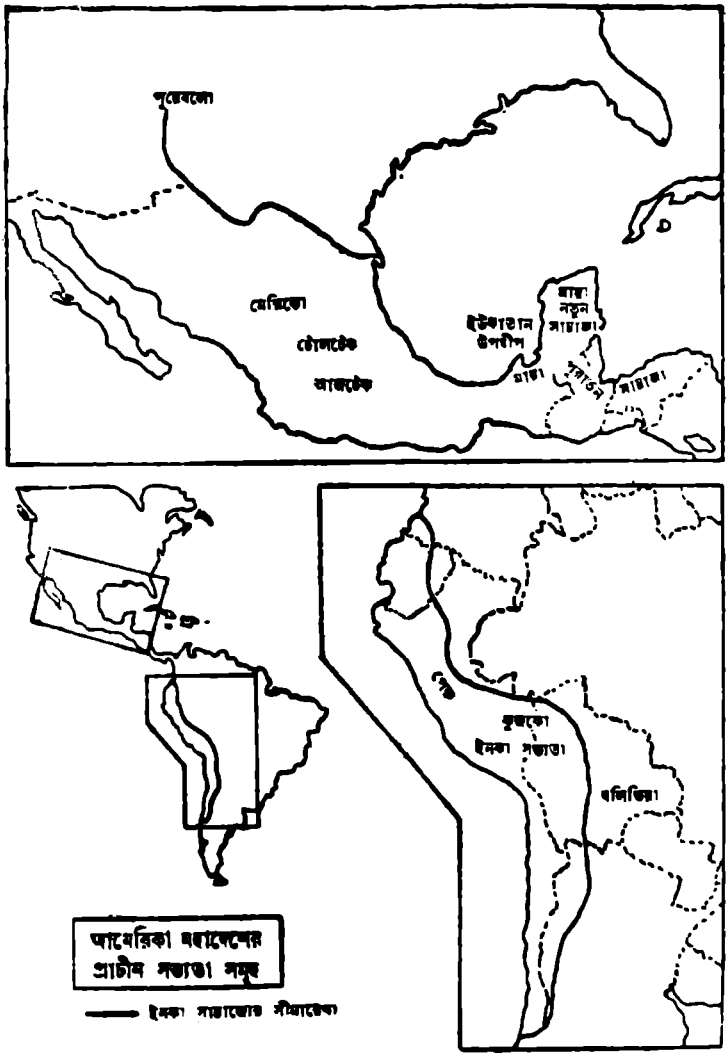

তার ভিত্তিতেই পণ্ডিতরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ বিভিন্ন সময়ে আমেরিকাতে প্রবেশ করেছে। আমেরিকাতে প্রবেশ করার পর বিভিন্ন দলের মানুষ উত্তর

www.icsbook.info

আমেরিকার নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, অনেক মানুষের দল কালক্রমে পানামা যোজক পার হয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবেশ করে। শেষ পর্যন্ত উত্তর আমেরিকার উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণতম বিন্দু পর্যন্ত আমেরিকার আদিবাসীরা ছড়িয়ে পড়ে।

কত আগে আমেরিকাতে এশিয়া থেকে মানুষ প্রবেশ করেছিল সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে মানুষের কঙ্কাল, নিহত পশুর হাড় প্রভৃতির বয়স নিরূপণ করে কোনো কোনো পণ্ডিত স্থির করেছেন যে, প্রায় পনের হাজার বছর আগে মানুষ প্রথম আমেরিকা মহাদেশে প্রবেশ করেছিল। তবে কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, মানুষ ২০ হাজার থেকে ৪০ হাজার বছর আগে উত্তর আমেরিকায় প্রথম পদার্পণ করেছিল।

আমেরিকার পুরোপলীয় সংস্কৃতি

মানুষ যখন এশিয়া থেকে আমেরিকায় প্রথম প্রবেশ করেছিল তখন তারা সেখানে পুরোপলীয় (অর্থাৎ পুরান পাথর যুগের) শিকারি সংস্কৃতিই বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। কারণ পুরাতন পৃথিবী তথা ইউরেশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে তখন একমাত্র পুরোপলীয় সংস্কৃতিরই বিকাশ ঘটেছিল। পৃথিবীর কোথাও তখন পর্যন্ত নবোপলীয় কৃষি সংস্কৃতির আবির্ভাবই ঘটেনি। আমেরিকায় প্রথম আগমনকারী আদিম মানুষরা তাই সেখানে শিকারি সংস্কৃতিরই বিস্তারসাধন করেছে। এদের বংশধররা ক্রমে ক্রমে সমস্ত উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এদের মাধ্যমে তাই উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় শিকারি মানবসমাজের প্রসার ঘটেছিল। উত্তর আমেরিকার উত্তর প্রান্তের এস্কিমো এবং দক্ষিণ আমেরিকার মাপুচি উপজাতি প্রভৃতি হল এ শিকারি মানবসমাজের দৃষ্টান্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ফল্‌সম্ নামক স্থানে প্রায় দশ হাজার বছর পুরানো যে শিকারি সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সংস্কৃতি ফল্‌সম্ সংস্কৃতি নামে বিখ্যাত হয়েছে। ফল্‌সম্ শিকারিরা বাইসন শিকার করত।

নবোপলীয় সংস্কৃতি

আমেরিকা মহাদেশে নবোপলীয় বা নতুন পাথরের যুগের কৃষি সংস্কৃতিরও সন্ধান পাওয়া গেছে। পুরাতন পৃথিবীতে আমরা যে অর্থে পুরোপলীয় ও নবোপলীয় সংস্কৃতি কথাটা ব্যবহার করি, নতুন পৃথিবীতে (আমেরিকা মহাদেশে) ঠিক সে অর্থে কথাটাকে ব্যবহার করা চলে না। পুরাতন পৃথিবীতে বহু লক্ষ বছর ধরে শিকারী যুগের বিকাশ ও বিবর্তন ঘটেছে। তারপর আফ্রিকা ও ইউরেশিয়া মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত পরিসরের পটভূমিতে পশ্চিম এশিয়ায় নবোপলীয় সংস্কৃতি জন্ম নিয়েছে মাত্র দশ হাজার বছর আগে। অথচ আমেরিকা মহাদেশে দেখা যায় যে, অল্প কয়েক হাজার বছরের মধ্যে সেখানে অল্প পরিসর স্থানের মধ্যেই প্রথমে শিকারি সংস্কৃতি ও তারপর কৃষি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। মনে হয় যেন পুরাতন পৃথিবীতে যা কয়েক লক্ষ বছর ধরে ঘটেছিল। তাই যেন আমেরিকাতে সংক্ষিপ্ত স্থানিক ও কালিক পরিসরে ঘটেছে। এ সকল লক্ষণ বিচার করলে মনে হয় যেন আমেরিকাতে নবোপলীয় কৃষি সংস্কৃতি এশিয়া থেকেই বিস্তার লাভ করেছে। কারণ অল্পকালের মধ্যেই আমেরিকার শিকারি মানুষরা স্বতন্ত্রভাবে কৃষি সংস্কৃতির আবিষ্কার করেছিল এ কথা মেনে নেওয়া কঠিন। অনেক

www.icsbook.info

পণ্ডিত তাই মনে করেন যে, আমেরিকাতে নবোপলীয় কৃষি সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল এশিয়া থেকে। আমরা যদি মনে রাখি যে, বহু হাজার বছর ধরে এশিয়া থেকে বিভিন্ন দলে মানুষ আমেরিকাতে গিয়েছিল। তাহলে পণ্ডিতদের উপরোক্ত অভিমতকে নিতান্ত অসম্ভব মনে হবে না। অবশ্য এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন, কারণ অনেক পণ্ডিত আবার মনে করেন যে, আমেরিকার আদিম মানুষরা কোনো রকম বাইরের প্রভাব ছাড়া নিজেরাই কৃষি সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটিয়েছিল।

আমেরিকা মহাদেশের আদিবাসীদের মধ্যে অবশ্য শিকারি সংস্কৃতির মতো কৃষি সংস্কৃতি ততখানি ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এবং ক্যানাডার দক্ষিণাঞ্চলে ইরোকয় উপজাতির লোকেরা শিকার এবং কৃষি উভয় সংস্কৃতিই আয়ত্ত করেছিল। তবে কৃষি সংস্কৃতিতে সবচেয়ে অগ্রসর হয়েছিল যারা, তারা হল পুয়েব্‌লো উপজাতির মানুষ। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এ পুয়েবলো গ্রাম সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। পুয়েবলো নবোপলীয় সংস্কৃতির মানুষরা পাহাড়ের গায়ের জমিতে সুন্দরভাবে চাষ করতে পারত। পুয়েবলোরা ভুট্টা ও অন্যান্য শস্য এবং তুলার চাষ করত। আমেরিকায় আদিমকালে কোথাও গম বা ধানের চাষ হত না। যেখানেই কৃষিকাজ হত, সেখানেই খাদ্যশস্য ছিল ভুট্টা। এ ছাড়া অনেক জায়গায় আলুর চাষও হত। (পুরাতন পৃথিবীতে আলু ও ভুট্টার প্রচলন আমেরিকা থেকেই হয়েছিল)। পুয়েবলোরা গিরিখাতে এবং পাহাড়ের গায়ে পাশাপাশি ঘর বানিয়ে এবং গ্রাম হিসাবে সংগঠিত হয়ে বাস করত। মায়া, আজটেক প্রভৃতি উচ্চতর সভ্যতার কথা বাদ দিলে, পুয়েবলো মানুষরা ছিল আমেরিকার মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর কৃষিজীবী। মায়া, আজটেক ও ইন্‌কা জাতিসমূহও অবশ্য কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতির নির্মাণ করেছিল, কিন্তু তাদের সভ্যতা ছিল অনেক উচ্চস্তরের। প্রায় মিশর ব্যবিলনের ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতার সমতুল্য। আমরা তাই এ সকল সভ্যতার পরিচয় পৃথকভাবে প্রদান করব।

মায়া সভ্যতা

মায়া সভ্যতা ছিল আমেরিকা মহাদেশের সমস্ত সভ্যতাসমূহের মধ্যে উচ্চতম সভ্যতা। খ্রিস্টের জন্মের অন্তত এক হাজার বছর আগে মায়া জাতির মানুষরা গুয়াতেমালা ও মেক্সিকো অঞ্চলে সভ্যতা গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করে। খ্রিস্টের জন্মের কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই মায়ারা তাদের রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে অপূর্ব সব নগর গড়ে তুলেছিল। তবে পণ্ডিতদের মতে মায়া সভ্যতা প্রকৃতপক্ষে বিকাশ লাভ করেছিল খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকে। ৩১৭ থেকে ৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কালকে বলা হয় মায়া সভ্যতার আদি পর্ব। এরপর দক্ষিণাঞ্চলের মায়া সভ্যতায় অবক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দেয় এবং মায়া সভ্যতার মূল কেন্দ্র উত্তরে ইউকাতান উপদ্বীপ অঞ্চলে চলে যায়। ৯৮৭ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কালকে বলা হয় মায়া সভ্যতার শেষ পর্যায়। এ সময়ে স্থাপত্য এবং শিল্পকলা নবজীবন লাভ করেছিল। মায়া সভ্যতা অনেকগুলি নগররাষ্ট্র নিয়ে গড়ে উঠেছিল। প্রত্যেক নগররাষ্ট্র গড়ে উঠত একটা নগর ও তার চারপাশের জমি নিয়ে। রাষ্ট্রের শাসক ছিলেন আইন, শাসন বিচার ও ধর্মীয় বিষয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। পুরোহিত ও সেনাপতিগণ ছিলেন এ শাসকের ঘনিষ্ঠ সহচর। মায়া রাষ্ট্রে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করেছিল। মায়াদের রাজ্যে ধাতু বিশেষ ছিল না, মায়ারা তাই প্রতিবেশী উপজাতিদের কাছ থেকে ধাতু সংগ্রহ করত। মায়াদের রাজ্যে কোকো

www.icsbook.info

গাছের বিচি মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হত। সমাজে বণিক, কারিগর ও অবস্থাপন্ন কৃষকদের স্থান ছিল পুরোহিত, সেনাপতি প্রভৃতি অভিজাতদের নিচেই। মায়া সমাজে ক্রীতদাসের প্রচলন ছিল। মায়াদের সমাজে সবচেয়ে নিচের স্তরের মানুষ ছিল ভূমিদাস ও ক্রীতদাসগণ। মায়াদের রাজ্যে দাসদের কঠোর পরিশ্রম করতে হত, কারণ সেখানে ভারবাহী পশু বা চাকাওয়ালা গাড়ির প্রচলন ছিল না।

মায়া রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষই ছিল কৃষক, তারা নগরের বাইরের জমিতে চাষ করত। মায়ারা বন কেটে জমি পরিষ্কার করত এবং জলসেচের সাহায্যে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করত। মায়ারা চাষের কাজ খুব ভাল জানত। তারা ভুট্টা, কোকো, বিভিন্ন ফল, শাক সবজি, মরিচ, তুলা প্রভৃতির চাষ করত। ভুট্টা ছিল তাদের প্রধান খাদ্যশস্য।

মায়া কারিগররা চমৎকার কাপড় বুনতে পারত, গয়না ও অস্ত্র বানাতে পারত এবং হাড়, কাঠ ও পাথরে খোদাই করতে পারত। মায়া রাজ্যে ধাতুর অভাব থাকায় মায়ারা অব্‌সিডিয়ান নামে একপ্রকার কাচতুল্য পাথর দিয়ে পাত্র, হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করত।

মায়াদের জীবনে ধর্মের অত্যধিক আধিপত্য ছিল। মায়াসমাজে পুরোহিতরা ছিল খুবই ক্ষমতাশালী। সমস্ত সার্বজনীন ভবন নির্মাণ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব ছিল পুরোহিতদের। শিক্ষা বলতে ছিল ধর্মশিক্ষা এবং লেখাপড়ার ব্যবস্থা ছিল পুরোহিতদের কবলিত। মায়াদের ধর্মে নরবলির প্রথা ছিল।

মায়াসমাজে লেখনপদ্ধতির প্রচলন ছিল। মায়াদের লিপি ছিল চিত্রলিপি অথবা ভাবব্যঞ্জক লিপি। মায়াদের লিপির পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয়নি। মায়াদের লেখার বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল ধর্মবিষয়ক ও সন-তারিখ সংক্রান্ত। প্রতি কুড়ি বছর অন্তর মায়া পুরোহিতরা একটা পাথরের দেওয়াল নির্মাণ করে তাতে পূর্ববর্তী কুড়ি বছরের ঘটনাপঞ্জি লিপিবদ্ধ করে রাখত। মায়া পুরোহিতরা ধর্মীয় প্রয়োজনে পঞ্জিকার হিসাবও আবিষ্কার করেছিল এবং এ পঞ্জিকা তারা পাথরের চাকতিতে লিপিবদ্ধ করে রাখত। এ ছাড়া মায়ারা সার্বজনীন ভবনে, স্মৃতিস্তম্ভে, মন্দিরে, গয়নায়, পাত্রের গায়ে এবং পুস্তকে বিভিন্ন কথা লিখত। মায়াদের বই বিশেষ এক ধরনের কাগজ দিয়ে তৈরি হত এবং এসব বইকে কাগজের পাখার মতো ভাঁজ করে রাখা চলত।

মায়াসমাজে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা যথেষ্ট বিকাশ লাভ করেছিল। মায়াসমাজে এক রকম অঙ্কপাতন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল যা অনেকটা আমাদের ব্যবহৃত অঙ্কপাতন পদ্ধতির মতোই। আমাদের গণনা পদ্ধতি ১০-ভিত্তিক, আর মায়াদের গণনা পদ্ধতি ছিল ২০-ভিত্তিক। আমাদের মতো মায়ারাও শূন্যের (০) ব্যবহার জানত। অবশ্য মায়াদের শূন্যচিহ্ন দেখতে আমাদের মতো ছিল না। আমরা যখন চার অঙ্কের কোনো সংখ্যা লিখি তখন ডান দিক থেকে বাঁ দিকে প্রথম স্থানের একক ১, দ্বিতীয় স্থানের একক ১০, তৃতীয় স্থানের একক ১০০ ইত্যাদি। অনুরূপভাবে মায়াদের প্রথম স্থানের একক ১, দ্বিতীয় স্থানের একক ২০। ফলে মায়াদের হিসাবে ৩৭ লিখলে তার অর্থ দাঁড়াবে ৩ ঙ ২০ + ৭ = ৬৭। তবে মায়াদের অঙ্কপাতন পদ্ধতি আমাদের মত নিখুঁত ছিল না। কারণ তারা ২০-ভিত্তিক অঙ্কপাতন পুরোপুরি অনুসরণ করত না। যেমন, আমাদের পদ্ধতিতে শতকের স্থানের মান হচ্ছে ১০০ অর্থাৎ ১০ঙ১০, মায়াদের হওয়া উচিত ছিল ২০ ঙ ২০ =৪০০; কিন্তু মায়ারা যে কারণেই হোক তৃতীয় স্থানের স্থানিক মান ধরত ৩৬০। এটা ছিল ত্রুটিপূর্ণ।

www.icsbook.info

মায়ারা তাদের লেখনপদ্ধতি ও গণিতবিদ্যাকে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চার সাথে যুক্ত করেছিল এবং এ সবকিছুর সহযোগে একটা নিখুঁত পঞ্জিকা প্রণয়ন করতে সমর্থ হয়েছিল। মায়ারা তাদের পঞ্জিকায় বছরের যে দৈর্ঘ্য নিরূপণ করেছিল তা প্রায় আমাদের মতোই নিখুঁত ছিল।

মায়াদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ছিল অত্যন্ত উচ্চমানের। স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে মায়াদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল সুউচ্চ পিরামিড, বিশাল সোপানশ্রেণী, অতি অপরূপ মন্দির প্রভৃতি। নগর চত্বরের চারপাশে এ সকল পিরামিড ও অন্যান্য ভবন নির্মাণ করা হত। মন্দিরের চত্বর প্রভৃতিতে সুন্দর সুন্দর ভাস্কর্য স্থান পেত। মায়া ভাস্কররা শুধুমাত্র পাথরের হাতিয়ার ও যন্ত্রের সাহায্যে এত সুন্দর সুন্দর ভাস্কর্য সৃষ্টি করতে পারতেন ভাবলে অবাক হতে হয়। এ ছাড়া রঙিন পাথর এবং সোনা ও রূপার বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর সামগ্রীও মায়ারা তৈরি করতে পারত। বস্তুত মায়া শিল্পকলা প্রাচীন মিশরের শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার সাথে তুলনীয়।

শেষ পর্যায়ে মায়া সভ্যতা অনেকগুলি স্বাধীন নগরের সমষ্টি হিসাবে টিকে ছিল। শেষ পর্যন্ত মায়া নগররাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিবাদ ও গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। এর ফলে ত্রয়োদশ শতকের পর থেকে মায়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির পতন ঘটে। স্পেনীয় উপনিবেশকরা যখন ষোল শতকে এখানে আসে তখন তারা এ অঞ্চলে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা দেখতে পায় এবং মায়া রাজ্যকে সহজেই জয় করে নেয়।

আজটেক সভ্যতা

খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে টোলটেক নামক এক জাতির মানুষ উত্তর দিক থেকে এসে মেক্সিকো উপত্যকা অধিকার করে। মায়াদের সংস্পর্শে এসে টোলটেকরা তাদের সংস্কৃতি আয়ত্ত করে এবং মায়াদের অনুকরণে সুন্দর সুন্দর নগর গড়ে তোলে। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে টোলটেক এবং তাদের সমগোত্রীয় অন্যান্য জাতির মানুষরা এক বড় রাজ্য গড়ে তোলে। এর কিছুকাল পরেই আজটেক নামক জাতি উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে মেক্সিকোতে আগমন করে। ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে আজটেকরা বর্তমান মেক্সিকো নগরীর কাছে এক হ্রদের মধ্যে বাস স্থাপন করে। এর পর তারা মেক্সিকোর অন্যান্য উপজাতিদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। পনের শতকে আজটেকদের এ রাজ্য সারা মেক্সিকো জুড়ে বিস্তৃত হয়। আজটেকদের রাজ্য শেষ পর্যন্ত মেক্সিকো উপসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। আজটেকরা ছিল যুদ্ধপ্রিয় জাতি। তাদের সুশিক্ষিত যোদ্ধার দল সর্বদা প্রস্তুত থাকত। এ সৈন্যদের সাহায্যে আজটেকরা তাদের প্রতিবেশী দেশসমূহকে সব সময় ব্যতিব্যস্ত করে রাখত। তবে আজটেকদের এ প্রতিপত্তি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি, কারণ ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনীয় সেনাপতি কর্টেজের আক্রমণে আজটেক সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

আজটেকদের শাসনকর্তা ছিলেন এক সর্বক্ষমতাময় রাজা। তাঁর সমর্থনকারী ছিল সেনাবাহিনী, পুরোহিত এবং অভিজাতগণ। আজটেকরা অনবরত যুদ্ধ করে অসংখ্য যুদ্ধবন্দী ধরে আনত। যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যককে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হত, অন্যান্যদের দাসে পরিণত করা হত। মায়াদের মত আজটেক সমাজেও দাসের প্রচলন ছিল। আজটেক সমাজে স্বাধীন মানুষরা কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

www.icsbook.info

সবচেয়ে নিচের শ্রেণীতে ছিল সাধারণ কৃষক ও ভূমিদাসরা। এরা যা উৎপাদন করত তার এক বৃহৎ অংশ রাষ্ট্র আত্মসাৎ করত পুরোহিত, সেনাবাহিনী ও অভিজাতদের পরিপোষণের জন্য।

আজটেক সভ্যতার ভিত্তি ছিল কৃষিকাজ। আজটেকরা কোকো, রবার, টমেটো, ভুট্টা প্রভৃতির চাষ করত। এ সকল গাছ এবং ফল ও শস্য আমেরিকা থেকেই অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করেছে। আজটেকদের রাজ্যে জমির বিশেষ অভাব ছিল। তাই তারা হ্রদের মধ্যে কৃত্রিম দ্বীপ সৃষ্টি করে তাতে ফলের চাষ করত। আজটেকদের সমাজে চারু ও কারুশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। আজটেকরা সুন্দর সুন্দর মাটির পাত্র ও মূর্তি, ধাতুর ভাস্কর্য, অলঙ্কার, অস্ত্র প্রভৃতি নির্মাণের কাজে দক্ষতা অর্জন করেছিল। আজটেকরা সুন্দর কাপড় বুনতে পারত। আজটেক সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটেছিল। পালকের ফাঁপা নলের ভিতর সোনার রেণু ভরে তাকে আজটেকরা মুদ্রারূপে ব্যবহার করত।

আজটেকরা এক ধরনের লেখনপদ্ধতি আয়ত্ত করেছিল। সম্ভবত ওলমেক অথবা মায়াদের কাছ থেকে তারা এ লিপি লাভ করেছিল। আজটেকরা মায়াদের পঞ্জিকাকেও গ্রহণ করেছিল। মায়াদের মতো আজটেকরাও প্রত্যেক নগরে পিরামিড, মন্দির ও বিশাল ভবন নির্মাণ করত। তারা খাল এবং বাঁধও নির্মাণ করতে পারত। আজটেকদের স্থাপত্যশিল্প ও ভাস্কর্যের প্রায় সকল নিদর্শন স্পেনীয় সেনাপতি কর্টেজের আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

ইন্কা সভ্যতা

আমরা গুয়াতেমালা ও মেক্সিকোর সভ্যতা তথা উত্তর আমেরিকার মায়া এবং আজটেক সভ্যতার কথা আলোচনা করেছি। ইন্কা নামক এক জাতি দক্ষিণ আমেরিকার পেরু অঞ্চলে প্রায় অনুরূপ উচ্চমানের এক সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, ইতিহাসে তা ইন্কা সভ্যতা নামে পরিচিত হয়েছে।

পেরু অঞ্চলে ইন্কাদের আবির্ভাবের আগেও সেখানে সভ্যতা-সংস্কৃতির উদয় ঘটেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণাদি থেকে জানা গেছে যে, দক্ষিণ আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে প্রাগৈতিহাসিক কালে বিভিন্ন রেড ইণ্ডিয়ান উপজাতির মানুষ বাস করত। খ্রিস্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এ আদিম মানুষরা গৃহ ও পিরামিড নির্মাণ, উৎকৃষ্ট মাটির পাত্র নির্মাণ, জলসেচ প্রভৃতির কৌশল আয়ত্ত করেছিল। ঐ সময়ের অল্পকাল পরে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল থেকে ১৩ হাজার ফুট উপরে আন্দিজ পর্বতের উপত্যকায় অন্যান্য রেড ইণ্ডিয়ান উপজাতিরা আরেক সুউচ্চ সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। এ মানুষরা যেসব বিশাল পাথরের নগরী গড়ে তুলেছিল তার ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। কালক্রমে এ সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু এর বিলুপ্তির কারণ এখনও জানা জায়নি।

খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ইন্কা নামে পরিচিত একদল মানুষ আন্দিজ পর্বতের মধ্যভাগে এসে বাস স্থাপন করে। ইন্কা শব্দের অর্থ হচ্ছে "সূর্যের সন্তান"। ইন্কারা ক্রমশ যুদ্ধ করে তাদের রাজ্যের পরিধি বাড়াতে শুরু করে। শেষ পর্যায়ে, ১৪৩৮ থেকে ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে ইন্কা রাজ্য আন্দিজ পর্বতের উপর প্রায় ২৭০০ মাইল

www.icsbook.info

এলাকা জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল। ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ইন্‌কা রাজ্য স্পেনীয় আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। স্পেনীয় আক্রমণের আগে ইন্‌কা রাজ্য বর্তমান পেরু, ইকোয়েডর, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা ও চিলির এক বড় অংশ জুড়ে অবস্থিত ছিল। ইন্‌কাদের শাসক ছিল সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন "সাপা ইন্‌কা" অর্থাৎ "একমাত্র ইন্‌কা"। ইন্‌কারা অন্যান্য উপজাতির মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের দাসে পরিণত করেছিল। অবশ্য সাধারণ ইন্‌কা ও দাসের অবস্থাতে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। সাধারণ ইন্‌কা ও দাস-ভূমিদাসদের উপর রাজত্ব করত প্রকৃতপক্ষে পুরোহিত ও অভিজাত শ্রেণী। দাস এবং ইন্‌কা কৃষক-কারিগররা যে বিপুল সম্পদ উৎপন্ন করত, অভিজাত শ্রেণী তার অধিকাংশই আত্মসাৎ করত নিজেদের সুখভোগের জন্য।

কৃষিই ছিল ইন্‌কা সংস্কৃতির ভিত্তি। পাহাড়ের গায়ে তারা ফসল ফলাত। পাহাড়ের গায়ে পাঁচ-ছয় ফুট উঁচু দেওয়াল তুলে তারা খাঁজ সৃষ্টি করত এবং সে খাঁজ মাটি দিয়ে ভরত। এ মাটির উপর তারা শস্যের চাষ করত। ইন্‌কারা প্রধানত ভুট্টা, আলু, মরিচ, তরিতরকারি, নানাপ্রকার লতাগুল্ম প্রভৃতির চাষ করত। ষোল শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ বা এশিয়াতে আলু অজানা ছিল; দক্ষিণ আমেরিকা থেকেই আলু পরবর্তীকালে সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছিল। ইন্‌কা রাজ্যে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। ইন্‌কারা পশুপালনের কৌশল আয়ত্ত করেছিল। লামা, আলপাকা প্রভৃতি প্রাণীকে তারা পোষ মানিয়েছিল। এ দু'টি প্রাণীই উটজাতীয়। আলপাকা আকারে ভেড়ার সমান, লামা আরেকটু বড়। ইন্‌কারা লামাকে ভারবাহী পশু হিসেবে ব্যবহার করত। তবে মায়া আজটেকদের মতো ইন্‌কারাও চাকাওয়ালা গাড়ির ব্যবহার জানত না। আলপাকার লোম থেকে ইন্‌কারা পশমী কাপড় বুনত। লামা এবং আলপাকার দলের বড় অংশই ছিল সাপা ইন্‌কার সম্পত্তি।

ইন্‌কারা কাপড় বুনতে পারত, মাটির সামগ্রী বানাতে পারত এবং সোনা, তামা প্রভৃতি ধাতুর সুন্দর সুন্দর সামগ্রীও বানাতে পারত। ইন্‌কারা সুবিশাল ও মজবুত পাথরের বাড়ি বানাতে পারত। ইন্‌কারা রাস্তা, বাঁধ ও সেতু নির্মাণে দক্ষ ছিল। রাজধানী কুজকো থেকে ইন্‌কা রাজ্যের সর্বত্র বড় বড় চওড়া রাস্তা গিয়েছিল। নদী, ঝরনা ইত্যাদির উপর দিয়ে ইন্‌কারা সেতু নির্মাণ করত; তার অধিকাংশই ছিল ঝুলন্ত সেতু। ইন্‌কারা জলপথে যাতায়াত ব্যবস্থারও উন্নতি সাধন করেছিল। তারা ভেলা, ডোঙ্গা নৌকা এবং পালতোলা নৌকার সাহায্যে জলপথে যাতায়াত করত। ইন্‌কারা সমুদ্র পথে মেক্সিকোর সাথে যোগাযোগ রাখত বলে অনুমান করা হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার এত উন্নতি সত্ত্বেও অবশ্য ইন্‌কাদের বাণিজ্য ব্যবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল না। ব্যবসা বলতে পণ্য বিনিময় ব্যবস্থারই প্রচলন ছিল, তবে ইন্‌কারা কড়িকেও মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করত বটে।

ইন্‌কাদের কোনো লেখনব্যবস্থা ছিল না, তবে তারা সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য এক প্রকার কৌশল আয়ত্ত করেছিল। তার নাম কিপু, বাংলায় বলা চলে গ্রন্থিলিপি। ইন্‌কারা দড়িতে গিঁট বেঁধে বেঁধে সেটা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠাত। দড়ির মধ্যে গিঁটের অবস্থান দেখে অন্যেরা লিপির অর্থ উদ্ধার করত। এরই নাম কিপু। ইন্‌কারা পঞ্জিকার ব্যবহার আয়ত্ত করেছিল। তারা ৩৬৫ দিনে বছর গণনা করত। তারা বছরকে বারটি মাসে এবং মাসকে চারটি সপ্তাহে বিভক্ত করত।

www.icsbook.info

১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে স্বার্থলোভী স্পেনীয় সৈনিক পিজারোর আক্রমণে ইন্‌কাদের প্রাচীন সভ্যতা বিলুপ্ত হয়েছিল।

মায়া, আজটেক, ইন্‌কা সভ্যতার উৎপত্তি প্রসঙ্গে

আমরা দেখতে পেলাম, আমেরিকা মহাদেশে আপাতদৃষ্টিতে স্বতন্ত্রভাবে মিশর ব্যবিলন প্রভৃতি ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতার অনুরূপ কয়েকটা সুউচ্চ সভ্যতা উদিত হয়েছিল। আমেরিকা মহাদেশে এ ধরনের অত্যুচ্চ সভ্যতার উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে দুই ধরনের মত প্রচলিত রয়েছে। কারও কারও মতে, আমেরিকাতে এ সকল সভ্যতার উদয় স্বতন্ত্রভাবে ঘটেছিল। আবার কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, পুরাতন পৃথিবীর ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতার প্রভাবেই আমেরিকাতে মায়া, আজটেক ও ইন্‌কা সভ্যতার উদয় ঘটেছিল।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে, পশ্চিম এশিয়া ও মিশরের প্রাচীন সভ্যতার সাথে আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতাসমূহের কিছু কিছু সম্ভাব্য যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। যেমন, ইন্‌কা রাজ্যের নানা স্থানে মিশরের মতো মৃতদেহ থেকে মমি তৈরি করা হত। আবার, মায়া আজটেক সভ্যতায় চাকাওয়ালা গাড়ি বা কুমোরের চাকের ব্যবহার ছিল না, কিন্তু মেক্সিকোর কোনো কোনো কবরের মধ্যে চাকাওয়ালা খেলনাগাড়ি পাওয়া গেছে। সমাজে চাকাওয়ালা গাড়ির প্রচলন না থাকা সত্ত্বেও কবরের মধ্যে চাকাওয়ালা খেলনাগাড়ির উপস্থিতি খুবই আশ্চর্যের। অনুমান করা চলে, প্রাচীন কোনো সভ্যতার অনুকরণে এ খেলনা নির্মিত হয়েছিল। এ সকল নিদর্শন ছাড়াও আরেকটা হিসাব আছে। প্রাচীন মিশর ও ব্যবিলনীয় সভ্যতার উদয় ঘটেছিল ব্যাপকসংখ্যক মানুষের সুদীর্ঘকালের কর্মপ্রচেষ্টার পটভূমিতে। অপরপক্ষে আমেরিকাতে স্বল্পকালের মধ্যে এবং স্বল্প পরিসরের মধ্যে এত উচ্চ সভ্যতার উদয় ঘটা সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার। যেমন, ব্যবিলনে ব্যবসা-বাণিজ্যের এত ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল যে তার হিসাব রাখার প্রয়োজন থেকে গণিতের উন্নতি এবং অঙ্কপাতন পদ্ধতির আবিষ্কারকে কোনো আশ্চর্য বিষয় বলে মনে হয় না। ব্যবিলনীয়রা ৬০-ভিত্তিক গণনাপদ্ধতি এবং শূন্যের অর্থবোধক একটা চিহ্ন আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল। অথচ, মায়াদের ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্যান্য সামাজিক কার্যকলাপ খুব ব্যাপক না হওয়া সত্ত্বেও তারা অতি সহজে ২০-ভিত্তিক গণনাপদ্ধতি এবং শূন্যের আবিষ্কার সাধন করল এটা অতি আশ্চর্যের ব্যাপার। তাই এটা খুব অসম্ভব নাও হতে পারে যে, এশিয়া থেকেই ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতার বীজ আমেরিকাতে গিয়েছিল। তবে এ বিষয়ে এখনও নিঃসংশয়ে কিছু বলা চলে না।

www.icsbook.info

কোরিয়া ও জাপানের প্রাচীন ইতিহাস

কোরিয়ার ইতিহাস

কোরিয়া উপদ্বীপটি এশিয়ার পূর্ব উপকূলে, চীনের মাঞ্চুরিয়ার পূর্ব অঞ্চল ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ব প্রান্ত থেকে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত। উপদ্বীপটি ৫২৫ মাইল লম্বা ও গড়ে প্রায় ১৫০ মাইল চওড়া।

নানা কারণে বর্তমান পৃথিবীতে কোরিয়া দেশটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। প্রাচীন কালেও এ দেশটি সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিল। চীনের নৈকট্যের দরুন কোরিয়া অতি প্রাচীন কালেই চীন সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। আবার জাপানে চীনের সভ্যতার নানা উপাদান পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও কোরিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

পুরান পাথরের যুগ এবং নতুন পাথরের যুগের কোরিয়া সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায়নি। প্রবাদ অনুসারে, ১১২২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে কিজা নামক এক চীনা ঔপনিবেশিক কোরিয়ায় এসে স্থানীয় রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। তিনি কোরিয়ায় এক উন্নত সভ্যতার প্রবর্তন করেন। ১০৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে চীন সাম্রাজ্য কোরিয়ার উত্তরাংশ জয় করে সেখানে চারটি উপনিবেশ স্থাপন করে। ৫৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পরে কোরিয়া অঞ্চলে তিনটি রাজ্যের উদয় হয়॥ একটি চীন অধিকৃত উত্তর অংশে; একটি দক্ষিণ-পূর্ব কোরিয়ায় এবং তৃতীয়টি দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে। সর্ব দক্ষিণের একটা ক্ষুদ্র অঞ্চল প্রথম শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত জাপানের অধিকারে ছিল বলে অনুমান করা হয়। পূর্বোক্ত তিনটি রাজ্য প্রায় ৭০০ বছর ধরে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিল। মধ্যযুগে কোরিয়ার সভ্যতার অতি অপরূপ বিকাশ ঘটেছিল। এ সময়ে কোরিয়ায় চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, ইতিহাস ও কৃষিবিদ্যার চর্চা বিকাশ লাভ করেছিল।

জাপানের ইতিহাস

দূর প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে জাপানেই প্রাচীন সভ্যতা সবচেয়ে দেরিতে বিকাশ লাভ করে। এর অবশ্য কারণও রয়েছে। জাপান দ্বীপপুঞ্জ এশিয়ার পূর্ব উপকূলের পার্শ্ববর্তী হলেও, মূল ভূ-খণ্ডের একেবারে নিকটবর্তী নয়। কোরিয়া উপদ্বীপের কাছেই জাপান এশিয়ার উপকূল থেকে সবচেয়ে কম দূরবর্তী এবং এ দূরত্ব ১০০ মাইলেরও বেশি। সমুদ্রগামী জাহাজের প্রচলন হওয়ার আগে জাপানের সাথে চীন বা এশিয়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেনি। এর ফলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত জাপানের অধিবাসীরা চীনের সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি।

www.icsbook.info

জাপান দ্বীপপুঞ্জ তিন হাজারেরও বেশি পর্বতসঙ্কুল দ্বীপ নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে মাত্র চারটি দ্বীপ বড় আকারের এবং মোট ৬০০টি দ্বীপে লোকবসতি আছে। মূল দ্বীপের নাম হনশু, এ দ্বীপেই বর্তমান রাজধানী টোকিও এবং প্রাচীন ঐতিহাসিক রাজধানী কিয়োতো অবস্থিত। হনশুর উত্তরে হোক্কাইডো দ্বীপ এবং দক্ষিণে শিকোকু ও কিউশিউ দ্বীপ। কিউশিউ হচ্ছে কোরিয়া উপদ্বীপের ঠিক মুখোমুখি। জাপানের স্থলভাগের মোট আয়তন ১ লক্ষ ৪২ হাজার বর্গমাইল। অবশ্য এর শতকরা ৮০ ভাগ জমিই পার্বত্য ও বসবাসের অযোগ্য। জাপানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। জাপান নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত, তবে উত্তর-দক্ষিণে এর বিস্তৃতি প্রায় ১৫ ডিগ্রী অক্ষাংশ বলে তার বিভিন্ন অংশে আবহাওয়ার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জাপানে শীতকালে শীত তীব্র এবং গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত প্রচুর।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এশিয়া ভূখণ্ড ও বোর্ণিও, জাভা এবং ফিলিপাইন থেকে মানুষ এসে জাপানে বাস স্থাপন করে।

পণ্ডিতদের মতে, চু-যুগে (১০২৭-২৪৯ খৃঃ পূঃ) কয়েক দফায় কোরিয়া ও অন্যান্য স্থান দিয়ে চীন থেকে মানুষের দল জাপানে যায়। বর্তমানে জাপানের হোক্কাইডোতে যেসব আদিবাসী আছে তাদের কাছে পাওয়া নানা শিল্প নিদর্শন থেকে জানা যায় যে, অন্তত ছয় হাজার বছর আগে তাদের পূর্বপুরুষ জাপানে এসেছিল।

জাপানে পুরান পাথরের যুগের শিকারি মানুষরা পদার্পণ করেছিল বলে জানা যায়নি। জাপানে প্রাপ্ত বাড়িঘর, মাটির পাত্র প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে, পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে নতুন পাথরের যুগের কৃষি সংস্কৃতির মানুষ জাপানে বাস স্থাপন করেছিল। কৃষিই ছিল আদিমতম জাপানিদের অর্থনীতির ভিত্তি। ক্রমশ অতি প্রাচীনকালেই জাপানে ট্রাইব সমাজ অনেকগুলো ছোট ছোট ট্রাইবভিত্তিক রাজ্যের জন্ম দেয়। বংশানুক্রমিক গোষ্ঠীপতিরা ছিল এসব রাজ্যের শাসক। শাসকগোষ্ঠী এবং অভিজাতরা জমির মালিকানা নিজেদের হাতে জড়ো করেছিল। তাদের নিচে ছিল কৃষক ও কারিগরদের অবস্থান এবং সকলের নিচে ছিল ভূমিদাসদের স্থান। মনে থাকতে পারে যে, আদি নবোপলীয় সংস্কৃতিতে সমাজের শ্রেণীবিভাগ ছিল না। কিন্তু জাপানে চীন থেকে চু-যুগে বা তার কাছাকাছি সময়ে যে নতুন মানুষরা এসেছিল তারাই সম্ভব সাথে করে ব্রোঞ্জযুগের শ্রেণী বিভাগের ধারণা ও কলাকৌশল জাপানে নিয়ে এসেছিল।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই মধ্য জাপানের ইয়ামাতো গোষ্ঠী হনশু দ্বীপের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করে এবং গোষ্ঠীর শাসক নিজেকে সম্রাটরূপে ঘোষণা করেন। অবশ্য খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এসেই প্রকৃতপক্ষে এ গোষ্ঠীর শাসক সর্বোচ্চ সম্রাটরূপে পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করেন।

চীনের ইতিহাসের চিন ও হান যুগে কোরিয়ার মাধ্যমে চীনের ব্রোঞ্জযুগের সংস্কৃতি জাপানে এসে পৌঁছায়। হান যুগে (খ্রিঃ পূঃ ২০৬-২২০ খ্রি) কোরিয়ার অংশবিশেষের উপর চীনের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। এরপর কোরিয়া থেকে চীনের সংস্কৃতির নানা উপাদান এসে জাপানে পৌঁছাতে শুরু করে। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে চীন থেকে লোহার কারিগরি জাপানে এসে পৌঁছায়। একই সময়ে দলে দলে চৈনিক ও কোরীয় কারিগর, তাঁতি, কুমোর, পটুয়া, অভিজ্ঞ কৃষক ও রেশম-চাষী জাপানে আগমন করে। এ ছাড়া চীনের চিকিৎসাবিদ্যা, ঔষধবিদ্যা, সামরিক বিজ্ঞান প্রভৃতিও জাপানে এসে

www.icsbook.info

পৌঁছায়। জাপান ১০০ থেকে ৫৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোরিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে একটা অঞ্চল অধিকার করে ছিল এবং কোরিয়ার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপও করেছিল। এ সময়েই, পঞ্চম শতাব্দীতে চীনের লেখনপদ্ধতি ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম কোরিয়ার মাধ্যমে জাপানে এসে পৌঁছায়। এ সময়ে দলে দলে চীনা বিদ্বান জাপানে এসে চীনা ভাষা ও লেখন পদ্ধতি এবং চীন সাহিত্যের সেরা সৃষ্টি— তার কবিতা, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার প্রচলন করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লেখনপদ্ধতি আয়ত্ত করার ফলে জাপানের সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল এ কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য হল যে চীনের কাছ থেকে লেখনপদ্ধতি অর্জন করার ফলে পরবর্তীকালে তার সভ্যতার বিকাশ অনেকাংশে ব্যাহতও হয়েছে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, চীনের লেখন পদ্ধতি হচ্ছে মূলত চিত্রলিপিভিত্তিক বা ভাবব্যঞ্জক। জাপান লেখন পদ্ধতি আয়ত্ত করার অন্তত এক হাজার বছর আগে পশ্চিম এশিয়ায় ও গ্রীসে বর্ণমালার প্রচলন হয়েছিল। জাপান যদি অন্য সূত্রে বর্ণমালা অর্জন করতে পারত তবে তার পক্ষে লেখ এবং পড়ার কাজটা অনেক সহজ হত। বিশেষত জাপানী ভাষা ধ্বনিগতভাবে চীন ভাষা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে চীনা ভাবব্যঞ্জক অক্ষর দিয়ে জাপানি ভাষা লেখা খুব কঠিন ছিল। জাপান অবশ্য চীনা লেখনপদ্ধতিকে বহুলাংশে সংক্ষেপিত ও পরিবর্তিত করে নিজেদের ভাষার উপযোগী করে নিয়েছে। তথাপি, জাপানী ভাষায় লিখতে শেখ এখন পর্যন্ত খুব দুঃসাধ্য রয়ে গেছে। অবশ্য, প্রাচীন ভারত থেকে যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা জাপানে গিয়েছিলেন তাঁরা গোপনে একটা বর্ণমালাভিত্তিক লেখন পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন।

আমরা দেখতে পেলাম, জাপানের প্রাচীন সভ্যতার আদি উৎস প্রত্যক্ষভাবে চীন। কিন্তু উল্লেখ করা দরকার যে, জাপান এক আশ্চর্য গুণে তার সভ্যতা-সংস্কৃতির সব বৈদেশিক উপাদানকেই পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করে গ্রহণ করেছে। জাপান চীনা লেখনপদ্ধতিকে, বৌদ্ধধর্মকে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী রূপান্তরিত করে গ্রহণ করেছে। এমনকি চীনের শিল্প, সাহিত্য, কাব্য, স্থাপত্য, নাট্য ও দৃশ্যকাব্য প্রভৃতিকে নিজেদের প্রয়োজন ও ঐতিহ্য অনুসারে রূপান্তরিত করে গ্রহণ করেছে। জাপান তার সভ্যতার আদি ও মূল উপকরণ চীন-কোরিয়া থেকে সংগ্রহ করলেও, নিজেদের দক্ষতা ও পরিশ্রমের গুণে জাপানিরা তার বিকাশ সাধন করে আধুনিক জগতে নিজেদের জন্য একটা অনন্য স্থান করে নিতে পেরেছে। জাপানের পরবর্তী ইতিহাস মধ্যযুগের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

www.icsbook.info

বিকাশরুদ্ধ সমাজের ইতিহাস

অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীন ইতিহাস

১৬০০ খ্রিস্টাব্দের সমকাল থেকেই ইউরোপীয় নাবিক-পর্যটকরা অস্ট্রেলিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। ১৬২৪ সালে ওলন্দাজ (হল্যাণ্ডের) নাবিক আবেল টাসম্যান অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত দ্বীপটিকে আবিষ্কার করেন; তাঁর নামানুসারে দ্বীপটির নাম দেয়া হয়েছে টাসমানিয়া। কিন্তু ১৭৭০ সালে ক্যাপ্টেন জেমস কুক্ অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে পদার্পণ করার পর থেকেই ইউরোপীয়রা ক্রমশ অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে শুরু করে।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশটি সুমাত্রা, জাভা ইত্যাদি ইন্দোনেশীয় দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি বিশাল দ্বীপ। অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ, আকারে ইউরোপের পৌনে একভাগ। এর আয়তন প্রায় ৩০ লক্ষ বর্গমাইল; পূর্ব-পশ্চিমে তার বিস্তৃতি মোটামুটি ২৪০০ মাইল ও উত্তর দক্ষিণে ২০০০ মাইল। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ পুরোপুরি দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত এবং মোটামুটি ১০ থেকে ৪০ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। অস্ট্রেলিয়ার মধ্যভাগ প্রায় সবটাই মরুভূমি। আর বাকি অংশের মধ্যেও তৃণভূমিই প্রধান-বৃষ্টিপাত কম বলে সেসব অঞ্চলে ঘাস ছাড়া কিছু জন্মায় না। উত্তর এবং উত্তর— পূর্বের উপকূলীয় অঞ্চলে নিরক্ষীয় বৃষ্টিপাতের দরুন বনভূমি আছে। অস্ট্রেলীয় আদিবাসীরাও প্রধানত উত্তর ও পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলেই বেশি সংখ্যায় বাস করত। শুষ্ক ও মরু অঞ্চলে আদিবাসীরা ছিল নগণ্য পরিমাণে। ইউরোপীয়রা যখন প্রথমে অস্ট্রেলিয়ায় যেতে শুরু করে তখন ১৭৮৮ সালে আদিবাসীদের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ। ইউরোপীয়দের উৎপীড়নে তাদের সংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে॥ ১৯৪৭ সালে তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৭ হাজার। অস্ট্রেলীয় আদিবাসীরা বর্তমানে পশ্চিম ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার অনুর্বর অঞ্চলে কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করছে।

পণ্ডিতরা জানতে পেরেছেন যে একদা অস্ট্রেলিয়া পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অর্থাৎ সুমাত্রা, জাভা ইত্যাদি দ্বীপের মাধ্যমে এশিয়ার সাথে যুক্ত ছিল। বহু কোটি বছর আগে এ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এ কারণে অস্ট্রেলিয়াতে অনেক পুরান জাতের প্রাণী ও উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায় যা এশিয়া-ইউরোপে অনেক আগে লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে টিকে আছে। আবার অস্ট্রেলিয়াতে প্লাটিপাস নামে এক ধরনের অণ্ডজ স্তন্যপায়ী আছে যারা ডিম পাড়ে কিন্তু বাচ্চাকে স্তন্য পান করায়। সেখানে ক্যাঙারু নামে আরেক ধরনের আধা স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে যারা ভ্রূণ অর্থাৎ অর্ধ পরিণত বাচ্চার জন্ম দেয়; এ বাচ্চারা মায়ের উদরসংলগ্ন একটি থলিতে আশ্রয় নেয় এবং মায়ের স্তন্য পান

www.icsbook.info

করে বড় হয়। কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে ইউরোপীয়রা গিয়ে মানুষ এবং কুকুর ছাড়া কোনো প্রকৃত স্তন্যপায়ী প্রাণীর সাক্ষাৎ পায়নি। গরু, ঘোড়া, শূকর, বিড়াল, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি আমাদের অতি পরিচিত স্তন্যপায়ী প্রাণী অস্ট্রেলিয়াতে আগে ছিল না, ইউরোপয়ীরা এ সকল প্রাণী সেখানে নিয়ে গেছে। এর অর্থ হল এশিয়া বা আফ্রিকায় স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব ঘটার আগেই অস্ট্রেলিয়া অবশিষ্ট পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই সেখানে কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণী যেতে পারেনি। ১৫-২০ হাজার বছর আগে এশিয়া থেকে শিকারি যুগের আদিম মানুষ নৌকায় চড়ে সাথে করে পোষা কুকুর নিয়ে গিয়েছিল বলেই অস্ট্রেলিয়াতে মানুষ ও কুকুর পৌঁছেছিল। প্রাণীর বিবর্তনের ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে, প্রায় সাত কোটি বছর আগে পৃথিবীতে সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছিল। সরীসৃপ এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যবর্তী পর্যায়ের প্রাণী হল প্লাটিপাস, ক্যাঙারু প্রভৃতি আধা-স্তন্যপায়ী প্রাণী। অস্ট্রেলিয়া এশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ফলেই মাত্র সেখানে ক্যাঙারু প্রভৃতি প্রাণী টিকে আছে, অবশিষ্ট পৃথিবীতে আধা-স্তন্যপায়ীরা লোপ পেয়েছে।× (অনুরূপ কারণে অবশ্য আমেরিকা মহাদেশেও অন্য কয়েক ধরনের আধা-স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে।) এ বিচার থেকে সহজেই বোঝা যাবে যে, অন্তত সাত কোটি বছর আগেই অস্ট্রেলিয়া এশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। ফলে এশিয়া থেকে ১৫-২০ হাজার বছর আগে যখন শিকারি যুগের মানুষ ডোঙ্গা, ভেলা প্রভৃতি আদিম জলযানের সাহায্যে অস্ট্রেলিয়াতে গিয়ে পৌঁছায় তখন তারা অবশিষ্ট পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এশিয়া-আফ্রিকা-ইউরোপের মানুষ এর পর যে সকল সভ্যতা-সংস্কৃতি অর্জন করেছে তার কোনো সংবাদ অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের কাছে পৌঁছায়নি। অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার সময় ঐ আদি অস্ট্রেলীয়রা বৃহত্তর মানবসমাজের কাছ থেকে যেটুকু সংস্কৃতি নিয়ে যেতে পেরেছিল তাই ছিল তাদের প্রাথমিক সম্বল। ঐ আদি সংস্কৃতি ছিল শিকারি যুগের সংস্কৃতি বা পুরাতন পাথরের যুগের সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির বিবরণ আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে প্রদান করেছি। বস্তুত, অস্ট্রেলিয়ার শিকারি সমাজের আচরণ থেকেই আমরা আদিম সমাজ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা শিকারি যুগের সংস্কৃতি নিয়ে সেখানে গিয়েছিল এবং শিকারি যুগেই তারা আটকে ছিল। এমনকি কৃষিকাজ পর্যন্ত তারা আবিষ্কার করতে পারেনি। এ জন্য অবশ্য তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। মগজে বা বুদ্ধিতে তারা আমাদের মতোই আধুনিক মানুষ, কিন্তু এ ধরনের যুগান্তকারী সামাজিক-অর্থনৈতিক আবিষ্কার কোনো একটা বিচ্ছিন্ন জাতি করতে পারে না। সমগ্রভাবে মানবসমাজই মাত্র এ রকম আবিষ্কার সাধনে সক্ষম। বৃহত্তর মানবসমাজের ব্যাপক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পশ্চিম এশিয়ার কোনো এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলেই সেখানে কৃষি, পশুপালন ও অন্যান্য নবোপলীয় আবিষ্কার সাধন সম্ভব হয়েছিল। পশ্চিম এশিয়ার মানুষ বিশেষ বুদ্ধিমান ছিল বলেই ঐ সব আবিষ্কার করতে পেরেছে একথা ভাবা ঠিক নয়। আসলে ইউরোপ-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের দরুন বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতা অর্জন করেছিল। এ সকল জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা যেখানে কেন্দ্রীভূত হয় সেখানে যদি অনুকূল সামাজিক পরিস্থিতি থাকে তবেই সেখানে নতুন উৎপাদনব্যবস্থা, সমাজ সংগঠন ইত্যাদির আবিষ্কার হতে পারে। নতুন উৎপাদনব্যবস্থা, নতুন সংস্কৃতি ইত্যাদি আবিষ্কৃত হওয়ার পর তা অন্যত্র সহজেই বিস্তার লাভ করতে পারে। কিন্তু ভিন্ন

* প্রাণীর বিবর্তনের ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ আবদুল হালিম প্রণীত 'বিশ্বজগতের পরিচয়'।

www.icsbook.info

ভিন্ন জাতির পক্ষে পৃথক পৃথকভাবে নতুন করে ঐ সব আবিষ্কার সাধন সম্ভব নয়। কারণ ভিন্ন ভিন্ন বিচ্ছিন্ন জাতির অভিজ্ঞতার পরিসর বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে খুব কম। এ কারণেই পশ্চিম এশিয়া থেকে নবোপলীয় কৃষি সংস্কৃতি যখন সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছিল তখন তা এমনকি এশিয়া থেকে চার হাজার মাইল দূরে হাওয়াই দ্বীপে পর্যন্ত পৌঁছেছিল। অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূলের নিকটবর্তী নিউগিনি দ্বীপে পর্যন্ত নবোপলীয় কৃষি সংস্কৃতি পৌঁছেছিল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা তার আগেই এশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন রয়ে গিয়েছিল বলে সেখানে নতুন পাথরের যুগের সংস্কৃতির উদ্ভব হয়নি। এ কারণেই নিউগিনির মানুষ মাটির পাত্রের ব্যবহার জানে, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা জানে না। কারণ মাটির পাত্র নির্মাণের কৌশল মানুষ আবিষ্কার করেছিল নবোপলীয় যুগে অর্থাৎ আজ থেকে আট-দশ হাজার বছর আগে, আর অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা সেখানে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল ১৫-২০ হাজার বছর আগে। মাটির পাত্র এবং কুমোরের চাক আমাদের কাছে যত সাধারণ বা তুচ্ছই মনে হোক না কেন, অনুকূল পরিবেশে মানবসমাজ একবারই তার আবিষ্কার করতে পেরেছিল। তারপর থেকে অনুকরণের মাধ্যমে এর নির্মাণকৌশল সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে। কোনো বিচ্ছিন্ন মানবগোষ্ঠীর পক্ষে দ্বিতীয় বার স্বতন্ত্রভাবে মাটির পাত্র নির্মাণ বা কুমোরের চাক আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি, বা তা সম্ভব নয়। অস্ট্রেলিয়ার মানুষদের দৃষ্টান্ত নিয়ে এ কথাটা অনুধাবন করতে পারলে আমরা মানুষের ইতিহাসের বিকাশের নিয়ম সম্পর্কে একটা সত্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হব। এ সত্য হল, কোনো জাতি বা গোষ্ঠী যদি বৃহত্তর মানবসামজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনুন্নত সংস্কৃতির স্তরে আটকে থাকে তবে উচ্চতর সমাজের সংস্পর্শ বা সাহায্য ছাড়া তার পক্ষে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ বা নিজ প্রচেষ্টায় উচ্চতর পর্যায়ের সমাজে উত্তরণ সম্ভব নয়। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা বহু হাজার বছর ধরে শিকারি সমাজের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এ গণ্ডি ছাড়িয়ে উচ্চতর অর্থাৎ কৃষি বা পশুপালক সমাজের পথে অগ্রসর হওয়ার কোনো প্রবণতা বা লক্ষণ তাদের মধ্যে দেখা যায়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ছাড়াও, সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা বা ঐতিহ্যগত রক্ষণশীলতার বাধার দরুনও অনেক জাতি পারিপার্শ্বিক জগৎ বা বৃহত্তর মানব জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে। যেমন, আমাদের দেশের অনেক উপজাতি উন্নততর সভ্যজাতির ভৌগোলিক সংস্পর্শে থাকলেও, সামাজিক রীতিনীতির রক্ষণশীলতার প্রাচীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন বলে উন্নত জীবনযাত্রা, চিন্তাধারা প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

ওশেনিয়ার ইতিহাস

অস্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহকে একত্রে নাম দেওয়া হয়েছে ওশেনিয়া (Oceania)। অবশ্য জাপান, ফিলিপাইন ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপসমূহকে এ হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হয়। আবার ওশেনিয়ার সাথে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপসমূহকে যোগ দিয়ে একত্রে অস্ট্রেলেশিয়া বলা হয়। ওশেনিয়া বলতে বোঝায় ঃ (১) অস্ট্রেলিয়া ও টাসমানিয়া (২) মেলানেশিয়া দ্বীপসমূহ (৩) মাইক্রোনেশিয়া দ্বীপসমূহ (৪) পোলিনেশিয়া দ্বীপসমূহ। মেলানেশিয়া নামের অর্থ কৃষ্ণ দ্বীপ ঃ দ্বীপের অধিবাসীদের কালো রঙের জন্যই এ নামকরণ হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে অবস্থিত নিউগিনি থেকে শুরু করে পূর্ব দিকে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত দ্বীপগুলি মেলানেশিয়া নামে পরিচিত।

www.icsbook.info

মেলানেশিয়ার অন্তর্গত অন্যান্য দ্বীপ হল ঃ বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জ, সলোমান দ্বীপপুঞ্জ, নিউ হেব্রাইডিস দ্বীপপুঞ্জ, লয়ালটি দ্বীপপুঞ্জ ও নিউ ক্যালেডোনিয়া দ্বীপপুঞ্জ। মেলানেশিয়ার উত্তরাঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে মাইক্রোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ। মাইক্রোনেশিয়া নামের অর্থ ছোট ছোট দ্বীপ; দ্বীপগুলির ক্ষুদ্র আকৃতির জন্য এ নাম দেয়া হয়েছে। মাইক্রোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মারিয়ানাস্, ক্যারোলিনস্, মার্শাল ও গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ। পোলিনেশিয়ার দ্বীপসমূহ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত। পোলিনেশিয়া নামের অর্থ হল 'অনেক দ্বীপ'। ১৭ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ১১ ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমার মধ্যে এ দ্বীপগুলি ছড়িয়ে রয়েছে। উত্তরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণে নিউজিল্যান্ড ও পূর্বে ইস্টার দ্বীপ— এ তিনটিকে যোগ করলে যে ত্রিভুজের উৎপত্তি হবে, তার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকেই পোলিনেশিয়া দ্বীপাবলী বলা হয় (হাওয়াইয়ের অবস্থান হল ১৫৫ ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমা ও ২০ ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখার ছেদ বিন্দুতে এবং ইস্টার দ্বীপের অবস্থান হল চিলির পশ্চিমে ১১৯ ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমার উপর)। পোলিনেশিয়ার অন্যান্য দ্বীপ হল ঃ টোঙ্গা, সামোয়া ও ফিনিক্স দ্বীপপুঞ্জ (নিউজিল্যাণ্ড-এর মোটামুটি উত্তরে অবস্থিত) এবং সোসাইটি ও মারকুইসাস দ্বীপপুঞ্জ (নিউজিল্যাণ্ডের উত্তর-পূর্ব দিকে, মাঝ প্রশান্ত মহাসাগরে)। সুপরিচিত দ্বীপ তাহিতি সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত।

অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাস আলোচনাকালে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সেখানে ১৫-২০ হাজার বছর আগে শিকারি মানুষরা গমন করেছিল। ওশেনিয়ার দ্বীপসমূহে মানুষ গিয়ে বাস স্থাপন করেছিল আরও পরে, নবোপলীয় যুগে। অস্ট্রেলিয়া ছাড়া ওশেনিয়ার সব দ্বীপেই নতুন পাথরের যুগের সংস্কৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় এসব সমাজে এশিয়া-ইউরোপের সভ্য সমাজের উচ্চতর সংস্কৃতি গিয়ে পৌঁছাতে পারেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ইউরোপীয়রা এ সকল দ্বীপে গিয়ে পৌঁছায় তখনও ঐ সব দ্বীপবাসীরা নতুন পাথরের যুগের সংস্কৃতিতেই আবদ্ধ ছিল। তবে ওশেনিয়ার দ্বীপবাসীরা স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী নতুন কলাকৌশল আয়ত্ত করেছিল। তারা মাছ শিকারের উন্নত কৌশল আয়ত্ত করেছিল এবং ছোট ছোট নৌকায় চড়ে সমুদ্রে বিচরণ করতে শিখেছিল। পোলিনেশীয়রা সমুদ্রের ঢেউ পর্যবেক্ষণ করে তার ভিত্তিতে সমুদ্রের মানচিত্র তৈরি করেছিল। লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি কাঠি সাজিয়ে তাদের দড়ি দিয়ে বেঁধে তারা ঐ মানচিত্র তৈরি করত। এ মানচিত্র নিয়ে দিকচিহ্নহীন বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরে তারা অনায়াসে চলাফেরা করত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পোলিনেশিয়ার মোট লোকসংখ্যা ছিল দশ লক্ষ। কিন্তু ইউরোপীয়দের থেকে সংক্রামিত রোগে এবং তাদের অত্যাচারের ফলে ১৯০০ শতকের মধ্যেই পোলিনেশিয়ার অধিবাসীদের তিন-চতুর্থাংশ মানুষ লোপ পেয়েছিল।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইস্টার দ্বীপ ও আরও কয়েকটি দ্বীপের সংস্কৃতি ছিল ওশেনিয়ার অন্যান্য দ্বীপের সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বস্তুত, ইস্টার দ্বীপের সংস্কৃতির রহস্য পণ্ডিতদের খুবই আশ্চর্য করেছে। ইস্টার দ্বীপটি কোথাও ১৫ মাইলের বেশি চওড়া নয় এবং এর আয়তন মাত্র ৪৬ বর্গমাইল। ১৭৭২ সালের ইস্টার সানডেতে (রবিবারে) যখন ওলন্দাজরা এ দ্বীপটিকে আবিষ্কার করে তখন এর জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৪ হাজার। দ্বীপের অধিবাসীরা নবোপলীয় কৃষি সংস্কৃতিরই মানুষ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এ দ্বীপে বহুসংখ্যক বিশাল পাথরের মূর্তি এবং নানাপ্রকার

www.icsbook.info

চিহ্ন খোদাই করা কাঠের ফলক পাওয়া গেছে। বিশাল পাথরের বেদীর উপর স্থাপিত এ সকল মূর্তি ছিল ১২ থেকে ১৫ ফুট উঁচু এবং কোনো কোনো মূর্তির ওজন ছিল ৫০ টন (প্রায় ১৩৫০ মণ)। এসব মূর্তি কারা তৈরি করল, কেমন করে বহন করে আনল তা এক রহস্য। মূর্তি ছাড়াও ইস্টার দ্বীপে পাথরের বাড়ি, পাথরের বেদী, আধা পিরামিডজাতীয় স্থাপত্য ইত্যাদি দেখা গেছে। স্থানীয় আদিবাসীরা বলেছিল যে, মূর্তিগুলিকে পাথরের নুড়ির উপর স্থাপন করে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হত এবং গাছের ছাল দিয়ে তৈরি দড়ির সাহায্যে টেনে দাঁড় করানো হত। স্থানীয় লোকশ্রুতি অনুসারে, অন্যত্র থেকে তাদের পূর্বপুরুষ এসে এ দ্বীপে বাস স্থাপন করেছিল। দ্বীপটি দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত চিলি দেশটি থেকে ২ হাজার মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। আমেরিকা মহাদেশের ইন্‌কা বা আজটেক সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত কোনো মানুষের দল ইস্টার দ্বীপে এসে বাস স্থাপন করেছিল কি না এবং তারাই ঐ পাথরের মূর্তির সৃজক কি না সে বিষয়ে পণ্ডিতরা একমত হতে পারেননি।

ইস্টার দ্বীপের আদি অধিবাসীরা আজ বিলুপ্তির পথে। ইউরোপীয়রা সেখানে যাওয়ার একশ বছরের মধ্যে ঐ দ্বীপের আদিবাসীদের সংখ্যা ৪ হাজার থেকে কমে ১৭৫-এ এসে দাঁড়ায়। ১৮৮৮ সালে চিলি এ দ্বীপটিকে দখল করে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের এক প্রান্তে হটিয়ে দিয়ে বাকি অংশকে ভেড়ার চারণভূমিতে পরিণত করে। ১৯৫২ সালে আদিবাসীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০০ জন।

অস্ট্রেলেশিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া ও ওশেনিয়াকে বাদ দিলে বাকি থাকে তার এশীয় দ্বীপসমূহ; যথা, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ফিলিপাইন। এ সকল অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস অস্ট্রেলিয়া বা ওশেনিয়ার মতো অপরিবর্তিত থাকেনি। সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপে খ্রিস্টীয় প্রথম থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় উপনিবেশ ও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফিলিপাইনেও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আফ্রিকা মহাদেশের প্রাচীন ইতিহাস

আফ্রিকায় নবোপলীয় কৃষি সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করার পর থেকে সাহারার দক্ষিণের আফ্রিকার ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তার ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা। আফ্রিকার উত্তরাংশে মিশর, কার্থেজ এবং প্রায় সমগ্র উত্তর উপকূলে প্রাচীন পৃথিবীর উচ্চতম সভ্যতার উদয় হয়েছিল। কিন্তু সাহারার দক্ষিণে অবস্থিত সমস্ত নিম্ন আফ্রিকার অধিবাসীরা শিকারি বা কৃষিযুগের ট্রাইব সংস্কৃতির চেয়ে বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। আফ্রিকার উত্তরাংশে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত বিশাল সাহারা মরুভূমির জন্য ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল থেকে অবশিষ্ট আফ্রিকা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। আবার সমুদ্রপথেও আফ্রিকার ভিতর অন্য দিক দিয়ে প্রবেশ করা কঠিন ছিল, যদিও তার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল বেষ্টন করে রয়েছে ভারত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর। কারণ আফ্রিকার উপকূল পোতাশ্রয় হিসাবে সুবিধাজনক নয়, তীরের কাছে সমুদ্র তরঙ্গবহুল এবং নদীগুলিও নৌ-পরিবহণের উপযুক্ত নয়। তার উপর মহাদেশের ভিতরে প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু পার্বত্যভূমি এবং দেশের অভ্যন্তরে রয়েছে জলাভূমি ও গভীর অরণ্য। এ কারণে

www.icsbook.info

প্রাচীনকালে ফিনিশীয় নাবিকদের সহায়তায় নানা সভ্যদেশ সমুদ্রপথে আফ্রিকার অভ্যন্তরে পৌঁছার চেষ্টা করলেও তা সফল হয়নি।

কিন্তু মধ্য বা দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হলেও, আফ্রিকা মহাদেশের অভ্যন্তরভাগ কিন্তু মানুষের বসবাসের অযোগ্য নয়। সেখানে আছে শীতল উপত্যকা, বিশাল তৃণভূমি, উর্বর নদী উপত্যকা। এ ছাড়া সোনা, হাতির দাঁত, উটপাখির পালক, পশুর চামড়া প্রভৃতি আহরণ করার কৌশল জানত আফ্রিকার প্রাচীন অধিবাসীরা এবং এ সকল মূল্যবান পদার্থ দিয়ে তারা মিশর ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলির সাথে বাণিজ্য-বিনিময়ও করত। পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলের অধিবাসীরা চাষবাসের কাজে বেশ সাফল্য লাভ করেছিল। পশ্চিম আফ্রিকায় ছিল কয়েকটি সুদীর্ঘ নদী— যেমন, ২৬০০ মাইল লম্বা নাইজার নদী, ৫৬০ মাইল লম্বা সেনেগাল নদী, ৩৫০ মাইল লম্বা গাম্বিয়া নদী। নদীগুলির মাধ্যমে আফ্রিকার প্রাচীন অধিবাসীরা সুদীর্ঘ অঞ্চল জুড়ে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রাখত।

আফ্রিকাতে শিকারি সংস্কৃতির আধুনিক মানুষ ২০-২৫ হাজার বছর আগে থেকেই ছিল। তখন ছিল বরফ যুগ, সাহারা মরুভূমি তখন ছিল তৃণভূমি। সে যুগের শিকারী মানুষরা সারা দক্ষিণের আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এর পর বরফ যুগের অবসানে যখন আট দশ হাজার বছর আগে পশ্চিম এশিয়াতে নতুন পাথর যুগের কৃষি সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে তখন উত্তর আফ্রিকাতেও তার বিস্তার ঘটে। কিন্তু বরফ যুগের অবসানে উত্তর আফ্রিকার জলবায়ুতে গভীর পরিবর্তন ঘটে ঃ সাহারার তৃণভূমি এ সময়ে ক্রমশ মরুভূমিতে পরিণত হয়। সাহারা অঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষরা এর ফলে বাধ্য হয়ে দক্ষিণে সরে যায়। এ কৃষি সমাজের মানুষদের সাথে আগেকার শিকারি সমাজের মানুষদের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে পরবর্তীকালের সাহারার দক্ষিণস্থ আফ্রিকার জনসমাজ। সাহারা অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার পর থেকেই নিম্ন আফ্রিকা বা আফ্রিকার মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চল অবশিষ্ট পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নিম্ন আফ্রিকায় তাই প্রধানত নবোপলীয় কৃষি ও পশুপালন সংস্কৃতি এবং পুরোপলীয় শিকারি সংস্কৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

আফ্রিকা মহাদেশে নানা জাতির মানুষ বাস করে। সাহারার উত্তরে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের দেশসমূহে প্রাচীনকাল থেকে হ্যামিটিক ভাষী শ্বেতাঙ্গ বারবার জাতির মানুষ বাস করত। পরবর্তীকালে এ অঞ্চলে সেমিটিকভাষী ইহুদী এবং আরব দেশের মানুষ আগমন করেছে। সাহারার দক্ষিণের আফ্রিকার অধিবাসীরা কৃষ্ণকায়। আফ্রিকার কৃষ্ণ অধিবাসীদের তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা চলে। পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে রয়েছে খাঁটি নিগ্রো জাতির মানুষ। উত্তর-পূর্বে মিশরের দক্ষিণ থেকে কেনিয়া পর্যন্ত মিশ্র হ্যামিটিক নিগ্রো জাতির মানুষ। আর সর্ব দক্ষিণে রয়েছে বান্টু জাতির মানুষ— এরা নিগ্রো ও অন্যান জাতির মিশ্রণে সৃষ্ট।

উত্তর আফ্রিকা থেকে সাহারার দক্ষিণের নিম্ন আফ্রিকায় উচ্চতর সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান অনুপ্রবেশ করলেও, নিম্ন আফ্রিকা উত্তর আফ্রিকা থেকে কার্যত সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। এর ফলে মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মানুষরা এশিয়া-ইউরোপের উচ্চতর সভ্যতা থেকে প্রায় কিছুই উপকার পায়নি। এ কারণে, ইউরোপীয়রা পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে আফ্রিকায় যাওয়ার আগে বহু হাজার বছরের

www.icsbook.info

মধ্যে আফ্রিকাবাসীদের সমাজ ও অর্থনীতিতে কোন উল্লেখযোগ্য বিকাশ বা পরিবর্তন ঘটেনি। সাহারার দক্ষিণের আফ্রিকায় লাঙল বা চাকার প্রচলন হয়নি, লেখন ও লিপির প্রচলন হয়নি, পঞ্জিকা বা অংক পাতন পদ্ধতির প্রচলন হয়নি। কারণ আফ্রিকার নিগ্রো জাতিরা নবোপলীয় কৃষি সংস্কৃতির চেয়ে উচ্চতর সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হয়নি। অর্থাৎ সেখানে ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতার বিস্তার ঘটেনি। অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাস আলোচনাকালে আমরা ব্যাখ্যা করেছি যে, বিচ্ছিন্নভাবে কোন জাতির পক্ষে উচ্চতর সমাজে উত্তরণ লাভ সম্ভব নয়। অর্থাৎ আফ্রিকার মানুষরা ব্রোঞ্জ যুগের বা লৌহযুগের সমাজ নির্মাণ করতে পারত যদি মিশর বা গ্রীসের সভ্যতার সাথে তাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হত বা তার প্রভাব লাভ করত। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার দরুন দক্ষিণের আফ্রিকা অবশিষ্ট পৃথিবীর উচ্চতর সংস্কৃতির কাছ থেকে উন্নততর সমাজব্যবস্থার কলাকৌশল লাভ করতে পারেনি এবং সে কারণে অনুন্নত সমাজব্যবস্থাতেই আটকে থেকেছে।

ইউরোপীয়রা যাওয়ার আগে পর্যন্ত নিরক্ষীয় ও দক্ষিণের আফ্রিকার মানুষরা অধিকাংশই নবোপলীয় কৃষি সংস্কৃতির পর্যায়ে ছিল। তবে বুশম্যান, পিগমী প্রভৃতি কিছু কিছু জাতির মানুষ আদিম ধরনের শিকারি বৃত্তিতে নিয়োজিত ছিল। আবার কিছু কিছু উপজাতির মানুষ পশুপালনেও নিযুক্ত ছিল— যেমন, পূর্ব আফ্রিকার নান্দী ও মাসাই উপজাতি। মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকা নবোপলীয় সংস্কৃতি পর্যায়ে থাকলেও, আফ্রিকাবাসীরা লোহা নিষ্কাশন ও লোহার হাতিয়ার তৈরি করার কৌশল জানত। এর অর্থ হল উত্তর আফ্রিকার উন্নত অঞ্চল থেকে লোহার ব্যবহার দক্ষিণের আফ্রিকাতে বিস্তার লাভ করেছিল। তবে এ রকম দু' একটি সাংস্কৃতিক উপাদান বা কারিগরি বিদ্যা দক্ষিণাঞ্চলে প্রবেশ করলেও, এ অঞ্চল ছিল প্রকৃতপক্ষে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন।

আফ্রিকার কৃষ্ণ অধিবাসীরা ট্রাইব সমাজে সংগঠিত ছিল, কারণ তারা শিকারি এবং কৃষি সংস্কৃতির পর্যায়েই আবদ্ধ ছিল। আফ্রিকার সর্বত্রই এরা নবোপলীয় গ্রামে সংগঠিত হয়ে বাস করত। ট্রাইব সমাজের পরিচয় আমরা আগেই প্রদান করেছি। এখানে আর তার পুনরুল্লেখ করা হল না। তবে মধ্য দক্ষিণ আফ্রিকার এ সকল ট্রাইব সমাজে যেমন লোহা প্রভৃতি কারিগরি বিদ্যার প্রবেশ ঘটেছিল, তেমনি উচ্চতর সমাজের ভাবাদর্শও কিছু পরিমাণে প্রবেশ করেছিল। যেমন, বুশম্যানদের মধ্যে বংশানুক্রমিক সর্দারের প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু আদি ট্রাইব সমাজে গোষ্ঠীপ্রধানের পদ বংশানুক্রমিক ছিল না। উত্তর আফ্রিকার শ্রেণী বিভক্ত সমাজের প্রভাবেই এটা ঘটা সম্ভব। অস্ট্রেলিয়া বাইরের জগতের প্রভাবমুক্ত ছিল বলে সেখানে কোথাও বংশানুক্রমিক সর্দারের প্রথার সৃষ্টি হয়নি। আবার, বুশম্যান ও অন্যান্য কিছু কিছু উপজাতির মধ্যে দেবতায় বিশ্বাস ও দেবপূজার রেওয়াজ দেখা যায়। অথচ, আদি ট্রাইব সমাজে ছিল যাদু বিশ্বাস এবং টোটেম বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান। ধর্ম বিশ্বাস ও দেবপূজার প্রচলন হয় ব্রোঞ্জযুগে। সভ্যসমাজের প্রভাবেই আফ্রিকার উপজাতিদের মধ্যে ধর্ম বিশ্বাসের প্রচলন হয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মিশর, দক্ষিণ আরবের মানুষ ও ফিনিশীয়রা মাঝে মাঝেই আফ্রিকার অভ্যন্তরে সম্পদের খোঁজে প্রবেশের চেষ্টা করত। ৩০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আরবের বণিকরা আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের অধিবাসীদের সাথে পণ্য বিনিময় করতে শুরু করে। প্রাচীন মিশরীয় সম্রাটদের বাণিজ্য বহর নীলনদ দিয়ে এবং

www.icsbook.info

আফ্রিকার পূর্ব উপকূল দিয়ে আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করেছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, মিশরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব নীলনদের পথে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে ক্রমশ মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকায় পৌঁছেছিল। এ পথে ভাবাদর্শগত চিন্তাধারা ও বস্তুগত উপাদান কৃষ্ণ আফ্রিকার আদিম চিন্তার উপর আরোপিত হলে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ধাতুর কারিগর, কাঠ খোদাই প্রভৃতি হয়তো মিশর থেকেই কৃষ্ণ আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করেছিল।

রোমান যুগে বর্তমান ইথিওপিয়ায় অবস্থিত এক্সাম অঞ্চলটি গুরুত্ব অর্জন করে। রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশ যখন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন এক্সাম্ অঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম প্রসার লাভ করে। অষ্টম শতাব্দীতে ইসলাম ধর্ম উত্তর আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করলে ইথিওয়পিয়া খৃষ্টীয় ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ইথিওপিয়াতে এখনও খ্রিস্টধর্ম বিদ্যমান আছে।

মুসলমানদের উত্তর আফ্রিকা বিজয়ের পর মুসলিম বার্‌বার্ ও আরবরা সাহারা অতিক্রম করে দক্ষিণ ও পশ্চিম আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ল। ইতিপূর্বে উত্তর আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গরা চতুর্থ শতাব্দীতে ঘানায় একটি রাষ্ট্র স্থাপন করেছিল। এ রাষ্ট্র ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। অবশ্য নিগ্রোরা ক্রমশ বিজয়ীদের আত্মস্থ করে নিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকায় রাজা এ রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। দশম শতাব্দীর পর মুসলিম বারবার জাতি ঘানা আক্রমণ করে। অবশেষে ঘানা অংশত মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলেও অনেকগুলি মুসলিম রাজ্য স্থাপিত হয়। একালের ইতিহাস মধ্যযুগের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আফ্রিকার প্রাচীন অধিবাসীরা অবশিষ্ট পৃথিবী থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন থাকার দরুন অনুন্নত সমাজেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু সে জন্য তাদের বুদ্ধিহীন ভাবার কোনো কারণ নেই। যখনই তারা কোনো নতুন কলাকৌশলের সাক্ষাৎ পেয়েছে, তা তারা আশ্চর্য দক্ষতার সাথে গ্রহণ করেছে। যেমন, ইউরোপীয়রা ষোল শতকে আফ্রিকায় যাওয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণ অধিবাসীরা অল্পকালের মধ্যেই লোহার ব্যবহার শিখে তীরের ফলক তৈরির কাজে হাড় বা পাথরের পরিবর্তে লোহার ব্যবহার শুরু করে। কৃষ্ণ আফ্রিকীয়দের দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তির আরেকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আফ্রিকার মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতি বাস করলেও তারা নিজেদের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য টমটম বা ঢাক বাজিয়ে খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। ঢাকের সংকেত সব উপজাতির মানুষ বুঝতে পারে। এক গ্রামের ঢাকের আওয়াজ শুনলে আরেক গ্রামের লোক ঢাক বাজিয়ে সে খবর আরও দূরে পাঠিয়ে দেয়। এভাবে আফ্রিকার কৃষ্ণ অধিবাসীরা একদিনের মধ্যে আফ্রিকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে খবর পাঠাতে পারত।

ইউরেশিয়ার বর্বর জাতিদের ইতিহাস

ইতিপূর্বে আলোচনায় আমরা দেখেছি যে খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম শতকে দক্ষিণ ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় ছিল রোমক সাম্রাজ্যের লৌহযুগের সভ্যতা। ভারতবর্ষ, চীনে ছিল লৌহযুগের উচ্চ সভ্যতা। চীনের প্রভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রভাবে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সে সময়

www.icsbook.info

লৌহযুগের সভ্যতা কিছু পরিমাণে বিস্তার লাভ করেছিল। অপর পক্ষে, আমেরিকা মহাদেশে প্রায় সর্বত্র ছিল শিকারি সমাজ। কোনো কোনো স্থানে কৃষিসমাজ; এবং কয়েকটি স্থানে ব্রোঞ্জযুগের তুল্য সমাজের (মায়া, আজটেক, ইন্‌কা সভ্যতার) উদয় ঘটেছিল। আমরা আরো দেখেছি যে, একই কালে অস্ট্রেলিয়াতে ছিল আদিম শিকারি সমাজ; ওশেনিয়াতে ছিল নতুন পাথরের যুগের কৃষিসমাজ; আফ্রিকার মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলে ছিল নবোপলীয় যুগের কৃষিসমাজ ও স্থানে স্থানে শিকারি সমাজ। কিন্তু মধ্য ও উত্তর এশিয়া এবং মধ্য ও উত্তর ইউরোপের সমগ্র অঞ্চল এ হিসাব থেকে বাদ রয়ে গেছে। অথচ ইউরেশিয়ার (ইউরোপ-এশিয়ার) এ অঞ্চলে আধুনিক কালের উন্নততম রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন, এ অঞ্চলে রয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া, জার্মানী, সুইডেন প্রভৃতি দেশ। খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকে এসব অঞ্চল জনবিরল ছিল না। ইউরেশিয়ার এ ব্যাপক অঞ্চলে বিভিন্ন বর্বর জাতির মানুষ বাস করত। এ বর্বর সমাজের উদয় কেমন করে হল তা আলোচনা করা যাক।

আমরা দেখেছি, পৃথিবীতে প্রথমে পুরানো পাথরের যুগের সংস্কৃতির উদয় হয়েছিল এবং এ সংস্কৃতি সব কটি মহাদেশে বিস্তার লাভ করেছিল। প্রায় দশ হাজার বছর আগে নবোপলীয় (নতুন পাথরের যুগের) কৃষি সংস্কৃতির উদয় হওয়ার পর শিকারি সমাজ লোপ পায় এবং পৃথিবীর সর্বত্র কৃষি সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। তবে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও সংস্কৃতিগত রক্ষণশীলতার দরুন অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে, আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলে, এস্কিমোদের দেশে শিকারি যুগের সংস্কৃতি বজায় থেকে গিয়েছিল। নবোপলীয় সংস্কৃতি আবার নতুন করে এবং শিকারি সমাজের চেয়ে ব্যাপকভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। নবোপলীয় সংস্কৃতির প্রভাবে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার আদিম শিকারি সমাজ বিলুপ্ত হয় অথবা নবোপলীয় সমাজে রূপান্তরিত হয়। নবোপলীয় কৃষিসমাজ মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করলেও, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার দরুন অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ লাভ করেনি। আর বরফাচ্ছন্ন তুন্দ্রা অঞ্চলে (এস্কিমোদের দেশে) নবোপলীয় কৃষি সংস্কৃতির সুবিধা ছিল না বলে সেখানেও শিকারি সমাজই বজায় ছিল।

মধ্য এশিয়া ও সন্নিহিত অঞ্চলে রয়েছে সুবিস্তৃত তৃণভূমি; কৃষিকাজ অসুবিধাজনক বলে সেসব অঞ্চলে পশুপালনের প্রথা বিস্তার লাভ করে। মনে থাকতে পারে যে, কৃষি ও পশুপালন হল নবোপলীয় অর্থনীতির দুটো প্রধান শাখা। মধ্য এশিয়ায় জমির অনুর্বরতা, চারণভূমির অভাব প্রভৃতি কারণে যাযাবর পশুপালক দলের উদয় হয়। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ সাত-আট হাজার বছর আগে এদের হাতিয়ার ও সরঞ্জাম ছিল নবোপলীয় যুগেরই স্তরের। কিন্তু তাদের নিকটবর্তী পারস্য, পশ্চিম এশিয়া, চীন প্রভৃতি সভ্যতার প্রভাবে এরা কালক্রমে ব্রোঞ্জ ও লৌহযুগের হাতিয়ার, সরঞ্জাম এবং কলাকৌশল সংগ্রহ ও আয়ত্ত করে। যেমন, মধ্য এশিয়ার বর্বর জনগোষ্ঠী ঘোড়ায় টানা চাকাওয়ালা গাড়ি, ব্রোঞ্জ ও লোহার অস্ত্র, ধাতুনির্মিত বর্ম, ঢাল প্রভৃতি আয়ত্ত করেছিল। মেসোপটেমিয়া ও অন্যান্য সভ্যতার কাছ থেকে বর্বররা যুদ্ধের কলাকৌশলও আয়ত্ত করেছিল। সভ্যতার দ্বারা কিছু কিছু প্রভাবিত হলেও, এ সকল বর্বর সমাজের মানুষ নবোপলীয় যুগের ট্রাইব সমাজের নিয়মেই সংগঠিত ছিল। এ সকল যুদ্ধপ্রিয় যাযাবর

www.icsbook.info

বর্বর গোষ্ঠী থেকেই বিভিন্ন সময়ে শক, হূন, মোঙ্গল প্রভৃতি গোষ্ঠীর উদয় হয়েছিল। মধ্যযুগের আলোচনাকালে আমরা এদের বিষয়ে বিশদ আলোচনা করব।

আমরা উল্লেখ করেছি যে, নবোপলীয় যুগে ইউরোপেও কৃষি সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের পার্বত্য ও বনময় জমিতে নবোপলীয় কৃষি সংস্কৃতির খুব বেশি বিস্তার ঘটা সম্ভব ছিল না। কারণ নবোপলীয় হাতিয়ার ছিল খুবই অনুন্নত। পাথরের হাতিয়ার দিয়ে পার্বত্য জমি আবাদ করা বা গাছ কেটে বন পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। এমনকি ব্রোঞ্জের হাতিয়ার দিয়েও গাছ কাটা সম্ভব নয়। ইউরোপে তাই লৌহযুগের আগে নবোপলীয় সংস্কৃতি ব্যাপক বিস্তার লাভ করেনি। লৌহযুগে যখন গ্রীস ও রোমের মানুষরা প্রাচীনকালের অতি উচ্চ সভ্যতা গড়ে তুলছিল, ইউরোপের মধ্য ও উত্তর অঞ্চলে তখন বর্বর সমাজের মানুষরা নবোপলীয় কৃষির বিস্তার ঘটাচ্ছিল। কিন্তু এ বর্বর সমাজ লৌহযুগের সভ্যতার অনেক কলাকৌশল এবং যুদ্ধবিদ্যাও আয়ত্ত করেছিল। স্থানীয় পরিবেশ অনুযায়ী এ সকল বর্বর সমাজের মানুষরা নানাপ্রকার কলাকৌশল, বিদ্যা ও দক্ষতা অর্জন করেছিল। এশিয়ার শক, হূন, মোঙ্গল প্রভৃতি সব বর্বর জনগোষ্ঠীই ছিল অশ্বচালনায়, ধনুর্বাণ ব্যবহারে সুদক্ষ। আবার উত্তর ইউরোপ, নরওয়ে প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষ ছিল জাহাজ নির্মাণে ও সমুদ্রবিদ্যায় পারদর্শী। অধিকাংশ বর্বর সমাজের মানুষই ছিল শিল্পকর্মে সুদক্ষ। তারা কাঠ, হাড়, সোনা, রূপা প্রভৃতি দিয়ে সুন্দর সুন্দর দ্রব্যাদি ও গয়না তৈরি করতে পারত।

খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যখন দক্ষিণ ইউরোপের রোমক সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল, তখন রোমক সাম্রাজ্যের উত্তর ও পূর্ব সীমান্তে ডানিউব নদীর অপর পারে বর্বর সমাজের মানুষরা বাস করত। মধ্য ইউরোপে রাইন ও এল্‌ব্‌ নদীর মধ্যবর্তী অংশে বাস করত জার্মান নামে পরিচিত বর্বর জাতি। জার্মানরা ভ্যাণ্ডাল, গথ, ফাঙ্ক, এ্যাংগ্‌ল, স্যাক্সন্‌ প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত ছিল। জার্মান বর্বর জাতির আক্রমণেই পরবর্তীকালে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল এবং এ বর্বর সমাজের মানুষরা বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করেছিল। জার্মানদের পূর্ব দিকে এল্‌ব্‌ নদীর পূর্ব তীরে ছিল স্লাভ্‌ জাতির বর্বর জনগোষ্ঠী। স্লাভরা পরবর্তীকালে তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্ব স্লাভরা হচ্ছে আধুনিক রুশ, ইউক্রেনীয় ও বাইলো রুশদের পূর্ব-পুরুষ। পশ্চিম স্লাভদের থেকে উৎপত্তি হয়েছে আধুনিক চেকোশ্লাভাকিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদের। দক্ষিণ স্লাভ জাতি থেকে উৎপত্তি হয়েছে বুলগেরিয়া, সার্বিয়া প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদের।

নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্কে যেসব বর্বর সমাজের মানুষ বাস করত তাদের একত্রে নাম দেওয়া হয়েছে ভাইকিং। এরা ডেন (অর্থাৎ ডেনমার্কবাসী) অথবা নর্স ম্যান বা নর্মান (অর্থাৎ নর্থ ম্যান বা উত্তরের মানুষ) নামেও পরিচিত। খ্রিষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তারা চাষাবাদই করত। কিন্তু নবম শতাব্দীতে সর্বত্র সমুদ্রপথে যুদ্ধ ও লুটতরাজের অভিযান চালাতে শুরু করলে এরা ভাইকিং নামে পরিচিত হয় এবং সর্বত্র ত্রাসের সঞ্চার করে। ভাইকিংরা সুদক্ষ নাবিক ছিল এবং স্থানীয় বনভূমির গাছ কেটে সুন্দর ও শক্ত জাহাজ নির্মাণ করতে পারত। এরা নানাপ্রকার লোহার অস্ত্র, ধাতুর হাতিয়ার এবং অলঙ্কার ও সুদৃশ্য দ্রব্যাদি তৈরি করতে পারত।

এশিয়া ইউরোপের বর্বর সমাজের মানুষদের পরিচয় আমরা দিলাম। এরা নবোপলীয় সমজের মানুষ হলেও, এরা ছিল লৌহযুগের সভ্যতার সমসাময়িক ও নিকট

www.icsbook.info

প্রতিবেশী। তাই এরা উন্নত সভ্যতার নানা উপকরণ ও উপাদান (লোহার হাতিয়ার প্রভৃতি) টুকরো টুকরো ও বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। তথাপি এরা ছিল মূলত নবোপলীয় বর্বর সমাজেরই মানুষ। এরা ছিল নবোপলীয় যুগের মতই ট্রাইব ও ক্ল্যানে সংগঠিত। এরা কৃষিকাজ এবং পশুপালনেই নিয়োজিত ছিল, তবে সভ্য সমাজের সংস্পর্শে এসে যুদ্ধবিদ্যাও আয়ত্ত করেছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মিশর, মেসোপটেমিয়া, রোম প্রভৃতি সব সাম্রাজ্যই বিভিন্ন সময়ে বর্বর মানুষদের জোর করে ধরে এনে সৈন্যদলে ভর্তি করত। এভাবেই সভ্য সমাজের রণকৌশল বর্বররা আয়ত্ত করেছিল। প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ইউরোপ এশিয়ার নানা সন্নিহিত অঞ্চলে উন্নত সভ্যতার বিস্তার ঘটা সত্ত্বেও, মধ্য এশিয়া ও মধ্য ইউরোপের বর্বর সমাজের মানুষরা কেন সভ্যতা নির্মাণ করেনি। এর দুটো কারণ সহজেই নির্দেশ করা চলে। প্রথমত, প্রাচীন ব্রোঞ্জ ও লৌহযুগের সভ্যতার অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল খুবই দুর্বল। একটা অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশে, উর্বর ও ফলনশীল অঞ্চলে এর উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ সম্ভব ছিল। এবং একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে শোষণ করেই মাত্র ব্রোঞ্জ ও লৌহযুগের সভ্যতার একটা সংকীর্ণ সুবিধাভোগী শ্রেণী একটা সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ সভ্যতা গড়ে তুলতে পেরেছিল। অপরপক্ষে, লৌহযুগের হাতিয়ার ও কারিগরি বিদ্যা হাতে পাওয়ায় ইউরেশিয়ার বর্বর সমাজ বলতে গেলে নবজীবন পেয়ে বিকাশ লাভ করেছিল। অনুন্নত হাতিয়ারের দরুন সভ্য অঞ্চলে যখন নবোপলীয় সংস্কৃতি লোপ পেয়ে গিয়েছিল, তখন ইউরেশিয়ার বর্বর সমাজ লোহার হাতিয়ার, ধাতুর কারিগরি, উন্নত লাঙ্গল ও চাষের পদ্ধতি ইত্যাদি জ্ঞান সভ্যদের কাছ থেকে নিয়ে তার সাহায্যে নবোপলীয় সমাজ ও অর্থনীতি অব্যাহত রাখে। সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত রক্ষণশীলতার জন্য ইউরেশিয়ার বর্বর সমাজ গভীর সংকটে না পড়া পর্যন্ত তাদের সমাজ, অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা ত্যাগ করতে পারছিল না। প্রথম আমলের নবোপলীয় যুগে সারা পৃথিবীতে সংস্কৃতির বিস্তার ঘটার পর জনসংখ্যা বাড়তে শুরু করলে এ রকম সংকট দেখা দিয়েছিল। তা থেকে মানব সমাজ উদ্ধার পেয়েছিল ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা সৃষ্টি করে। কিন্তু ইউরোপীয় বর্বর সমাজ সভ্যতার নানা উপকরণ সংগ্রহ করে নবোপলীয় সমাজকে দীর্ঘকাল টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। মাঝে মাঝে স্থানীয়ভাবে জনসংখ্যা বেড়ে গেলে বা অনাবৃষ্টির দরুন খাদ্যাভাব দেখা দিলে যে সংকট দেখা দিয়েছে তার ফলেই মাঝে মাঝে ঘটেছে বর্বর আক্রমণ— যেমন, শক, হুন ইত্যাদির বিজয় অভিযান। শেষ পর্যন্ত খ্রিষ্টীয় তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দীতে ইউরোপীয় বর্বর সমাজের নবোপলীয় অর্থনীতিতে মহাসংকট দেখা দেয়, প্রধানত জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন। কারণ নবোপলীয় অর্থনীতিতে এত বৃহৎ জনসংখ্যার পরিপোষণ আর সম্ভব হচ্ছিল না। এ পরিস্থিতিতেই বর্বর আক্রমণে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এর পরই মাত্র লৌহযুগের কারিগরি আবিষ্কার এবং ইউরোপীয় বর্বর জনসমাজের আয়ত্তাধীন কলাকৌশলের সংমিশ্রণে ইউরোপে গড়ে ওঠে সামন্ত কৃষি অর্থনীতি ও সংস্কৃতি। ইউরেশিয়ার অন্যান্য বর্বর জাতির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। মধ্যযুগে স্লাভরা পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়ায়, শক ও হুনরা ভারতবর্ষে ও মধ্য এশিয়ায় কালক্রমে সামন্ত সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। গ্রামীণ কৃষি নির্ভর সামন্ত অর্থনীতি ছিল বর্বর সমাজের বা রোমক প্রভৃতি লৌহযুগের সভ্যতার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপকভিত্তিক ও শক্তিশালী। এ সামন্ত সমাজের ইতিহাস মধ্যযুগের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

www.icsbook.info

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

1. The Emergence of man—John E. Pfeiffer (Harper & Row, New York, 1969).
2. The Science of man—Mischa Titiev (Henry Holte Co, New York).
3. Social Evolution—V. Gordon Childe.
4. History of Mankind—Jacquetta Hawkes and Leonard Woolley (London).
5. World Civilization, Vol. I—Edward Burns and Philip Ralph (W. W. Norton & Co. New York).
6. The Dawn of European Civilization—V. Gordon Childe.
7. The History of Black Africa, Vol. I—Endre Sik (Budapest).
8. History of Greece—J. B. Bury (London).
9. Scince in Antiquity—Benjamin Farrington (Oxford).
10. Shamanism: The beginning of art—Andreas Lommel (Mc Graw Hill, New York).
11. The Birth of Indian Civilization—Bridget and Raymond Allchin (Pelican Book).
12. The Culture and Civilization of Ancient India—D. D. Kosambi (Foutledge & Kegan Paul, London).
13. Legacy of China—Raymond Dawson (Ed), (Oxford).
14. Science and Civilization in China, Vol. I—Joseph Needham (Cambridge).
15. A History of Technology, Vol. I—Charles singer, et al. (Oxford).
16. A Short History of Scientific Ideas—Charles singer (Oxford).

www.icsbook.info

মানবসমাজ এক ও অখণ্ড। পৃথিবীর সব দেশের মানুষ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত এবং মানব সমাজের ইতিহাসও অখণ্ড ও অবিভাজ্য।

আধুনিক মানবসমাজের উৎপত্তি হয়েছিল একটা মাত্র উৎস থেকে। আদিম শিকারী মানুষ যে সমাজ সংগঠন এবং বস্তুগত ও ভাবগত সংস্কৃতি সৃজন করেছিল তার অনেক উপাদান আজকের পৃথিবীর সব কটি জাতির ও সমাজের মূলভিত্তিরূপে কাজ করছে। মানব সমাজ অবিভাজ্য একথা যেমন সত্য, মানব সমাজ খণ্ড খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন এ কথাও সমান সত্য। পৃথিবীর সব মানুষ মূলত এক হলেও তারা বিভিন্ন দেশ ও জাতিসত্তার অন্তর্গত।

মানুষের ইতিহাস মূলত ভিন্ন ভিন্ন জাতির খণ্ডিত ইতিহাসের যোগসমষ্টি।

'মানুষের ইতিহাস' গ্রন্থে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির সভ্যতার ও সংস্কৃতির ইতিহাস লিখিত হয়েছে। সাধারণভাবে যাকে পৃথিবীর ইতিহাস বা সভ্যতাবলীর ইতিহাস নামে অভিহিত করা হয়, এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু তাই।

মানুষের ইতিহাস বা মানব সভ্যতার বিকাশের ইতিহাস এমন একটা বিষয় যা প্রতিটি মানুষের পক্ষে জানা বিশেষভাবে আবশ্যক। বিশুদ্ধ বা বিমূর্ত জ্ঞান লাভের প্রয়োজনে মাত্র নয়, সমসাময়িক বিশ্বে নিজের এবং স্বদেশের অবস্থান জানার জন্য, স্বদেশ বা সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য মানুষের ইতিহাস অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

বাংলা ভাষায় রচিত এ গ্রন্থে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত, সূত্রানুগ সহ তথ্য ও তত্ত্ব সর্বাধুনিক এবং আকর্ষণীয়। প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ ছাড়াও অজস্র গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে সর্বাধুনিক আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করে সহজবোধ্য ও সুশৃঙ্খলভাবে বর্তমান গ্রন্থে উপস্থাপিত করা হয়েছে। বক্তব্যকে স্পষ্ট ও দৃশ্যমান করে তোলার জন্য বহুসংখ্যক ছবি ও মানচিত্র এ পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। বইয়ের ভাষা ও যুক্তি-বিশ্লেষণে প্রাঞ্জলতার কারণে এবং বইটির বিষয়বস্তুর বিচারে নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট এবং সকল শ্রেণীর পাঠকের পক্ষে সহজবোধ্য। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত গ্রন্থাগারে বইটির অন্তর্ভূক্তির আবশ্যিকতা অপরিসীম।

প্রচ্ছদ আবদুল মুকতাদির

www.icsbook.info